অধ্যাপক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ, ৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুরমা মিত্র

কন্যাপ্রতিমাসু—

আজ দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে

বিধাতা যখন নিলেন একটি চক্ষু হরণ করে',

তখন তুমি এসেছিলে আমার দ্বারে, বিদ্যার্থিনী হয়ে।

কতখানি তোমায় শিখিয়েছি,

তার মূল্য আমি জানি না।

কিন্তু এই দীর্ঘকাল ধরে'

তুমিই হয়েছিলে আমার চোখের দৃষ্টি।

তুমিই শোনাতে আমাকে পড়ে',

মুখে যা বলেছি এঁকে নিয়েছ তা তুমি তোমার লেখনীতে,

মুদ্রাকরের ভুলভ্রান্তি করেছ সংশোধন,

তাদের প্রমাদ সংস্কার লাভ করেছে

তোমার জাগ্রত অশিথিল দৃষ্টিতে।

তোমার জিজ্ঞাসায় কত তত্ত্বালোচনা হয়েছে উদ্বুদ্ধ,

দীর্ঘদিনের চিন্তাধারা তোমার কাছে হয়েছে অভিব্যক্ত।

সঞ্চার করেছ তুমি একটা প্রাণধর্ম্ম, তোমার সশ্রদ্ধ প্রশ্নে।

চিন্তার প্রজ্বলিত হোমানলে

নিরন্তর ঘটেছে তোমার তপস্যা;

সেই অগ্নিতে গড়ে' উঠেছ তুমি আমার মানসপুত্রী রূপে।

তাই সকল পুত্র-পুত্রীর মধ্যে তুমি অনুপম।

মেয়েটির বয়স আঠারো-উনিশ হবে। দেহ নাতিদীর্ঘ, রং আত্মীয়েরা বলবে উজ্জ্বল শ্যাম, শত্রুপক্ষ হয় ত' 'উজ্জ্বল' কথাটা উঠিয়ে দেবে। মুখে লাবণ্য ও স্নিগ্ধতার লীলালহর যেন খেলে' বেড়াচ্ছে। চোখ দু'টি বড়, উজ্জ্বল, অথচ দীপ্তিতে মৃগশিশুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হাস্যোজ্জ্বল, ক্রীড়াচঞ্চল বিলাসভঙ্গিতে তার গতির মধ্যে যেন একটি নাচের ছন্দ সৌন্দর্য্যে এলায়িত হয়ে চলেছে।

উভয়ের মধ্যে কোনও সঙ্কোচ নেই। হাস্যপরিহাসের কলধ্বনিতে বনভূমি তরঙ্গিত করে' দু'জনে চলেছে, যেন দু'টি বলাকা ডানার ছন্দে নীল আকাশকে গুঞ্জনমুখর করে' উড়ে' চলেছে।

ছেলেটির নাম সুকুমার বন্দোপাধ্যায়। বাপ করতেন ব্যারিষ্টারি রাওলপিণ্ডিতে। রেখে গিয়েছেন বিস্তর টাকা, যাতে লক্ষ্মীর স্বর্ণাসনকে চিরকাল অচঞ্চল করে' বেঁধে রাখা যায় বাড়ীর দেউড়িতে। শাসন রেখে গেছেন এমন পিচ্ছিল করে' যে যদি সম্ভব হ'ত তবে লক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিয়ে অলক্ষ্মীকে আবাহন করতে বেশী সময় লাগত না। ছেলেকে নিজের হাতে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ ছেলের চরিত্রের উপর। তাই বিষয় আশয় ছেলের উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে' দিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। ছেলেকে তিনি শিখিয়েছিলেন প্রচুর পরিমাণে দেহচর্চ্চা করতে। তাই ছেলের দেহরক্ষার জন্য তাঁকে দেবার্চ্চনা, মাদুলি বা তাবিজের শরণ নিতে হয় নি। নিজে কপর্দ্দকহীন অবস্থা থেকে স্ববুদ্ধিবলে ও স্বাবলম্বিতার গুণে প্রচুর ধন ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেছিলেন। তাই ছেলের মনের উপর নিরন্তর বিধিনিষেধের কড়া পাহারা তিনি বসাতে চাইতেন না। অনেকটা মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বভাবের আকাশ-বাতাসে স্বভাবের সহিত স্বাভাবিক দ্বন্দ্বে ও সংঙ্ঘর্ষে ছেলের মন গড়ে' উঠবে, বলিষ্ঠ হবে

অরণ্যানীর বনস্পতির মত, এই ধারণা নিয়ে তিনি ছেলেকে অযথা আশ্রয় বা অযথা প্রশ্রয় দিয়ে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন নি। বুদ্ধিমান ছেলে বাপের দানের মর্য্যাদা রেখেছে। পরীক্ষাগুলিতে প্রথম স্থান অধিকার করে' এখন সায়েন্স কলেজে পড়ছে এম্-এস্-সি।

মেয়েটির নাম সুজাতা। তারও পিতা নেই। তিনি অনেকদিন বর্ম্মা ও সিঙ্গাপুর অঞ্চলে কাঠের ব্যবসা করে' বহুলক্ষের মালিক হয়ে রাওলপিণ্ডিতে বাস করতেন। সুকুমারের পিতা রামনারায়ণ বাবুর বাড়ীর পাশেই ছিল তাঁর বাড়ী। স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে কন্যাটিকে তিনি দুইদিক থেকে আক্রমণ করেছিলেন, একটি অতিলালন, আর একটি অতিশিক্ষা। সর্ব্বদাই স্বদেশী বিদেশী বিবিধ শিক্ষয়িত্রীরা সুজাতার পিছনে লেগে থাকত। তার একমাত্র মুক্তির আনন্দ ছিল সুকুমারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, খেলা করা ও গল্প করা।

সুজাতার পিতা হরিবল্লভ বাবু সুকুমার ছেলেটিকে বেশ একটু ভালবাসতেন। সমস্ত ক্লাশের পরীক্ষায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দু'একটি পরীক্ষা দিয়েছিল তাতে সুকুমার প্রথম স্থানই অধিকার করেছিল। তার স্বভাব ছিল কোমল, অমায়িক ও বিনীত। তার চেহারা ছিল সুন্দর, দেহ ছিল বলিষ্ঠ, দৃঢ়। প্রভাতের শুক-তারার ন্যায় তার দু'টি চোখ থাকত বুদ্ধির প্রেরণায় দীপ্ত হয়ে। তবু তার স্বভাবের কোথায় যেন ছিল একটা মেয়েলি ছাঁদ, সে যেন কখনও কাউকে কোনও বিষয়ে না বলতে পারত না। তার এই অমায়িক স্বভাবের জন্য গুরুজনেরা তার সকল সময়ই খুব সুখ্যাতি করতেন যে এমন ছেলে আর হয় না। মোটা হাড় ও লোহার কাঠামোর মধ্যে কেমন করে' যে স্থান পেয়েছিল একটি পেলব, নমনীয় ব্রততিবলয় তার খবর জানতেন তার বিধাতা-পুরুষ, আর কেউ নয়।

হরিবল্লভবাবু ও রামনারায়ণবাবুর মধ্যে এমন কথা অনেকবারই হয়েছে যে ভবিষ্যতে এই দু'টি ছেলেমেয়ের যোগ হলে সত্যিই মণিকাঞ্চনযোগ উপস্থিত হবে। একথা কোন সময় যে সুকুমারের কাণে যায় নি তা বলা যায় না। কিন্তু কোন পক্ষেই মাতা বা অন্য ঘনিষ্ঠা আত্মীয়া না থাকাতে কথাটা তেমন ছড়িয়ে পড়তে পারে নি।

বৃদ্ধ হরিবল্লভবাবু কন্যাটিকে মায়ের স্নেহে পালন করেছিলেন এবং সর্ব্বরকম শিক্ষায় তাকে পটু করে' তোলবার চেষ্টার তাঁর কোন অন্ত ছিল না। এই নিয়মশৃঙ্খলার ব্যূহের মধ্য থেকে সহজে বেরিয়ে আসার পথ সুজাতার জানা ছিল না। তবে অনেক সময়ই যখন সুকুমার এসে হরিবল্লভবাবুকে বলত—"কাকা, ও আর কত পড়বে? ওর স্বাস্থ্যটাও ত দেখতে হবে; ওকে ছেড়ে দিন, আমি ওকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি"—তখন কি জানি কি মনে করে' বৃদ্ধ হরিবল্লভবাবু ঈষৎ হাস্যে এ কথার অনুমোদন করতেন। এমনি করে' দু'জনের মধ্যে স্নেহধারার প্রদীপটি ক্রমশঃই যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। সুকুমারের উপর সুজাতারও আব্দার ও অভিমানের শেষ নেই, কিন্তু সুকুমারও যেন সর্ব্বদাই তার আব্দার ও অভিমান, রাগারাগি ও দাপট, অতি সহজ আনন্দের সহিত গ্রহণ করতে পারত। সুজাতা ও সুকুমারের মান অভিমানের অন্ত ছিল না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুকুমারকেই নরম হয়ে এসে সুজাতার মান ভাঙ্গাতে হ'ত। তর্কে ছিল সুজাতার অশিক্ষিত পটুত্ব, যে কোন বিষয়ে কথা উঠলে সুজাতা এমন করে' প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলত যে বেচারা সুকুমারকে হাঁপিয়ে উঠতে হ'ত; কোন কল্পিত অপরাধকে উপলক্ষ্য করে' সুজাতা যখন চতুর ব্যারিষ্টারের মত কৈফিয়তের পর কৈফিয়ৎ খাড়া করে' তুলত তখন তার জবাব দেওয়ার চেয়ে, যেন অপরাধটা করেই ফেলেছে

এরূপ ভাব দেখিয়ে তবে সে নিষ্কৃতি পেত, সুজাতার সঙ্গে আপোষে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে' সন্ধিস্থাপন করবার চেষ্টা করতে হ'ত তাকে। সুজাতার পিতা ব্যবসায়ী লোক হলেও কোনদিন সরস্বতীর সঙ্গে বিবাদ করেন নি। লক্ষ্মীর আসন যখন তৈরী হ'ল তখন তাঁকে বেঁধে রাখবার জন্য তাঁকে বেশী প্রয়াস পেতে হয় নি। উদ্বৃত্ত সময় তিনি দুরারাধ্যা সরস্বতীর পূজায় নিয়োগ করতেন। পড়তেন তিনি বিস্তর গ্রন্থ দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে, খবর রাখতেন তিনি ইউরোপের ক্রমবিবর্ত্তমান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার, আর সেই সমস্ত জ্ঞান অতি সরল করে' সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করতেন তাঁর ধীমতী কন্যার মধ্যে। কেবল সংবাদের বোঝায় তার মাথাটি তিনি ক্লিষ্ট করতেন না, তার স্বাধীন বুদ্ধিকে তিনি উৎসাহ দিতেন তার স্বাভাবিক পথে প্রসারিত হ'তে। মানুষের চিন্তা স্বাভাবিক পথে প্রসারিত হ'লেও কোন্ পথে চলা যায়, আর কোন্ পথে চলা যায় না, কোন্‌খানে নালা আর কোন্‌খানে খাদ, তার ম্যাপ তৈরী করার জন্য দরকার হয় নানা বিষয়ের জ্ঞানের খবর। সুকুমারের সঙ্গে মিশে' এ শিক্ষা ও জ্ঞান পরিবেশনের নিবিড় সংযম ও নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সে তার উচ্ছল প্রাণের আনন্দে মনকে লীলায়িত করে' তুলতে পারত, তাই সুকুমারকে তার ভাল লাগত।

সুকুমার এসেছে কলকাতায় এম্-এস্-সি পড়তে। স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে' সুজাতাও এসে ভর্ত্তি হয়েছে একটি মেয়েকলেজে এবং আশ্রয় নিয়েছে সেই মেয়েকলেজের বোর্ডিং-এর দুর্গম দুর্গে। সেখান থেকে বাইরে বের হবার সুযোগ বড় কম। অভিভাবকদের খাতায় সুকুমারের নাম লেখা ছিল, তাই আজ অপরাহ্নে অতি কষ্টে অনুমতি পাওয়া গেছে তার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবার। নিরন্তর নিষেধের বাঁধনের

মধ্য থেকে আজ ছাড় পেয়ে. তার প্রাণের আনন্দ ভাগীরথীর জল-প্রবাহের মত কলকল করে' উঠেছে।

দু'জনে যখন গঙ্গাতীরের উদ্যানে প্রবেশ করল তখন স্ফূর্তিতে সুজাতার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কলকাতার ইটকাঠের অরণ্যের চেয়ে এই স্বাভাবিক অরণ্য, যেখানে অজস্র প্রাণের ধারা চলেছে বর্ষার প্লাবনে নিষিক্ত হয়ে, সে কত পৃথক, কত উদার, কি মনোরম! মেয়েটি যেন হিমাচলমুক্ত স্রোতস্বিনীর ন্যায় নাচতে নাচতে ছুটেছে, মনের আবেগে কলকলিয়ে মুখে যাচ্ছে ছড়া কেটে :—

ছলছলিয়ে ছুটেছে আজ প্রাণ-জোয়ারের ধারা,
সেই প্লাবনে আকাশ বাতাস আনন্দে হয় হারা।
কচিঘাসের সবুজ পাতায়
কে যেন আজ গান গেয়ে যায়,
বাঁশের বনে পাতার কোলে
মত্ত বুকের কাঁপন দোলে,
ভুবন যেন বিস্ময়ে আজ নয়ন মেলে।
গানের হাওয়া বক্ষে যেন তরঙ্গে যায় খেলে'।
গন্ধে বিভোর পুষ্প যেমন মাতাল হয়ে ফুটে,
হৃদয়টুকু তেমনি আমার ভুবনে যায় লুটে'।

দু'জনে চলেছে সোজা সেখানে, যেখানে প্রকাণ্ড বটগাছটি চতুষ্পার্শ্বে তার পত্রসমাকীর্ণ শাখা প্রসারিত করে' মসৃণ ছায়ায় শীতল করে' রেখেছে চারিদিকের ভূখণ্ডকে, আশ্রয় দিয়েছে সে-সব শাখায় কত বিহঙ্গমিথুনকে, ফলে যোগাচ্ছে তাদের আহার। বট-অশ্বত্থের কেন বিয়ে দেয় জানি না, কিন্তু মনে হয় যে বোধিদ্রুমের মধ্যে এককালে যে মার আশ্রয় নিয়েছিলেন অধিকারসূত্রে, সে মার বোধ হয়

এখনো বটবৃক্ষের মায়া ছাড়েন নি। তার প্রমাণ এই যে বড় বড় বনস্পতি যেমন ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধে উঠে' যায়, বটবৃক্ষে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। সে যত বাড়ে ততই থাকে তার চারিপাশের মাটিকে ছায়াচ্ছন্ন করে'। প্রতি শাখা থেকে তার মূলকে সে প্রসারিত করে মাটির দিকে, মাটির রসের জন্য তার লোভ দুর্নিবার। সমস্ত বটগাছটির চারিদিক থেকে ঝুলে পড়েছে অসংখ্য শিফাগুচ্ছ।

মেয়েটি ছুটতে ছুটতে এসে বটগাছটির সামনে দাঁড়াল এবং তার আয়ত চক্ষু বিস্তৃত করে' বলে' উঠল—"বাস্ রে! কত বড় বটগাছ! কতদিকে ছড়িয়েছে এর ডাল, চারিদিক দিয়ে অসংখ্য ঝুড়ি গেছে নেমে মাটি থেকে রস টানবার জন্যে! মাটির রসে এর এত মমতা!"

এই কথা বলে' আবার গুন্ গুন্ করে' গান ধরলে—

মাটির সাথে নিত্য তোমার মূল রয়েছে বাঁধা
তবে কেন নিত্য তোমার এতই ওঠে ভয়?
উঠতে গিয়ে উঠতে নার, পাও যে পরাজয়!
মন রয়েছে নিত্য তোমার যেথায় মাটির কাদা।
তাই ত বুকের পাঁজরগুলি ডাইনে বাঁয়ে ঘিরে'
নেমে আসে শিকড়গুলি মাটির কাছে ধীরে।
সেথায় তারে মনের মতন কতই চুমা খেয়ে
পশে গিয়ে যেথায় রসের স্রোত চলেছে বেয়ে'।
উঠতে তুমি চাও না দূরে যেথায় মহাকাশ,
এই ভুবনের সাথে তোমার নিত্য মহারাস।
ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধ লোকে উঠতে নাহি চাও,
মাটির পরে থেকে তুমি মাটিরই গান গাও।

মাটির সাথে নিত্য তোমার চলছে হাসাকাঁদা,
তোমার ভালবাসার গর্ব্ব মাটির সাথে বাঁধা।

ইতিমধ্যে ছেলেটি এসে কাছে দাঁড়াল। মেয়েটি তার সামনে গিয়ে বল্লে—"সুকু-দা, বল ত কী চমৎকার! কিন্তু সুকু-দা, ও কি? ও কি বার করছ?"

সুকুমার উত্তর করলে: "দেখ্ না সুজি, আজ কি মজা করব।" এই কথা বলে' জড়ানো ওয়াটারপ্রুফটার ভিতর থেকে একখানা ছোট কাঠ, দুটো দড়ি, গোটা দুই রিং ও গোটা দুই প্যাঁচ বার করলে।

মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠে বল্লে: "ওমা, তোমার পেটে এত বুদ্ধি! দোল্না এনেছ! সত্যি, আমার এত স্ফূর্ত্তি হচ্ছে যে যদি পারতাম তোমায় কাঁধে করে' নাচতাম।"

ছেলেটি বল্লে—"দেখ্ না, আজ তোকে কেমন আমি নাচিয়ে দি।" এই কথা বলে' লাফ দিয়ে একটা উঁচু ডাল ধরে' জিম্‌নাষ্টিকি কায়দায় ডালটার উপর ঘোড়ার মত চড়ে' বস্‌ল। তারপর সেই ডালে রিং দুটো লাগিয়ে দিয়ে প্যাঁচ কসে' দিলে, আর দোলনার কাঠটা দিলে তার সঙ্গে ঝুলিয়ে।

সুজাতা বলে' উঠ্‌ল: "বাঃ রে! অত দূরে উঠ্‌ব কেমন করে'?"

এই কথা বলতে না বলতে সুকুমার নেমে এল মাটিতে। বল্লে—"কেমন করে' উঠ্‌বি তা এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি। তুই ঠিক হয়ে দোলনাটার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে থাক্। শক্ত হয়ে থাকিস্, যেন হেলিস্ নে। না পারলে আমার মাথায় হাত দিস্।" এই কথা বলে' তার দুই পায়ের গোড়ালি দুটো ধরে' সিধে উঁচু করে' ধরলে সুজাতাকে। তার দু'হাত দিয়ে সে ধরলে দোলনার দুটো দড়ি,

আর সুকুমারের কাঁধে ভর করে' চড়ে' বসল দোলনাটার উপরে, আর সুকুমার পেছন থেকে দোলনাটায় দিলে এক ধাক্কা। দোলনাটা যখন দুলতে আরম্ভ করল তখন সুকুমার এসে দাঁড়াল সামনে। তখন সুজাতা দোলনার উপর দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে দড়ি ধরে' ক্রমশঃ বেগ বাড়াতে চেষ্টা করল। আগেপাছে দোলনা তখন পাগল হয়ে দোল খেতে লাগল। সুজাতার মুখে হাসি যেন আর ধরে না। এবার সে একটু জোরে একটি গান ধরল—

দোল্ দোলা দোল্ দোল্
ঘাটের বাঁধন্ খোল্!
সামনে পিছে ছুটল রে আজ দোলা।
পাগল হাওয়া রক্তে নাচে রসের ঝুলনঝোলা।
হারাই হারাই এই ভয়েতে আগ্‌লে যখন থাকি
পিছন ফিরে দেখি তখন সব হয়েছে ফাঁকি।
আকাশ দিয়ে দাঁড় বেয়ে যাই, শূন্যে নোঙর বাঁধি,
সব-খোয়ানো শূন্যমাঝে মিথ্যে বসে' কাঁদি।
সামনে পিছে ধাওয়াধাওয়ি চলছে জীবন বাওয়া,
কোন্ অকূলের দোলন এসে লাগায় পালে হাওয়া।
রক্ত ছোটে স্রোতের মত তপ্ত সুরায় ভরা,
স্বপ্নভরে চলুক জীবন নেশায় বিভোল করা।
দে দোলা দে জীবন-দোলায় পথ রয়েছে খোলা,
যেথায় খুসি যাক্ না ছুটে' আমি রে পথভোলা!

সুজাতা দোল খেতে লাগল। সুকুমার এসে সামনে দাঁড়াল। শালপ্রাংশু, মহাভুজ, তেজস্বী চেহারা। হেসে বল্লে—"কেমন লাগছে রে সুজি?"

সুজাতা দোল খেতে খেতে বল্লে—"চমৎকার! ভারি মজা লাগছে। অনেকদিন এমনটি হয় নি। তোমার মনে আছে, রাওলপিণ্ডিতে তোমাদের বাগানে কেমন এমনি দোল্ খেতুম? তুমি পিছন থেকে দোল দিয়ে দিতে?"

সুকুমার বল্লে—"খুব মনে আছে। তখন তুই পরতিস্ ফ্রক্, এখন হয়েছিস্ 'লেডি'। পশ্চিম দিক থেকে সোনালি আলো এসে তোর কোঁকড়া চুলে ঝক্‌মক্ করছে, তার আভা পড়েছে তোর মুখে। তার সঙ্গে মানান দিয়েছে তোর সূর্য্যমুখী রঙের ওড়নাটা। মনে হচ্ছে যেন কোন দেবী এসে বুঝি সিংহাসনে বসলেন। সে তুমি আর এ তুমি ঢের তফাৎ।"

"দেখ, অমনি করে' তুমি বলবে না, আমার ভারি লজ্জা করে।"

এতক্ষণ সুজাতা আস্তে আস্তে দোল খাচ্ছিল। এখন সুকুমারের মুখ বন্ধ করবার জন্যে দোলনার উপর দাঁড়িয়ে উঠে' খুব জোরে জোরে দোল খেতে লাগল। দোলনাটা এক একবার যেন একেবারে উপরের দিকে খাড়া হ'তে চায়, আবার নেমে আসে।

সুকুমার ব্যস্ত হয়ে বল্লে—"ওরে অত জোরে নয়, অত জোরে নয়। শেষকালে তাল সামলাতে পারবি না।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা? সুকুমার যত ব্যস্ত হয় সুজাতা তত খিল্‌খিল্ করে' হাসে আর আরও জোরে দোল দেয়। সুজাতা যত এ রকম করে তত সুকুমার অসহায় উদ্বিগ্নতার সহিত তার দিকে স্থির হয়ে চেয়ে থাকে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে হঠাৎ সুজাতার পা গেল দোলনা থেকে ফস্‌কে'। হাত দিয়ে সে চেষ্টা করলে দড়ি ধরে' ঝুলে' থাকতে, পারলে না। ছিট্‌কে এল সামনের দিকে। সেই নিমেষে সুকুমার দুই বাহু প্রসারণ করে' অবলীলাক্রমে নিলে তাকে লুফে'।

সুজাতার চিবুকে লাগল সুকুমারের মাথার একটা ধাক্কা, তার গন্ধসুবাসিত কোঁকড়া চুলগুলো পড়ল সুকুমারের ঘাড় বেয়ে পিঠের উপরে। তার কটিদেশ হ'ল আবদ্ধ সুকুমারের বাহুপঞ্জরে, সমস্ত শরীরটা লগ্ন হ'ল সুকুমারের বিশাল বক্ষের উপরে এবং দু' হাত দিয়ে সে জড়িয়ে ধরলে সুকুমারের গলা। সুকুমার ধীরে ধীরে তাকে মাটিতে নামিয়ে দিলে। সে সময় যদি সে বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী সেখানে থাকতেন তবে তাঁর চোখে হয় ত ধরা পড়ত যে ঠিক যতটুকু কাল সুজাতাকে ধরে' রাখা উচিত ছিল হয় ত তার চেয়ে একটু কাল বেশীই সে ধরে' রেখেছিল। কিন্তু সে কথা না জান্‌ল সুকুমার, না জান্‌ল সুজাতা।

সুজাতা মাটিতে নেমে ঘন ঘন দুটো শ্বাস ফেলে' বল্লে—"কি কাণ্ডই আজ হ'ত, বল ত সুকু-দা।"

সুকুমার বল্লে—"কি আর হ'ত বল্? নাকটা যেত থেবড়ে', সামনের দাঁত দুটো যেত ভেঙ্গে, কপালের উপর চড়ত একটা গলগণ্ড, তোদের হোষ্টেলে গেলে একটা নিরীক্ষণ করবার মত শোভা হ'ত বটে! যত পই পই করে' বারণ করি, অত জোরে নয়, অত জোরে নয়, ততই মেয়ে আরও জোরে দোলায় দিতে থাকেন দোল। গুরুজনের কথা তো কাণে শোনা নেই। আর আমি যদি এখানে না থাকতুম?"

সুজাতা বল্লে—"না সুকু-দা, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। তবে, তুমি না থাকতে কি? তুমি না থাকলে বুঝি আমি একলা একলা দোল খেতুম? আর আমি যেখানে বিপদে পড়ব সেখানে তুমি থাকবে না, তোমার শালকাঠের মত দু'খানা হাত থাকবে না আমাকে লুফে' নেবার জন্য? তবেই ত হয়েছে আর কি! তবে ভগ্‌বান তোমাকে দু'খানা হাত দিয়েছেন কেন?"

"ওঃ, ভারি আমার ভগবানওয়ালী! তুই কথা না শুনে' ছিট্‌কে পড়বি আর আমি সেখানে 'বডি গার্ড্‌' হয়ে হাত দু'খানা উঁচিয়ে ধরে' দাঁড়িয়ে থাক্‌ব? স্পর্দ্ধা ত কম নয়!"

"স্পর্দ্ধাই ত! আমি ত জানি, যখন আমি যেখানেই হোঁচট খাই না কেন, তুমি এসে তোমার দু'খানা হাত দিয়ে আমাকে বাঁচাবে।"

"আমি বাঁচাতে গেলুম আর কি! আমার কি দায়?"

"তোমার দায়, তোমার ঐ হাত দু'খানার দায়। আর এর চেয়ে কোন বড় কাজ কখনও করতেও পারবে না, যত বড় পালোয়ানই হও না কেন। তা থাক্‌, কথা কাটাকাটি করে' কি হবে? চল, দোলনাটা গুটিয়ে নিয়ে কোথাও বসে' গল্প করি। বুকটা এখনও ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করছে।"

সুকুমার স্নিগ্ধহাস্যে মুখখানা উজ্জ্বল করে' বল্লে—"বেশ, আমার উপর তোমার ভরসা ত বড় কম নয়!" এই কথা বলে' ধীরে ধীরে গিয়ে দোল্‌নাটা খুলে' ওয়াটারপ্রুফে জড়িয়ে সুজাতার কাছে এসে দাঁড়াল। কাছেই ছিল অর্কিড্‌-ঘেরা একটা ঝোপ, তার ভিতরে ছিল একটা বেঞ্চি।

সুজাতা বল্লে—"দেখ সুকু-দা, তোমাকে আমার বড্ড ভাল লাগে।"

সুজাতার মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যেত যে সে চাহনির মধ্যে কোন চাতুরী নেই, কোন বিলাসের ছলাকলা নেই, মন্মথের কোন গুপ্তদ্বার থেকে কোন স্পষ্ট রশ্মি সেখানে এসে পড়ে নি। যদি আলোআঁধারি হয়ে সেখানে কিছু থেকে থাকে তবে তাকে চিন্‌বার কোন উপায় ছিল না, সহজ সরল ভ্রাতৃস্নেহের গভীরতা ও ঔজ্জ্বল্যে তা দীপ্ত ও পরিপূর্ণ।

সুকুমার ধীরে ধীরে সুজাতার হাতখানি চেপে ধরে' বল্লে—"তোকেও আমার বড্ড ভাল লাগে।" কিন্তু এই কথার মধ্যে কি যেন একটা প্রচ্ছন্ন আবেগ গুপ্ত হয়ে ছিল।

নিশান্তের শুকতারা যেমন উষার আরক্তিম প্রতিভাকে গোপনে আপনার মধ্যে ধারণ করতে গিয়ে প্রখর ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে তেমনি প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল সুকুমারের দুই চক্ষু। সে আবার বল্লে—"শুধু ভাল লাগে? তার বেশী আর কিছু নয়?"

সুজাতা বল্লে—"তার বেশী আরও অনেক কিছু। আমার দাদা নেই, তাই চিরকালই তোমার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দাদার ছবি দেখতে পাই। তোমার সাহস, তোমার শক্তি আমার বিস্ময় ঘটাত। সেবারে একবার আমাদের মোটরের সঙ্গে যখন একটা মিলিটারী সাহেবের মোটরের ধাক্কা লাগবার জোগাড় হয়েছিল তখন সে সাহেবটা চাবুক হাতে করে' তোমাকে গালাগালি করতে করতে নেমে এল। তুমি গিয়ে দাঁড়ালে তার সামনে, ধীর, স্থির। সাহেবটা মারলে তোমাকে দু' ঘা চাবুক, তুমি দাঁড়িয়ে সহ্য করলে। তৃতীয় ঘা মারবার সময় বিদ্যুদ্বেগে তার চাবুক কেড়ে নিয়ে তাকে মারলে এমন এক ঘুষি তার চোয়ালের ওপর যে, সে চিৎ হয়ে পড়ল একেবারে বেহুঁস্ হয়ে। আমি ত গাড়ীর মধ্যে আতঙ্কে মরি আর কি! পৃথিবী যেমন তার আপন কক্ষা ছেড়ে কোথাও নড়তে পারে না আমার তেমনি ছিল রুটিন্-বাঁধা কর্ম্মক্ষেত্র। বাবা ছিলেন তার কেন্দ্রস্থল। তাঁর আকর্ষণ ছিল মহান্ ও ব্যাপক। তাঁর মধ্যে যেমন ছিল শাসন তেমন ছিল গভীর ভালবাসা। তবু হাল্‌কা মন চাইত মাঝে মাঝে তার অয়নচক্র থেকে একটু আধটু সরে' যেতে। তার অবসর দিয়েছ তুমি; যখন যে আব্দার করেছি, আনন্দে তা করেছ তুমি

পালন। আমার মা থাকলে তাঁর কাছ থেকে যে প্রশ্রয়টুকু পেতাম সেটুকু অঞ্জলি ভরে' তুমিই দিয়ে গেছ। লতা যেমন তার পত্রপুটে প্রভাতের আলো পান করে অথচ কোনক্রমে তার ধার শুধতে পারে না, তেমনি তোমার কাছে পেয়েছি আমি কত উৎসাহ, কত স্নেহের বর্ষণ। তা চিরন্তন হয়ে আছে আমার নাড়ীতে, তা ফিরিয়ে দেবার নয়। মাটির ডেলা যেমন আকাশ থেকে আপনি পৃথিবীর বুকে ছুটে' আসে অথচ সে জানে না কেন ছুটে' আসে, তেমনি আমার মন ছুটত তোমার দিকে। সে ছিল একটা অন্ধ আকর্ষণ, ধোঁয়াটে ছিল তার রূপ। কিন্তু যখন বয়স বাড়তে লাগল এবং চেতনা উঠ্‌ল প্রখর হয়ে, ধূমকেতুর ধোঁয়া গেল কেটে, তার নক্ষত্রটা উঠ্‌ল জ্বলে', যেন ঠাকুরঘরে আরতির প্রদীপ। তুমি ত জান আমাদের দেবসেবার কোনও বালাই নেই। কিন্তু সেবার পিসীমা এসে উঠলেন আমাদের বাড়ীতে, সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর রাধামাধব ঠাকুর। পূজো করতেন তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে', কেউ আমরা ঘরে ঢুকতে পেতুম না। একদিন করলেন তিনি ঠাকুরের শীতলী উৎসব। ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় ডাক পড়্‌ল আমাদের প্রসাদ খাওয়ার। সেদিন তাকিয়ে দেখলুম ঠাকুরঘরের ভিতর উঁকি মেরে। ধূনো ও ধূপকাঠির গন্ধে ঘরটি হয়েছে আমোদিত। ঘরের ভিতরের চারিদিকের পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সমস্ত মিলিত হয়ে বুকের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য-রকম দোলা লাগ্‌ল। জীবনে যেন প্রথম বুঝতে পারলুম কাকে বলে পবিত্রতা। এ পবিত্রতা অনুভব করা যায়, বলা যায় না; একে দূর থেকে দেখা যায়, ছোঁওয়া যায় না। এই যে চারিদিকে আশ্চর্য্য সুগন্ধে ও রূপে ফুটে' রয়েছে অর্কিড্‌গুলি, মনে এদের প্রতি লোভ হয়। যেন সত্যি মনে হয়, কোঁচড় ভরে' এদের নিয়েছি, কাণে পরেছি

অবতংস করে', খোঁপার চুলে গুঁজে' দিয়েছি এদের মালা। তবু ত কই, এদের ছুঁতে পারি না! এদের সৌন্দর্য্যের মধ্যে রয়েছে এমন একটা শাসন যে শাসন আপনি বাহন করে' আনে সংযমকে। তোমার সম্বন্ধে বড় হয়ে যখনই আমি ভেবেছি তখনই মনে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ হয়েছে, সে আনন্দ যেন পিসীমার ঠাকুরঘরের সেই পবিত্রতার স্পর্শ। তোমার চরিত্রের সৌন্দর্য্য শান্তভাবে শাসন করছে আমার চপল মনকে। তাই তোমার সঙ্গে আমি যেমন ঘনিষ্ঠভাবে রয়েছি, তেমনি রয়েছি বহুদূরে। তোমাকে যেন কিছুতেই আমার নাগালের মধ্যে পাই না। তবু ভাল লাগে তোমার সঙ্গ, যেমন ভাল লাগে দিনকে রাত্রির। রাত্রি থাকে দিনের অতি কাছে, তবু সে থাকে অতি দূরে।"

সুকুমার বল্লে—"কিন্তু তোমাকে ত আমার খুবই ভাল লাগে, খুবই সহজ মনে হয়, খুবই নিকট মনে হয়, আলো যেমন নিকট মনে হয় ফুলের কাছে। প্রভাতের তরুণ আলো যখন শিহর দিয়ে পড়ে গিয়ে ফুলের গায়ে, সে আলো ফুলের কাছে অতি সহজ। ফুল যেন তারই অপেক্ষায় ছিল। সে আলো প্রবেশ করে গিয়ে ফুলের সমস্ত পাপড়ির মধ্যে, আপ্লাবিত করে তার সমস্ত গন্ধের কুহরকে, অথচ সে আলো থাকে কত দূরে। দূরতম দেশ থেকে এলেও নিকটতম দেশের জিনিষের চেয়েও ফুলের পক্ষে সে বেশী ঘনিষ্ঠ। তুমি একদিকে রয়েছ আমার নাগালের বহুদূরে। অনেক সময়ই পাই না তোমায় কাছে। সকল সময়ই যে তোমার কথা মনে হয় তাও বলতে পারি না। তবু যখন তোমায় মনে হয়, বা যখন তোমায় কাছে পাই, তখন অনুভব করি যে, যে ক্ষণগুলো ফাঁকা হয়ে ছিল সেগুলো ছিল অন্ধকার রাত্রির মত আমাকে ছেয়ে। সমস্ত

রাত্রি জেগে ফুলের মতনই সেগুলি অপেক্ষা করেছে তাদের না-পাওয়া আলোর—'পুষ্প যেমন আলোর লাগি' না জেনে রাত কাটায় জাগি'। ভোরের আলো স্মরণ করিয়ে দেয় রাত্রির নিবিড় ব্যথা।"

সুজাতা একটু হেসে বল্লে—"অত রোম্যান্স আর অত কবিতা ছড়াতে হবে না। ফুলের সমস্ত লাবণ্য, সমস্ত রং নির্ভর করে আলোর উপরে ; যে আলোটুকু সে অপহরণ করে সেটুকু সে খরচ করে নিজেকে গড়ে' তোলবার জন্যে, আর যে আলোটুকু সে জগৎকে দেয় ফিরিয়ে সেটুকুতে লোকের কাছে প্রকাশ পায় তার রূপ ও লাবণ্য। নিজের পূর্ণতার জন্যে, নিজেকে গড়ে' তোলবার জন্যে যেমন একদিকে তার প্রয়োজন হয় সূর্য্যের আলো তেমনি নিজেকে দশের কাছে তুলে' ধরবার জন্যে তার দরকার হয় রবির বর্ণমালাময় রশ্মি। আমি আমার মধ্যে অনুভব করি একটা প্রাণশক্তি, সে কারও অপেক্ষা করে না তাকে গড়বার জন্যে। সে চেয়ে আছে কালের অভিব্যক্তির বেগের দিকে। তেমনি সে চায় না যে আর কারও কাছ থেকে ঠিক্‌রানো রশ্মি এসে তাকে লোকসমাজে তুলে' ধরবে। বীজ থাকে মাটির মধ্যে, সেখানে থাকে না সূর্য্যরশ্মি। সেখানে আছে শুধু কর্দ্দমাক্ত আবরণের সিক্ততা। সে সিক্ততা শুধু তার পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাকে দমিয়ে দেয়। তারপর সে পারিপার্শ্বিক আবরণ থেকে সংগ্রহ করে তার বাড়বার জন্যে যা প্রয়োজন। সে তার আপন বলে মাটি ভেদ করে' পৃথিবীলোকে আপনাকে প্রকাশ করে। তখন দেখা হয় তার সঙ্গে সূর্য্যালোকের, দেখা হয় তার সঙ্গে বাতাসের। সূর্য্যালোক দিয়ে সে আপনাকে গড়ে না, সূর্য্যালোক তার উপর পড়লে সেই সাহচর্য্যে অথচ তার বিনা অনুকম্পায় সহজ হয় তার পক্ষে আপন ধাতুকে গড়ে' তোলা। তেমনি তুমি যখন আমার কাছে থাক,

কিংবা তুমি আছ আমার সহায় হয়ে এটা যখন জানি, সেটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তোমার সাহায্যকে আমি ব্যয় করতে চাই না আমাকে গড়বার জন্য, আর সে সাহায্য তুমি আমায় করতে পার না, আর তার কিছুমাত্র প্রয়োজনও নেই। তবু তোমার কাছে যে স্নেহ পেয়েছি সেই স্নেহটুকু আমার মনকে সিক্ত করে' রাখবে এবং তারই ফলে ফুটে' উঠবে আমার 'আমির' মধ্যে যেটা রয়েছে গোপনে নিভৃতে। আর এই স্নেহ অনুভবের জন্য তোমার সঙ্গও যে আমার একান্ত প্রয়োজন তা নয়। তোমার সঙ্গ আমার যতই ভাল লাগুক, যতই সমাদরের হোক্ আমার কাছে তোমার স্নেহের পবিত্রতা, তবু তার যতটুকু পাই সেটুকু আমার অন্তরের, যেটুকু পাই না সেটুকু আমার অন্তরের নয়, আমার বাইরের, সেটুকু তোমার নিজস্ব। যেটুকুতে তুমি তোমার মহত্ত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ সেটুকুতে তুমি আমার আবেষ্টনের বাইরে। তার প্রতি আমার কোন লোভ নেই।"

সুকুমার একটু যেন দুঃখিত হয়েই বল্লে—"এর চাইতে কি আরও ঘনিষ্ঠ আমরা হতে পারি না? আরও নিকট, আরও সহজ তুমি আমার কাছে হতে পার না, যেমন সহজ যেমন নিকট হয় বাতাস ফুলের কাছে?"

সুজাতা হেসে বল্লে—"তুমি হ'লে পুরো scientist, উপমার বাণগুলোর চেয়ে তোমার বন্দুকের গুলীগুলো তাদের লক্ষ্যস্থানে সহজে পৌছোয়। বাতাসের সঙ্গে ফুলের এমন কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক? বাতাস চাটুকার, সে ফুলকে একটু নাড়া দিয়ে যায়, দুলিয়ে দেয় তার কেশর আর পাপড়ি, সঙ্গে সঙ্গে কিছু গন্ধপরাগ লেগে যায় তার গায়ে। কিন্তু সে ক্ষণচাটুকার, সে বসে' থাকবার লোক নয়। সে ছুটছে দিগ্বিদিকে, আর সে ছোটার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিচ্ছে সকলকে ফুলের গন্ধগুণের

কথা। সে হচ্ছে সেই স্বভাবের লোক যারা অকারণে করে' ফেরে লোকের গুণগান। তার ব্যস্ত বিচরণের সঙ্গে সঙ্গে সে করে' বেড়াচ্ছে ফুলের প্রোপাগাণ্ডা। ঝর্ণা নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে। ছোট সে ঝর্ণা, এঁকে-বেঁকে পাথরে ঠেকে চলেছে তার গতি; উচ্ছল, চপল, লীলালাস্যময়, এদিকে ওদিকে ঘুরতে ফিরতে সে মিলিত হয় এমন আরও কত ছোট ছোট জলধারার সঙ্গে। সে তখন সাগরকে চেনে না, তার দৃষ্টি ছোট ছোট উপলখণ্ডের দিকে, কেমন করে' তার চলবার পথের বাধাকে সে অতিক্রম করবে। সে মিশছে ছোট ছোট জলধারার সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে আপনার মধ্যে আপনি সঞ্চিত হয়ে বাড়ে তার বেগ, প্রশস্ত হয় তার বক্ষ, অবশেষে দাঁড়ায় একদিন এসে তার প্রকাণ্ড জলরাশি নিয়ে সাগরের মোহানার কাছে। তার সে বৃহত্ত্বে সে আর কারও সঙ্গে যোগ দিতে পারে না। সে চায় তার চেয়ে বৃহত্তরকে। তখন সে তার নাম, রূপ বর্জ্জন করে' হারিয়ে ফেলে নিজেকে মহাসাগরের বক্ষে। সেই যোগ তার সহজ, সেই যোগ তার সার্থক। মানুষ তখনই মানুষের সঙ্গে যথার্থভাবে যুক্ত হ'তে পারে যখন দু'জনেই চলে একটা বড়র দিকে। আপন বৃহত্ত্ব লাভ করে' সে চায় বৃহত্তরকে, সেটা তার আত্মার স্বাভাবিক এষণা। তেমনি যদি আমাদের মধ্যে কোন দিন ঘটে তখন হয় ত তোমার সঙ্গে আমার যোগ হবে অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, কিন্তু তার আগে নিজেকে কোথাও হারিয়ে ফেলার কোনও মানে হয় না। তোমার স্নেহে অনুরাগে তুমি আমায় অবসর দাও বাড়তে, তুমিও চল তোমার অনির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধির দিকে। তারপর বিধাতার ইঙ্গিতে কি ঘটবে কল্পনার ছায়া দিয়ে তাকে সীমাবদ্ধ করে' কোন লাভ নেই। যাক্, এ বিষয়ে আলোচনা করে' কোন ফল নেই। আমার একটি সঙ্গিনী জুটেছে

চমৎকার। ভারী ভাল মেয়েটি। তুমি যখন এবারে আমাদের কলেজে যাবে তখন তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। আমাকে যেমন ভালবাস তেমনি ভালবাসতে হবে তাকে। এমন সুন্দর আর এমন মিষ্টিস্বভাব যে তাকে ভাল না বেসে তুমি কিছুতেই থাকতে পারবে না।"

সুকুমার হেসে বল্লে—"আমার আর কারুর সঙ্গে মিলবার গরজ নেই।"

"গরজ হয় ত এখন আমারই, কিন্তু হয় ত এমন দিন আসতে পারে যে দিন তোমারই গরজ হবে সব চেয়ে বেশী। তোমার ধাতের সঙ্গে তার মিল আছে। তোমারই মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তোমারই মত ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় সকল বিষয়ে। আর মানুষকে তুষ্ট করবার জন্য বিধাতা তাকে দিয়েছেন অনিন্দনীয় রূপের অর্ঘ্য। সে রূপ দেখামাত্রই মনে হয় যেন অখণ্ড পুণ্যের ফল লাভ হ'ল।"

"তুমি যে বেজায় ভয় পাইয়ে দিলে। শেষকালে একটা triangle-এর সৃষ্টি হবে না ত?"

সুজাতা হেসে বল্লে—"ছোট জায়গা থেকে যখন triangle হয় তখনই হয় ভয়ের কথা, কারণ তাতে গতি হয়ে যায় অবরুদ্ধ, তাতে একজন করে অপরকে বিদ্ধ। কিন্তু তুমি রয়েছ infinityতে, সেখান থেকে triangle হ'লে কোন ক্ষতি নেই, কারণ parallel হয়ে অনন্ত পথ চলবার অবসর রইল।"

সুকুমার হেসে উঠল। তখন অপরাহ্নের আলো এসে পড়েছে উচ্চ বনস্পতির শীর্ষশাখায়। দু'জনে অনুভব করলে যে সময়মত কলেজে পৌছতে হ'লে আর দেরী করা চলে না। দু'জনেই তখন এই কথাটা আবিষ্কার করে' উঠে পড়ল তাদের নিরালা কুঞ্জের আসন থেকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এর পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। পূর্ব্বের দিন ছিল শনিবার। সেদিন ছিল স্পোর্ট্‌স্‌-এর দিন। ধাবন, উল্লম্ফন, ভারোত্তোলন, কন্দুক-নিক্ষেপ প্রভৃতি বহুরকম ছিল খেলার আয়োজন। সব জড়িয়ে সুজাতা হয়েছে প্রথম, সে পাবে প্রথম পুরস্কার। শনিবারের দৌড়া-দৌড়ির পর রবিবার দ্বিপ্রহরে মেয়েরা এদিকে ওদিকে পড়েছে ছড়িয়ে। কেউ বা কোথাও গল্প করছে, কেউ বা পড়েছে ঘুমিয়ে, কেউ বা কোন গাছতলায় বসে' কোন বাংলা রসাল উপন্যাস পাঠ করছে। একটি ক্লাসঘরের নিভৃত কোণে বসে' আছে দু'টি মেয়ে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সুজাতা, অপরটির নাম মঞ্জরী। এই মেয়েটি সুজাতার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। নাওয়া, খাওয়া, শোওয়া, পড়া, সবই এদের চলে এক সঙ্গে, রাত্রে নিদ্রার সময় কিন্তু এদের স্বপ্নটা যে একই রকম হয় তা হলপ্‌ করে' বলা যায় না। মনের ভিতরে যা ঘটে, যা মুখের বাক্যে পড়ে ঢাকা, তার যদি কোন আলোকচিত্র নেওয়া সম্ভব হ'ত তবে একথা অনেকটা হয় ত নিশ্চয় করে'ই বলা যেতে পারত যে এদের দু'জনের মনের প্রতিবিম্ব কিছুতেই একরূপ হ'ত না।

এই মেয়েটি ছিপছিপে, দোহারা চেহারা, সমস্ত শরীরের গড়ন বেশ আঁটসাঁট। রংটি তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ না হ'লেও খানিকটা তারই কাছা-কাছি। চোখ, নাক, মুখ, সমস্তই প্রথম দৃষ্টিতে একটা সৌন্দর্য্যের বিস্ময় উৎপাদন করে। হয় ত চেয়ে দেখলে মনে হ'তে পারে যে চোখ একটু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। তার চাউনির মধ্যে যেমন আছে তীক্ষ্ণতা, নেই তেমন প্রসন্নতা। সে চোখের সঙ্গে পদ্মপত্রের উপমা দেওয়া চলে

না, হরিণীর লোচনের সঙ্গেও উপমা দেওয়া যায় না। তার প্রেক্ষিতকে হয় ত চটুল সফরোৎবর্ত্তনের সঙ্গে কিংবা খঞ্জনার নৃত্যের সঙ্গে উপমিত করা যেতে পারে। সেই চোখ যেন সর্ব্বদাই কোনও গুপ্ত কিছুর অন্বেষণে ঘুরছে। তাতে কৌতুক তেমন প্রকাশ পায় না যেমন প্রকাশ পায় আগন্তুককে আবিষ্কার করার চেষ্টা। নাকটি তেমন সূঁচালো নয়, বুদ্ধির শুচিতার চেয়ে তাতে প্রকাশ করে বুদ্ধির প্রাখর্য্য। ভুরু দু'টি টানা, কপালটি সরু এবং কাণ দু'টি অপেক্ষাকৃত ছোট। সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা সজাগ ভাব, একটা স্বাভাবিক লীলায়িত পটুতা প্রকাশ পায়। সাজসজ্জার বাহুল্য নেই কিন্তু পারিপাট্য আছে। কপালের কুঙ্কুমেব ফোঁটাটি থেকে আরম্ভ করে' হাত রাখার ভঙ্গি পর্য্যন্ত কোথাও কোন অনবধানতা নেই। সুজাতার চেয়ে সে বয়সে কিছু বড়, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী বড় মনে। তার মুখের দিকে তাকালে যে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনায়াসেই বলতে পারত যে সে আর যাই হোক্, মুগ্ধা নয়। সে তার দেহ ও মনকে যে বেশ ভাল করে' জান্‌ত তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ছিল তার মুখভঙ্গির মধ্যে। তার মুখে লাবণ্য ছিল প্রচুর কিন্তু সেই মাধুর্য্য ব্যাহত হয়েছিল তার শ্রীর উগ্রতায়, অথচ সে ছিল অত্যন্ত মিষ্টভাষিণী। মিথ্যাকেও সে এমন করে' প্রকাশ করতে পারত যে সত্যের চেয়ে তা হ'ত অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক। তার পিতা করতেন কোনও মফঃস্বল সহরে ওকালতি এবং সৎ ও তদিতর উপায়ে কিছু অর্থও সঞ্চয় করে' রেখে গিয়েছিলেন। তার মা তার পিসীমাকে নিয়ে থাকতেন কলকাতায় একটা বাসা ভাড়া করে'। পড়াশুনার সুবিধার জন্য সে নিজে প্রায়ই থাক্‌ত মেয়েকলেজের হোষ্টেলে। সুজাতা আসবার আগে থেকেই সে পড়ত ঐ কলেজে। সুজাতাকে সে কি চোখে দেখ্‌ল বলা যায় না। সে ছোঁ মেরে তাকে

কেড়ে নিলে তার অন্য সমস্ত সঙ্গিনীদের কাছ থেকে এবং তার সর্ব্বদা চেষ্টা ছিল তাকে নিজের বাহন করে' নিতে। এমন তার বুদ্ধি, এমন তার চাতুরী, যে তার হাত থেকে এড়িয়ে যাওয়া কারও পক্ষে সহজ হ'ত না। সে ছিল চতুর চক্রী, কাকে কেমন করে' আত্মীয় করতে হয় সে বিষয়ে ছিল তার অসাধারণ নৈপুণ্য। মেয়েকলেজে মেয়েদের মধ্যে ভাল মেয়েদের অনেকে থাকে 'অ্যাড্‌মায়ারার'। পরীক্ষার কষ্টি পাথরে সুজাতা পেয়েছিল খাঁটি সোণার রেখা, ব্যবহার ছিল তার অতি মধুর, দয়ার্দ্র ছিল তার মনটি। তাই তার 'অ্যাড্‌মায়ারার'-এর সংখ্যা ছিল কিছু বেশী।

একবার সুজাতার হ'ল জ্বর। অসুখটা হ'ল কিছু শক্ত রকমের। ডাক্তার বল্লেন—এ অসুখে ওষুধের চেয়ে সেবা বেশী প্রয়োজন। এমন করে' বসে' গেল মঞ্জরী তার সেবা করতে যে তার দিনরাত্রি জ্ঞান রইল না। স্থিরভাবে করত সে সুজাতার সেবা। এ বিষয়ে ছিল তার স্বভাবদক্ষতা। ডাক্তারেরা বল্লেন—এমন সেবা কোন পাকা বিলিতি নার্সও করতে পারবে না। এসেছিল অনেক মেয়েই সুজাতার সেবা করতে কিন্তু টিঁকতে পারলে না কেউ মঞ্জরীর দাপটে। কাউকে বা ছোঁয়াচের ভয় দেখিয়ে, কাউকে বা পরিচর্য্যার ভুল দেখিয়ে, কাউকে বা বাক্যবাণে সে এমন করে' ভাগিয়ে দিলে যে কেউ আর সেদিকে ঘেঁসতে পারলে না। রোগশয্যা থেকে উঠে সুজাতা তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠল এবং নিশ্চয় বুঝতে পারল যে মঞ্জরীর মত তার অকৃত্রিম বন্ধু আর নেই। মনের মধ্যে যখন মানুষের কারও প্রতি কোনও একটা প্রবল আকর্ষণ জেগে ওঠে তখন মানুষ যে শুধু বাধ্য হয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে তা নয়, তার ভাল লাগে সেখানে আত্মসমর্পণ করতে। সে তার সম্বন্ধে কোন বিচার করতে পারে না, সে

ছেড়ে দেয় আপনাকে তার হাতে, মনে করে সেই তার একমাত্র সম্বল। তাই সে তার সঙ্গে হয়ে পড়ে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তার সম্বন্ধে কোন বিচার বা বিবেচনা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। মঞ্জরীও ঠিক এমনিভাবে সুজাতার হৃদয় জুড়ে' বসেছিল। এমন কোনও ঘটনা ছিল না যাতে সুজাতা মঞ্জরীর উপর একটুও রাগ করতে পারে।

আজ এই রবিবারের অপরাহ্লে দুই বন্ধুতে এক জায়গায় বসে' আছে। মঞ্জরী রেশমের সুতো দিয়ে একটা কম্ফর্টার বুন্‌ছিল আর সুজাতা তার পাশে বসে' তার চম্পকাঙ্গুলির অদ্ভূত লীলাবৈচিত্র্য নিবিষ্টভাবে দেখছিল এবং গুন্ গুন্ করে' একটা গান গাইছিল :—

কোন্ রূপকার অজানা মোর
শিল্পঘরের দুয়ারখানি,
কোন্ আবেশে কিসের বশে
আগল দিয়ে গেল টানি'।
শুধু রেখার আঁকাবাঁকা,
কোথাও খালি রইল ফাঁকা,
আঁকতে গিয়ে হঠাৎ কি গো
স্তব্ধ হ'ল বাণী!
তাই ত মরি গভীর লাজে
গোপন করি' আপন কাজে
তুলি আড়ালখানি।
গড়তে গিয়ে হয় না গড়া
আমার ছবিখানি॥
জানি আমি জানি॥

কোন্ মায়াবীর হাতের ছোঁওয়ায়
ফুটবে ছবি রেখায় রেখায়,
চরণে তার অর্ঘ্য করে'
পরাণ দেব আনি'।
জানা আমার, অজানা মোর
তাইতে গেঁথে পুষ্পের ডোর,
গলায় তোমার, বন্ধু আমার,
পরাই মাল্যখানি ॥
জানি আমি জানি ॥

মঞ্জরী তা'র কম্ফর্টার বুন্‌তে বুন্‌তে সুজাতার দিকে কটাক্ষ করে' মুচ্‌কি হেসে তারই ভঙ্গি অনুকরণের ছলে মুখ নাচিয়ে বল্লে :—

ছল্ ছলাছল্ ছল্,
কোন্ সাগরের বুক ছুঁয়ে যায়
কোন্ ফোয়ারার জল।
পড়ে' থাকা পিছে চেয়ে দেখা মিছে
কে পায় তাহার তল!

সুজাতা আশ্চর্য্য হয়ে মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে বল্লে—"হঠাৎ খামাখা তোর এ ছড়া কাটার মানে কি? আমাকে কি বলতে চাস্ তুই?"

"কিছুই বলতে চাই না। মানুষ খামাখা ছড়া কাটে না? তুই বা খামাখা একটা গান ধরলি কেন? এ গান ত কোথাও শুনেছি বলে' মনে পড়ে না।"

"আমরা যখন রাওলপিণ্ডি থাকতুম তখন সেখানকার ইস্কুলে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য বলে' একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনেক কবিতা লিখতেন, গানও লিখতেন। বাবাকে সেই কবিতা পড়ে' পড়ে'

শোনাতাম। বেচারার পয়সা ছিল না যে কবিতা ছাপায়। বাংলা-দেশে কবিতার বই কাটে বটে, তবে উইয়ে কিংবা ইঁদুরে। বিয়ের উপহার দেওয়া ছাড়া কবিতার বইয়ের প্রায় একটা কাট্‌তিই নেই। বেচারা হতাশ হয়ে বাবার কাছে মস্ত এক বাণ্ডিল কাগজের তাড়া রেখে গেলেন। বল্লেন—'ছাপানো ত আর আমার ভাগ্যে ঘটবে না। আর ছাপাবার দরকারই বা কি? কবিতা লিখেছি মনের আনন্দে, ঐখানেই ওর মূল্য গেছে শেষ হয়ে। কাজেই এর উপর আর কোন ফাউয়ের আশা করি না। আপনারা যখন বলেন যে আপনাদের এ কবিতা ভাল লাগে তখন এ কাগজগুলো আপনাদের কাছেই থাক্। পড়ে' যদি কখনো আনন্দ পান সেই হবে আমার চরম পুরস্কার।' তারপরে তাঁর কবিতা আমি অনেক সময় পড়েছি। অনেক কবিতা হয়ে গেছে আমার মুখস্থ। তাঁর গানও তিনি সুর করে' গাইতেন। সেই সুরও আমার একটু একটু মনে আছে, তাই খানিকটা তাঁর মত করে' দুটো একটা গান গাই।"

"তা ত গাস্, কিন্তু এত গান থাকতে ও রকম একটা গানই বা গাইবার মানেটা কি? বেশ ত গাইতে পারতিস্‌:

তাঁরে আরতি করে চন্দ্রতপন,
দেব মনুজ বন্দে চরণ।

কিন্তু তা না গেয়ে কে কোথায় তোমাকে গড়ে' তুলছে আর তার গলায় মালা দিতে হবে এমন নতুন ঢঙের গান ত তোর কাছে বড় একটা শুনি না; প্রেমচর্চ্চা ত তোমার পক্ষে একটা taboo!"

সুজাতা হো হো করে' হেসে উঠল। বল্লে—"গান করছি ত গান করছি। কোন্ গান গাইব আর কোন্ গান গাইব না তার কি একটা নিয়ম আছে নাকি?"

"নিয়ম ত একটা থাকেই, সেইটিই ত মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।"

"কি রকম ?"

"ধর, যদি আমি বলি যে তুমি কিছুতেই এখন 'বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে, যাচ্ছ তুমি শ্মশান ঘাটে,' এমন একটা তাৎপর্য্যের গান গাইতে পারতে না, তা হ'লে সে কথাটা কি একেবারে মিথ্যে হবে ?"

সুজাতা আবার মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠ্‌ল! সে হাসি শরৎপ্রভাতের পুঞ্জীকৃত শেফালিকার ন্যায়, পাহাড় থেকে সদ্য বের-হওয়া ঝর্‌ণাধারার ন্যায় নির্ম্মল। সে বল্লে—"তা ত পারতুমই না।"

মঞ্জরী টিপিটিপি হেসে বল্লে—"যখন কতগুলো গান, যা গাইতে পার না, তার নিয়ম রয়েছে, তখন যেগুলো গাও বা গাইতে পার বা গাইতে ভাল লাগে তারও একটা নিয়ম আছে। তবে সে নিয়মটা কি তা পরিষ্কারভাবে আবিষ্কার করা হয় নি এই যা কথা।"

"এত ঢঙ্ করে' তুই কি বলতে চাস্ খুলে বল্ দেখি।"

"আমি ত বলি, এতদিনে তোর আঁটসাঁট বাঁধনের ভিতর থেকে জগদ্দল পাথরের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসছে মনের স্বাভাবিক ঝর্‌ণাটা।"

"আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না তোর হেঁয়ালি কথা। কোন্ জিনিষটা আমি পাথর-চাপা দিয়ে রেখেছিলুম ? আমার ত মনে যা আসে তাই আমি ফর্‌ফর্ করে' বলে' যাই।"

চোখে একটু কটাক্ষ করে' মঞ্জরী বল্লে—"হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু এমন অনেক ভাব কি আসে না যে অসমাপ্ত বা অস্ফুট বলে'ই মনের রঙ্গমঞ্চে তাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, ঠেলে দেওয়া হয় মনের সাজঘরে ?"

সুজাতা বল্লে—"কই, আমি তেমন কিছুই টের পাই না। কি ভাব মনে এল আর কি ভাব মনে আসতে দিলুম না—তুই এ সব কি ইঙ্গিত করছিস্ ?"

"তুই যে ইচ্ছা করে' মনের ভাব চেপেছিস্ সে কথা ত আমি বলছি না। তাই যদি হবে তবে আর কথা চাপা হ'ল কই ? মনের রঙ্গমঞ্চে যে ঢুকল তাকে ত দেখতেই পাওয়া গেল যে সে রাবণ এসেছে না হনুমান্ এসেছে। তাকে তখন চাপতে গেলে তার চাপা হ'ল কই ? কিন্তু যে ভাবটা খুব ভাল লাগে সেই ভাবটাকেই মানুষ সহজে স্বীকার করতে চায় না। সে যতক্ষণ থাকে অস্ফুট ততক্ষণ তার এমন পরিচয় থাকে না যার দাবীতে সে রঙ্গমঞ্চে ঢোকে। রঙ্গমঞ্চে যারা ভিড় করে' আছে, পরিচয়ের অভাবে সে তাদের মধ্য দিয়ে ঠেলে' নিজের পথ করে' নিতে পারে না, উল্টে ঠেলা খেয়ে নিজেই ছিট্‌কে পড়ে সাজঘরের মধ্যে। এই ঠেলাঠেলির ফলে হয় ত বা কোনদিন ছিট্‌কে রঙ্গমঞ্চের মধ্যে প্রবেশও করে' ফেলতে পারে। তখনও তার পূর্ণ পরিচয়ের পরোয়ানা নেই। রঙ্গমঞ্চের কেউ পারে না তাকে চিনতে। নাটকে তার স্থান কোথায় তা সে নিজেই ভাল করে' জানে না। পার্টও হয় নি তার তৈরী, তাই তাকে হটে' চলে' যেতে হয় আবার পিছনে। কিন্তু ঐ যে এক-আধবার ছিট্‌কে আসে তাতেই রঙ্গমঞ্চের সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, একটু অস্বস্তিও বোধ করে—এটা আবার কে এসেছিল রে ? পরে যখন তার পূর্ণ পরিচয় নিয়ে সে আসে তখন রঙ্গমঞ্চে তার স্থান হয়ে যায় সুনির্দ্দিষ্ট। তখন আর তার পিছু হটবার ভয় থাকে না।"

"তোকে ত এতদিন সাদাসিধে বেশ ভাল মানুষ বলে' জানতুম, মনোরাজ্যের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে শিখলি কেমন করে' ?"

"দায়ে পড়ে'।"

"কেন, দায়টা কিসের ?"

মঞ্জরী তার কম্ফর্টারটা টেবিলের উপর রেখে সুজাতার একেবারে কাছে এসে বসে' আদর করে' হাত দিয়ে তার গলাটি জড়িয়ে ধরে' উজ্জ্বল চোখ দুটি হাস্যোজ্জ্বল করে' বল্লে—"দায় হচ্ছ তুমি গো সখি, তুমি।"

মঞ্জরীর আদরে বিগলিতপ্রায় হয়ে সুজাতা বল্লে—"কি রকম ?"

মঞ্জরী বল্লে—"তুমি যে আমার বন্ধু, সখী, সুহৃদ্, মিত্র। তোমার শরীরে অসুখ করলে আমি বসে' রাত জাগতে পারি, আর তোমার মনে কোন দরদ হচ্ছে কিনা তা কি আমার দেখবার কথা নয় ? আমি হ'তে চাই তোমার একখানা আয়নার মত। তোমার মনে যা ধরা পড়বে না, আমার দিকে চেয়ে তুমি সেই অ-ধরার সন্ধান পাবে। আমি তোমার মনকে পড়তে চাই একখানা সহজপাঠ্য উপন্যাসের মত। তবে ত আমি তোমার প্রাণের সঙ্গে একপ্রাণ হয়ে সায় দিতে পারব।"

সুজাতা বল্লে—"সত্যি, তুই আমায় এত ভালবাসিস্! তোর স্নেহ আমার মনকে সব সময় সিক্ত করে' রেখেছে। কিন্তু কই ভাই, আমার ত মনে কোন দরদ নেই। আর তুই কি ইঙ্গিত করতে চাচ্ছিস্ তোর হেঁয়ালির ভাষায় তা আমি কিছুতেই স্পষ্ট করে' বুঝতে পারছি না।"

"সব কথা কি স্পষ্ট করে' বোঝবার দরকার আছে ? আর অনেক জিনিষ এমন আছে যার অস্পষ্টতাই তার স্পষ্টতা।"

কিন্তু এতেও সুজাতা ভাল বুঝতে পারলে না। সে মুখখানা রইল নিরেট করে'। মঞ্জরী তখন হেসে বল্লে—"তুই ত আচ্ছা নেকী! তোর ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে! এত করে' বলছি, তোর

মাথাটা আছে কোন্ দিকে? জিজ্ঞেস্ করছিলুম—তুই কাউকে ভালবেসেছিস্?"

সুজাতা হেসে বল্লে—"এই কথা? তার জন্যে এতক্ষণ বেড়াজাল ফেলছিলি কেন? উকীলের মত জেরার পর জেরা চালিয়ে আসছেন! আমি ভাবি, যেন কিই বা একটা কিছু বলতে চাস্ তুই। ভাল ত বাসিই, তোকে ভালবাসি, সুকু-দা'কে ভালবাসি, আবার পিসীমাকে ভালবাসি—কত লোককেই ত আমি ভালবাসি।"

"আরে নেকী, তা নয়, তা নয়। এ সেই ভালবাসা যে ভালবাসা ছিল দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার, রোমিওর প্রতি জুলিয়েটের।"

সুজাতা খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠে বল্লে—"ও, এতক্ষণে তোমার মতলব বুঝলুম। এত গভীর জলের মাছকে ধরি কি করে'?"

"আমি কি না জলের নেয়ে, তাই একটু জলের কাঁপন দেখলে তলায় কোন্খান দিয়ে রাঘব-বোয়াল চলেছে তা ঠিক করতে পারি।"

"বেশ ত, তুই তোর রাঘব-বোয়াল ধর্, ধরে' ভাজা, ঝোল, যা ইচ্ছে তৈরী করে' খা। আমি ওসব কিছু জানি না।"

"জান না বৈ কি! বুক ফাটলেও ত মুখ ফুটবে না!"

"দেখ্, এসব কথা আমার ভাল লাগে না। তুই যে ভালবাসার কথা বলছিস্ সে ভালবাসা ত একলা হয় না, তাতে ত দু'জন চাই এবং দু'জনের দুই জাতের হওয়া চাই। তোকে ত আর রোমিও বা দুষ্মন্ত বানানো চলবে না। তা হ'লে না হয় চেষ্টা করে' দেখতুম।"

"কেন, তোমার দ্বিতীয় ব্যক্তির অভাব হ'ল কোথায়? তোর সুকু-দা'কে তুই ভালবাসিস্ না? সত্যি করে' বলতে পারিস্?"

সুজাতা হেসে বল্লে—"ও, এই কথা? তা ত আগেই তোকে

আমি বলেছি যে সংসারে যদি কাউকে ভালবাসতে হয়, শ্রদ্ধা করতে হয়, ভক্তি করতে হয়, তাকেই আমি করি। কিন্তু তার মধ্যে ত ওরকম কিছু নেই।”

“না'ই বা যদি থাকে, হ'লে দোষ কি?”

সুজাতা বল্লে—“দোষ কিছুই নেই।”

কথাটা শুনে মঞ্জরীর মুখখানা একটু পাংশু হয়ে উঠল। নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্লে—“তবে?”

সুজাতা বল্লে—“ 'তবে আর কি? হ'লে দোষ না থাকতে পারে, কিন্তু হয় নি।”

“আচ্ছা, না হয় মানলুম—হয় নি। কিন্তু হবে না যে তা ত তুই বলতে পারিস্ না।”

সুজাতা বল্লে—“ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তা কি করে' জান্‌ব? তা নিয়ে আমিই বা কেন মাথা ঘামাব, তুই-ই বা কেন মাথা ঘামাবি?”

মঞ্জরী একটু চুপ করে' থেকে সুজাতার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে—“কিন্তু, হওয়াই ত উচিত। দু'জনে এক সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছিস্। অমন পণ্ডিত, দেখতে অমন সুন্দর, ধনী, ব্যবহারটি মিষ্টি, আর তোকে এত ভালবাসেন। আর তুইও ত তাঁকে বরাবর ভালবাসিস্। এ ক্ষেত্রে দু'টি সঙ্গীহীন ধারা একটি রসের ধারায় মিশবে এইটিই ত উচিত, এইটিই ত শোভন।”

সুজাতা বল্লে—“অনেক সময় লক্ষ্য করে' দেখেছি যে তুমি এই ভালবাসার কথা আমার চেয়ে অনেক বেশী বোঝ। আমার কাছে এ বিষয়টা এখনও মূর্ত্তি নিয়ে ফুটে' ওঠে নি।”

মঞ্জরী বল্লে—“উঠবে না কেন? তুমি ত আর কচি খুকীটি নও।

পাহাড়-ভাঙা ঝরণার মত তোমার প্রাণ ছুটে' চলেছে, দেহের সৌষ্ঠব ও লাবণ্য যোগ দিয়েছে উচ্ছল প্রাণশক্তির সঙ্গে, শ্রাবণের গঙ্গায় যেন বানের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে, আর যে বিষয়টা যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মধ্যে উঁকি দেয় সে বিষয়টাই তোমার মনে ওঠে নি!"

"তুমি যখন বলছ যে এখনই সেটা ওঠবার কথা তখন সে হয় ত উঠেছে, কিন্তু আমি ত কিছু টের পাই নি।"

মঞ্জরী বল্লে—"এ কিন্তু সেই পরশুরামের কবিরাজের কথার মত —পেট-কামড়ানি হয় বটে, কিন্তু Zান্তি পায় না।"

"তুই যখন বলছিস্ তখন আমি আমার মনটাকে ভাল করে' বোঝবার চেষ্টা করছি। একেবারে যে বুঝতে পারি না তা বোধ হয় নয়।"

"এইবারে পথে এস।"

"হ্যাঁ, পথেই যাবার চেষ্টা করছি। আমাদের বাড়ীতে অনেক ভাল ভাল মুরগী পোষা হ'ত। মুরগীগুলোর যখন ডিম পাড়বার সময় হ'ত তখন তারা দিনের পর দিন ডিম পেড়ে যেত। তারপরে তারা গিয়ে বসত তাদের ডিমের উপরে। চারিদিকে পাখা বিস্তার করে', গায়ের পালক সব ফুলিয়ে একটা মুরগী যখন তার ডিমের উপরে বসত তখন তার লাবণ্য ফুটে' উঠ্‌ত তার সমস্ত গায়ে, মুরগী বলে' মনে হ'ত না, মনে হ'ত যেন একটা ময়ূর। কত লোক কাছ দিয়ে যায় আসে, তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার চক্ষু স্থির, তার সমস্ত মুখ, ঘাড় কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক নূতন ভাবে আপ্লুত। প্রকৃতির প্রেরণায় সৃষ্টির নিয়মকে সফল করবার জন্যে সে তখন যেন বসেছে একটা সীমাহীন, বিষয়হীন অলৌকিক ধ্যানে। তপস্যার মাধুর্য্য ছড়িয়ে

পড়েছে তার সমস্ত অবয়বের মধ্যে। সে জানে না সে কেন এমন করে' বসেছে। না বসে' থাকতে পারে না, তাই বসেছে। তার সমস্ত শরীর মন কি একটা আকর্ষণে যেন উন্মুখ হয়ে রয়েছে!"

"তুইও বুঝি অমনি উন্মুখ হয়ে উঠেছিস্? কার দিকে উন্মুখ হয়ে উঠেছিস্ সেটিই ত চাই জানতে!"

"কারও দিকে উন্মুখ হয়েছি তা ত বলতে পারি না। সে কথা সত্যিও নয়। সমস্ত শরীরে মনে একটা নূতনতা, একটা সজীবতা অনুভব করি। একদিকে যেমন মন চায় জোয়ারের জলের মত ছুটে' যেতে, অপর দিকে সে যেন কোথায় কোন্ পাহাড়ে বাধা পায়, জলের প্রবাহ যেন থম্‌কে দাঁড়ায়। তর্‌তর্ করে' থাকে বাড়তে, আপন আবেগে আপনি থাকে কাঁপতে। তাতে আনন্দও আছে, যেন দুঃখও আছে। আমার সমস্ত সত্তা যেন পূর্ণ হয়ে উঠছে আর তাই যেন আমি পান করছি:—

আমার সমগ্র চিত্ততলে
ধমনীর রক্তছলছলে
দেহ মন বাক্য জুড়ে'
নবোদ্গত পক্ষে যেন
নীলাকাশে উড়ে,
জেগে ওঠে কি অপূর্ব্ব অসীমার প্লাবিনী চেতনা!
হৃদয়নলিনীনাল মথি'
দুঃখ নহে, সুখ নহে,
তবুও জুড়িয়া রহে
সমগ্র সত্তারে ব্যাপি'

একটি সঙ্গীত শুধু বহে,
সব শব্দ মুছে' গিয়ে
ধ্বনি শুধু ওঠে—'প্রিয়, প্রিয়'
বিশ্বেরে করিয়া তোলে
একান্তই অনির্ব্বচনীয়।
নবীন স্পর্শের মাঝে
সে যে নব সৃষ্টির বেদনা—
ফোটার প্রেরণা লাগি'
কুঁড়ি সহে ফোটার যাতনা।
সে আনন্দরেশখানি
দূরশ্রুত বংশীধ্বনি প্রায়
নিরালা তরুর ছায়ে,
নিদাঘে বসন্তে কিংবা আশ্বিন সন্ধ্যায়,
ধরে' তোলে ওষ্ঠপুটে
অমৃতের স্পর্শখানি আনি',
ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায়
ব্যক্ত করে অস্ফুট গুঞ্জন কলগান।
আপনার বক্ষমাঝে আপনার সত্তা যেন
আপনিই করিতেছি পান।"

"তোমার এ হেঁয়ালি-কথা আমি বুঝতে পারি না। পুরুষকে ভালবাসা মেয়েদের প্রাণ। লতা যেমন সুকুমার পল্লবদলে বসন্ত-পুষ্পাভরণে সজ্জিত হয়ে তার রূপে আহ্বান করে প্রজাপতিকে, তার মধুতে আমন্ত্রণ করে মৌমাছিকে, তেমনি নারী তার যৌবনের বহিঃসম্পদে ও অন্তরের মনোহারিতায় আমন্ত্রণ করে পুরুষকে; পুরুষের

ডানা আটকে যায় পল্লবদলগত শিশির-বিন্দুতে। তেমনি করে' তাকে আশ্রয় দিয়ে, নিত্য মধুরস পান করিয়ে, আপন রূপে ও যৌবনে তাকে শৃঙ্খলিত করে' রেখে নারী পায় তার সার্থকতা; শুনতে পায় তার কাণের কাছে ঝঙ্কৃত হচ্ছে তার বন্দীকৃত ভূপতির চাটুবাণী, তার বিজয়যাত্রার সাফল্যে ও সন্তোষে সে দেহে মনে অনুভব করে তার পূর্ণতা, তার সার্থকতা।"

সুজাতা বল্লে—"ঠিক এখানেই আমি তোমাকে বুঝতে পারি না। রূপ, যৌবন, হাবভাব, ছলাকলা, বিলাসবিভ্রম, এ সমস্ত দিয়ে যে একজন পুরুষকে বাঁধতে হবে এবং তাতেই হবে নারীজীবনের চরম সার্থকতা, এ কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, স্বীকারও করতে পারি না।"

"এ সব নইলে পুরুষের মন ভুলবে কেন? ওরা হ'ল প্রজাপতির দল, আমাদের রূপযৌবনের কল্পনা করতে করতে, আমাদের ভোগ-বিলাসের উন্মাদনায় ওদের পাখা হয়ে ওঠে রঙে রঙে বিচিত্র।"

"এই যে পুরুষের মন ভোলাবার কথা তুমি বলছ, এর মধ্যে একটা লজ্জা নেই, একটা হীনতা নেই, একটা দারুণ অপমান কি নেই?"

"অপমান আবার কিসের? লজ্জাই বা কিসের? পুরুষ আছে তার পৌরুষ নিয়ে, তার বিদ্যা, বল, সৌন্দর্য্য, ধন প্রভৃতির কৌলীন্য নিয়ে। তাকে কেড়ে নিতে হবে নারীর আপন অস্ত্রে।"

"পুরুষকে কেড়ে নেওয়াই বুঝি নারীর চরম সার্থকতা?"

"তা নয় ত কি? পুরুষ তার সার্থকতা খোঁজে সংসারে তার কর্ম্মের মধ্যে। তার শক্তিতে সে উপার্জ্জন করে অর্থ, সে লাভ করে সম্মান, দশের মধ্যে প্রতিপত্তি, গৌরব, খ্যাতি, যশ, প্রতিষ্ঠা, বল। তা আহরণ করবার জন্য বিধাতা তাকে দিয়েছেন বাহুতে বল,

শরীরের কর্ম্মঠতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও নিপুণতা। বাধা ও বিঘ্নের মধ্য দিয়ে তাকে পথ কেটে নিতে হয় তার প্রাণস্রোতের অভিব্যক্তির জন্য। কিন্তু এ সমস্ত পেয়েও সে অনায়াসে আপনাকে বিলিয়ে দেয় অর্ঘ্য করে' নারীর প্রেমের কাছে। বিধাতা এইখানে দিয়েছেন তার দুর্ব্বলতা। নারীর কাছে আবদ্ধ হয়ে থাকবার যে একটা স্বাভাবিক আকূতি আছে তার প্রাণের মধ্যে, সেইটি নিয়ে প্রজাপতি তাঁর সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এইটি আছে বলে'ই মহাশক্তিমান্ পুরুষ, যে সিংহের মুখে হাত প্রবেশ করিয়ে তার মুখ ছিঁড়ে দিতে পারে, সে লুটিয়ে পড়ে ভয়ে নারীর কটাক্ষের মৃদু ভৎর্সনে, সে বন্দী হয় অনায়াসে নারীর বক্ষের মধ্যে তার বাহুবন্ধনে। পুরুষের মধ্যে এই দুর্ব্বলতা আছে বলে'ই পুরুষ নারীকে নিয়ে পেতেছে সংসার। তাই ঘটেছে তার পারিবারিক বন্ধন, তাই সে পালন করছে তার পুত্রকন্যা, তাই পরিবারের সংহতিতে গড়ে' উঠেছে সমাজ।"

"তাই তুমি মনে কর যে পুরুষকে জালবদ্ধ করার মধ্যেই নারীর জীবনের চরম সার্থকতা?"

"সুখেই মানুষের সার্থকতা, সুখেই মানুষের সমাপ্তি। আর যা জিনিষ চাও সব জিনিষেই প্রশ্ন ওঠে—ততঃ কিম্! এই পাবার পরে কি? ওটা পাওয়ায় আমার কি লাভ? কিন্তু সুখের সম্বন্ধে এ প্রশ্ন ওঠে না। সুখ চাই সুখের জন্য, তার আর 'পর' নেই। তাতেই মানবজীবনের সার্থকতা ও পূর্ণ পরিসমাপ্তি। নারীর স্বাভাবিক বৃত্তিতে সে চায় পুরুষকে বাঁধতে। পুরুষকে দিয়েই তার সমস্ত কামনার পরিসমাপ্তি। পুরুষ যা সংসারে যুদ্ধ করে' উপার্জ্জন করবে নারী তা অনায়াসে বিনা পরিশ্রমে ভোগ করবে তার ভালবাসার দাবীতে। তাকে তা না দিয়ে পুরুষের তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই। পুরুষ যদি

দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে নিজের রক্তস্রোত ঢেলে প্রাণকে একান্ত বিপন্ন করে' বিজয়ী হয়ে রাজা হয়, নারী তার বিলাস-সজ্জার আভরণ নিয়ে অনায়াসে এসে তার সিংহাসনে বসবে রাণী হয়ে। ধন, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা, সমস্তই নারী অর্জ্জন করে পুরুষকে দিয়ে। বিনিময়ে তার রূপ ও যৌবন দিয়ে করতে হয় তার মনোহরণ, দিতে হয় তাকে শ্রান্তির মধ্যে বিশ্রাম, বাঁধতে হয় তাকে আপন বাহুডোরে। ভালবাসা দিয়ে পুরুষকে বাঁধবার অধিকার নারীর, এটা নারীপ্রকৃতির স্বাভাবিক বৃত্তি। তাই এটা তার পক্ষে অত্যন্ত সহজ, যেমন সহজ মাধবীলতার পক্ষে তার পার্শ্বস্থ সহকার-তরুকে আশ্রয় করা।"

স্বজাতা বল্লে—"তোমার এ যুক্তি আমার মনে সায় দেয় না। যখনই মনে হয় যে নারীকে দেখছি কেবলই তার প্রজাসৃষ্টির দিক দিয়ে, তখনই মনে হয় নারীকে বড় ছোট করে' দেখা হ'ল। মনু বলেছেন, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' তেমনি কি আমরা বলতে পারি —'সুখার্থং ক্রিয়তে ভর্ত্তা' ? যার মনে পুরুষকে আয়ত্ত করবার লোভ শুধু যে স্বাভাবিক এবং সহজ তা নয়, পরন্তু তার চেয়ে বড় যে আর কিছু দেখতে পায় না, তার সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু সকল মেয়েরই মনে এই ভাবটি যে একান্ত প্রবল এ কথা বলা যায় না। অন্ততঃ আমি ত এমন মনে করি না।"

স্বজাতার এই কথায় মঞ্জরী হেসে বল্লে—"নারীর পক্ষে এইটিই যে সহজ এবং স্বাভাবিক, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাস্তব জগতের দিকে তাকালে। শত শত পরিবারের দিকে চেয়ে দেখ, কেমন করে' মেয়েরা শুধু স্বামীদের যে ঘিরে আছে তা নয়, শুধু যে তাদের ধরে' আশ্রয় করে' আছে তা নয়, তাদের তারা এমন করে' গলা পর্য্যন্ত এঁটে ফাঁস দিয়েছে যে নারী যতটুকু তাকে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতে দেয় তার

বেশী শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলারও পুরুষের সাধ্য থাকে না। পুরুষকে নারী এমন করে' মোহের জালে জড়িয়ে তার মুক্ত পাখার শলাকাগুলি তার আকর্ষণের আঠাতে জুড়ে দেয় যে, তার সমস্ত চিত্ত নারীর দিকে ছুটতে চাইলেও সে আপন আবেগের চারিদিকে ঘুরপাক খেতে থাকে। নারীকে সে বাঁধবে, সে বশ করবে, এ সাধ থাকলেও তার এ সাধ্য থাকে না। নারীর হৃদয়কে পাওয়া তার কাছে আকাশ-কুসুম হয়ে ওঠে। তারই মোহে সে ছোটে যতদূর তার শক্তি, কিন্তু নাগাল পায় না। একজন অখ্যাত কবির একটা কবিতা মনে পড়্ছে :—

স্বর্য্যেরে করিয়া কেন্দ্র, গ্রহ যথা ছুটিয়াছে
অনন্তের নিত্য আবর্ত্তনে,
তেমনি তোমার মাল্যচ্ছায়া হৃদয়ের অন্তরালে থাকি'
সকলের প্রেম-চেতনারে জাগাইয়া সর্ব্ব অঙ্গে,
ছুটিয়াছে নিরন্তর নানা ভঙ্গে
আপনার দিকে,
চেতনার পুণ্যদোলামাঝে, অফুরন্ত অভিসারে,
ভাবময় দোলাময় নানা বিবর্ত্তনে ;
নিত্যকাল দুলিবে অনন্ত মাঝে তব মাল্যখানি,
অনাদি পুরুষ তার স্পর্শলোভে,
নিয়ত ছুটিবে,
আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেগে ও ক্ষোভে,
পারিবে না কভু তারে বক্ষে নিতে টানি'।

পুরুষকে এমনি করে' খেলিয়ে মেয়েদের গর্ব্ব চরিতার্থ হয়। তাদের কিছু না থাকলেও, যাদের সমস্তই আছে, যাদের বলবীর্য্যে, বুদ্ধিতে ও কৌশলে প্রকৃতি তার সমস্ত সম্পদ ঢেলে দেয়, তাদের

উপরই রূপসর্ব্বস্ব নারী করে তার আধিপত্য বিস্তার। দাসী বলে' আপনাকে নিবেদন করে' তারা হয় তাদের জীবনমরণের প্রভু। ইংরেজ সিভিল্ সার্ভেণ্ট নামে জানায় যে সে নাগরিকদের ভৃত্য ও সেবক, ফলে করে তাদের উপর বাদসাহী।"

সুজাতা একটু হেসে বল্লে—"তুমি যা বলছ তা হয় ত অনেকটা ঠিক, অন্ততঃ এ সব বিষয়ে তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশী ভেবেছ এ কথা আমি বুঝতে পারছি। আমাদের বাড়ীতে দেয়ালের পাশে একটি কদম গাছের চারা ছিল। চারাটি একটু বড় হ'তে না হ'তেই তাকে জড়িয়ে ধরলে একটি মাধবীলতা। চারাটিও ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠে, মাধবী লতাটিও তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরে' বেড়ে চলে। চারাটি উঠছিল তার তকৃতকে যৌবনের পূর্ণ মহিমায়, গাঢ় সবুজ ব্যাপ্ত হয়েছিল তার সমস্ত শাখাপ্রশাখায়, পত্রবিতানে, মস্ত মস্ত হয়ে উঠেছিল তার পাতা। তার ওঠবার রকম দেখেই মনে হয়েছিল তার শিখা একদিন আকাশে গিয়ে ঠেকবে। গাছটির দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যেত। কিন্তু মাধবীলতাটি একে এমন কষে' বাঁধতে লাগল যে তার সমস্ত গায়ে গভীর খাঁজ হয়ে গর্ত্ত হয়ে গেল। ক্রমশঃ মাধবীলতাটির শাখাপ্রশাখাগুলি অসংখ্য বাহুডোরে আপন পাতাগুলির অবগুণ্ঠনের মধ্যে তাকে একেবারে ঘিরে ধরল। ফলে এমন হ'ল যে ঐ লতাটির হাত থেকে মুক্তি না পেলে গাছটির আর রক্ষা নেই। তার সমস্ত আলো আকাশ বাতাস আড়াল পেয়েছে মাধবীর পত্রপুঞ্জের মধ্যে। অবশেষে একদিন নিরুপায় হয়ে মালী মাধবীলতাটিকে কেটে ফেল্লে, কদম গাছটির গা থেকে জোর করে' টেনে ছাড়িয়ে দিলে মাধবীলতার স্থূল বন্ধন। তারপরে গাছটি চল্ল আবার তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে' আকাশের দিকে সূর্য্যের

অনুসন্ধানে। আমার মনে হয় যে মেয়েরাও হয় ত অনেক সময় পুরুষকে এমনি করে'ই বাঁধে যে সে কতটুকু নিঃশ্বাস ফেলবে তাও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে মেয়েদের ফাঁসের মধ্য থেকে। কিন্তু একটা কথা আমার এই মনে হয়, মেয়েদের যে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রয়েছে, সেটা কি তারা সচেতনভাবে ব্যবহার করে, না তাদের মনেরও একান্ত অজ্ঞাতে তাদের প্রচ্ছন্ন সংস্কারের মধ্যে তারা এ রকম করে!"

মঞ্জরী হেসে বল্লে—"তা নির্ভর করে মেয়ের প্রকৃতির উপর। কোনও মেয়ে হয় ত এমন আছে যে স্বভাবতঃই একেবারে এলানো স্বভাবের। পুরুষকে বাঁধার চেয়ে তাদের বেশী আনন্দ হচ্ছে তাদের উপর আশ্রয় করে' এলিয়ে পড়াতে। মনের তাগিদ তাদের কম, চেতনার চিক্কণতা তাদের ম্লান। তাদের মধ্যে আছে ভালবাসার আকর্ষণ, আশ্রয়ের মোহ। তাদের দেহের ও মনের ভার তারা বহন করতে পারে না, তাই তারা চায় যে কোনখানে এলিয়ে পড়ে' নিশ্চিন্ত হয়ে সারাটা জীবন একটু ঘুমিয়ে নেয়। পুরুষের পক্ষে তারা ভার হয় না, চাদরের মত তাদের কাঁধে নিয়ে তারা হন্ হন্ করে' এগিয়ে চলতে পারে তাদের গন্তব্য পথে। তারা পুরুষকে বাঁধে বটে, কিন্তু চেতনায় নয়, অবচেতনায়; বুদ্ধিতে নয়, ভালবাসার বিলাসে। কিন্তু যাদের মধ্যে বুদ্ধির প্রখর দীপ্তি আছে, রূপের সম্পদ আছে, তারা আশ্রয় করতে চায় যথার্থ একজন সতেজ মানুষকে; তারা পরখ্ করে' দেখতে চায় যে কোমল ও কঠিন, বিলাস ও বীর্য্য, নারী ও পুরুষের এই যে দু'টি অস্ত্র, এর মধ্যে কোন্‌টি বেশী বলবান্। পুরুষ যত বাড়ে, যত তার সম্পদ অজস্র হয়ে ওঠে, তত নারীর লোভ থাকে তার সেই সর্ব্বস্বটুকুর দিকে—কোনও দিক দিয়ে, কোনও ফাঁক দিয়ে তার যেন এমন একটি কণাও না থাকে যা নারীর কাছে বাদ পড়বে।

এই রকমের নারী পুরুষের কাছে প্রত্যাশার অঞ্জলি পাতে না, কিন্তু যেখান দিয়ে তার রসধারা ছুটে চলে, তার উপরে জোর করে' মুঠি চেপে ধরে, যেন একটি ফোঁটাও আঙুলের ফাঁকে গলে' না যেতে পারে। হয় ত এই চাপে পুরুষের যে অজস্র উর্দ্ধ গতি, তার যে গগনভেদী উচ্চ আশা, তা নিঃস্তব্ধ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু নারীর ত তাতে কোনও ক্ষতি নেই। সে ত অত উর্দ্ধে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না, কাজেই পুরুষের অতি উর্দ্ধ গতিতে তার যে শুধু কোন স্বার্থ নেই তা নয়, বরং তাতে তার ক্ষতি আছে বিস্তর। যে পুরুষ শালপ্রাংশু হয়ে উর্দ্ধে ছুটে চলে, সমস্ত বৃক্ষলোককে এড়িয়ে আপন শীর্ষকে সূর্য্যচন্দ্রের আলোর ফোয়ারায় অভিষিক্ত করতে চায়, নারী থাকে তার কটিস্থল আশ্রয় করে'। সমস্ত আকাশের ডাক যে পুরুষের কাণে নিরন্তর নেমে আসছে, নারীর ক্রন্দন তার কাণে পৌঁছায় না, পৌঁছালেও স্থায়ী হয় না। সে নিরন্তর স্বপ্ন দেখে অন্য জগতের। নারীর বাহুবন্ধনে তার একদণ্ড বিশ্রামের মুহূর্ত্ত বিলাসে কাটতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী নয়। যে নারী কেবল আশ্রয়বিলাসিনী, সে হয় ত তাতেই সুখী হয়ে স্বামীর গর্ব্বে গর্ব্বিণী হয়ে তার বিশ্রামের ক্ষণটিকে সুখে ও আনন্দে পূর্ণ করাই তার জীবনের সব চেয়ে বড় সুখ, সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা মনে করতে পারে। সে নারী মনে ভাবে:—

রবির দুঃসহ তেজে মরুভূমি-বালুকণা মাঝে
তুমি যবে ছুটে যাবে আপনার কাজে,
অঞ্চলের ছায়াটুকু সেথা দিতে চাই,
এ মোর আপন ধর্ম্ম, এ যে মোর নিতান্তই চাই।

আবার যে নারী যথার্থ তার স্বার্থে সচেতন, যে পুরুষের মধ্য দিয়ে আপনার জীবনকে সুখে ও আনন্দে চরিতার্থ করতে চায়, তার

চেষ্টা হবে একদিকে যেমন পুরুষকে বৃদ্ধি ও উন্নতির দিকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে, যাতে সে নারীর জন্য পৃথিবীর সমস্ত ভোগ ও সম্মান আহরণ করে' আনতে পারে, তেমনি অপরদিকে সে সর্ব্বদা সজাগ থাকবে যে এতদূরে সে যেন না ছুটতে পারে যাতে নারীর জীবনের সঙ্গে তার কোনও বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। সেইজন্য অতিতেজস্বী ও অতিবীর্য্যবান পুরুষকে যখন নারী আশ্রয় করে তখন তার ভাগ্য দুর্ভাগ্যে পরিণত হয়। যেমন বুদ্ধদেবকে আশ্রয় করেছিলেন গোপা, চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।"

সুজাতা একটু গম্ভীরভাবে বল্লে—"তবে তুমি কি বলতে চাও যে সুখই আমাদের জীবনে একমাত্র চাওয়ার ধন এবং সেই সুখ অর্জ্জন করতে হবে আমাদের নিজেদের বঞ্চনা করে' এবং যাকে আশ্রয় করব তাকে বঞ্চনা করে' ?"

মঞ্জরী জবাব করলে—"এখানে নিজেকে বঞ্চনা করার প্রশ্ন ওঠে কোথা থেকে ? আর সুখই যে আমাদের সমস্ত কামনার বিষয় এ সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কি কোনও কারণ আছে ? সব কাজই মানুষ কোনও না কোনও প্রয়োজনের জন্য করে, আর সে প্রয়োজন হচ্ছে সুখ। সুখ নিষ্প্রয়োজন অর্থাৎ সুখ আর কোনও জিনিষের প্রয়োজনে লাগে না। সুখই সকল প্রয়োজনের বড় প্রয়োজন, সকল চাওয়ার উদ্দেশ্য, সকল পাওয়ার শেষ। সেই সুখ নারী লাভ করে পুরুষকে আশ্রয় করে' অনায়াসে, বিলাসে, প্রমোদে।"

এর জবাবে সুজাতা বল্লে—"আমাদের সকল চেষ্টা এবং সকল কাজের পিছনে যে সুখ-চাওয়া রয়েছে এমন কথা আমার মনে হয় না। আমরা যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু চাই তার সঙ্গে একটা প্রয়োজনের সম্বন্ধ রয়েছে আমাদের দেহের এবং মনের। ক্ষুধা যখন পায় তখন চাই

আমরা আহার। আহার যখন জোটে তখন আমাদের সেই প্রয়োজনের নিবৃত্তি হয়, হয় আমাদের সুখবোধ। আহার চাই না, চাই আহারের সুখ, বেড়াতে চাই না, চাই বেড়াবার সুখ—এমন কথা আমার ত কখনও মনে হয় না। সুখ আমাদের প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন-সিদ্ধির ফল। আমরা দেহের জন্য নানা জিনিষ চাই, ভাল কাপড়, ভাল থাকা, ভাল আহার। এই চাওয়ার নিবৃত্তি হয় বলে' আমরা সুখ পাই। কিন্তু সুখ হিসাবে সুখকে আমাদের কাজের উদ্দেশ্য বলে' আমরা খুব কমই মনে করি। তবে যে কাজ করে' দশবার সুখ পাওয়া গেছে সে কাজের সঙ্গে হয় ত সুখের অনুভবের একটুখানি ছায়া জড়িত থাকতে পারে। কোনও কাজ করতে গেলেই তার একটা ছবি আমাদের মনের সামনে পড়ে, আর সেই ছবিটা অনুসরণ করে' আনুষঙ্গিকভাবে অনেক বস্তু এবং অনেক ছবি আমাদের মনের সামনে ভেসে ওঠে। এইভাবে একটা ছবি থেকে আর একটা ছবিতে যে ইঙ্গিত দিয়ে যায় সেই অনুসারে আমরা কাজ করে' চলি। কিন্তু সুখের ত কোনও ছবি হয় না। আজ সকালে যে মিষ্টি গান শুনেছিলুম সে গানটা গাইতে পারি, তার সুরটা মনে করতে পারি, যে গেয়েছিল, যেখানে গেয়েছিল, যেভাবে সে বসেছিল তার প্রত্যেকটিরই ছবি মনে ভাসে, কিন্তু যে সুখটা অনুভব করেছিলুম তার ছবি ত কিছুতেই মনে ভাসে না। যার ছবি মনে ভাসে না সেটাকে উদ্দেশ্য করে' কোনও কাজ করা যায় না। তা ছাড়া আমাদের অনেক চাওয়া এ রকমের আছে যে সেখানে কি যে চাই তা বলতে পারি না। ভোর হ'লেই আমার মনে হয় যে এক চক্কর বেড়িয়ে আসি। এখানে এ কাজের কোনও উদ্দেশ্য নেই। এখানে বেড়াবার ফলে আমি কিছু পাব না, বেড়িয়েই তৃপ্তি, বেড়িয়েই প্রাণপ্রবাহের একটা স্বচ্ছন্দ লীলা

স্ফূর্ত্তি হয়ে ওঠে। তেমনি আনন্দ পাই বেড়িয়ে যেমন মাছেরা পায় নিরন্তর জলে সাঁতার কেটে, পাখীরা পায় ডানার তালে তালে আকাশে উড়ে’। এমনি কারও মন হয় ত ছুটে যেতে চায় কোনও সুদূর গভীর সত্যের আবিষ্কারের জন্য, কেউ বা হয় ত কোনও আদর্শের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করতে চায়। জীবনই যদি গেল, তবে সমস্ত সুখের মূলই গেল উচ্ছিন্ন হয়ে; তবু সে ছুটেছে সেই দিকে, তার মাথা আর কোনও দিকে হেলে না, দোলে না, পতঙ্গ যেন উড়ে চলেছে প্রদীপের শিখার দিকে। তেমনি হয় ত কোনও মানুষ এমনভাবে ভালবাসতে পারে যেখানে ভালবাসাটাই তার নেশা। এই ভালবাসার জন্য অনায়াসে সে হয় ত পরম দুঃখ বরণ করে’ নেবে, নিজেকে একান্তভাবে দেবে বলি প্রিয়ের উদ্দেশ্যে, পুরোহিত যেমন হোমাগ্নিতে দেয় আহুতি!”

মঞ্জরী একটু গম্ভীর হয়ে বল্লে—“অতিতর্ক করা তোমার একটা স্বভাব। অতিতর্কের একটা নেশা আছে, আর সেই নেশায় যারা বিহ্বল হয়ে পড়ে তারা বাস্তব জগৎটাকে ফেলে হারিয়ে। কিন্তু এই বাস্তব জগৎটা নেই বল্লেই নেই হয়ে যায় না, সে রয়েছে হিমালয় পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে। ভাবের কুয়াশায় সেই পাহাড়টাকে না দেখতে পেয়ে খোলা আকাশ মনে করে’ মানুষ যদি ছুটে যায় তার দিকে তাকে অগ্রাহ্য করে’, তখন সে এক মুহূর্ত্তেই বুঝতে পারবে যে ভাবের ধোঁয়ার চেয়ে বাস্তব জীবনটা কত কঠোরভাবে সত্য—‘এই যে মাটির ক্ষিতি পায় বাজে নিতি নিতি, চপল্লা রে, সবি হেথা স্থূল’।”

সুজাতা হেসে জবাব করলে—“তোমার বাস্তবপ্রিয়তা আমি জানি। ‘আমি বাস্তব’, ‘আমি বাস্তব’ বলে’ ঢাক পেটালেই কেউ বাস্তব হয় না। এত কোমল, এত স্নিগ্ধ তোমার মন, যে তোমার মুখে

এই জগৎটাই যে স্থূল এ কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। এতই যদি বাস্তবপ্রিয় তুমি তবে এত পরিশ্রম করে', রাত্রি জাগরণ করে', নিজের দেহকে তুচ্ছ করে' সেবারে আমার শুশ্রূষা করেছিলে কেন? সেটাতে ত নিজের বাস্তবতার পরিচয় দাও নি। স্থূলকে আমি অগ্রাহ্যও করি না, অস্বীকারও করি না। হয় ত এ কথা ঠিক যে স্থূলের মধ্যে যে নিয়ম খাটে, আপাতদৃষ্টিতে সেটা সূক্ষ্ম জগতের নিয়ম থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, হয় ত বা এত বিভিন্ন যে যতক্ষণ স্থূলের মধ্যে থাকা যায় ততক্ষণ সূক্ষ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা অনেক সময় থাকি বিস্মৃত। কিন্তু সূক্ষ্মের দিকে দৃষ্টি করলে দেখা যায় যে তার নিয়ম স্থূলজগতের নিয়ম থেকে অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক্। তথাপি দু'য়ে কোনও বিরোধ নেই। এইটিই সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা। যে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আমরা দেখতে পাই আমাদের পৃথিবীর ও গ্রহনক্ষত্রের আবর্ত্তগতির মধ্যে এবং পৃথিবীর যাবতীয় স্থূল বস্তুর মধ্যে, গতিবেগ যখন বাড়ে এবং ইলেক্ট্রন্ প্রভৃতি বস্তু নিয়ে যখন আলোচনা করা যায় তখন দেখা যায় যে এই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মধ্যে এমন একটা বৈষম্য এসেছে যা বুঝতে হ'লে আমাদের কল্পনার ধারা সম্পূর্ণভাবে বদ্‌লে ফেলতে হয়। পরিণামে সূক্ষ্মের নিয়ম কেমন করে' স্থূলের নিয়মের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে তা বলা কঠিন; তবু যেন এ কথা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ বলে'ই মনে হয় যে সূক্ষ্মের নিয়মের মধ্যেই স্থূল প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, কারণ সূক্ষ্ম থেকে স্থূলের উৎপত্তি। কিন্তু আমরা ত বাস্তব অবাস্তব, স্থূলসূক্ষ্মের দার্শনিক বিচার করতে বসি নি, আমি শুধু বলছিলুম যে, নারী যে পুরুষের চিত্তকে জয় করা তার একমাত্র উদ্দেশ্য বলে' মনে করবে, নারী যে আপন ভাগ্যের পথ আপনি রচনা করতে পারবে না, এ বিশ্বাস নারী-মর্য্যাদার মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করে :—

কে বলে পুরুষ ছাড়া নারীর জীবন নাহি চলে,
তাহার আপন স্থান পুরুষের চরণের তলে ?
যে পথে পুরুষ চলে সে পথে চলিতে নারী পারে,
পারে সে গৌরবে তার আপনারে উচ্চ করিবারে।
সে ত দুর্ব্বলের বৃত্তি যে রহিবে নিয়ে ভালবাসা—
উড়িতে যে চাহে উর্দ্ধে কেমনে সে নীড়ে নেবে বাসা !"

মঞ্জরী বল্লে—"তুমি এ সম্বন্ধে যে রকম উগ্র মত পোষণ কর তাতে তোমার সঙ্গে বেশী তর্ক করে' কোনও লাভ নেই। পুরাণের নরসিংহ মূর্ত্তিতে দেখা যায় যে তার নীচের দিকটা জন্তু, উপরের দিকটা মানুষ। তুমিও তেমনি দেহে যেমন পূর্ণ হয়ে রয়েছ নারীত্বের চরম উৎকর্ষে, তেমনি মনের দিকে হয়ে ওঠ পূর্ণ পুরুষের তেজস্বিতায়, তার আদর্শের পিছনে ছুটে চলার বৃত্তিতে, প্রতিষ্ঠা ও সার্থকতার অনুসন্ধানের গৌরবে। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেক যে সে পথে আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হব না। আর যদি নেমে এস শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ধূলোকাদার মধ্যে, তবে কি হয় বলা যায় না। আচ্ছা, সে কথা যাক্। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—আমাদের হেড্ মিষ্ট্রেস্ নিস্তারিণী দেবীর ঘরে তুমি সকালসন্ধ্যায় বই বা গুছিয়ে দিতে যাও কেন, বাগান থেকে টাট্কা ফুল চয়ন করে' সেখানে অর্ঘ্যের ডালি বা রাখ কেন, আর ধূপকাঠি জ্বেলে তাঁর ঘরটি বা গন্ধে আমোদিত করে', রাখ কেন ? এটা ত খুব তেমন একটা উচ্চ বা সূক্ষ্মতম বৃত্তি বলে' মনে হচ্ছে না।"

সুজাতা বল্লে—"ওটা যে আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব তা বলতে পারি না। কোথাও যেন এই নিস্তারিণী দেবীর মধ্যে আমি আমার মায়ের মুখের ছায়া পাই। সেই থেকেই আমার অজান্তে আমি ওঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছি। এক এক জন লোকের চেহারার

মধ্যে এমন কিছু থাকে যাতে হৃদয়কে নিজের অজ্ঞাতে তার দিকে টানে। এইখানেই আর এক দিকে তোমার কথার একটা উল্টো দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নিস্তারিণী দেবীর সঙ্গে আমার কোনও প্রয়োজনের সম্বন্ধ নেই। বয়সে উনি হয় ত আমার মায়ের চেয়েও বড়। আমাদের মনের ধারা এক নয়, তবু ওঁকে দেখে' আমার ভাল লাগে। ওঁর দেবীচরিত্রের দিকে আমি প্রতিদিনই আকৃষ্ট হচ্ছি। ওঁর কি বিশুদ্ধ অমায়িক ব্যবহার! কি মধুময় ওঁর দৃষ্টি, কি স্নিগ্ধ ওঁর চিত্ত! লোকে সাংসারিকভাবে যাকে সুখ বলে তার কিছুই ওঁর নেই, কোনদিন ঘটেও নি। সমস্ত জীবন পরের জন্য কেবল ত্যাগ করে'ই গেলেন। কোথায় কে দুঃখী, কোথায় কে আর্ত্ত, কোথায় কার দুঃখ এতটুকু প্রশান্ত করা যেতে পারে, তারই অন্বেষণে তাঁর মাতৃচিত্ত হাহাকার করছে। নিজের দিকে কোনও দৃষ্টি নেই, নিজের জন্য কিছুই খরচ করেন না। নিজের কোনও চাহিদা বা অভাবের কথা একবারও মনে তোলেন না। একটি অভিযোগ নেই ওঁর মুখে। ওঁর জীবনের কোনও খবর জানি না, নিজের কোনও কথা উনি বলতে চান না। কি যেন একটা সোণার কাঠি আছে ওঁর কাছে, যার দ্বারা উনি সমস্ত জগৎকে মধুময় করে' নিতে পারেন। এইসব লোক সহজসিদ্ধ। এইজন্য স্বভাবতঃ আমার চিত্ত ওঁর দিকে ভক্তিনত হয়ে ওঠে। লোকে যেমন দেবীমন্দিরে প্রবেশ করে তেমনি আমি ওঁর ঘরে প্রবেশ করি। তাই নিয়ে যাই ফুল। উনি ফুল বড় ভালবাসেন। গুছিয়ে দি ওঁর বইপত্র। উনি যখন ধীর সমাহিতভাবে বিশুদ্ধ উচ্চারণে উপনিষদ্ পড়েন তখন আমি স্তব্ধভাবে বসে' থাকি ওঁর পায়ের কাছে। সন্ধ্যা-বেলায় জেলে দিই ওঁর প্রদীপ। দুটো একটা ধূপকাঠি জেলে দিয়ে দেখি উনি শান্ত সমাহিতভাবে চেয়ে রয়েছেন একদৃষ্টিতে পশ্চিমের

শুকতারার দিকে। কাছে গিয়ে বসলে মাথায় দেন হাত বুলিয়ে—মনে হয় যেন দেবতার আশীর্ব্বাদ নেমে এল আমার মাথার উপরে। তাই অকারণে ওঁকে ভালবাসি, অকারণে ওঁর সেবা করতে ইচ্ছা হয়। অথচ, এতে আমার কোন প্রয়োজনও নেই, তার সিদ্ধিও নেই। কিন্তু বাইরে প্রয়োজন না থাকলেও অন্তরের চাওয়ার দায়, সে যে একটা বড দায়। অন্তর যখন কোনদিকে ছোটে তার পূর্ণতার অন্বেষণ করে' তখন তার সেই স্রোতকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এমনি করে' মানুষ অনেক কাজ করে তার অন্তরের চাহিদাতে, তার আপন সত্তার দাবীতে। সেই পথেই হয় তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। তাতে দুঃখ থাকতে পারে, ত্যাগ থাকতে পারে, কিন্তু সেইখানেই তার আনন্দ, ঝর্‌ণার যেমন আনন্দ পাহাড়ের গা বেয়ে' ঝর্ ঝর্ করে' হাজার ফিট্ নীচে ঝরে' পড়ায়, তারপব অসংখ্য পাথর ও নুড়ির সঙ্গে উপলবিষম পর্ব্বতের গাত্র বেয়ে ছুটে চলে' যেতে। কোন্ দূরে থাকে সাগর, ঝর্‌ণা তাকে দেখে নি কখনও চোখে, শোনে নি তার গর্জ্জন ; তবু সেই সাগরের ডাক যেন তার বুকের মধ্যে পাঞ্চজন্যের তর্জ্জন তোলে, সে আহ্বান উপেক্ষা করবে এমন সাধ্য তার থাকে না। এই প্রেরণা শুধু যে মানুষকে বড় বড় কাজের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় তা নয়, অনেক ছোট ছোট সামান্য কাজের মধ্যেও এমনি একটা অসীমের অজ্ঞাতের অহৈতুকী প্রেরণা দেখা যায়। এই ডাক আসে দূরস্থিত মেঘধ্বনির মত, অনেক সময় এটাকে যেন বুকের মধ্যে একটা চাপা আওয়াজের মত অনুভব করি। সেইজন্যই আমি তোমার সঙ্গে এ কথায় সায় দিতে পারি নি যে মানুষ যা করে তা সবই সুখের জন্য। আচ্ছা, সে যাক্, কিন্তু তুমিই বা বিনা কারণে অমন একটি সুন্দর গলাবন্ধ বুন্‌ছ কেন ?”

মঞ্জরী এই প্রশ্নে ঈষৎ বিব্রত বোধ করে' হেসে জবাব করলে—

"সে খবরে তোমার কাজ কি ? তুমি তোমার পাদ্রীসাহেবের বক্তৃতাটা চালিয়ে যাও, শুনতে বেশ লাগে। বিশেষতঃ এইসব ভারিক্কি ধরণের কথা যখন তুমি বলতে আরম্ভ কর তখন মনে হয় যে বুকের কোন্ নিভৃত ব্যথা, একটা গোপন কাঁদুনি যেন তোমার গলার শিরাগুলিকে জর্জ্জরিত করে' তোলে। ফলে তোমার কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে ভারী, তোমার আওয়াজগুলি বেরিয়ে আসে যেন চাপা মৃদঙ্গের বোল। মানুষের অন্তরের ব্যথা যখন নিবিড় হয়ে আসে ঘন মেঘের মত কণ্ঠের আকাশে, তখন সে কথার আকর্ষণ অকস্মাৎ মনকে এত নাড়া দেয় কেন বলতে পার ?"

সুজাতা বল্লে—"আমি আর ওসব পাদ্রী সাহেবের বক্তৃতার মধ্যে নেই। নিজের কথাটি অমন করে' ঢাকলে চলবে না, কার জন্য গলাবন্ধ বানাচ্ছ বল দেখি। দেখছি ত পুরুষের গলাবন্ধ, পুরুষ ত আর সুকু-দা' ছাড়া কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।"

মঞ্জরী হেসে বল্লে—"তুমি ত লোক মন্দ নও দেখছি। তোমার সুকু-দা' ছাড়া আর কাউকে পুরুষ মনে কর না! এক তোমার সুকু-দা'ই পুরুষ, আর সমস্তই নারী! তোমার প্রেম ত গভীর হয়ে উঠেছে কম নয়, এ যে একেবারে রাই-উন্মাদিনীর দশা—'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল'।"

সুজাতা হেসে বল্লে—"ঠাট্টার আড়াল দিয়ে পালিয়ে গেলে চলবে না। এ তুমি নিশ্চিত জান যে সুকু-দা'কে আমি যতই ভালবাসি না কেন, সে ভালবাসা কোনও নির্দ্দিষ্ট রূপ নেয় নি।"

মঞ্জরী বল্লে—"রূপ না নিতে পারে, কিন্তু রেখা ত পড়তে পারে! আর রেখাও যদি না পড়ে' থাকে তবে শিল্পীর গভীর ধ্যানে ছায়া ত পড়তে পারে!"

সুজাতা বল্লে—“রূপও নেয় নি, রেখাও পড়ে নি, তবে গভীর ধ্যানের অন্ধকার গৃহে কি তৈরী হয়ে ওঠে তার খবর আমি জানি না। তার শিল্পী আমি নই, তার যে শিল্পী তিনিও তার খবর জানেন কি না তা জানি না। একটা সংস্কৃত কথা শুনেছি—কো অধ্বা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ—কে বা জানে, কে বা বলবে? শিল্পী যতক্ষণ দেখেন যে তাঁর রচনা রূপ নেয় নি ততক্ষণ তাঁর শিল্পাগারের দরজা রাখেন বন্ধ করে’। যা গড়ে তা আপনিই গড়ে, কি গড়তে কি গড়বেন তা জানেন না বলে’ই শিল্পীর সেই নিভৃত কক্ষে আমাদের মন বা চেতনার কোনও প্রবেশ নেই। কাজেই সেখানকার খবর আমি বলতে একান্ত অসমর্থ। আর সেখানকার খবর জানবার জন্যই বা তোমার এত ব্যাকুলতা কেন? সোজা প্রশ্নটাব সোজা জবাব দিলেই ত চলে’ যায়।”

মঞ্জরী বল্লে—“আমি যা সোজা করে’ দেব, তোমার বুকের মধ্যে গিয়ে তা যে বাঁকা হবে না তার কি প্রমাণ আছে? সোজা সমান্তরাল রেখা অনন্তে গিয়ে বাঁকা হয়। আলোর সরল রেখা সূর্য্যের পাশ দিয়ে আসবার সময় বেঁকে যায়। সোজাটা বাঁকা হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রকৃতিতে বড় কম নেই।”

সুজাতা বল্লে—“সোজাটা কোথায় গিয়ে বাঁকা হবে সে খোঁজে তোমার এত গরজ কি? তোমার হাত দিয়ে তুমি যা ছাড়বে সেটাকে সোজা বা বাঁকা করার ভার তোমার আছে, তারপর কোথায় ঠেকে’ সেটা কোন্ দিকে যাবে, সীমার চাপেই বেঁকবে, না অসীমার চাপেই বেঁকবে, তা ত আর তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে পার না।”

মঞ্জরী ঈষৎ কটাক্ষ করে’ সুজাতার মুখের দিকে পরীক্ষকের দৃষ্টি রেখে ঈষৎহাস্যে জবাব করলে—“যদি বলি তোর সুকু-দা’র জন্যই বুনছি?”

সুজাতা হেসে উঠে বল্লে—"তা হ'লে ত খুসীই হব, তোমাকে আরও ভালবাসব। আমি যাকে ভালবাসি তাকে যদি তুমি ভালবেসে যত্ন করে' পরিশ্রম করে' কিছু করে' দাও, তাতে আমার অসুখী হওয়ার কি কারণ আছে ? সেইজন্য তুমি এত ইতস্ততঃ করছ কেন ?"

মঞ্জরী বল্লে—"সে কথা তুমি বুঝতে পারবে না। ভালবাসা ভালবাসাকে ঘনিয়ে তোলে, ঋতুকালে ফুল যেমন তোলে ফুলকে ফুটিয়ে। কিন্তু ফুল যে খালি ফুলকে ফোটায় তা নয়, অনেক সময় কাঁটাও তীক্ষ্ণ করে' তোলে। কালিদাস বলে' গেছেন—স্নেহ পাপশঙ্কী, কোনও জায়গায় স্নেহ থাকলে তাকে অন্যের কাছ থেকে রক্ষা করবার জন্য অনেক রকমের আশঙ্কা লোকের মনে জেগে ওঠে, তাই অনেক সময় হয় রজ্জুতে সর্পভ্রম।"

এমন সময় বৈকালিক আহারের ঘণ্টা বাজল, কথা আর চলল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনেক দিন কেটে গেছে। মাঘের শেষ। শীত যাই যাই করে'ও যেতে পারছে না, বাঁধা পড়ে' গেছে শাল আলোয়ানের আবরণের মধ্যে। এখনও চলেছে তার পাতা ঝরাবার লীলা। শুকনো উত্তর হাওয়ায় নিরন্তর চলেছে বিশুষ্ক শালপত্রের খড়খড়ি। গঙ্গার জল ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে চলেছে, কিন্তু এরই মধ্যে নবোদ্গত বসন্ত শিশুকৃষ্ণের মত তার বলবিক্রম প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে।

শীতকে চলে' যাবার অবসর সে দেয় না; শীতের মধ্যেই তাকে আত্মপ্রকাশ করতে হবে, নইলে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তার কমনীয় অঙ্গ ভস্মসাৎ করে' দেবে। অলক্ষ্যে আসে ঋতু, কোন্ দূর অলক্ষ্যে সে যায় চলে'। আমরা যখন আপিস্ আদালত, মামলা মোকদ্দমা, হাটবাজার বেচাকেনায় থাকি ব্যস্ত, মুহূর্ত্তমাত্র যখন আমাদের অবসর হয় না চারিদিকে তাকিয়ে দেখবার, তখনও দেখি ঋতুরা তাদের কাজ ভোলে নি। সকলের অলক্ষ্যে আমের গাছে বেরিয়ে আসে পল্লবাঞ্চল পূর্ণ করে' মুকুল; সজ্‌নে গাছে কখন যে ফুল শেষ হয়ে ডাঁটা আরম্ভ হয়, প্রকাণ্ড শিমুলে কখন যে আকাশকে রক্তাম্বর পরিয়ে দেয়, পলাশ ও মাদারের পাতায় পাতায় কখন যে আগুন ধরে' ওঠে, তা নজর করবার আমাদের কোনও অবসর হয় না। আমরা আমাদের জ্ঞান আহরণ করি খবরের কাগজ থেকে, আমাদের ব্যক্তিগত মতামত নিজেদের অলক্ষ্যে পুষ্ট করতে থাকি খবরের কাগজের মন্তব্যের ঝুড়ি থেকে। কিন্তু প্রকৃতির দরবারের সংবাদ রাখবার আমাদের কোনও আবশ্যক হয় না। রয়টারের কোনও লোক সেখানে সাংবাদিকের কাজে নিযুক্ত হয় না, তার কাজ চলে অলক্ষ্যে ভূগর্ভে অতি প্রচ্ছন্নে। তবু তার বাইরের প্রকাশের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। যখন কিছুমাত্র অপেক্ষা করি নি হঠাৎ তখন মাটির দিকে চেয়ে দেখি আশ্চর্য্য পীত শোভা সর্ষেফুলের মধ্য দিয়ে চলেছে আন্দোলিত হয়ে, গোধূমের শীষগুলি কোমল হরিদ্বর্ণে ছেয়ে দিয়েছে সমস্ত প্রান্তর। পদ্মবনে দু'টি চারটি করে' পদ্ম উন্মীলিত হচ্ছে। অকাল-বসন্তের উদ্যোগ হয়েছিল যোগীশ্বর মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গের জন্য, কিন্তু প্রতিবর্ষে যথাকালে সমাগত বসন্ত আমাদের সজাগ করে' তোলে না। বাইরের প্রকৃতি যেমন গোপনে চলে তার কাজ করে', আমাদের

অন্তরের প্রকৃতিও তেমনি চলে তার সঙ্গে সায় দিয়ে। কখন যে আমরা কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিই তার আমরা কোনও খবর রাখি না, কিন্তু যৌবনের ভুল হয় না কখনও দেহে মনে তার উৎসবের চাঞ্চল্যকে প্রকাশ করতে। অথচ এই যৌবনের শক্তি কোথায় যে ছিল প্রচ্ছন্ন হয়ে, কেউ তার খবর জানত না। কেন যে আসে যৌবনের অনিমিত্ত আনন্দ, তার রহস্য উদ্ঘাটন করা তেমনই কঠিন যেমন কঠিন এই ঋতুর রহস্য উদ্ঘাটন করা। বৃদ্ধ যখন বালাপোষ মুড়ি দিয়ে পাশা খেলছেন কিংবা স্তব্ধভাবে প্রাচীন জীবনের ধূমায়িত স্বপ্নের মধ্যে বসে' তাম্রকূটের উচ্ছ্বসিত ধূমরাজি নিভৃতে নিরীক্ষণ করছেন তখন তরুণতরুণীরা হয় ত রয়েছে মত্ত হয়ে তাদের খেলার আনন্দে, নয় ত বা পিক্‌নিকের বসন্ত-উৎসবে।

এমনি একটা শীতবসন্তের সন্ধিলগ্নে কতগুলি তরুণী এসেছে বোটানিক্সের বনভূমিতে পিক্‌নিক্ করতে। যেখানে পশ্চিমের রৌদ্রটা এসে পড়তে পারে অথচ এদিকে ওদিকে পত্রপুঞ্জ-সমাকীর্ণ বিশালশীর্ষ তরু-শ্রেণী রয়েছে, সেইরকম স্থানে কয়েকটা সতরঞ্চ বিছানো রয়েছে, দুটো একটা বালিশও আছে। সেইখানে জমেছে পিক্‌নিকের একটি বড় আড্ডা। রন্ধনাদির কোনও বন্দোবস্ত ছিল না, খাবার সঙ্গে এসেছে। আজকালকার মেয়েরা বিদ্যাপথে যতই সারস্বত অভিযান করছেন ততই তাঁদের প্রাচীন বৃত্তিটা ক্রমশঃ যেন একটু একটু হ্রাস পেয়ে আসছে। যে বিষয়ে দক্ষতা ও পটুতা কমে' যায় সেই বিষয়টিই মানুষের কাছে মনে হয় ক্লেশকর। দক্ষতা থাকলে আত্মপ্রকাশের মহিমা ও আকর্ষণ সমস্ত ক্ষয়ক্ষতিক্লেশকে তুচ্ছ করে। তাই আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে রান্নাবাড়ার প্রস্তাব উঠলেই সেটাকে মেয়েরা প্রায় হাঙ্গামা বলে' মনে করেন এবং ঐ তুচ্ছ ব্যাপারটাকে যত

সংক্ষেপে সারতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে ছাড়েন না। বাঙ্লার মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যায় রন্ধনের নানা পারিপাট্যের কথা। সেকালের কবিরা তাঁদের গৃহিণীদের হাতে রন্ধনের এত পারিপাট্যের সেবা পেতেন যে মেয়েদের সম্বন্ধে সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ না করলে হয় ত তাঁদের গৃহস্থালী করা দুর্ঘট হয়ে উঠত। কিন্তু বর্ত্তমানকালের কবিদের সে সৌভাগ্য নেই। আজকালকার দিনে পাচক ও ভৃত্যে করে রন্ধন, আলস্যের মৃদুসঞ্চরণে কদাচিৎ পাকশালার কিঞ্চিৎ পর্য্যবেক্ষণ করে' বাহাদুরীটা নেন গৃহিণী। এখানেও এই ব্যবস্থা হয়েছে। খাওয়াদাওয়া শেষ করে' নানাদিকে মেয়েরা ছুটোছুটি করছে। কেউ বা কোনও বৃক্ষের এলায়িত শাখায় চড়ে' বসে' দোল খাবার ব্যবস্থা করছে, কেউ বা কোনও বিলিতি ফুলগাছের পুষ্পস্তবক কবরীবদ্ধ করছে, কেউ বা নানা জায়গা থেকে পুষ্প চয়ন করে' মালা গাঁথছে। কোনখানে বা চার পাঁচজন বসে' জটলা করে' পরচর্চ্চা করছে। কেউ বা চয়নিকা থেকে কোন কবিতা আবৃত্তির ভঙ্গিতে পাঠ করছে। কেউ বা নিভৃতে বসে' কোন সুখপাঠ্য উপন্যাস পড়ছে। নিস্তারিণী দেবীও এসেছেন এবং তাঁর পাশে অনেকগুলি মেয়ে জটলা করে' বসেছে। তিনি পড়ছেন দেবেন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মধর্ম্ম"। চারিদিকে মেয়েদের আজ অবাধ স্বাধীনতা। বোটানিক্সের এই অংশটি আজ হয়ে উঠেছে একান্তভাবে একটি স্ত্রীরাজ্য।

কিন্তু এই স্ত্রীরাজ্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে সুজাতা খানিকটা দূরে সোৎসুকনেত্রে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে চলেছে। মনটা যেন একটু উৎকণ্ঠিত, কাউকে যেন অপেক্ষা করছে, অন্যদিকে বিশেষ দৃষ্টি নেই। এমন সময় দেখা গেল দূরে একটি শালপ্রাংশু যুবক। তাকে দেখে সুজাতা ছুটল সেই দিকে বিচ্ছুরিত রৌপ্যস্রোতের

কলহাস্যে। ছেলেটি সুকুমার। সে এই স্ত্রীগোষ্ঠীর পিক্‌নিকে যোগ দিতে পারে নি, কারণ সে পুরুষ। কিন্তু একান্ত অনাহূত বা রবাহূত হয়েও সে আসে নি। সে এসেছে সঙ্কেতাহূত হয়ে। সুজাতা তাকে বলেছিল আজ বোটানিক্সে আসতে। তার ইচ্ছা ছিল আজ পিক্‌নিকের পরে সুকু-দা'কে নিয়ে সে খানিক টহল দেবে ও গল্প করবে। এর অনেক আগেই তার আসার কথা ছিল, কিন্তু সে আসে নি। তাই তার অপেক্ষায় সুজাতা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাই সুকুমাবকে দেখেই সুজাতা বলে' উঠল—

"এতক্ষণ কি করছিলে? তোমার জন্য অপেক্ষা করে' করে' সেই কখন থেকে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি।"

সুকুমার একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে—"তাই ত, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। আমাদের ওখানে আজ চল্‌ছিল দাবার চ্যাম্পিয়নশিপ্, তাই খেলাটা সেরে আসতে দেরী হয়ে গেল। ভেবেছিলুম যে অনেক আগেই খেলাটা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ এমন সব চাল দিতে লাগল যে প্রতি চালে আমাকে অনেকক্ষণ ভাবিয়ে দিয়েছে। শেষটায় যে একেবারে হেরে যাই নি এই ভাগ্য।"

সুজাতা সুকুমারের কাছে এগিয়ে গিয়ে হেসে বল্লে—"তুমি দাবাও খেল? তোমার যে এ রোগ ছিল তা জানি নি ত কোনদিন।"

সুকুমার বল্লে—"আমার সব রোগই যে তোমার কাছে প্রকাশ পাবে এমনই বা কি কথা? তুমি ত আর চিকিৎসক নও বা নার্স'ও নও যে আমার রোগ জানবে, তার ওষুধ বাৎলে দিতে পারবে, কিংবা হবে আমার শুশ্রূষাকারিণী!"

এই কথা হ'তে হ'তে উভয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটি ছোট কুঞ্জের আবরণের মধ্যে প্রবেশ করল। সুজাতা বল্লে—"না'ই বা হলুম

চিকিৎসক, নাই বা হলুম নার্স, তবু সত্যিকার তোমার যদি কোন রোগ থাকে ত আমাকে তা না বলে' তুমি কেমন করে' থাকবে? আমার ত যা মনে আসে সব কথা তোমাকে বলে' ফেলি।"

"তোমার মনের মধ্যে নেই-ই কিছু, তুমি কি বলবে? তোমার মনটি হচ্ছে একটি শূন্য কলস আর তা পূর্ণ করে' আছে আনন্দের কলোচ্ছ্বাস। তার মধ্যে রোগের বীজাণু প্রবেশ করতে এখনও ঢের দেরী।"

এমন সময় পাশের ঝোপটা যেন অকারণে একটু কেঁপে উঠ্‌ল। দুটো বক উড়ে' গেল। কেউ সে দিকে মন দিলে না।

সুজাতা বল্লে—"আমার আবার রোগের বীজাণু কি?"

সুকুমার বল্লে—"কেন, কুসুমে কীট কি একেবারেই অসম্ভব? কিন্তু তোমাকে দেখলেই মনে হয় যেন অনাঘ্রাত পুষ্প, যেন অচ্ছিন্ন তরুণ পেলব পল্লবদল, যেন অনাস্বাদিতরস মধু, যেন বহুজন্মের অখণ্ড পুণ্যফল।"

সুজাতা বল্লে—"হয়েছে, হয়েছে, আর 'শকুন্তলা' আওড়াতে হবে না। আমি ত আর তপস্বিনী শকুন্তলা নই, আর তুমিও মহারাজ-চক্রবর্ত্তী দুষ্মন্ত নও, প্রবেশ কর নি তপোবনে মত্ত মাতঙ্গের মত তার পদ্মবন নির্ম্মথিত করে'।"

সুকুমার বল্লে—"তপস্বিনী শকুন্তলা তুমি না হ'তে পার, কিন্তু তুমি যে নগরবাসিনী শকুন্তলা সে সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নেই। সে পরম ভাগ্যবান, যে দুষ্মন্ত হয়ে' তোমার তপোময় চিত্তের ধ্যান ভাঙ্‌বে।"

ঠিক এই সময় হঠাৎ যেন আকাশ থেকে নেমে এল মঞ্জরী। সে কোন্‌খান থেকে এল তা কেউ লক্ষ্য করতে পারে নি। হঠাৎ দু'জনে

দেখলে মঞ্জরী এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। দু'জনেই হ'ল একটু অপ্রস্তুত। একটু শ্লেষমিশ্রিত স্বরে মঞ্জরী সুকুমারের দিকে চেয়ে বল্লে—"আপনারা এখানে দেখছি দুষ্মন্ত শকুন্তলার অভিনয় বেশ জমিয়ে তুলেছেন, কিন্তু শকুন্তলাটি তার পার্ট ভাল বলতে পারছে না। ওর বদলে আমি হ'লে হয়ত মহাকবির সৃষ্টির আর একটু সরস পরিচয় দিতে পারতুম।"

সুজাতা খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠে' বল্লে—"তুমি হঠাৎ এখানে এসে হাজির হ'লে কি করে'?"

"তা তুমি বুঝবে কি করে'? আমি তোমায় কতক্ষণ ধরে' খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমার নিস্তারিণী দেবী উচাটন চিত্তে এদিকে ওদিকে নিরীক্ষণ করছেন, মনে হ'ল তোমাকেই খুঁজছেন।"

সুজাতা বল্লে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ত। তাঁকে একটা ওষুধ দিতে হবে, কিন্তু সে ত আরও খানিক পরে। তা যাই হোক্, আমি একবার ঘুরে আসি, আর তুই ততক্ষণ সুকু-দা'র সঙ্গে বসে' গল্প কর্।"

মঞ্জরী হেসে বল্লে—"কেন, তোমার জন্য আসর জমিয়ে রাখতে? কিন্তু মনে রেখো, বিপক্ষকে বার বার আসন ছেড়ে দিলে দখলী স্বত্ব নষ্ট হ'তে পারে।"

সুজাতা একটু যেন কষ্টহাস্যে বল্লে—"তা তুই ভাল করে' দখল কর্ না, আমার দখলের কোন লোভ নেই। এই বলে' দু'জনের মুখের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি ফেলে' সে ছুটল নিস্তারিণী দেবীর তল্লাসে।

মেয়েদের মধ্যে একটা বিশেষ শ্রেণী আছে যাদের বলা যায় জাত-শিকারী। তাদের রক্তের মধ্যে খেলা করে শিকারের লোভ। বিড়াল যে ইঁদুর ধরবার জন্য আড়ি পাতে সেটা তার কুলক্রমাগত

সংস্কারের ফল। তখন বিড়ালও থাক্‌ত বনে, ইঁদুরও থাক্‌ত বনে। বিড়ালকে বসে' থাক্‌তে হ'ত একজায়গায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আড়ি পেতে, সমস্ত দেহের মাংসপেশীকে একান্তভাবে উন্মুখ করে' রাখতে হ'ত যাতে ইঁদুরের ছবিটি চোখে এসে পড়া মাত্র কিংবা তার নিঃসরণের শব্দটি কাণে যাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক তারে নাড়া লাগার মত সমস্ত দেহটা লাফিয়ে পড়বে ইঁদুরটার উপর। আজ ঘরের ইঁদুরকে মারবার জন্য হয় ত সব সময়ে আড়ি পাতার আবশ্যক হয় না, কিন্তু আড়ি পাতার সংস্কার তাকে ছাড়ে নি; তাই এখনও যখন ঘরের ইঁদুর অত্যন্ত সুলভ, তখনও আড়ি না পেতে সে ঝাঁপ দিতে পারে না। জাতশিকারী মেয়েদের মধ্যে শিকারীসুলভ সমস্ত সদ্‌গুণই যেন তাদের রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হয়। এই বিষয়ে আছে তাদের অশিক্ষিত পটুত্ব। একেই প্রাচীন কবিরা বলেছেন স্ত্রীসুলভ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। তারা প্রত্যেকটি পা বাড়াতে ডাইনে বাঁয়ে দেখে এবং ঝাঁপ দেওয়ার আগে আড়ি পাতবার ব্যবস্থাটা আয়ত্ত করে' নেয়। একটা বিড়াল যখন আড়ি পেতে থাকে কিংবা একটা বক যখন এক পায়ে ভর করে' অত্যন্ত শান্ত হয়ে আপ্লাবিত ধানের ক্ষেতে বসে' থাকে তখন মনে হয় যে তারা অত্যন্ত নিরীহ, তাদের সন্দেহ কর্‌বার একটু মাত্রও কারণ থাকে না। সেইজন্য এই শ্রেণীর মেয়েদের কবলে যারা পড়ে, গলায় ফাঁস লাগার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তারা হয় ত মনে করে—এরা মানবী, না দেবী! যে ছলাকলা তারা ব্যবহার করে, মুগ্ধ পুরুষ তার মধ্যে কিছুতেই চাতুরী আবিষ্কার করতে পারে না। নানা কৌশল, নানা বিলাসের বিভ্রম, আকর্ষণের ফাঁদ পাতবার নানা ছাঁদ তাদের কাছে মনে হয় যেন লীলোৎসারী সরলতা। যেখানে পুরুষকে মুগ্ধ করবার জন্য নানা রকমের যাদু তারা প্রয়োগ করে সেখানে পুরুষ

মনে করে যে এ তারই প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার স্বাভাবিক প্রকাশ। এই জাতশিকারী মেয়েরা যাদের ধরে তাদের সকলকেই যে আত্মসাৎ করে তা নয়। বিড়ালের যেমন ইঁদুর খাওয়ায় যত আনন্দ তার চেয়ে কম আনন্দ নয় ইঁদুর নিয়ে খেলানোতে, এদেরও তেমনি পুরুষ নিয়ে খেলানোতেই একটা স্বাভাবিক আনন্দ আছে। যাদের খেলায় তাদেরই যে ডাঙ্গায় তোলে বা আত্মসাৎ করে তা নয়, কিন্তু অনেক সময় খেলিয়ে এমন করে' ছেড়ে দেয় যে বেঁচে থাকলেও সারা জীবন হয় ত তাদের বুকের জ্বালা নিবৃত্ত হয় না। এ কথা বলা যায় না যে এই বিভ্রম লীলার প্রত্যেকটি কাজ সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ সচেতন; বরং অনেক সময় এ কথাও বলা যেতে পারে যে তারা যে কি করছে তা তারা নিজেরাই জানে না। প্রজাপতির গুপ্তচর বাস করে তাদের অন্তরের মধ্যে অন্তর্যামী হয়ে, তিনিই নেন তাদের মুখ থেকে ভাষা কেড়ে, সৃষ্টি করেন বিচিত্র ছলাকলা, অঙ্গে দোলা দিয়ে যান লাবণ্য-হিল্লোলে। নিদ্রিত পঞ্চশর হয়ে ওঠেন জাগ্রত! তাঁরই তীক্ষ্ণ আঘাতে প্রলুব্ধ পুরুষ হয় বাণবিদ্ধ, যত বিদ্ধ হয় ততই বিদ্ধ হ'তে ভালবাসে, ততই তার দেহ পড়ে এলিয়ে, চেতনা যায় বিবশ হয়ে—কোন্ ঘুম-পাড়ানিয়া এসে বুদ্ধিকে দেয় ঘুম পাড়িয়ে, ইচ্ছাশক্তি আসে নিস্তেজ হয়ে, আর প্রমাদের চলে তাণ্ডব নৃত্য। এমনি করে' পুরুষ পড়ে নারীর ফাঁদে, কারণ এই ফাঁদে পড়াই তার বিধিলিপি। এইটিই হচ্ছে পুরুষজীবনের শ্রেষ্ঠ অভিশাপ এবং বর। আঘাতই এখানে আনন্দ, অপ্রাপ্যের চিন্তা এখানে মাধুর্য্য।

পুরুষকে আবিষ্কার করার একটা কৌতুক নারীহৃদয়ের অন্তঃসলিলে স্পন্দমান হয়ে চলেছে। এমনই মানুষের মধ্যে নূতন বস্তুকে আবিষ্কার করবার একটা প্রবল ঔৎসুক্য তাকে চঞ্চল করে' তোলে। গভীর

জলে থাকে মাছ। তাকে আকর্ষণ করবার জন্য বঁড়শী ফেলে' চতুর শিকারী ফাৎনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' গ্রীষ্মে বর্ষায় বসে' থাকে দিনের পর দিন। গভীর অরণ্যচারী চঞ্চল হরিণকে বাণবিদ্ধ করবার জন্য শিকারী কি অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে! হঠাৎ যে ধরা দেয় তাকে ধরায় কোন আনন্দ নেই। যে একেবারেই ধরা দেবে না, তার পিছনে মিথ্যা পরিশ্রম ক্লেশকর। যে ধরা-অধরায় পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে, তাকে ধরবার জন্যই আসে মনের আগ্রহ। এই আগ্রহ যে শুধু নারীর মনেই থাকে তা নয়, অবোধ পুরুষও মনে করে যে সে তাব সমীপস্থ নারীকে আবিষ্কার করছে। কিন্তু নারীকে এইজন্যই বলা যায় মায়াবিনী যে সে অনেকদূর পর্যন্ত তার মায়াজালকে ব্যাপ্ত করে'ও নিজে থাকতে পারে সে মায়ার বাইরে। স্বয়ং-প্রসারিত মায়া দ্বারা সে যে সহসা ধরা পড়ে না এইখানেই তার পটুত্ব। পুরুষ যখন চায় নারীকে আবিষ্কার করতে, ফাঁস লাগে তার গলায়। নারীর মায়া তাকে টেনে নিয়ে যায় তার দিকে, কিন্তু পুরুষ যখন এমনি করে' আকৃষ্ট হ'তে থাকে তখন সে সেই টানেই ছুটতে থাকে তার দিকে, কিন্তু নিজের মনকে বোঝায় যে সে চলেছে নারীকে আবিষ্কার করতে। সে মনে করে যে সে তলিয়ে দেখবে যে তার নিক্ষিপ্ত দু'একটা বাণে নারী কতদূর বিদ্ধ হ'ল, কিন্তু আসলে তার অজ্ঞাতে সে চলেছে নারীর মায়াকুহকের অতল গহ্বরে। নারীও যখন মায়াজাল পাতে তখন তার আপন জালে যে কখনও তার পা জড়িয়ে যায় না তা নয়, কিন্তু যে সব মেয়ে এই মায়াবিনী জাতের, তারা ধরে কিন্তু সহজে ধরা দেয় না। খেলার যেমন একটা স্বাভাবিক লীলা আছে, সে লীলার বাইরে কোন উদ্দেশ্য নেই, এ ঠিক সে জাতীয় লীলা নয়; অথচ ভালবাসায় যে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে, আপনাকে সম্পূর্ণ

ত্যাগ করে' একটা গভীর পাওয়ার পরিতৃপ্তি আছে এরা তা কখনও অনুভব করে না। এরা ভালবাসা কি তা জানে না, জানে ভালবাসার বহিরঙ্গ লীলা। অনেক খেলোয়াড় আছে যারা ছলে বলে কৌশলে কেবলই চায় জিততে, কখনও হারবে না এই হচ্ছে তাদের পণ। তারা চায় আত্মাভিমানের গৌরব, খেলার আনন্দ তারা চায়ও না, পায়ও না। সেইখানেই খেলার আনন্দ তার পূর্ণ প্রকাশ লাভ করে যেখানে খেলা হয়ে ওঠে প্রধান, জেতাটা হয় গৌণ। তাই, যে সমস্ত ব্যাধ জাতীয় নারী অপরকে বিদ্ধ করে' আত্মসাৎ করতে চায়, নিজেরা বিদ্ধ হয় না পঞ্চশরের বাণে, কিংবা বিদ্ধ হ'লেও সে বাণ গিয়ে তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে না, তারা ভালবাসাকে করে জীবিকার বৃত্তি, আধিপত্যের সোপান, প্রভুত্বের বিজয়কেতন। তারা ভালবাসার বেদনা নিজেরাও অনুভব করে না এবং তাদের মুগ্ধ ভক্তদের ব্যথার সঙ্গেও থাকে না তাদের কোনও সহানুভূতি। তাদের বাক্য এবং ব্যবহার হৃদয়ের মূল থেকে উৎসারিত হয় না, চালিত হয় সেই আদিম মানবের বুদ্ধির বৃত্তিতে, যে বুদ্ধির প্রধান ব্যবহার-ক্ষেত্র হচ্ছে সুখ, সুবিধা, সুযোগ এবং প্রভুত্ব। হৃদয় তাদের হয়ে থাকে রিক্ত, শুষ্ক, কিন্তু সে কথা উপলব্ধি করতে তাদের এত দেরী হয় যে যখন তারা তা বোঝে তখন তারা হয় নিরুপায়।--

> 'যে জীবনে পাই নাই, কোনকালে দিই নাই কিছু,
> সারাটি জীবন নিয়ে ঘুরিয়াছি আপনার পিছু,
> যত ছুটে চলে' যাই দেখিনু যে আছি এক ঠাঁই,
> এ আমার রিক্ত চিত্তে ওঠে শুধু নাই নাই নাই।'

মঞ্জরী ইঙ্গিত করেছিল যে গলাবন্ধটা যদি সে সুকুমারের জন্যই বুনে থাকে তবে কি হয়। কথাটা তখন আর এগোয় নি। পরে

সে সুজাতাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে গলাবন্ধটা সে কোনও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের জন্য বুনেছে; অথচ গলাবন্ধটা সে বাস্তবিক বুনেছিল সুকুমারের জন্য এবং কিছুদিন বাদে পাঠিয়েও-দিয়েছিল তাকেই, কিন্তু গোপনে।

সুজাতার কল্যাণে মঞ্জরীর সঙ্গে সুকুমারের বেশ আলাপ হয়ে গেছে। সুকুমার এম্-এস্-সি হ'লেও সংস্কৃত সাহিত্যে, বাংলা সাহিত্যে এবং ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে তার প্রচুর পড়াশুনা ছিল। সে পড়াশুনা পাকা না হ'লেও মোটামুটি চলনসই বটে। এই প্রসঙ্গে মঞ্জরী নানা বিষয়ে সুকুমারের কাছে আলোচনা করতে ও পড়তে যেত। মঞ্জরীর একটা সুবিধা ছিল যে সে নিয়মিতভাবে মেয়েবিদ্যালয়ের অধিবাসিনী ছিল না। তার বিধবা মা কলকাতায় তারই জন্য বাসা করে' থাকতেন। প্রায়ই সে বাসায় থাকত, আবার অনেক সময় তাকে মেয়েবিদ্যালয়ে থাকতে দেখা যেত। সে ছিল অবাধ সঞ্চারিণী। মেয়েবিদ্যালয়ে যখন সুকুমার আসত সুজাতার সঙ্গে দেখা করতে, সেই অবসরে সুজাতার মারফৎ সে বেশ করে' আলাপ জমিয়ে নিয়েছিল সুকুমারের সঙ্গে। কিন্তু সুজাতার সামনে সে কিছুতেই সুকুমারের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ হ'তে চাইত না, সুজাতাকে এগিয়ে দিয়ে সে থাকত পশ্চাতে ব্রীড়ানত হয়ে। অনেক কষ্ট করে'ও সুজাতা তার এই সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্‌তে পারে নি। এই সঙ্কোচের আড়ালে থেকে সে অতি নিপুণ ও নিবিষ্টভাবে পর্য্যবেক্ষণ করত সুজাতা ও সুকুমারের পরস্পরের মধ্যে কি মনোভাব গড়ে' উঠছে। সুজাতার ব্যবহারে যে স্বচ্ছন্দ সরলতা অসঙ্কোচে প্রকাশ পেত তার রহস্য ছিল মঞ্জরীর কাছে দুর্ভেদ্য। সে মনে মনে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারত না যে এই সরল ব্যবহারকে নিছক ভালবাসা ছাড়া আর কোনও আখ্যা দেওয়া যেতে

পারে, অথচ এমন কোনও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যেত না যার দ্বারা এই ভালবাসাকে কোনও একটা বিশেষ পর্য্যায়ের মধ্যে ফেলা যায়। সুজাতার হৃদয়ে গোপনে সুকুমারের প্রতি কি ভাব গড়ে' উঠছে তা আবিষ্কার করবার জন্য মঞ্জরীর মনে ছিল অসীম কৌতূহল, অথচ এই কৌতূহলটি যে একান্তভাবে সত্য আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তা বলা যায় না। সুজাতার ধরণের মেয়ে সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নি, তাই সে ছিল তার কাছে একটা হেঁয়ালি হয়ে।

কিন্তু তার প্রখরতর দৃষ্টি ছিল সুকুমারের প্রতি। তার মনে হ'ত যেন সুকুমার তাকে আমলই দেয় না। সুকুমারের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মধুর ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু সে ব্যবহারকে একটা অসীম সৌজন্য ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তার প্রত্যেকটি ব্যবহারে সুজাতার প্রতি একটা গাঢ় স্নেহ প্রকাশ পেত, অথচ এই গাঢ় স্নেহকে কি পর্য্যায়ের মধ্যে ফেলা যায় তা আবিষ্কার করা ছিল কঠিন। সে ভালবাসা ভগিনীর প্রতি ভাইয়ের ভালবাসার চেয়ে যে অন্য রকমের তা জোর করে' বলা চলত না। সুজাতার সামনে এলেই সুকুমারের মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠত একটি স্নিগ্ধ আলোতে। চতুর মঞ্জরী নানা কথার টোপ ফেলে' চেষ্টা করত সেই আলোর নিবিড় রহস্য ভেদ করতে। সে অনুভব করত যে এ আলো সেই আলো নয় যে আলো উদার ভাবে ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে, নদীর জলের উপর ওঠে ঝিক্‌মিক্ করে' এবং দূর্ব্বার ক্ষেত্রে পড়ে স্নিগ্ধ হয়ে। এ আলো যেন সেই আলো যে আলো রাত্রির শেষ যামে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অতি গোপনে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলে' আসে, স্পর্শ করে অতি সন্তর্পণে স্ফুটনোন্মুখ পুষ্পরাজির পেলব পত্রদল, অতি মৃদুভাবে স্পন্দিত হয় ফুলের ঘুম-ভাঙানোর জন্য, অসীম কৌতূহলে ও অসীম

ধৈর্য্যের সহিত নেচে বেড়ায় পল্লবপুরীর প্রাঙ্গণে, বসে' থাকে সেই অপেক্ষায় কখন কুঁড়ির মুখ খুলবে, যাতে সেই পথে প্রবেশ করে' সে তার অন্তর্লোককে রাঙিয়ে দিতে পারবে। সুকুমারের প্রতিটি কথায় প্রকাশ পেত সুজাতার প্রতি একটা দরদ। সে দরদ কোনও স্পষ্ট মূর্ত্তি নেয় নি বটে, কিন্তু তা এমনই বিগলিত হয়ে আছে যে, যে কোন সময়েই যেন একটা মূর্ত্তি নিতে পাবে। এইখানেই ছিল মঞ্জরীর আশঙ্কা ও ভয়। সে মনে মনে জানত যে নির্জ্জনতার উদ্দীপনা পেলে এই ভালবাসা অনায়াসেই কোনও একটা বিশেষ দিক দিয়ে প্রবাহিত হ'তে পারে। তাই সুজাতার সঙ্গে যখনই সুকুমারের দেখা হ'ত মঞ্জরী কিছুতেই তাদের সঙ্গ ছাড়ত না। নানা হাস্যপরিহাসে এই আলাপের ক্ষণ-গুলিকে সে এমন কল্লোলিত ও মুখরিত করে' রাখত যে পঞ্চশরের গোপন সঞ্চার একান্ত অসম্ভব হয়ে উঠত।

আবার অপরদিকে, নানা ছলে সে সুজাতাকে দিত সরিয়ে এবং সেই অবসরে সুকুমারকে নিরালা করে' নিয়ে নিজের সঙ্গে তাকে পূর্ণ করে' তুলতে চেষ্টা করত। সে সুকুমারকে বুঝিয়েছিল যে সুজাতার সামনে সে সুকুমারের সঙ্গে কোনও পড়াশুনার আলোচনা করতে সঙ্কোচ বোধ করে। সুকুমার থাকত একলা বাসা করে'। মধ্যে মধ্যে অপরাহ্ণে সে গিয়ে হাজির হ'ত তার বাসায় কেতাবপত্র নিয়ে। সন্ধ্যার স্নিগ্ধচ্ছায়ায় সে বাধ্য করত সুকুমারকে তার বাসা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে। সুকুমারকে সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে সে যেন এর কোনও কথা সুজাতার নিকট প্রকাশ না করে।

এক এক শ্রেণীর পুরুষমানুষ আছে যাদের চিত্ত নারীজাতির প্রতি অত্যন্ত সম্ভ্রমশীল, অথচ নারীজাতি সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সৌজন্য ও ভদ্রতার একটা উচ্চ আদর্শে তাদের চিত্তের স্বাভাবিক

স্বচ্ছন্দতা নানা বাঁধনে তাদের আবদ্ধ করে। সুজাতাকে গোপন করে' এই যে মঞ্জরীর সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে' উঠছে এ লুকোচুরিটা সুকুমারের একেবারেই ভাল লাগত না। কিন্তু ফাঁদে যখন একবার পা দিয়েছে তখন এড়াবারও কোনও উপায় নেই। তা ছাড়া, মঞ্জরী দেখতে অতি সুন্দরী। যৌবনের লাবণ্য তার সমস্ত দেহে ও মনে যেন একটা প্লাবন এনে দিয়েছে। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, হাস্যপরিহাসের চাতুর্য্য এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা স্নিগ্ধ নম্রতা তার চারিদিকে এমন একটা মাধুর্য্যের আকর্ষণ রচনা করত যাতে সুকুমার তার সাহচর্য্যে একটা নবীন উন্মাদনা অনুভব করত। সুকুমারের মনে হ'ত যে সুজাতার স্নেহে ভালবাসায় ত এ জিনিষটি পাওয়া যায় নি। সুজাতার ভালবাসায় স্রোত ছিল, কিন্তু লীলা ছিল না; গতি ছিল, কিন্তু তরঙ্গ ছিল না; প্রবাহ ছিল, কিন্তু বক্রতা ছিল না। সূর্য্যের আলোর মত তা ছিল অপ্রচ্ছন্ন, উদার। চোখ খুললেই যেমন আমরা আলো দেখতে পাই, সুজাতা কাছে এলেই তেমনি পাওয়া যেত তার সম্পূর্ণ স্পর্শ, তার কোথাও আবরণের কুহেলিকা ছিল না। কিন্তু মঞ্জরীর ঔজ্জ্বল্য ঝলক দিয়ে বর্ণমালায় উদ্গীর্ণ হয়ে পড়ত, তবে রামধনুর বর্ণমালার মত সে যেন কোন্ দূরলোকের বর্ণমালা—তার কাছে যখন যেতে চেষ্টা করা যায় তখন দেখা যায় যে সে আর নেই। এ আলো প্রভাতসূর্য্যের আলোর ন্যায় দেদীপ্যমান নয়, এ যেন নারিকেল-বনবীথিচ্ছায়ায় ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাসক্রীড়া। দক্ষিণ বায়ুর আন্দোলনে নারিকেলবনের পত্ররাজি যখন দোল খেয়ে ফেরে তখন সেই পত্রান্তরালের মধ্য দিয়ে যে জ্যোৎস্নার নৃত্য সন্ধ্যার ছায়া-পটের মধ্যে অস্পষ্টতার মোহে তরঙ্গিত হয়ে ওঠে, তার মধ্যে থাকে একটা পাওয়া-না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্বে থাকে একটা নবীনতার

মূঢ় আকর্ষণ, ধরা-অধরার চলে সেখানে একটা লীলা। এই রসের আস্বাদ বিশুদ্ধ গঙ্গাজলের আস্বাদ নয়, এ যেন নানা সুগন্ধে বাসিত পানকরস। মান, অভিমান, বক্রতা, বিলাস, বিভ্রম নিরন্তর এর নবীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখে। তাই, যখন মঞ্জরী সুকুমারের কাছে পড়তে আসত, নির্জ্জন সন্ধ্যায় বসে' তারার আলোকের সঙ্কেতে সুকুমারের মন চাইত মঞ্জরীকে আবিষ্কার করতে, তখন ভালই লাগত সেটা সুকুমারের। আবার সন্ধ্যার ছায়ায় যখন সুকুমার তাকে পৌঁছে দিয়ে আসত, তখন পথে নানা কল্পিত আশঙ্কায় হয় ত বা সে কখনও সুকুমারের গায়ের কাছে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ত এবং আপন অজ্ঞাতে সুকুমারের বলিষ্ঠ বাহু তাকে বেষ্টন করত তাকে রক্ষা করবার জন্য। মৃদু আশঙ্কায় ও ভৎর্সনায় সুকুমার তার অযথা ভীরুতার কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিত। তখন হয় ত তার মনে একটি আশ্রিতা নারীকে ভয় থেকে রক্ষা করল এই পৌরুষ উজ্জীবিত হয়ে উঠ্‌ত। শুধু তাই নয়। মঞ্জরীও মধ্যে মধ্যে দুই একদিন সুকুমারকে বাড়ীতে এনে নিজের হস্তে পরিপাটিরূপে রন্ধন করে' খাইয়েছে এবং আহারের সময় মৃদু ব্যজনে তার মৌন সেবা জ্ঞাপন করেছে; সময় সময় নিজের হাতে বুনে তাকে উপহার দিয়েছে। কিন্তু এ সমস্তই ঘটেছে সুজাতার চোখের আড়ালে। বাগ্‌বদ্ধ হয়ে সুকুমার এর একটি কথাও সুজাতার কাছে প্রকাশ করে নি। সুজাতার প্রতি তার ভালবাসা কমে নি, কিন্তু যে হৃদয় সুজাতাকে দিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারে নি সেই হৃদয় অপর দিক দিয়ে আপন অজ্ঞাতে যেন পূর্ণ হয়ে উঠছে এমনি একটা অস্পষ্ট বোধ, অস্পষ্ট আকর্ষণ সুকুমারের চিত্তে আন্দোলিত হয়ে উঠছিল। আমাদের চিত্তের মধ্যে নানা বাসনার বীজ থাকে নিমগ্ন হয়ে, যেমন নিমগ্ন হয়ে থাকে গ্রীষ্মকালে নানা জাতীয় তরু-

গুল্মের মূল মাটির মধ্যে। বর্ষার জলনিষেকে যখন সেগুলি ধীরে ধীরে প্রোদ্ভিন্ন হয়ে মাটির উপরে মুখ জাগিয়ে তোলে তখনই তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি ভোগের অভিবর্ষণে যখন চিত্তের অভ্যন্তরস্থ নানা জাতীয় আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুরগুলি আত্মপ্রকাশ করতে থাকে তখনই সেগুলির চাহিদা ওঠে বেড়ে এবং সেগুলি পূর্ণতরভাবে অনুভব করবার জন্য মন লোলুপ হয়ে ওঠে। সুজাতার সাহচর্য্যে সুকুমারের মন যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠতে পারে নি, আজ মঞ্জরীর সাহচর্য্যে এসে সেই আকাঙ্ক্ষাগুলির পরিতৃপ্তির জন্য সুকুমারের মন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তাই সে অনুভব করতে আরম্ভ করেছে যে পূর্ব্বে সুজাতার মধ্যে সে আপনাকে যেমন পূর্ণভাবে পেত আজ তা পাচ্ছে না। কি একটা অভাব, কি একটা দৈন্য যেন আজ সুজাতাকে সচ্ছিদ্র করে' তুলেছে। সুজাতাকে সে যা দিতে চায় তা যেন শত ছিদ্রের মধ্য দিয়ে কোথায় নির্ঝরিত হয়ে চলে' যায়, ফুলে' ফুলে' দ্বিগুণ হয়ে তা তার কাছে ফিরে আসে না। যা দেওয়া গেল তা যদি নির্ঝরিত হয়ে আবার ফিরে না আসে তবে সে দেওয়ায় তৃপ্তি কোথায়? অথচ, সুজাতাকে কিছু বলার উপায় নেই, তার ব্যবহার পূর্ব্বেও যেমন ছিল আজও তেমনি। সে বনবিহঙ্গী, আপন আনন্দে সে গান করে, তাকে দাঁড়ে বসিয়ে ইচ্ছামত গান শোনা যায় না। তাকে ভালবাসা যায়, তার ভালবাসা পাওয়া যায়, কিন্তু তাকে নিয়ে বিলাস করা যায় না।

সুজাতা চলে' যেতে যেতেই মঞ্জরী এসে দাঁড়াল সুকুমারের সামনে, একবার তাকাল উচ্ছলগতি সুজাতার দিকে, আর একবার তাকাল সুকুমারের মুখের দিকে। ঈষৎ হেসে বল্লে—"হঠাৎ মেঘ এল যে!"

সুকুমার আশ্চর্য্য হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বল্লে—"খট্‌খটে

রোদ চারিদিকে, মেঘের ত লেশমাত্র নেই, আপনি মেঘ দেখলেন কোথা থেকে ?"

মঞ্জরী আবার একটু হেসে বল্লে—"ও, মেঘ নেই বুঝি ? আপনার মুখের আলোটা হঠাৎ এমন কমে' গেল যে আমার মনে হ'ল বুঝি মেঘেরই ছায়া পড়েছে।"

স্কুমার এখনও একটু অর্দ্ধ-উদ্‌ভ্রান্তভাবে বল্লে—"কই, না, আমার মুখের আলো নিববে কেন ? আর আমার মুখের আলো নিবলে আমি বুঝ্‌ব না, আপনি বুঝবেন কেমন করে' ?"

মঞ্জরী বল্লে—"এই ত, আপনি এত বড় পণ্ডিতলোক হয়ে এটা বুঝলেন না যে নিজের মুখের আলো নিজে দেখতে পাওয়া যায় না ; আর তা ছাড়া, আলো চলে' গেলে যে ছায়া পড়ে এটা বোঝবার জন্য যে চোখ খুলে দেখারও দরকার হয় না।"

এতক্ষণে বিভ্রান্ত স্কুমার উপহাসপদ্ধতির মধ্যে মঞ্জরীর বক্তব্যের আঁচটা বুঝতে পারল। অনেক সময়ই পুরুষেরা হয় একটু নিরেট রকমের। একটু সম্ভ্রান্ত হয়ে স্কুমার বল্লে, যেন একটা স্খলন ধরা পড়েছে এইভাবে—"ও, এ ঠাট্টাটা হচ্ছে আপনার স্কুজাতাকে নিয়ে ! তা, স্কুজাতাকে নিয়ে আপনার এ উপহাসের তাৎপর্য্যটা কি ? অনেক সময়ই দেখেছি স্কুজাতাকে নিয়ে আপনি শরচালনা করেন ; তা আপনারা সখীতে সখীতে পরস্পর যত ইচ্ছা শরযুদ্ধ করুন, আমাকে এর মধ্যে জড়ান কেন ? আর যদি স্কুজাতার চলে' যাওয়াতে একটা আলোই চলে' গিয়ে থাকে ত আর একটি আলো আমার মুখের সামনে জলছে, কাজেই মুখ নিষ্প্রভ হওয়ার অভিযোগটা মিথ্যা।"

মঞ্জরী আবাব হেসে বল্লে—"আপনার মত পণ্ডিতলোকের কাছ থেকে এ জবাব একেবারেই অগ্রাহ্য। একটা ডে-লাইটের আলো

যদি সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় আর তার বদলে সামনে থাকে একটা কেরোসিনের কূপী, তবে এই আলোর পরিবর্ত্তনে কি নিবিড় ছায়াপাত হ'তে পারে সে সম্বন্ধে আপনার জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা কি বলেন ?"

কথাটার মোড় ঘোরাবার জন্য সুকুমার বল্লে—"জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা যাই বলুন না কেন, জার্ম্মাণ কবি গ্যেটে কিংবা আমাদের মহাকবি কালিদাস আপনার এ উপমাটা মানানসই বলে' মনে করতেন না।"

মঞ্জরী একটু থম্‌কে বল্লে—"কেন ?"

"কেন তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব বলে' মনে করি না, কিন্তু যন্ত্ররাজ্যের বস্তু থেকে এ যন্ত্রযুগেও উপমা আহরণ করা দুর্ঘট।"

মঞ্জরী বল্লে—"কেন ? আজকাল বাস্তবের দিন। আমরা বাস্তব জগতে বাস করি। আমাদের চারিদিকে তেড়েফুঁড়ে উঠছে নানা যন্ত্র, তারই মধ্যে গড়ে' উঠছে আমাদের অভিজ্ঞতা। নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্যে, অনুভবের মধ্যে যা সত্য তাই নিয়েই ত গড়বে জীবন, কাব্য, উপমা। এই জন্যই ত আধুনিক সাহিত্যিকেরা ধরেছেন একটা নূতন সরণি। কালক্রমে দেখবেন পুরাণো পদ্ধতির কবিতা হয়ে আসবে অচল; রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী বিক্রী হবে সের দরে, কাটবে পোকায় প্রকাশকের সিন্দুকে।"

কথাটা অন্যদিকে ঘুরল তাতে একটু স্বস্তি পেয়ে সুকুমার বল্লে —"কোন্ কালে কি কাটে না কাটে, তা সে কালের চাহিদা ও রুচির উপর নির্ভর করে; কিন্তু সাহিত্যের একটা চিরন্তন মর্য্যাদা আছে, যে মর্য্যাদা কালের কোলাহলকে অতিক্রম করে' আপন ধ্রুবলোকের বাণী প্রচার করে। সে বাণী কালবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের ক্ষণ-পরিবর্ত্তী রুচির বাণী নয়, সে বাণী সৌন্দর্য্যের বাণী, কোথাও কোনও

গভীর সৌন্দর্য্যের মধ্যে তার মূল নিহিত হয়ে আছে। রুচির অনুরোধে সেখান থেকে তাদের উৎপাটিত করা যায় না।"

মঞ্জরী বল্লে—"আপনার স্বপক্ষে দৃষ্টান্ত কোথায়? কি করে' আপনি প্রমাণ করবেন যে দাশুরায়ের পাঁচালীর মত রবীন্দ্র-সাহিত্য একদিন অচল হবে না? দাশু রায় যখন বেঁচে ছিলেন তখন নোবেল প্রাইজের সৃষ্টি হয় নি বটে, কিন্তু তাঁর ডব্‌ডবানি বড় কম ছিল না।"

সুকুমার বল্লে—"কোনও বিষয় প্রমাণ করা সহজ নয়। কিন্তু চেয়ে দেখুন আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে। এক সময় আমাদের দেশে রুচি এমন অবসন্ন হয়ে এসেছিল যখন মাঘ, ভারবি ও শ্রীহর্ষ কালিদাসের চেয়ে বড় জায়গা পেতেন। ভবভূতি কেঁদেছিলেন যে তাঁর গুণগ্রাহী লোক হয় ত কেউ দেশান্তরে আছে বা কালান্তরে জন্মাবে। পণ্ডিত সমাজে একটা প্রবাদ আছে যে রঘুবংশও কাব্য, আর তাও পড়তে হবে! ভট্টি গর্ব্ব করেছিলেন যে তাঁর কাব্য এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে ব্যাখ্যা ছাড়া তা বোঝা যায় না, এবং সেই কারণেই ভামহ করেছিলেন তাঁকে তিরস্কার। কিন্তু কালের গতি ফিরে এসে আবার তার সনাতন স্থান নিয়েছে। আজ বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক—এঁরাই সংস্কৃত সাহিত্যের স্তম্ভ। মাঘ, শ্রীহর্ষের পঠনপাঠন এসে দাঁড়িয়েছে সাহিত্যের ইতিহাসের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য, কাব্য-সেবার জন্য নয়।"

মঞ্জরী জবাব করলে—"সে সনাতন আদর্শটা কি? কি এমন কারণ আছে যে জন্য আমরা বর্ত্তমান যুগের, বর্ত্তমান মানুষের, বর্ত্তমান সভ্যতার বস্তু থেকে আমাদের কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করতে পারবই না?"

সুকুমার বল্লে—"সনাতন আদর্শটা কি সেটা আমি আপনাকে

এক কথায় বোঝাতে পারব না, কারণ আদর্শের মধ্য দিয়ে যা ফোটে তার মধ্যে খানিক থাকে ছায়া, খানিক থাকে ভ্রম। বাস্তবের উপরই হয় ত তা প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বাস্তবের প্রকৃতিকে অনেকখানি পরিবর্ত্তিত না করে' আদর্শ তার প্রতিচ্ছবি গড়ে' তুলতে পারে না। এই জন্যই বোধ হয় নিছক বাস্তবতা সাহিত্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। ক্যামেরা যা তোলে তা নিছক বাস্তবের অনুকরণ, হাতে যে চিত্র করেন চিত্রকর, তা বাস্তবকে ছাড়িয়ে যায় অনেক দূর এবং সেইখানেই চিত্রীর চিত্র হয় সার্থক।"

"আপনি কি তবে মনে করেন যে বাস্তবকে ছাড়িয়ে যাওয়াতেই শিল্পের চারুত্ব? কিন্তু অনেকে ত একথা বলেছেন যে আর্ট জীবনের প্রতিচ্ছবি।"

"আর্ট জীবনের প্রতিচ্ছবি বলে'ই তা নিছক বাস্তব জীবন নয়। যেটা বাস্তব সেটা আর্টের ভিত্তি, উপাদান, কিন্তু সেইভাবে সেটা উপাদান নয়। শিল্পীর আনন্দ, শিল্পীর কল্পনা, শিল্পীর ধ্যানের মধ্য দিয়ে শিল্পীচিত্তের প্রতিভা দ্বারা প্রেরিত হয়ে যা প্রকাশ পায় তাই হয় আর্ট, তাই হয় কাব্য। এই শিল্পীচিত্তের অনুপ্রেরণা আসে তার অন্তশ্চেতনার মধ্য থেকে, তার অবচেতনার মধ্য থেকে। যন্ত্রজাতীয় বস্তু নিছক কাজের উপযোগী হয়ে তৈরী হয়েছে, তা ছাড়া অতি-আধুনিক বলে'ই আমাদের চিত্তের মধ্যে তা কোনও সংস্কার ফেলে' যায় নি। চিত্তের গভীর স্থানে যার দাগ পড়ে নি, বহু কবিচিত্তের জীবনের দ্বারা, প্রকাশের দ্বারা যা উজ্জীবিত হয় নি, তা আমাদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। একটা জাহাজ বা ষ্টিমার অসুন্দর একথা বলা চলে না, কিন্তু কাব্যে তার স্থান নেই, কাব্যে স্থান হচ্ছে তরী কিংবা ভেলার। তার কারণ এই যে বহু কবিকুলের কল্পনা

দ্বারা-অভিষিক্ত হয়ে ওঠে নি তার ইতিহাস। মাইক্রোবেরা যে মাটি প্রস্তুত করে' দেয় গাছের জীবনের উপযোগী করে', তা থেকেই গাছ নিতে পারে তার আহার, আবার বৃক্ষলোক যে খাদ্য প্রস্তুত করে সেই খাদ্যের উপরই বেঁচে আছে মনুষ্যলোক। তেমনি মনুষ্যলোকে মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে কবিরা যে সমস্ত কল্পনাকে তাঁদের জীবনের রসে অভিষিক্ত করে' প্রকাশ করেছেন, যে ভাষা তাঁরা ব্যবহার করেছেন, তার পিছনে রয়ে গিয়েছে দূর কুজ্ঝটিকালোকের একটি স্নিগ্ধ আবরণ। কাব্য বাস্তবের বর্ণনা নয়, মরীচিকালোকের মধ্য দিয়ে সত্যকে স্নিগ্ধ করে', হৃদ্য করে' প্রকাশ করাই তার কাজ। তাই তার ভাষা, তার শব্দ হওয়া উচিত এমন যার পিছনে আছে অনুস্যূত হয়ে নীহারিকামণ্ডলের ন্যায় অগণ্য কবিলোকের হৃদয়ালোক। তাদের ব্যক্তিত্ব সেখানে গেছে হারিয়ে, তার আলোটি শুধু ভেসে আসছে মৃদুমন্দ গন্ধের ন্যায়। প্রাচীন কবিকুলের কল্পনাকে একান্তভাবে বর্জ্জন করলে কাব্য তার ছায়াকুঞ্জের স্নিগ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে না। এই জন্যই কেরোসিনের কূপী বা ডে-লাইট নিয়ে উপমা চলে না, উপমাকে আনতে হয় নামিয়ে মাটির ঘরের প্রদীপে। তার তেল-সল্‌তের মধ্যে আছে প্রাচীন কবিলোকের কল্পনা মুগ্ধভাবে জড়িত হয়ে। অথবা টেনে আনতে হয় আকাশের শুকতারাকে, অরুন্ধতীকে, ধ্রুবতারাকে। তাঁরাই চিরন্তনভাবে দেদীপ্যমান হয়ে বিজয়ের টিপ্‌ পরিয়ে দিয়েছেন কবিকুলের কল্পনাকে। কেউ পাউডার মেখেছে বললে মন যায় চটে', কিন্তু লোধ্রপুষ্পের পরাগ মেখেছে বললে মনটি আসে স্নিগ্ধ হয়ে।"

মঞ্জরী হেসে বল্লে—"আমার উপমা-যুগলের এমন দুর্গতি হবে জানলে আমি আপনার সামনে তাদের প্রবেশ করতে দিতুম না।

কিন্তু উপমার যে দুরবস্থাই হোক্ না কেন, আপনার দুরবস্থা তার চেয়ে কম নয়।"

"কেন, আমার আপনি কি দুরবস্থা দেখলেন?"

"অলভ্য বস্তুতে অতিমাত্রায় লোভ। শাস্ত্রকারেরা এমন কার্য্যের প্রশংসা করেন না।"

এই কথা বলে' মঞ্জরী একটু মুখ টিপে হাসলে।

সুকুমার হেসে বল্লে—"কিন্তু তবুও ত মানুষ নাগালের বাইরে যা তার জন্য হাত বাড়ায়।"

একটু তিক্তভাবে মঞ্জরী বল্লে—"কিন্তু ওর মধ্যে আপনি এমন কি দেখলেন যার জন্য বিনা আশায়, বিনা সম্ভাবনায় নিরন্তর ছুটে যেতে হবে ওর পিছু পিছু? ওকে ত নাগালের মধ্যেই পেয়েছিলেন দীর্ঘকাল ধরে', আর যৌবনের ঊষা থেকে ছুটেও ত চলেছেন ওরই পিছে পিছে। অনেক সময় মনে হয় যেন দিগ্‌দিগন্ত সমস্ত লয় পেয়ে গেছে আপনার চোখে, খালি একটি জ্যোতি আপনার চোখের সামনে জ্বলছে।"

সুকুমার একটু ক্ষুণ্ণভাবে বল্লে—"মাঝ দরিয়ায় যখন কোথাও কূল দেখা যায় না তখন নাবিকেরা চলে একটি ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করে'। সে আছে স্থির অচঞ্চল হয়ে, তার স্থান থেকে সে নড়ে না।"

মঞ্জরী বল্লে—"কিন্তু এও ঠিক যে আপনি যত উঁচু কক্ষায় উঠবেন ধ্রুবতারাও আরও আরও উপরে উঠতে থাকবে। আপনি যখন গিয়ে দাঁড়াবেন উত্তরমেরুতে তখন ধ্রুবতারা এসে উঠবে আপনার মাথার উপরে। আর আপনি যত নেমে আসবেন নীচের দিকে ততই দেখবেন ধ্রুবতারাও নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে, বাস্তব জগতের সন্নিধিতে। ধ্রুবতারা সম্বন্ধেও যে লোকের দেখবার ভুল হয় না তা

নয়। আর ধ্রুবতারার জ্যোতিটুকু জ্বলে বটে, কিন্তু সে আলো কত ক্ষীণ! তাতে ঔজ্জ্বল্য বা কোথায়, বর্ণের লাবণ্যোচ্ছ্বাসই বা কোথায়?"

সুকুমার বল্লে—"আমাদের মত লোকের পক্ষে আকাশের প্রত্যেকটি তারাই যে দুর্গম। এই দেখুন, Sirius-তারাটি নিরন্তর স্পন্দমান হয়ে আলো উদ্গীরণ করছে, ক্ষণে ক্ষণে উঠছে তার নানাবর্ণের উচ্ছ্বাস। আলো চলে সেকেণ্ডে একলক্ষ বিরানব্বই হাজার মাইল, তবু Sirius থেকে আসতে সেই আলোর লাগে শত শত বৎসর।"

মঞ্জরী বল্লে—"তবু ত জ্যোতিষীরা তার রহস্য উদ্ঘাটন করতে নিরন্তর চেষ্টা করছে। তাকে চোখের সামনে পায় না, তাই চোখের মণির সঙ্গে টেলিস্কোপের মণি জুড়ে তাকে বড় করে' উজ্জ্বল করে' চোখের সামনে ধরে। তখন ধরা পড়ে জ্যোতিষিকের হাতে জ্যোতিষ্কদের বুকের কাঁপন। প্রতিদিন তাঁরা সেই কাঁপনের মধ্যে আবিষ্কার করেন তাদের নানা ইঙ্গিত, তাদের নানা রহস্য। প্রতিদিন যেখানে চলে নব নব আবিষ্কার, নব নব বর্ণবিলাসের নানা তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন, সেইখানেই চলতে পারে প্রেমের নিত্য নব উন্মেষশালিনী গতি। প্রেমের যথার্থ সম্পদই হচ্ছে প্রেমাস্পদের হৃদয়ের নব নব বিলাসের মাধুরীতে মুগ্ধ হওয়া। সেটা যেখানে সম্ভব নয় সেখানে প্রেম ফিরে আসবে কাঙাল হয়ে তার দীনতা নিয়ে। পঞ্চশরের শর যখন ছোটে তখন সে ছোটে নবমল্লিকার কোমলতায়, অশোক-কলিকার রাগচ্ছটায়, পদ্মের লাবণ্যসম্পদে, কিন্তু অকৃতার্থ হয়ে যখন সে ফিরে আসে তখন সে রুদ্রের অগ্নির মত জ্বলন্ত হয়ে দগ্ধ করে হৃদয়কে। আপনার ধ্রুবনক্ষত্রকে কি আপনি নব নব আবিষ্কারে প্রতিদিন মহীয়সী করে' তুলতে পারছেন?"

সুকুমার বল্লে—" 'অর্দ্ধেক রমণী তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা।' নারীকে

বোঝবার জন্য বিধাতা পুরুষকে যে কেবল চোখ দিয়েছেন তা নয়, দিয়েছেন তাকে অফুরন্ত কল্পনা। যে রূপ বাস্তব দৃষ্টিতে অত্যন্ত সাধারণ, যে গুণ অত্যন্ত চলনসই রকমের, একজন পুরুষের মধ্যে হয় ত আমরা তা লক্ষ্যই করতুম না। কিন্তু তাই যখন আমরা দেখি একটি নারীর মধ্যে, আমাদের কল্পনার মণিতে বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়ে, একেবারে নূতন সম্পদ নিয়ে তা আমাদের আকৃষ্ট করে। সত্য বা বাস্তব আমাদের তত আকর্ষণ করে না যত আকর্ষণ করে আমাদের নিজেদের সৃষ্টি, কারণ আমাদের সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পায় আমাদের বুকের দরদ, আমাদের আনন্দ, আমাদের উচ্ছ্বাস। আমাদের দরদ দিয়ে যা আমরা গড়ে' তুলি তা আমাদের হৃদয়কে সহজেই দেয় গলিয়ে, তাই কল্পনার আকর্ষণ বাস্তবের চেয়ে এত বেশী। কল্পনা যখন ভেঙ্গে যায় তখন হৃদয়ও ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যায়, অনুরাগ পরিণত হয় বৈরাগ্যে। ভর্ত্তৃহরি এক জায়গায় বলেছেন 'সেব্যা নিতম্বা কিম্ ভূধরাণাম্, উত স্মরস্মেরবিলাসিনীনাম্', অনুরাগ প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারলেই সেখানে আসে বৈরাগ্য।"

মঞ্জরী বল্লে—"কিন্তু কল্পনা যখন কোনও সত্যের বীজকে অবলম্বন করে' গড়ে' উঠতে না পারে তখন তা কি বুদ্বুদের মত আপনিই ভেঙ্গে যাবে না? এতটুকু ফেনাকে ফুঁ দিয়ে তোলা যায় ফুলিয়ে, দেখা যায় তাতে রামধনুর নানা রং, তাই সে রং হয় ক্ষণিকের। শুধুই যা কল্পনার ধন তা কিছুতেই বেশীক্ষণ টিঁকতে পারে না। কল্পনার বেলুনে আকাশে উঠতে গেলে মাটিতে পড়তে বেশী দেরী হয় না।"

"কিন্তু তবু আদিম মানবের চিরন্তন বিশ্বাস লুকিয়ে থাকে মানুষের কল্পনার মধ্যে, তাই কল্পনাকে মানুষ সহজে অবিশ্বাস করতে পারে না। কতবার চূর্ণিত হয়েও সে আবার বিশ্বাস করে তার

কল্পনাকে। তার হৃদয়ের দরদ লুকানো থাকে হৃদয়ে, কেউ জানে না তার হৃদয়ের ক্ষতের কথা, দিতে পারে না কেউ সেখানে একটু স্নেহের আলিম্পন।"

এই কথা বলতে বলতে স্নকুমারের দু'টি চোখ সজল স্নিগ্ধ হয়ে এল। সে খপ্ করে' মঞ্জরীর হাতটা চেপে ধরলে। মঞ্জরী কোনও শব্দ করলে না।

দু'জনে লতাবিতান থেকে বেরিয়ে একটি নির্জ্জন পথ দিয়ে কিছুক্ষণ চলতে লাগল। কারুর মুখেই কোনও কথা নেই, কিন্তু অন্তরের মেঘ যেন নবজলভারাক্রান্ত হয়ে একটি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় উভয়ের উপর ছায়াগভীর হয়ে নেমে এল। অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণ কোনও সময় বা পাতার ফাঁকের মধ্য দিয়ে, কোনও সময় বা দীপ্ত প্রখরতার সহিত উভয়ের আনত মুখের উপর হাস্যতরঙ্গিত হয়ে আন্দোলিত হচ্ছিল। ফাল্গুনের দক্ষিণ হাওয়া নানা অজ্ঞাতনামা বনফুলের, কখনও বা আম্রমুকুলের মৃদুস্নিগ্ধ সৌরভে গাঢ় হয়ে মঞ্জরীর কপোলবিলম্বী চূর্ণকুন্তলে দোলা দিচ্ছিল। বিহঙ্গকুলের বিচিত্র কলগান বনলক্ষ্মীর আবাহনগানের ন্যায় ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছিল বৃদ্ধ বনস্পতিদের পত্রপুঞ্জের গভীরতার মধ্য থেকে; শৈবালসঙ্কুল দীঘির কালো জল আচ্ছন্ন করে' রেখেছিল কুমুদিনীকুলের হরিতচিক্কণ পেলব সুকুমার পত্রাবলিতে। সাদা ও লাল শাপ্‌লাফুলে ছবির ন্যায় চিত্রিত করে' তুলেছিল দীঘির পত্রাবরণ। পদ্মের তখনও আত্মপ্রকাশের সময় হয় নি, কেবল ঈষৎমুকুলিত হয়ে উঠেছে তার কোরকগুলি। নিরন্তর সূর্য্যরশ্মির আরাধনা চলেছে তার সর্ব্বাঙ্গকে বেষ্টন করে' তারুণ্যের সম্পদে তাকে উদ্ভাসিত করে' তোলবার জন্য। পুষ্পস্তবকাবনম্রা বনযূথিকা অযত্নে হেলে' পড়েছে পার্শ্বস্থ তটদ্রুমের উপরে। কোথাও বা রক্তারুণ হয়ে উঠেছে অশোক-

গুচ্ছ। সমস্ত আকাশে বাতাসে নবীন বসন্তের আবির্ভাবের মাধুর্য্য পড়েছে ছড়িয়ে। একটি শান্ত নির্জ্জনতা প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব বৈভবের মধ্যে যেন ঘনিয়ে আনতে চাইছে হৃদয়ের স্বাভাবিক সঙ্কেত, নিবিড় ক'রে' তুলতে চাইছে বিশ্রম্ভসুলভ পরিচয়। কোথাও বা কূজনক্লান্ত পারাবতমিথুন পরস্পরের প্রতি চঞ্চুতে চঞ্চুতে জানাচ্ছে তাদের জৈব ভালবাসা। দূর প্রান্তর থেকে ঘুঘুর ডাকের স্বর যেন বিরহতপ্ত হৃদয়ের অবিচ্ছিন্ন বেদনা জ্ঞাপন করছে ছেদবিহীন স্বরের একতারাতে। পাশাপাশি চলেছে মঞ্জরী ও সুকুমার। মঞ্জরীর একটি হাত সুকুমারের একটি হাতে অতি সহজে এলায়িত হয়ে রয়েছে, যেমন সহজে এলায়িত হয় জ্যোৎস্নারেখা বনশাখীর পল্লবাঙ্কিত শাখায়।

নৈস্তব্ধ্য ভঙ্গ করে' হঠাৎ মঞ্জরী বল্লে—"এত গভীর, এত গাঢ় আপনার হৃদয়ের অনুভব, এত হৃদয়স্পর্শী আপনার প্রাণের আর্ত্তি! অথচ দুঃখ এই যে আপনাকে বুঝতে পারে এমন লোক আপনার মিলল না।"

সুকুমার একটু কষ্টহাস্যে বল্লে—"রাত্রির শেষ যামে দীঘির মৎস্যকুল যখন থাকে প্রসুপ্ত, তার উপরের জল যখন থাকে একান্ত নিস্তরঙ্গ, তখন কিছুতেই অনুমান করা যায় না তার বক্ষের মধ্যে কি বড় বড় জলজন্তু সকলের অগোচরে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। বোধ হয় সমাধিমগ্ন ঋষির বুকে এমনিভাবেই প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে তার সমস্ত বাসনা ও সংস্কারের দুর্দ্দান্ত প্রাণীগুলি। জলে একবার নাড়া পড়লেই সেই প্রসুপ্ত মাছগুলি দুর্দ্দমনীয় হয়ে ওঠে আপনাদের গতির বিলাসে। আজ কি একটা অদ্ভুত ক্ষণে আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল, কি একটা নাড়া দিয়ে সমস্ত বক্ষটা উঠছে যেন দুলে। তাই ত আজ আপনি অজ্ঞাতে যে সমস্ত আর্ত্তি ছিল অনুদ্দীপিত হয়ে, প্রশান্ত হয়ে, তাদের তুললেন ক্ষেপিয়ে।

আপনি কি অপরের হৃদয়ে জাল ফেলে' সেখানকার তথ্য আবিষ্কারের ব্যবসা করেন ?"

এই কথা বলতে বলতে পার্শ্বস্থ একটি বেঞ্চের উপরে উভয়ে গিয়ে বসল। মঞ্জরী বল্লে—"আপনারা পুরুষ। দুটো হাত আর মাথা—এই দুটোকে নিরন্তর চালনা করাই আপনাদের পক্ষে সব চেয়ে সেরা কাজ। তাই হৃদয় বস্তুটা প্রস্ফুট হ'তে কিংবা প্রস্ফুট হয়েছে তা বুঝতে আপনাদের দেরী লাগে। স্বভাবতঃই লোহার মত অচল হয়ে থাকে আপনাদের হৃদয়টা। সেই লোহা সচল হয়ে ওঠে তখনই যখন প্রজ্জ্বলিত আগুনে তা যায় গলে' কিংবা কোনও চুম্বক তাকে টান দেয় তার নিকটে এসে।"

সুকুমার বল্লে—"চুম্বকের টানে যখন আমরা ছুটি তখন সে ছোটা আমরা বুঝতে পারি, কারণ সে ছোটায় আছে আমাদের আনন্দ। পতঙ্গ যখন মূঢ় আকর্ষণে আলোর দিকে ধাবিত হয় তখন সে ছোটাটা একান্ত তার জৈবপ্রকৃতির ধর্ম্ম, যেমন সূর্য্যমুখী মুখ ফিরায় সর্ব্বদা সূর্য্যের দিকে আর গাছের শিকড় ছোটে মাধ্যাকর্ষণের প্রবলতায় গভীর মাটির মধ্যে। নারীর আকর্ষণে যে আমরা ছুটি তার মূলে হয় ত আছে জৈব প্রকৃতি, কিন্তু বারবার চেতন করিয়ে দিলেও এই ছোটা থেকে আমরা নিবৃত্ত হ'তে পারি না। অপরকে বাঁধতে আমাদের যতখানি আগ্রহ, বাঁধা পড়তে আগ্রহ তার চেয়ে বেশী, তাই, যতই ব্যর্থ হই না কেন, এ ছোটার উন্মাদনা আমাদের ছাড়ে না। ছুটছি যে তাও সব সময় ভাল বুঝতে পারি না। চেতনা তখনই আসে যখন আসে ব্যর্থতা। ছুটতে ছুটতে যখন দেখি কারুর বুকে প্রবেশ করতে পারলুম না, মাথা ঠুকে গেল বক্ষের কঠিন পঞ্জরে, তখন সজাগ হই যে আমরা ছুটছিলাম। তবুও এই ব্যর্থতার মধ্যে আছে একটুখানি

হাসি, একটুখানি কথার ঝিলিক্, একটুখানি ছোঁওয়া-লাগা, তার মধ্যে ঝরে' পড়ছে শরৎপ্রভাতের অজস্র শেফালি ফুল।"

মঞ্জরী বল্লে—"কবিরাজেরা লোহাভস্ম করে কেমন করে' তা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। মাটির দু'টি ঝিনুকের মধ্যে লোহা ভরে' সেই মাটীর ঝিনুকের খোলাটি জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে দাহ করা হয়, ভিতরের লোহা গলে' পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও মাটির মুচি দেখে সেই দাহের তীব্রতা কিছুতেই বোঝা যায় না। আপনাদের হৃদয়ের আগুনও তেমনি কাব্যের ভাষায় বল্‌তে গেলে 'পুটপাক-প্রতীকাশ', বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু ও আপনার দরদ বুঝতে পারে না কেন?"

"আমি ত কখনও ওকে আমার কোনও গভীর ব্যথা বা দরদের কথা বলি নি, বা কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিতেও তেমন করে' প্রকাশ করি নি।"

"কিন্তু ও ত মেয়েমানুষ বটে। পুরুষের আগুনের সামনে এলে ওর হৃদয়ের স্নেহপদার্থ কি তরল হয়ে ওঠে না?"

সুকুমার বল্লে—"ও অনেক পড়েছে শুনেছে। অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি। পবিত্রতায় পূর্ণ ওর হৃদয়। একটা অস্ফুট উচ্চ আদর্শের দিকে ছুটে চলেছে ওর সমস্ত দেহমন। কিন্তু ও যে নারী সে সম্বন্ধে ও এখনও সচেতন হয় নি।"

মঞ্জরী বল্লে—"ও আমার বিশেষ বন্ধু, ওকে আমি খুব ভালবাসি। অনেক চেষ্টা করেছি ওকে আবিষ্কার করতে, কিন্তু কখনও থই পাই নি। বড় একটা কিছু জীবনে গড়ে' তুলবে এরই একটা স্বপ্ন ও সব সময় দেখে। কিন্তু কি করে' যে গড়ে' তুলবে, কি পথ অবলম্বন করবে, সে সম্বন্ধে ও যেন কিছুই আবিষ্কার করতে পারে না। এ যেন 'নাভিকা সুগন্ধ মৃগ নাহি জানত, ঢুঁড়ত ব্যাকুল হই'। কিন্তু এটা যে শুধু

যৌবনেরই সুগন্ধ নয় সে কথা জোর করে' বলা কঠিন। ওর মন যে কার উপরে পড়েছে তা জানি না। সেদিকে ভয়ানক চাপা, কিন্তু দেখেছি অনেক সময় একাকী বসে' থাকে, গোপনে কি সব লেখে। চোখে দেখেছি অনেক সময় উদাস দৃষ্টি, ফেলতে দেখেছি দীর্ঘশ্বাস। অথচ আপনার সম্বন্ধে যতবারই ওর মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করেছি ততবারই এই কথাই মনে হয়েছে যে আপনাকে ও যতই গভীরভাবে ভালবাসুক না কেন, সে ভালবাসাটা একেবারেই অন্য জাতের।"

সুকুমার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লে—"আমার মনের মধ্যে আমার অন্তরালে ওর প্রতি আমার ভালবাসাটা যে কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবে তা জানতুম না। কিন্তু কিছুদিন ধরে' ক্রমশঃই তার পরিচয় পাচ্ছি। অথচ ওর মধ্যে সে মূর্ত্তির কোনও ছবি দেখতে পাই না। ওর মধ্যে স্বচ্ছ প্রাণের ঝর্ণা ঝর্ঝর্ করে' ছুটে চলেছে, সূর্য্যের কিরণে প্রতিফলিত হচ্ছে তার প্রত্যেকটি পরমাণু। কিন্তু হৃদয়ের গভীর চাপে সে জল স্ফটিকের মত দানা বেঁধে কোনও মূর্ত্তি নিয়েছে বলে' মনে হয় না। কাঁচের মত স্বচ্ছ হ'লেও ওর হৃদয়ের আড়ালে এমন কোনও লেপ জমে' ওঠে নি যার ফলে দর্পণের মত কোনও প্রতিচ্ছবি তার উপরে ভেসে উঠবে। আমি যত রকমেই ওকে জানাতে চেষ্টা করেছি আমার হৃদয়ের বেদনা, ততই হাসির তরঙ্গে ও তাকে ভাসিয়ে দিয়েছে তাদের নিরুদ্দেশ যাত্রায়।"

মঞ্জরী একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লে—"আপনার মত একটা দরদী মনের গভীর আর্ত্তি যে কেউ বুঝলে না এতে যথার্থই আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়। আপনাকে দেখে' মনে হয় যে একটা গভীর আগুন জ্বলছে আপনার হৃদয়ের মধ্যে, শুধু আপনার বিশাল বক্ষের পাঁজরগুলি তাকে এমন করে' চেপে বন্ধ করেছে যে সহজে আপনাকে দেখে'

কিছু বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু আমাকে আপনি ফাঁকি দিতে পারেন নি।"

সুকুমার বল্লে—"বুকের ভাষা শোনবার কি কোনও বিশেষ যন্ত্র আছে নাকি আপনার কাছে?"

মঞ্জরী ঈষৎ হেসে বল্লে—"চোখ দিয়ে দেখা যায় রূপ, কাণ দিয়ে শোনা যায় কথা, জিহ্বায় পাওয়া যায় আস্বাদ, হাতে করি স্পর্শ, নাকে নিই গন্ধ, কিন্তু এ সমস্তই বাইরের জগতের। বুকের কথা বাইরের জগতের নয়, সে হচ্ছে অন্তর্লোকের আলোড়ন, তা ধরা পড়ে নিজের বুকের স্পন্দনে।"

এই কথা বলে' সে খপ্ করে' সুকুমারের হাতখানি নিয়ে চেপে ধরলে নিজের বক্ষের উপরে। বল্লে—"দেখুন দেখি, এখানে কোনও স্পন্দন পান কি না, আর সে স্পন্দন আপনার বুকের স্পন্দনের সঙ্গে সাড়া দেয় কি না!"

মিনিটখানেক এইভাবে কাট্‌ল। সুকুমাব শুধু যে মঞ্জরীর বক্ষের স্পন্দনই অনুভব করল তা নয়, চতুর্গুণ অনুভব করল তার নিজের বক্ষের স্পন্দন, সমস্ত শরীরে অনুভব করল রক্তের দোলা, বোধ হতে লাগল যে কোমল বায়ুতরঙ্গের প্রশ্বাসে প্রশ্বাসে তার সমস্ত দেহখানা যেন সুদূর ব্যোমলোকে উত্থাপিত হচ্ছে। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন বিশ্ববিধাতার আদিযুগের মহা আদিমতম রহস্য রেখে গেল তার ইঙ্গিত তার ধমনীর রক্তধারার মধ্যে।

উৎফুল্লমুখে মঞ্জরীর চোখের দিকে অতি দীনভাবে তাকিয়ে সুকুমার বল্লে—"আপনি আমার দরদ বোঝেন। যদি স্পর্দ্ধা না মনে করেন তবে আপনাকে বন্ধু বলে' বরণ করে' নিতে চাই।"

মঞ্জরীর মুখ শারদীয়া উষার স্থলপদ্মের মত অরুণাভ হয়ে উঠল।

সে বল্লে—"কে কাকে বন্ধু মনে করবে সে খবর থাকে তার নিজের বুকের মধ্যে। সেটা তারই নিজস্ব ধন, সেজন্য কারুর অনুমতি চাওয়ার অপেক্ষা থাকে না। আজ হঠাৎ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের ভরে আমাকে যে স্থান দিতে চাইলেন, কাল হয় ত শান্ত অবসরের সময় তা নিয়ে অনুতাপ করবেন। অথচ আপনার এই আবেগের ক্ষণটি হয় ত চিরন্তন হয়ে থাকবে আমার হৃদয়-কোরকের মধ্যে, হয় ত তাকে উন্মেষিত করতে চাইবে গন্ধে ও লাবণ্যে। 'বন্ধু' কথাটা ছোট বটে কিন্তু তার অর্থ অনেক গভীর। বন্ধুতে আনে এমন বাঁধন যার বিচ্ছেদ যায় না সহ্য করা। আবন্ত তার ক্ষণে, পরিসমাপ্তি তার সীমাহীনে। আমাকে কি আপনি এই অসামান্য স্থান দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন?"

সুকুমার বল্লে—"প্রস্তুত ছিলাম কি না তা বলতে পারি না। আমাদের নিজেদের কতটুকুই বা আমরা জানি! জানা মন যেখানে দ্বিধা করে অজানা মন সেখানে ঝরণার গতিতে যায় ছুটে, প্রাণের স্পন্দনে হয় লীলায়িত। এই প্রাণের স্পন্দনের মূর্ত্তি তখন পরিস্ফুট নয়, তবু একে বিশ্বাস করতে কোন ভয় নেই। জীবনের সমস্ত বড় ব্যাপার প্রাণের স্বচ্ছন্দ বিশ্বাসের উপর তার ভিৎ গেড়ে তোলে। এ বিশ্বাস প্রাণের ফসল, মনের নয়। তাই মনে হয়, আজ যে কথা আবেগের উচ্ছ্বাসে বল্লুম সে হয় ত আমারও হয়ে থাকবে চিরন্তন লোকের সম্পত্তি।"

"কিন্তু একটি কথা আপনাকে বলি। আমার প্রতি আপনার যেটুকু দরদই থাক্ না কেন, আজ থাক্ তা পড়ে' আপনার মনের পিছে, তা প্রকাশ পায় না যেন আপনার কোন ইঙ্গিতে। আমি থাকব ছায়া হয়ে আপনার পশ্চাতে। সামনে আসুক সুজাতা। আমি বন্ধু হয়ে চেষ্টা করব আপনাদের বন্ধুত্বকে এগিয়ে দিতে, আপনার

দরদের সঙ্গে সহানুভূতি করতে। এমনি করে' আমার বন্ধুকৃত্য আমি সম্পন্ন করতে চেষ্টা করব। আপনার বন্ধুর পথযাত্রায় আপনার এই বন্ধুটিকে পাবেন আপনার সাথীরূপে। তার চেয়ে বেশী আজ আপনারও কোন চাওয়া থাকতে পারে না, আমারও কিছু দেয় থাকতে পারে না।"

সুকুমার বল্লে—

"সহসা নয়ন-পটহে লাগিল নবীন পুলকরেখা,
পলকে দেখিনু কপোলে তোমার মুগ্ধ লালিমা রেখা।
ডাকিয়া কহিলে—বন্ধু আমার, হেথায় দাঁড়ায়ে আছি,
বক্ষে আমার হাত নিলে টানি', দাঁড়াইলে কাছাকাছি।
নিমেষে বুঝিনু. বন্ধু আমার, আমি তব চিরসাথী,
চির-জনমের প্রিয়তম মোর, বন্ধু দিবস-রাতি।
যাত্রা পথের ক্লান্তি আমার নিমেষে হবে গো দূর,
বন্ধুর পথে বন্ধুর সাথে মিলিবে একটি সুর।"

কিন্তু কথা আর বেশী এগোতে পারল না। উভয়ের দৃষ্টিপথে হঠাৎ দেখা গেল উচ্ছলা চঞ্চলা সুজাতাকে। উভয়ে সামলে নিতে না নিতে সুজাতা এসে সামনে দাঁড়াল। বল্লে—"এই যে, দু'টিতে বেশ মাণিকজোড় হয়ে গল্পগুজব চলছে, আমি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।" এই কথা বলতে বলতেই দু'জনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে কি যে সে আবিষ্কার করল তা সেই জানে; কিন্তু তার মুখখানা যেন একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। মঞ্জরী যদি নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত না থাকত তবে নিশ্চয়ই এটা তার চোখে পড়ত। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই নিজেকে সংযত করে' নিয়ে সুজাতা বল্লে—"এখন চল ত সব শীগ্‌গির, ওদিকে সব জিনিষপত্র গোছান হয়ে গেছে, অনেকগুলো গাড়ীতে ওঠানোও হয়ে গেছে।"

সুকুমার বল্লে—"তোমার জন্য আজ এখানে এলুম, তোমার ত আজ নাগালই পাওয়া গেল না।"

সুজাতা একটু হেসে উত্তর করলে—"ঘর আগ্‌লে থাকলে নাগাল কি করে' পাওয়া যায়? আর আমার নাগাল না পেলেও আমার বন্ধুটির নাগাল ত আজ পেয়েছ! বেশী লোভ নয়, চল।"

সকলে মিলে' তখন রওনা দিলে। সন্ধ্যার আসন্ন ছায়া যেন বিকীর্ণ করল তার ম্লানিমাটুকু এদের মুখের উপর। কোথাও কিছু ঘটে নি, অথচ ভবিষ্যতের কি আয়োজনের বীজ বিধাতা যেন আজ কোন্ মানসলোকে উপ্ত করলেন। সকলের মনেব গাঢ়তা যেন আজ এই বনস্পতিকুলের পল্লবাঙ্কিত ছায়াকে মসীলিপ্ত করে' তুল্‌ল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৈশাখী সন্ধ্যা প্রায় আসন্ন। পশ্চিমদিকে সূর্য্য কিছুক্ষণ অস্ত গিয়েছে, সন্ধ্যার ছায়া আসন্ন হয়ে এসেছে। ইডেন গার্ডেনের সামনে একটি ল্যাম্প্‌পোষ্টের নীচে একটি ছেলে পায়চারি করছে। ছেলেটি দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, রং গাঢ় শ্যাম, কালো বললেও অত্যুক্তি হয় না। ললাট প্রশস্ত, চক্ষু আয়ত, নাসিকা উন্নত। সমস্ত মাংসপেশীগুলি কেবল যে দৃঢ় তা নয়, কর্ম্মঠ এবং কর্ম্মোন্মুখ। দেহের কোনও স্থানে কোনও বাহুল্য নেই। দেখলে শক্তিমান বলে' মনে হয়, অথচ এমন কথা মনে হয় না যে অনেকখানি শক্তি এক স্থানে বাঁধা পড়ে' আছে। এ শক্তি সেই নিরর্গল শক্তি যে শক্তি চিন্তা করবার আগে ছোটে কাজের দিকে। প্রবৃত্তির তাড়না সেখানে মুখ্য; শুভাশুভ বিবেচনা করে',

লাভালাভের কথা মনে করে', চিন্তার পথে সংযমের নিয়ন্ত্রণ সেখানে শিথিল। মুখের মধ্যে কমনীয়তা তেমন নেই যেমন আছে দৃঢ়তা, তেজস্বিতা এবং নির্ভীকতা। ছেলেটির পরণে খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবী, দুটোই আধময়লা। হাতে একটা মোটা ধরণের ভারী লাঠি, মাথায় গান্ধীটুপি, পায়ে নাগরাই জুতো। ছেলেটি পায়চারি করছে আর অসহিষ্ণুভাবে রেড্ রোডের মোড়ের দিকে তাকাচ্ছে; ভাবখানা এই যে আর অপেক্ষা করা যাচ্ছে না, অথচ অপেক্ষা না করে' চলে' যাওয়ারও উপায় নেই। এমন সময় দেখা গেল, একটি মেয়ে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে চলে' আসছে। একটু এগিয়ে আসতে দেখা গেল মেয়েটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত মঞ্জরী। দূর থেকে মঞ্জরীকে দেখে'ই ছেলেটি ছুটে গিয়ে হেসে বল্লে—"বেশ যা হোক্, দাঁড়িয়ে আছি সেই সাড়ে পাঁচটা থেকে। আমি ত ভাবলুম শেষ পর্য্যন্ত তুমি এলেই না বুঝি।"

মঞ্জরী একটু কৈফিয়তের সুরে বল্লে—"তাই ত, অনেকটা দেরী হয়ে গেল। কি হাঙ্গামা করে' যে এসেছি তা আমিই জানি। আমিও ভাবছিলাম যে কানাই-দা যে-রকম তড়্বড়ে লোক, হয় ত বা রেগে চলে'ই গেল।"

ছেলেটির নাম কানাইলাল সেন। এম্-এস্-সি পাশ করে' বেরিয়েছে। ছেলে খুব মেধাবী, কিন্তু পরীক্ষার ফল তেমন ভাল হয় নি। কানাই বল্লে—"তাই ত, আর একটু দেরী হ'লে আমাকে হয় ত চলে' যেতেই হ'ত।"

মঞ্জরী একটু ব্যঙ্গস্বরে বল্লে—"কেন, এত কি কাজ তোমার? কোনও আখড়ার মিটিং আছে নাকি?"

কানাই উচ্চহাস্যে বল্লে—"তা থাকলেই বা তোমাকে সে কথা বলে' লাভ কি? এখন চল, একটু বেড়ানো যাক্।"

মঞ্জরী বল্লে—"তা চল। আজ আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। বাড়ীতে কয়েকজন অতিথি আসবার কথা আছে, সেই জন্য মা বলে' দিয়েছেন যেন ফিরতে দেরী না হয়।"

কানাই একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্লে—"আজ তিন মাস পরে কত লেখালেখি, কত অনুরোধের পর তুমি এসেছ, আর এখনই চলে' যাবে? তোমাদের বাড়ীতে কতদিন গিয়েছি তার ঠিকানা নেই। একদিনও বাড়ীতে পাই নি। এত কি কাজ কর?"

মঞ্জরী জবাব দিলে—"কি কাজ করি তা বলে' বোঝানো শক্ত। খতিয়ান নিতে গেলে আমি নিজেই বুঝতে পারি না যে কি কাজ করি, অথচ যে একেবারে বসে' থাকি তাও বলতে পারি না। তা ছাড়া একজনের কাজের প্রতি আর একজনের দরদ না থাকলে তার সে কাজটা হয় ত তার কাজ বলে'ই মনে হবে না। আমি যদি তোমায় উল্টে সেই কথা জিজ্ঞাসা করি যে—তুমি কি কাজ কর? আমিও তোমার খোঁজ নিয়েছি, তোমার মেসে তুমি রাত্রি এগারটা বারটার পূর্ব্বে ফের না। সারাদিনই টো টো করে' ঘুরে বেড়াচ্ছ। কি এত কাজ তোমার? আব দিন দিন তোমার পোষাকপরিচ্ছদ যা হচ্ছে! ভদ্রলোকের ছেলেরা কি এই চোয়াড়ে রকমের পোষাক পরে' বেরোয়?"

এই কথা বলতে বলতে দু'জনে গিয়ে একটি নিভৃত লতাকুঞ্জের সমীপবর্ত্তী একটি বেঞ্চে বসল। কানাই একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে—"তুমি হঠাৎ অমন চটে' উঠলে কেন? কাজ না থাকলে কি লোকে শুধুই ঘুরে বেড়ায়?"

অনেকদিন পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার সময় কানাই একটা মোটর গাড়ীতে সামান্য ধাক্কা লেগে পড়ে' যায়। ঘটনাটা ঘটে মঞ্জরীর ঠিক

বাসার সামনে। মঞ্জরী দেখতে পেয়ে ভীড় জমবার আগেই রাস্তার দু'তিনজন লোক দিয়ে তাকে উপরে নিয়ে আসে। মঞ্জরীর মা, পিসীমা ও মঞ্জরী নিজে চার পাঁচদিন শুশ্রূষা করে' সুস্থ করে' কানাইলালকে ছেড়ে দেয়। সেই থেকে ওবাড়ীতে কানাইয়ের নিত্য গতাগতি। মঞ্জরীর সঙ্গে ক্রমশঃ তার ভাব খুব ঘনিয়ে উঠল। কানাইয়ের বাপ-মা নেই। ব্যাঙ্কে সামান্য কিছু টাকা ছিল। কানাই অনেক দিন পর্যান্ত মঞ্জরীর প্রতি এমনিভাবে আকৃষ্ট হয়ে আসছিল যে তাদেব বাড়ীর সকলেই জানত যে তাদের বিবাহ অবশ্যম্ভাবী। এই সম্ভাবিত বিবাহে মঞ্জরীর মা-পিসীমার তেমন মত ছিল না, কারণ কানাই যে শুধু দেখতে সুন্দর নয় তা নয়, তার টাকাকড়িও বিশেষ ছিল না, সহায়-সম্পদও বিশেষ ছিল না। কিন্তু মঞ্জরী পড়ল কানাইকে নিয়ে ঝুঁকে। শিক্ষিতা মঞ্জরীর মুখের জোরের কাছে মা-পিসীমাকে চুপ করে' যেতে হ'ল। তাঁবা মনে করলেন, যে ঢল নীচের দিকে নামে তাকে কে সামলাতে পারে! ইতিমধ্যে এল একটা স্বদেশীভাবের বন্যা। কানাই দিলে স্বদেশীতে যোগ। তারই উত্তেজনায় সে গেল এমন মেতে যে মঞ্জরীর কাছে আনাগোনা তার ক্রমশঃ রহিত হয়ে আসতে লাগল। এদিকে মঞ্জরীও সুজাতার সখিত্বের মধ্য দিয়ে সুকুমারের সান্নিধ্য লাভ করতে লাগল। সুকুমারের মনোহারী রূপ, বলিষ্ঠ দেহ ও প্রচুর ধন দেখে' মঞ্জরী মনে করলে যে আপন ভাল দেখতে হ'লে সুকুমারকেই আকর্ষণ করা আবশ্যক। বহ্নি পতঙ্গকে ভালবাসে কিনা বলা যায় না, তবে সে তাকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ যে একনিষ্ঠ তা বলা যায় না। সুকুমার এসে সামনে দাঁড়াল বলে' মঞ্জরীর মন থেকে কানাই যে একেবারে লোপ পেয়ে গেছে এ কথা বলা চলে না। সে ভেবে দেখলে যে কানাই একরকম দখলী স্বত্বের মধ্যেই এসে গেছে, কিন্তু

সে এখন আবার তার উপর দখলী স্বত্ব স্থাপন করতে চেষ্টা না করে। মানুষের মনে এই অসামঞ্জস্যটা অনেক সময় দেখা যায় যে সে নিজেকে কারুর দখলী স্বত্বের মধ্যে আনতে চায় না, অথচ নিজের দখলে যা একবার এসেছে তা বিনা ঝঞ্ঝাটে যাতে নিজের আয়ত্তের মধ্যে থাকে, এমন কি, তার জন্য একটু যত্ন বা চেষ্টা করবারও কোন প্রয়োজন না থাকে, এইভাবে চলতে চায়। বর্ত্তমান অবস্থায় সুকুমার আকৃষ্ট হয়েছে বটে কিন্তু এখনও তার সত্যকার টান রয়েছে সুজাতার দিকে। সেখান থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে হ'লে তার সমস্ত আয়োজন হওয়া চাই নিখুঁত। কাজেই এ অবস্থায় কানাইকে প্রশ্রয় দিলে সেটা ঘটিয়ে তোলা হবে একান্ত অসম্ভব। তা ছাড়া, মঞ্জরী মনে করেছিল যে কানাই যেখানেই থাক্, যাই করুক, সে জালের মধ্যে এমন করে'ই তার হাত-পা জড়িয়েছে যে তার পালিয়ে যাবার উপায় নেই, যখন খুসী তাকে ডাকলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন তাকে কিছুদিন অন্ততঃ দূরে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। সুকুমারকে নিয়ে যে কি করবে তা এখনও মঞ্জরী মনে মনে ঠিক করে' উঠতে পারে নি, কিন্তু তার মনে একদিকে যেমন প্রবল হয়ে উঠেছে সুকুমারের প্রতি লোভ, অপরদিকে তেমনি প্রবল হয়েছে নারীহৃদয়ের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কি এমন সুজাতা, যে মঞ্জরী কাছে থাকতেও সুকুমার তারই পিছনে ছুটবে ?

মঞ্জরী আজ এসেছে একটু বিশেষ পারিপাট্যের সহিত সাজ করে'। কপালে দিয়েছে কুঙ্কুমের ফোঁটা। চোখের প্রান্তে ঈষৎ স্পর্শ করেছে কাজলরেখা। বিশেষ হুঁসিয়ার লোক না হ'লে তা কারুর চোখে পড়বার কথা নয়, অথচ চোখের আয়তত্ব ব্যঞ্জিত করবার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট। পরিচ্ছদ যা পরেছে তা একান্ত বাহুল্যবর্জ্জিত।

তার যৌবনশ্রী যেন তার বসনের শাসনকে অতিক্রম করে' উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে, যেমন উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে শরৎকালের পদ্মকোরক তার পত্রাবলীর মধ্য থেকে।. মৃণালের ন্যায় দু'খানি বাহু এলায়িত হয়ে লতাবলয়ের ন্যায় স্রস্ত হয়ে পড়েছে। মুখে এমন একটা অনুবাসন দিয়েছে যে তাতে বসন্তপুষ্পাভরণা বনলক্ষ্মীর কমনীয় কান্তি ও লাবণ্য উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। দূরস্থিত বৈদ্যুতিক প্রদীপের আলো পত্রপুঞ্জ থেকে প্রতিবিম্বিত হয়ে সেই মুখের উপর পড়েছে এবং দক্ষিণ বায়ুতে তার কপালের চূর্ণ-কুন্তল কর্ণাভরণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত কানাইলাল এক মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। দ্রুত হয়ে উঠল তার হৃদয়ের স্পন্দন। সে নির্নিমেষ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল এবং তারপর তার মুখখানা ধাবিত হয়ে এল মঞ্জরীর মুখের দিকে, যেমন ধাবিত হয় ভ্রমর অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত পদ্মকলিটির দিকে। পদ্মকলি তার জবাবে বাতাসের মৃদু আন্দোলনে শিরঃসঞ্চালন করে' ভ্রমরের সঙ্গে করে খেলা, কিন্তু মঞ্জরীর কাছ থেকে এল একটা ক্রুদ্ধ ঝঙ্কার—"যাও, যাও, নোংরামি কর' না, তুমি ত ভারী বেহায়া হয়ে উঠেছ!"

কথাটা যেভাবে মঞ্জরীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঠিক সেই রকম কঠোর ভাবে বলাটা তার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে থেকেই ঠিক কি রকম ভাবে সে কানাইয়ের সঙ্গে ব্যবহার করবে এই নিয়ে তার মনে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। এক একবার মনে হচ্ছিল ধীরে ধীরে নরম করে' কানাইকে সরাবার চেষ্টা করবে; আবার এক একবার মনে হচ্ছিল যে কানাই জেদী মানুষ, ওর কাছে একবার নরম হ'লে আর রক্ষা থাকবে না। তাই এক একবার মনে হচ্ছিল যে একবার যদি ধৈর্য্য ধরে' কানাইয়ের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করতে পারে তবে হয় ত কানাইয়ের আত্মসম্ভ্রমে আঘাত লাগবে, তার ফলে সে

থম্‌কে যেতে পারে। কানাইকে নিয়ে এতকাল সে অনেক চালিয়ে এসেছে, অনেক অসুবিধায়, অনেক বাধায় ডাক দেওয়ামাত্র সমস্ত ঝঞ্ঝাট মাথায় নেওয়া, এ কানাইয়ের মত আর কাউকে পাওয়া যাবে না। যত বড় ঝঞ্ঝাটই হোক্ না কেন, কানাই যেন সমস্ত তুচ্ছ করে' মঞ্জরীর জন্য যা কিছু করবার জন্য পা বাড়িয়েই আছে, যত বড় অপমানই হোক্ না কেন, বহন করবার জন্য মাথা যেন বাড়িয়েই আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মঞ্জরী চিঠি চালাচালি করেছিল একটি নিম্নজাতীয় সহাধ্যায়ীর সঙ্গে। চিঠি লিখবার সময় কথার রঙের উপর যতটা দৃষ্টি ছিল, চিঠিগুলোকে রোম্যাণ্টিক্ করে' তোলবার জন্য যে প্রলোভন ছিল, দৃষ্টি ছিল না সে-রকম চিঠি লিখবার ফলের দিকে। সে খালি এইটুকু মাত্র সতর্কতা নিয়েছিল যে চিঠিগুলোর মধ্যে কোথাও সেই সহাধ্যায়ীটির নাম দেয় নি। চিঠির পর চিঠিতে উত্তেজিত হয়ে ছেলেটি একদিন এসে মঞ্জরীদের বাড়ীতে উপস্থিত। মঞ্জরী তখন বাড়ী ছিল না। সে এসে মঞ্জরীর মা ও পিসীমার নিকট নিজের পরিচয় দিয়ে প্রস্তাব করে যে সে মঞ্জরীকে বিয়ে করতে চায় এবং বলে এ সম্বন্ধে মঞ্জরী প্রস্তুত আছে। বাড়ীতে মহা হুলস্থুল বেধে গেল। মঞ্জরী এসে বাড়ীতে উপাস্থত হয়ে দেখলে যে শুধু খেলা খেলবার জন্য, শুধু একটু মাদক উত্তেজনার জন্য সে এসে এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যেখানে কলঙ্ক থেকে রক্ষা পাওয়ার তার আর উপায় নেই। একান্ত নিরুপায় হয়ে সে কানাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলে। কানাইয়ের সঙ্গে তখন পর্য্যন্ত তার তেমন ভাব জমে' ওঠে নি। কিন্তু কানাই ছিল সেই রকম উদার প্রকৃতির ছেলে যে নিজের জন্য কোথাও কিছু জোর করে' চাইতে পারত না, রাখতেও পারত না, কিন্তু অপরের সকরুণ প্রার্থনা সে কখনও প্রত্যাখ্যান করতে পারত না; বিশেষতঃ কোন নারী বিপন্ন

হয়ে কোনও আবেদন জানালে সে কিছুতেই না বলতে পারত না। কানাইকে মঞ্জরী সোজা সরল সত্য কথাটা বলে নি, অনেক মিথ্যা কথা মিশ্রিত করে' খালি তার প্রয়োজনের কথাটা জানিয়েছিল যে সে সেই ছেলেটির কাছে যে সমস্ত চিঠি লিখেছে সেগুলি কোন রকমে ফিরিয়ে এনে দিতে হবে, কারণ মঞ্জরীর বিরুদ্ধে সেগুলিই তার প্রধান প্রমাণ। কানাই মঞ্জরীকে একটিও প্রশ্ন করে নি, চিঠিতে কি লিখেছিল জানতে চায় নি। সে সোজা গিয়ে সেই ছেলেটির ঘরে উপস্থিত হয়ে চিঠিগুলো দাবী করে। এমনিভাবে সে দাবী করে যে সে বেচারা প্রাণের ভয়ে সমস্ত চিঠিগুলি কানাইকে দিয়ে দেয়। একা একজনের বাড়ীতে গিয়ে তারই ঘরের মধ্যে এমন ভাবে দাবী করাতে তার বিপদ ছিল যথেষ্ট, কিন্তু করবে বলে' ঠিক করলে ও কর্ত্তব্য মনে করলে বিপদের দুদ্দিনকে সে কিছুমাত্র গণ্য করত না। এমন আর দ্বিতীয় লোক কেউ ছিল না যে নিঃস্বার্থভাবে এতখানি ঝঞ্ঝাট মাথায় নিয়ে মঞ্জরীকে এমনি ভাবে সাহায্য করত। সে শুধু যে চিঠিই কেড়ে এনেছিল তা নয়, ছেলেটিকে সে এমন ভয় দেখিয়েছিল এবং ছেলেটিও তার কথার মধ্যে এমন দৃঢ়তার পরিচয় পেয়েছিল যে, সে আর দ্বিতীয়বার মঞ্জরীর দিকে অগ্রসর হয়ে তার দাবী দাখিল করতে সাহস করে নি। এই কানাইয়ের সঙ্গে মঞ্জরী ক্রমশঃ কত ঘনিষ্ঠ হয়েছে, নিজের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য দিয়ে তাকে আকর্ষণ করেছে, কাছে টেনেছে, প্রশ্রয় দিয়েছে। এ অবস্থায় আর রূঢ়ভাবে তাকে কি করে' প্রত্যাখ্যান করা যায়? তবে কানাইকে ভয় করবার কিছু ছিল না। এমনি কোন আশঙ্কা ছিল না যে সে কোন সময় তার দাবী নিয়ে এসে জোর করে' দাঁড়াবে, বা কোন সময় তার পূর্ব্বকালের ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে কোনও রূঢ় ব্যবহার করবে। কোনও যথার্থ ভদ্রলোকের সঙ্গে

ব্যবহার করবার এই একটা সুবিধা আছে যে তার সঙ্গে যতই অপ্রীতি-কর ব্যবহার কর না কেন, সে যে ভদ্রলোক এ কথা তার সব সময়ই মনে থাকে এবং সে কখনই অভদ্র ব্যবহার করতে পারে না, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির সঙ্গে। কিন্তু এ কথাও বলা ঠিক হবে না যে এমন চিরানুগত কানাইয়ের প্রতি, এমন দৃঢ় বলিষ্ঠপ্রকৃতির প্রতি, এমন একাগ্র সত্যনিষ্ঠ যথার্থ ভদ্রব্যক্তির প্রতি, এতদিনের মেলামেশাতেও মঞ্জরীর মনে কোন টান জন্মায় নি। মঞ্জরীর মধ্যে ছিল বিলাসবিভ্রম, চটুলতা, তার মধ্যে ছিল ছেলেধরার অসীম লোভ। শিকারের বস্তু আহার করায় ছিল না তেমন রুচি, যেমন রুচি ছিল শিকার নিয়ে খেলা করায়। এই খেলার মধ্যে তার মন যে কখনও কোথাও টানত না তা নয়, কিন্তু একান্তভাবে ধরা না দেওয়ার কৌশলটি সে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিল। শেষ পর্য্যন্ত কোথায় ধরা দেবে বা না দেবে, সেটা সে রাখত আপন বিচারবুদ্ধির হাতে। নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ যাচাই না করে' সে কোথাও ধরা দিতে প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু অপরকে ধরবার লোভে আদিম নারীরক্ত তার হৃদয়কে স্পন্দিত করত এবং তার ধমনীকে তুলত নাচিয়ে। আজ কানাইয়ের সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করবে তা সে তখনও স্থির করতে পারে নি। তাকে প্রলুব্ধও করবে, প্রত্যাখ্যানও করবে, অথচ এই দু'টি বিভিন্ন বিপরীত বৃত্তিকে কেমন করে' সফল করে' তুলবে, বুদ্ধির আওতার মধ্যে তার কোনও হদিস্ পাচ্ছিল না। এমন সময় কানাই এমন একটা আকস্মিক ব্যবহার করে' বসল যেটাকে প্রশ্রয় দিলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা দুর্ঘট হয়ে উঠত। এই জন্য হঠাৎ নিজের অনিচ্ছাতেও তাকে রূঢ় হয়ে উঠতে হ'ল।

কানাই অপমান সহ্য করতে পারত না। কিন্তু এমন অবস্থায় সহ্য

করা ছাড়া উপায়ান্তরও ছিল না। এমন অনেক লোক আছে যাদের স্পর্শশক্তি ও অনুভবশক্তি অত্যন্ত প্রবল ও তীক্ষ্ণ অথচ ব্যবহারে তারা দিতে পারে অসাধারণ ধৈর্য্যের পরিচয়। একদিকে যেমন তারা কুসুমের মত কোমল অপর দিকে তেমনি বজ্রের মত কঠিন। হৃদয়ে যতই না কেন আঘাত পাক, বাইরে সংযমের দ্বারা আঘাতকে নিরুদ্ধ করতে তারা অভ্যস্ত। কানাই ছিল সেই প্রকৃতির। মঞ্জরী যখন কানাইকে আঘাত করল তখন তার মুখখানি বেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু মঞ্জরীকে সে একটুও দোষ দিলে না, সে দোষ দিলে নিজের অনবধান চাঞ্চল্যকে। এ কথা তার মুখে এল না যে এতদিন যে বিষয়ে সে এমন প্রশ্রয় পেয়েছে আজ সেটা হঠাৎ এমন নোংরামি কেন হ'ল। তার বেদনাক্লিষ্ট মুখ দেখে' মঞ্জরী হৃদয়ে কষ্ট পেল, নিজের অসঙ্গত ব্যবহারের কথা তার মনে হ'ল। কিন্তু একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েই সে এসেছিল, হঠাৎ একটা ভুল করে' বস্‌ল বলে' সে সঙ্কল্প থেকে পেছিয়ে যাওয়া চলে না।

একটুকাল চুপ করে' থেকে কানাইয়ের ক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে মঞ্জরী বল্লে—"দেখ, রাগ কর' না। সব সময় কি সকল রকম ব্যবহার শোভন হয়?"

কানাই বল্লে—"তা ত নয়ই।"

কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে পার্শ্বস্থ একটি জিরেনিয়াম্-ফুলের স্তবক হাত দিয়ে ভেঙ্গে নিয়ে অধোমুখে তার ফুলগুলি ছিন্ন করতে করতে মঞ্জরী বল্লে—"দেখ, আমাদের দু'জনেরই এখন বয়স হচ্ছে। কাজেই পরিণামে আমরা কোন্ দিকে চলব সে বিষয়ে একান্তভাবে মন স্থির না করে' ছেলেমানুষী করা আমাদের আর পোষায় না।"

মঞ্জরীর চোখে মুখে ঈষৎ সলজ্জ ভঙ্গি। বোধ হয় আদিম মানবীর

এই বিষয়ে অযত্নশিক্ষিত বিলাসবিভ্রম চিরকাল ধরে' এক রকমই চলে' আসছে। সেকালে ও একালে বেশভূষা, পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে, কিন্তু নারীপ্রকৃতির বিলাসবিভ্রম বোধ হয় একই রকম চলে' আসছে। যখন নারদ-ঋষি পার্ব্বতীর সম্মুখে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করেছিলেন তখন শিবের সহিত বিবাহের জন্য প্রগল্‌ভতার চূড়ান্ত পর্য্যন্ত যিনি পৌঁছেছিলেন, যিনি রূপ দিয়ে শিবকে মুগ্ধ না করতে পেরে কঠোর তপস্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তিনিও বোধ হয় তখন বিবাহের কথায় এমনি সলজ্জ বিলাসনম্রতা দেখিয়েছিলেন :—

এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী ॥

মঞ্জরীর কথা শুনে হঠাৎ যেন কশাহত হয়ে, যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হয়ে কানাই অত্যন্ত বিস্মিতভাবে মঞ্জরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে—"তা ত বটেই।"

কিছুক্ষণ চুপ করে' কাট্‌ল। আকাশে একাদশীর চাঁদের উপর পাতলা পাতলা মেঘ ক্রমশঃ তাদের ছায়া ফেলে' তাকে অবগুণ্ঠিত করে' তুলতে লাগল, আর চন্দ্রের আলো তমোগর্ভ হয়ে মলিন করে' দিতে লাগল ধরণীর পুষ্পলোকের লাবণ্য। মঞ্জরী বল্লে—"আচ্ছা, তুমি ত অনেকদিন হয় তোমার এম্‌-এস্‌-সি পড়া শেষ করেছ। তুমি ত পূর্ব্বে বলতে যে অধ্যাপক ব্যানার্জির নিকট আরও পড়াশুনা করবে। বলতে যে জীবনে পড়াশুনাকে তুমি ব্রত করে' তুলে সত্য আবিষ্কারের পথে জীবনকে উৎসর্গ করবে। সে কাজ আজকাল কি রকম চলছে?"

কানাই বল্লে—"না, তা আর চলছে কই? তাঁর কাছে ত যাওয়াই হয়ে ওঠে না।"

"তবে কি কোনও চাকরী বাকরীর চেষ্টা করছ ?"

"না, কিছুমাত্র না। আর করলেই বা কে দেবে ? আমার ডিগ্রীও তেমন উচ্চাঙ্গের নয় যে সামান্য চেষ্টাতেই চাকরী পাওয়া যাবে। সাধারণ কলেজে পড়াবার চাকরীতে বেতনই বা কত আর আমার ভালও লাগে না কোনও একটি মফঃস্বল কলেজে একটি চাকরী নিয়ে থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড় চালিয়ে যাব তিনশ পঁয়ষট্টি দিন। ও জীবনের কোন অর্থ নেই, ও ত আলস্যের নামান্তর। এতে অধ্যয়নও নেই, অধ্যাপনও নেই, অথচ নামটা আছে অধ্যাপক। অধ্যয়নের কোন প্রয়োজনই নেই এবং অধ্যয়ন করবার বইও কোথাও পাওয়া যায় না। ল্যাবরেটরী ত নেই বললেই চলে। আর অধ্যাপন হচ্ছে পুরাতন জিনিষের নিত্য নবীন ছেলেখেলা। ওতে আমার মন এতটুকুও খোরাক যোগাড় করতে পারবে না।"

মঞ্জরী হেসে বল্লে—"উচ্চাঙ্গের লেখাপড়াও করবে না, যেমন-তেমন চাকরীও করবে না, কে তোমাকে লাটসাহেবী দেবে বল ?"

কানাই হেসে বল্লে—"ওঃ, লাটসাহেবী ! ভাল ত চাকরী খুঁজে বের করেছ দেখছি ! লাটসাহেবী দিলেই বা কে করে ? মস্‌নদে বসে' গোটাকতক সই চালানো আর মন্ত্রীসভা গড়া আর ভাঙ্গা, আর দেশের অনশনক্লিষ্ট নরনারীর অর্থে চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় আহার। অনেক তপস্যার পর একটি লাটসাহেব জন্মে। আমি বোকা হ'তে পারি, কিন্তু অত সঞ্চিত বোকামির তপস্যা আমার নেই।"

মঞ্জরী বল্লে—"তবে তোমার কি চাকরী হবে ? তোমাকে প্রফেসার ব্যানার্জি করে' দিলে খুসী হ'বে ?"

"কিছু মনে কর' না মঞ্জরী, তোমার বুদ্ধিটা ক্রমে নিরেট হয়ে আসছে। প্রফেসার ব্যানার্জি কি কেউ করে' দিতে পারে ? প্রফেসার

ব্যানার্জি হয় অক্লান্ত পরিশ্রমে। অনেক মেধা, অনেক বুদ্ধি, মহান্ আদর্শের পিছনে অনেক সাধনা থাকলে তবে ঐ রকম একটি অধ্যাপক তৈরী হয়। ও-সব নাম ও-রকম হেলায় অশ্রদ্ধায় নেওয়া চলে না।"

"তা বেশ, নাই বা হ'লে অধ্যাপক ব্যানার্জি। কিছু ত একটা হ'তে হবে। সেটা কি তা ভেবে দেখেছ? টাকা পয়সা ত যথেষ্ট নেই যে যেমন ইচ্ছা তেমন খেয়ালের বশে চলবে।"

"আরে, টাকাপয়সা যে নেই সেই ত একটা মস্ত বাঁচোয়া, থাকলে ত একদিনও তাকে রাখতে পারতুম না। যে টাকাপয়সা ঘরে রাখে তার পক্ষে টাকাপয়সা থাকা এবং না থাকা দুইই সমান। টাকাপয়সা রাখলে তাকে পাওয়া যায় না। টাকাপয়সা হচ্ছে প্রবাহের ধন। ভাগীরথীর জল যখন বয়ে যায় তখনই তার সার্থকতা, তখনই তা পৌঁছতে পারে দশের কাছে, শত শত লোক পানে ও অবগাহনে করতে পারে আপনাদের চরিতার্থ, লক্ষ লক্ষ নালার মধ্য দিয়ে তা প্রবেশ কবতে পারে পার্শ্বস্থ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে, উৎপন্ন করতে পারে সোণার ফসল। জল যেখানে বাঁধা পড়ে তার উঁচু পাড়ের মধ্যে, তখন সে হয় জমিদার বাবুদের দীঘি। দু'চারজন লোকের কাজ তাতে চলে কিন্তু পৃথিবীর কাজ তাতে চলে না। কালক্রমে জমে সেখানে শ্যাওলা আর পাঁক, বুজিয়ে না দিলে আসে ম্যালেরিয়ার মহামারী। সে দীঘি মনুষ্যকুলের জননী না হয়ে, হয়ে ওঠে মশককুলের জননী। জমিদার বাবুদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে দীঘিকামাতার ভাগ্য। কিন্তু গঙ্গার স্রোতকে কোনও জমিদারবাবুর স্রোত বলা যায় না, এমন কি, মহামান্য সম্রাটের স্রোতও বলা যায় না। তা হয়ে ওঠে বিশ্ব-ধরণীর। অর্থের স্রোত জলস্রোতের মতই ক্ষণের অতিথি। তাকে আঁকড়ে ধরে' জীবন চালানো যায় না, নিজেকে রিক্ত করে' তাকে

ভাসিয়ে দিতে হয়, তবেই হয় অর্থের সার্থকতা। যা কিছু আমার ছিল এতদিনে তা দিয়েছি ভাসিয়ে। তার জন্য আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই, ও ত স্রোতেরই জিনিষ।"

মঞ্জরী অনুভব করলে যে কথায় ত একে বাগানো যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে তার মনে পড়ল সুকুমারের কথা। তার কাছে ত সে তর্ক-শক্তির জন্য অনেক বাহবা পেয়েছে, কিন্তু এর কাছে ত থই পাওয়া যাচ্ছে না। এ যে তার চেয়ে বেশী মেধাবী বা বেশী তার্কিক তা নয়। এরা জীবনের সম্মুখীন হয় নিজের সমস্ত সত্তা নিয়ে, তর্ক নিয়ে নয়। জীবনের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে' দেয় বলে' জীবনের রহস্য এদের রক্তের মধ্যে ধরা পড়েছে। একরকম বুদ্ধি আছে যা মগজের ধর্ম্ম নয়, যা হচ্ছে জীবনের ধর্ম্ম, যাকে পাওয়া যায় জীবনে বেঁচে থাকার মধ্যে। কল্পনামূলক তর্কবিতর্কের সূক্ষ্ম রন্ধ্রের মধ্যে তার কোনও স্থান নেই। তার স্থান হচ্ছে জীবনের ব্যাপ্তির মধ্যে। তাদের সঙ্গে তর্কের প্যাঁচ চলে না, তাদের প্যাঁচ দিতে পারে তারাই যারা জীবনের প্যাঁচ-কসরৎ খেলেছে সমগ্র জীবনের পণ্য দিয়ে। কানাই ছিল সেই শ্রেণীর লোক যার বোঝা পরিষ্কার হ'ত কাজের মধ্য দিয়ে, কাজকে পরিষ্কার করার জন্য তার বোঝার প্রয়োজন হ'ত না। কাজের প্রবাহই তার আপন স্রোতের মধ্যে তার বোঝাকে প্রতিবিম্বিত করে' তুলত। যারা জীবনকে বাইরে রেখে তর্ককে প্রধান করে' তোলে, তাদের তর্কের প্যাঁচ যতই বেড়ে চলে ততই তা থাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। সেই রকম লোকদের জ্ঞানের মহত্ত্ব জীবনের মধ্যে সত্তা লাভ করে না। জ্ঞানের প্রকোষ্ঠে থাকে জ্ঞান, জীবনের প্রকোষ্ঠে থাকে জীবন। মাঝের দ্বার সর্ব্বদাই থাকে রুদ্ধ, কদাচিৎ বা ঈষদুন্মুক্ত হয়ে এক ঘরের আলো অন্য ঘরে পৌছতে পারে।

মঞ্জরী এবারে তেড়ে জিজ্ঞাসা করলে—"তবে অন্ন জুটবে কোথা থেকে ?"

কানাই বল্লে—"হ্যাঁ, তাই ত! কোথা থেকে জুটবে! সে কথা ত ভাবি নি, আর ভাবার দরকারই বা কি ? এ পর্য্যন্ত ত জুটে যাচ্ছে।"

মঞ্জরী রুষ্ট হয়ে বল্লে—"হ্যাঁ, জুটে যাচ্ছে বই কি! কাপড়চোপড়, জুতো, এর কি দশা হয়েছে দেখতে পাচ্ছ ?"

কানাই হো হো করে' হেসে বল্লে—"ও, এই কথা! আমাদের দেশের কোটি কোটি নরনারীর কাপড়ের কথা একবার ভেবে দেখেছ ? ভেবে দেখেছ কত ক্রোরপতি শ্রেষ্ঠী একদিনের বে-চালে ভিখারী হয়ে গিয়েছে ? এগুলো ত অবস্থামাত্র, আসবে, যাবে, পরিবর্ত্তন হবে। ভাগীরথীর জল দেখেছ, দামোদরের বান দেখেছ ? বর্ষায় জলের উদ্দণ্ড তাণ্ডবলীলা, আবার হয় ত শীতে গ্রীষ্মে শুকিয়ে হয়ে গেছে বালুময়। যেখানে হাতী ভেসে যেত সেখানে পতঙ্গ আর পিপীলিকা বেঁধেছে বাসা। অর্থের প্রবাহ চলেছে আপন স্রোতে। যে লোকটার উপর দিয়ে তার প্রবাহ চলেছে তাকে আমরা দেখছি ধনী, আর যে কূল থেকে সে প্রবাহ বিচ্যুত হয়েছে তাকে আমরা দেখছি নির্ধন। মানুষের জীবনপ্রবাহের স্রোতের সঙ্গে এই সম্পদবাহী স্রোতের স্থানে স্থানে হচ্ছে সঙ্গম আর স্থানে স্থানে হচ্ছে বিচ্ছেদ। যেখানে এই সঙ্গম ঘটছে সেইটিই হচ্ছে ধনের পুণ্যক্ষেত্র। কেবল যে ব্যক্তির উপর দিয়ে এই প্রবাহের গতি বিষমভাবে চলেছে তা নয়, বিভিন্ন জাতির উপর দিয়েও এর প্রবাহ এমনি বিষমভাবে চলেছে। এমন কোনও খেয়ালী লোক থাকতে পারে যে বলবে, ভাগীরথীর জলস্রোতের মধ্যে কোথাও কেন থাকবে পঞ্চাশ ফিট গভীরতা এবং কোথাও

বা কেন থাকবে এক ফুট গভীরতা। সে হয় ত মনে করতে পারে যে পূর্ত্তকৌশলের বিচক্ষণতায় সব জায়গায়ই যাতে জল দুই ফিট করে' থাকে এই ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সে ব্যবস্থায় ফল হয় এই যে প্রবাহ যায় থেমে এবং ভাগীরথী হয়ে পড়েন বাবুদের দীঘি। প্রবাহ থেকে কাটান দেওয়া জল কোথাও রাখতে হয় জমা করে'। সেই জমা জল যে কি কাজে লাগবে, কার উপকারে লাগবে বা বিনাশে লাগবে, না ধ্বংসে লাগবে, তা বলা যায় না। এই জমা জল যদি অপচিত হয় তবে সমস্ত দেশটা হয়ে যায় শুকনো ডাঙা। যখনই মানুষ তার সমাজে করলে ধনের সৃষ্টি, পরিশ্রমকে তার জীবনের প্রবাহ থেকে মুক্ত করে' করলে তার প্রতিমূর্ত্তি, তখনই সে মূর্ত্তি মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা স্বতন্ত্র জীবন লাভ করে' ছুটতে লাগল তার আপন প্রবাহে। ধন সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে জীবনের সঙ্গে ধনের বিচ্ছেদ, তাকে আবার জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করার সাধ্য কারুর নেই। দুধকে মন্থন করে' তা থেকে তোলা যায় মাখন, সেই মাখনকে আর পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে দুধের সঙ্গে মিশ্রিত করা কোনও বৈজ্ঞানিকের সাধ্য নয়। মাখন গলিয়ে তরল করে' স্রোত বইয়ে দিলে সেই স্রোত দুগ্ধের পরমাণুর মধ্যে সমভাবে প্রবেশ করবে না। যে সমাজে মানুষ ধন সৃষ্টি করতে শেখে নি সেখানে জীবনের পরিশ্রমের সঙ্গেই ছিল জীবনের ভোগ একাত্ম হয়ে। যেই পরিশ্রমকে আলাদা করে' মূর্ত্তি দিলে সেই তার সঙ্গে হ'ল জীবনের বিচ্ছেদ। অনেক পণ্ডিতেরা বলেন যে ধনকে অবলম্বন করে' ঘটেছে মানুষের শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব, কিন্তু তাঁরা ঘোড়াটাকে গাড়ীর সামনে না বসিয়ে গাড়ীটাকে বসিয়েছেন ঘোড়ার সামনে। মানুষের মধ্যে আছে স্বাভাবিক অভিমান, অপরের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ

এই বোধ, আছে বর্ব্বরশ্রেণীর প্রাণিসুলভ দ্বন্দ্বপ্রবৃত্তি। তাই অনেক সময় তারা ধনকে অবলম্বন করে' এই প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিয়েছে। এই বিভাগ ও দ্বন্দ্বের কারণ ধন নয়, ধন এখানে উপাধিমাত্র। ভারতবর্ষীয়েরাও এই বিভাগ করেছিলেন, ব্রাহ্মণকে বসিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ আসনে জ্ঞান ও বিদ্যাকে উপলক্ষ্য করে'। এখানে জ্ঞান বা বিদ্যাই হয়েছে বিভাগের উপাধি, কিন্তু এ বিভাগটি শ্রেষ্ঠ এই জন্য যে জ্ঞান ও বিদ্যা মানুষের জীবনের একাত্মগত সম্পত্তি, তা ধনের মত বহিরঙ্গ জড়বস্তু নয়।"

মঞ্জরী বল্লে—"সোজা কথার সোজা জবাব দেবে তা নয়, এমন হেঁয়ালি করে' কথা কইচ যে তার অর্দ্ধেক কথাই আমি বুঝতে পারছি না।"

কানাই হেসে বল্লে—"তোমার বিনয়টা সম্পূর্ণ হয় নি। তোমার বলা উচিত ছিল, একটা কথাও তুমি বুঝতে পারছ না। তোমাকে বোঝাবার জন্য আমি কিছুই প্রায় বলি নি, আমি ঝেড়ে যাচ্ছিলুম আমার মনের পাগলামি।"

বাস্তবিক মঞ্জরী কানাইয়ের আজ যে রূপ দেখলে সেটা তার কাছে একেবারে বিস্ময়কর। সে জান্‌ত কানাই তার একটি নিতান্ত নিরীহ বাহন। কানাইয়ের উপর সে যে কত সময় কত জুলুম করেছে তার সীমা নেই। এক সময় মঞ্জরীর কিছু টাকার দরকার হয়। মঞ্জরীদের বাসায় ছিল কানাইয়ের একটা খোলা সুটকেস্, তার মধ্যে ছিল একটা চেক্-বই। মঞ্জরী কানাইকে কিছুমাত্র না বলে', একটি কথামাত্র জিজ্ঞাসা না করে' একখানা চেকে কানাইয়ের নাম সই করে' আনলে শ' খানেক টাকা কানাইয়ের ব্যাঙ্ক্ থেকে। পরের লেখা অনুকরণ করাতে মঞ্জরীর নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। ব্যাপারটা যখন কানাইয়ের

সঙ্গে ব্যাঙ্কের একটা গোলমাল ও অনাসৃষ্টিতে পরিণত হ'ল তখন সে জানতে পারল আদত কথাটা। কিন্তু সে এই নিয়ে মঞ্জরীকে কোনও তিরস্কার করলে না, বোঝাতে চেষ্টা করলে না যে কাজটা কত গর্হিত। সে শুধু তাকে বল্লে—"আমায় বল নি কেন, মঞ্জরী ?" তারপর যখনই কোনও দুঃসাধ্য কাজের প্রয়োজন হ'ত, কানাইকে বলা মাত্র সে তা নির্ব্বাহ করত। এই জন্য মঞ্জরী কানাইকে খাতির করত। কিন্তু সে খাতির তার পৌরুষ ও চরিত্রের মাহাত্ম্যের জন্য নয়। সে খাতির একটি নিতান্ত নিরীহ পোষমানা প্রাণীর প্রতি প্রভুর যে একটি সদয় স্নেহ থাকে সেই জাতীয়। কোনও একটি বিশিষ্ট লোকের পৌরুষ ও চরিত্রের মাহাত্ম্য অনুভব করতে হ'লে চরিত্রের যে মাহাত্ম্য, যে আদর্শ থাকা আবশ্যক, মঞ্জরীর তা ছিল না। মহত্ত্ব যখন তার স্বচ্ছ, সরল, নগ্ন স্বরূপে প্রকাশ পায় তখন তার সমাদর করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। সূর্য্যের জ্যোতিরেখা আমরা সাধারণ চোখে দেখতে পাই না, তা যখন অন্য বস্তুর উপর প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ে তখন সেই সমস্ত বস্তুর বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের বিলাস দেখে' আমরা প্রশংসমান চিত্তে সেইগুলির দিকে চেয়ে থাকি। তেমনই মহত্ত্ব যখন প্রতিফলিত হয়ে আসে ধনে, খ্যাতিতে, প্রতিষ্ঠায় তখন মহত্ত্বের সেই স্থূল রূপ সকলেই অনুভব করতে পারে এবং সকলেই তাতে মুগ্ধ হ'তে পারে। কিন্তু মহত্ত্বের নিরাবরণ রূপ সহজে আমাদের চোখে পড়ে না। কানাইয়ের না ছিল ধন, না ছিল প্রতিষ্ঠা, না ছিল কোনও পরিচয়গৌরব। পরীক্ষায় পাশটাও তার খুব উঁচু কোঠায় ছিল না। এই জন্যই কানাইকে মহত্ত্বমণ্ডিতভাবে দেখতে মঞ্জরী কোনও অবসর পায় নি। সে সাধারণতঃ ছিল স্বল্পভাষী ও একান্ত

বিনীত। কিন্তু মঞ্জরী লক্ষ্য করলে যে কয়মাসে কানাইয়ের মধ্যে এমন কিছু একটা ঘটে' গেছে যাতে সে কানাই কোথায় লোপ পেয়েছে। মঞ্জরী মনে করত, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় এবং সভ্যসমাজের চিক্কণতায় সে কানাই অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আজ কানাই যে সব বড় বড় কথা বলছে, মঞ্জরী এক নিমেষে বুঝল সেখানে সে থই পাবে না। কথা বলতে বলতে কানাইয়ের চোখ দিয়ে উঠছে আগুন ঠিক্‌রে, তার মুখভাব একটা নূতন দীপ্তি নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। এমন কানাইকে ত সে চেনে না! আজ যেন কানাইয়ের সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে মঞ্জরী দেখতে পেল যে সে অনেক ছোট হয়ে গেছে তার কাছে। তার দুই হাত উঁচুতে বাড়িয়েও সে যেন আর কানাইয়ের নাগাল পাচ্ছে না। সে যতই নিজের উপর জোর করতে যায় ততই অনুভব করে যেন সে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এ কি দীপ্ত রূপ, এ কি তেজস্বিতা! মঞ্জরী চিরদিনই লোভ করতে শিখেছে, কিন্তু সম্ভ্রম করতে শেখে নি। আজ যেন নূতন করে' এ-রকম একটা ভাব তার হৃদয়ে রেখাপাত করল।

কথাটার মোড় ঘোরাবার জন্য মঞ্জরী একটু সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি যে বলতে যে সত্য আবিষ্কারের জন্য তোমার আকুল আগ্রহ, তার কি হ'ল?"

কানাই একটু হেসে বল্লে—"সত্য জিনিষটা ত উত্তরমেরু বা দক্ষিণমেরুতে বা হিমালয়ের গৌরীশঙ্করের অভ্রভেদী চূড়ার উপর অবস্থিত নেই, যে সেখানে গিয়ে তাকে আবিষ্কার করতে হবে। সকল সত্যের গোড়া রয়েছে আমাদের নিজেদের মধ্যে। আমরা আমাদের নিজেদের যেমন অত্যন্ত নিকটে তেমনি অত্যন্ত দূরে। আমরা আমাদের অতি কাছে বসে' থেকেও এত দূরে যে নাগাল পাওয়ার যো নেই। কোথায় যেন পড়েছিলুম—'আসীনো

দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ'—বসে' থেকেও ছোটে দূরে, শুয়ে থেকেও যায় বহুদূরে। আমরা কথায় কথায় বলে' থাকি 'আমার সমস্ত তোমায় দিলুম', কিন্তু 'আমার সমস্ত' যে কি বা কতটুকু তার কি কোনও খোঁজ আমরা কোনদিন করেছি বা করতে পারি? আজ যেটুকু কাউকে হাতে ধরে' দিতে পারি, কাল আবিষ্কার করি যে তারই মধ্যে রয়েছে এমন অনেক জিনিষ যা সকলকে শুধু যে দেওয়া যায় না তা নয়, তা তাদেৰ নাগালের বাইরে। আজ যে আমের চারাটি প্রোদ্ভিন্ন কিশলয়ে জীবনের কাঁচা রূপ নিয়ে সবুজ হয়ে দাঁড়িয়েছে চোখের সামনে, তা স্বচ্ছন্দে আপনাকে বিতরণ করে' দিতে পারে পশুলোকের জীবনধাবণের জন্য, কিন্তু কাল সে দাঁড়াবে তার মহত্ত্বের উচ্চতর রূপে, পশুদের নাগালের বাইরে। সমস্ত পশুলোক ও নরলোককে যা দেওয়ার তা দিয়েও তার হাতে থাকবে তার অমর জীবন, যে জীবনধারাকে সে ব্যাপ্ত কববে অনন্ত দেশকালের মধ্যে মহাকালের স্রোতধারায়। চারাগাছ জানে না তার সেই অমর রূপ, যা মুকুলে মুকুলায়িত হয়ে, ফলবান্ হয়ে, আপন অসীম সন্তানের বীজ আপনি উপ্ত করে' যাবে। মানুষও তেমনি নিরন্তর উঠছে গড়ে' তার অন্তরের দিক থেকে। আজ যা সে মনে করছে 'এই আমি', 'এইটুকু আমি', কাল সে দেখছে যে তার সেইটুকু সে আর চিনতে পারে না, সে আর একটা নবতর সৃষ্টির মধ্যে তার নাম ও পরিচয় ফেলেছে হারিয়ে। যে সত্য রয়েছে আমাদের মধ্যে তা স্থিরভূত পদার্থ নয়, তা নিরন্তর সৃষ্টির স্পন্দের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে নবতর রূপে আপনাকে প্রকাশ করছে। এইজন্যই শুধু চিন্তার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, মননের দ্বারা আমরা আমাদের যথার্থ পরিচয় পেতে পারি না। একটা লোহা চুম্বক হয়ে উঠেছে কি না তার পরিচয় তার

লৌহরূপকে ধ্যান করে' আমরা পাই না, কিন্তু যখন দেখি টুকরো টুকরো লোহা তার দিকে ছুটে আসছে তখনই বুঝি যে সেই লোহা চুম্বকে পরিণত হয়েছে। তেমনি আমাদের অন্তর্জীবনের যথার্থ পরিচয় আমরা পাই তখনই এবং সেইটুকুতেই যেটুকু দিয়ে আমরা আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক লোকের মধ্যে বা নরসমাজের মধ্যে আমাদের বিশিষ্ট সত্তা ও বিশিষ্ট রূপ প্রতিফলিত করতে পারি। সেইভাবে প্রতিফলিত হ'লে তবেই তা পড়ে আমাদের নজরে, তখনই করি তাকে আবিষ্কার। নইলে, কেবল ধ্যানস্থ হয়ে পরিস্পন্দমান আত্মস্বরূপকে তার স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। আমাদের আমরা যতটুকু পরিমাণে আবিষ্কার করতে পারি ততটুকু দিয়েই আমরা বহির্লোককে আবিষ্কার করি এবং বহির্লোককে যতটুকু আমরা আবিষ্কার করি ততটুকুতেই আমরা অন্তর্লোককে আবিষ্কার করি।"

মঞ্জরী একটু গম্ভীরভাবে বল্লে—"তোমার কথা আমি একটুও বুঝতে পারছি না। সকলেই এ কথা বলে' থাকে যে প্রেমের দ্বারাই আমরা আমাদের আবিষ্কার করি। কোনও নারীর নিকট সর্ব্বস্ব দান করে' তাকে ভালবাসলে তারই ভালবাসার মধ্যে পুরুষ পায় তার চরম সার্থকতা, সেইখানেই সে পারে তাকে যথার্থভাবে আবিষ্কার করতে।"

কানাই হেসে বল্লে—"দেখ, শোনা কথার কোনও সীমা করা যায় না, কার কাছে কি শোনা গেল সেটা নিয়ে কোনও জিনিষের স্বরূপ বিচার করা যায় না। বিচার করতে হয় নিজের অনুভবের সাক্ষিত্বে। এই অনুভবের মধ্যে একদিকে থাকে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, অপরদিকে থাকে ভাবের গাঢ়তা এবং এই উভয়কে মিলিত করে আমাদের কর্ম্মোন্মুখতা,

আমাদের প্রবৃত্তির স্পন্দমানতা। স্ত্রীপুরুষের ভালবাসার মধ্যে মিশ্রিত হয়ে থাকে একটা আদিম দৈহিক কামনা, সেটা পশুসাধারণ এবং জৈবপ্রকৃতিক। তাই তা ব্যাপক। তা থাকে সমস্ত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে, তা উদ্বুদ্ধ করে আমাদের জৈব প্রবৃত্তিকে। কিন্তু মানুষের মধ্যে জৈব প্রবৃত্তি একমাত্র প্রবৃত্তি নয়। মানুষের মধ্যে এমন প্রবৃত্তিও রয়েছে যার প্রভাবে কোনও একজন পুরুষ বা নারী উভয়ের অধ্যাত্ম সত্তাকে এমন করে' এক বলে' মনে করতে পারে যে নিজের জীবনকে অপরের উপকরণরূপে ব্যবহার করতে দিয়ে নিজেকে সার্থক মনে করে। একটা নদী যেমন ঢালু পথে অপর একটি নদীর সহিত মিলিত হয়ে পরস্পরকে পরস্পরের উপকরণ করে' তুলে মহাকল্লোলে ধাবিত হয় সাগরের দিকে, তেমনি একটি চিত্ত চায় অপর একটি চিত্তের সহিত মিলিত হ'তে। কিন্তু চিত্ত ত জড়পদার্থ নয় যে দৈশিক কোনও সংযোগে একটি চিত্ত অপর চিত্তটির সহিত মিলিত হ'তে পারে। তাই একটি চিত্ত খোঁজে অপর চিত্তটির বিকাশের তাৎপর্য্য। এই বিকাশের তাৎপর্য্য খুঁজতে গেলে নিজের চিত্ত দিয়ে তাকে বাধা দিলে চলে না, দিতে হয় নিজের চিত্তকে উন্মুক্ত করে', ধরতে হয় এমন করে' তাকে তার কাছে যাতে একের চিত্ত অপরের কাছে ক্রমশঃ ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হয়। দু'টি চিত্তই চলেছে আপন আপন বৃদ্ধির পথে, তাই পরস্পরের কাছে পরস্পরের আবিষ্কার ছুটে চলেছে একটা অসীমার দিকে। ক্রমশঃ মিলিত হয়েও থাকছে তাদের মধ্যে দূর এবং অন্তরাল, তাই তাদের পরস্পরের আবিষ্কারের চেষ্টারও চলেছে একটা অসীমার দিকে গতি। এই গতির মধ্যে একদিকে তারা পাচ্ছে পরস্পরের চিত্তের পরিচয়, অপরদিকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এই পরিচয়প্রাপ্তির আনন্দ। প্রত্যেক পরিচয়েই অনুভব করছে একটি চিত্ত আপন

ব্যাপ্তি অপর চিত্তটির মধ্যে। এই অনুভবই প্রেম। আমার ব্যাপ্তিতে আমার যে আনন্দ সেই আনন্দই আমার প্রেম। দৈহিক কামনা যদি সমান্তরালভাবে এরই পাশে পাশে সংলগ্ন হয়ে থাকে তথাপি সেই কামনাকে প্রেম বলা চলে না। দু'টি জিনিষকে একত্র পাওয়া যায় বলে'ই তা এক হয় না, সহোপলম্ভের দ্বারা অভিন্নতা স্থাপন করা যায় না।"

মঞ্জরী বল্লে—"তোমার সব কথা আমি বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পারছি যে পুরুষ এবং নারীর চিত্ত যখন পরস্পরের কাছে আবিষ্কৃত হ'তে থাকে এবং একটি চিত্ত যখন এমনি করে' আপন সত্তার একটি অনুকূল পরিচয় পায়, তখনই তাকে বলা যায় প্রেম।"

কানাই একটু গম্ভীর হয়ে বল্লে—"তুমি যা বলছ তা খানিকটা সত্য হ'লেও পূর্ণ সত্য নয়। মানুষের চিত্ত যে কেবল অপর একটি চিত্তের মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত করতে চায় তা নয়, সে হয় ত আপনাকে ব্যাপ্ত করতে চায় আপন অন্তরঙ্গ আদর্শের মহাগতির মধ্যে, জ্ঞানাহরণের অসীম তৃষ্ণার মধ্যে কিংবা নরসমাজের কোনও বিশেষ-জাতীয় কল্যাণের মধ্যে। যেখানেই আমাদের চিত্ত অনুভব করে তার ব্যাপ্তির আস্বাদ, সেখানেই আসে আনন্দ, তাকেই বলি প্রেম। নরনারীর প্রেম এই সাধারণ প্রেমের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এই প্রেমকে সেখানে হয় ত শাঁসালো করে' তোলে কিংবা একটা নূতন আঘ্রাণ দেয় দৈহিক কামনা। কিন্তু তাই বলে' কেবল সেই দৈহিক কামনাটিকে আমরা প্রেম বলতে পারি না। আবার কামনা আছে বলে' প্রেম যে কলুষিত হয়েছে বা প্রেমের হানি হয়েছে তা বলা যায় না।"

যতই কানাই সোজা কথার সোজা উত্তর না দিয়ে তার মনের লাটাই থেকে শুষ্ক তত্ত্বের সূত্র বের করে' আকাশে তার চিন্তাগুলিকে

ওড়াবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল ততই মঞ্জরীর মন আসতে লাগল কঠিন হয়ে। সম্ভ্রমের যে ছায়াটুকু পড়েছিল তাও আসতে লাগল ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে। সে মনে করতে লাগ্‌ল যে এ সব কতগুলি ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। যতই তর্কের রন্ধ্র থেকে সে কোনও প্রবেশপথ পেল না ততই সে অনুভব করতে লাগল যে ঐ জমাট তর্কগুলি একটা নিরেট দেওয়ালের মত, কোনও এক স্থান থেকে এনে কানাই ওগুলিকে জুড়ে দিচ্ছে কথার সঙ্গে কথাগুলিকে ভারীক্কি করে' তোলবার জন্য। ওগুলি সত্যও নয়, বাস্তবও নয়। সাধারণবুদ্ধির মেয়েরা প্রায়শঃই অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের, কিংবা যারা নিরন্তর কাজ-পাগলা হয়ে ঘোরে তাদের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে না, তা সে কাজ যে জাতীয়ই হোক্ না কেন। যে সর্ব্বদা পড়াশুনা বা গ্রন্থলেখা নিয়ে ব্যস্ত, কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে কোথায় কি বক্তৃতা দিয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করবে, কিংবা তীব্রভাষায় কেমন করে' সরকারপক্ষকে অপদস্থ করবে, কিংবা দেশের নানাবিধ হিতকর অনুষ্ঠান কি করে' গড়ে' তুলবে, কিংবা ব্যবসাতে প্রচুর ধন কি করে' উপার্জ্জন করবে এই চিন্তায় নিয়ত ব্যস্ত, মেয়েরা তাদের কাছে থই পায় না এবং নিজেদের তাদের কাছে অনাদৃত বলে' মনে করে এবং তাদের ভালবাসা বুঝতেও অক্ষম হয়। এই সব শ্রেণীর লোক খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা লাভ করলে হয় ত তাদের প্রতি মেয়েদের একটু সম্ভ্রম জন্মাতে পারে, কিংবা তাদের আত্মীয়তার গর্ব্বে নিজেরা গর্ব্বিত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তাদের তারা আপন মনের মানুষ বলে' সহজে মনে করতে পারে না। তাদের তপস্যার উত্তাপ মেয়েদের হৃদয়কে করে' আনে শুষ্ক। চটুল বুদ্ধিতে চতুরভাবে যারা নানা বিষয়ে দক্ষতার সহিত কথা চালাতে পারে এবং প্রতি কথার ইঙ্গিতে ও চাতুর্য্যে বেশ আসর জমিয়ে নিতে পারে, চারিদিকে

প্রসন্নতা ও হাস্যপরিহাসের কলোচ্ছ্বাস বইয়ে দিতে পারে, তারাই সাধারণতঃ মেয়েদের বিমুগ্ধ করতে পারে। দৈহিক পৌরুষ, সাহস এবং অনুকূল ব্যবহারে কানাই মঞ্জরীর কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কানাইয়ের মধ্যে কি যে একটা শক্ত কঠোর দিক ছিল সেটাতে মঞ্জরী স্বস্তি অনুভব করত না। কিন্তু আজ এই তর্কের মধ্য দিয়ে কানাইয়ের চিত্তের এই বন্যতা দেখে' এক নিমেষে মঞ্জরীর মনে হ'ল যে কানাই-জাতীয় জীবকে নিয়ে দু'চারদিন নাড়াচাড়া করা চলে, কিন্তু কানাই সে জাতীয় লোক নয় যাকে নিশ্চিন্তভাবে সারা জীবন ব্যবহার করা যায়। অথচ এদিকে তার বিশ্লেষণের নৈপুণ্য যতই কঠোর হয়ে উঠতে লাগল এবং যতই মঞ্জরী দেখতে লাগল যে কানাইয়ের সঙ্গে কথায় সে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না, ততই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জরীর মন তিক্ত হয়ে উঠতে লাগল। সে একটু কঠিনভাবে কানাইকে বল্লে—"এ সব লম্বা লম্বা বক্তৃতা কোন্ বই থেকে সংগ্রহ করলে? তুমি ভালবাসার জান কি যে তার জুড়েছ এমন দার্শনিক ব্যাখ্যা? সোজা কথা সোজাভাবে না বুঝে যারা তর্কের নাড়াতে নীচে উপরে সব তালগোল পাকিয়ে তোলে আমি তাদের রুচির প্রশংসা করতে পারি না। তাদের দেখ্‌লে," একটু মুচকি হেসে মঞ্জরী বল্লে, "আমার সেই জাতীয় জীবের কথা মনে হয় যারা ঘোলা না করে' জল খেতে পারে না।"

কানাই এই কথা শুনে যেন একটু ব্যথিতভাবে বল্লে—"কেন, ঘোলা করার চিহ্নটা আমার কথায় কোথায় পেলে?"

মঞ্জরী বল্লে—"তা নয় ত কি? প্রেম কাকে বলে, ভালবাসা কাকে বলে, সে কথা বোঝবার জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি বই খুঁজে দার্শনিক বিশ্লেষণের কি কোনও প্রয়োজন আছে? বিশ্লেষণ করতে গেলেই জিনিষটি যায়

ভেঙ্গে। বিশ্লেষণে আমরা যেখানে পৌঁছই সেখানে জিনিষটার বাস্তব রূপ পড়ে চাপা। বসে' দুধ খাচ্ছি এমন সময় তুমি যদি এসে তর্ক ধর —বসে বসে খাচ্ছ ত বেশ, কি খাচ্ছ তাই যখন জান না তখন আর খাওয়া কেন? আমি বল্‌ব বাস্‌ রে মায়ের কোল থেকে দুধ খেয়ে আসছি আর দুধ কি জানি না? তুমি হয় ত বল্‌বে—না, জান না। যাকে তুমি দুধ বলে' খাচ্ছ বা দুধ নামে ব্যবহার করছ, আসলে তাতে জলের অংশই ৮৭ ভাগ; ২ ভাগ থেকে ৪ ভাগ আছে তাতে ঘৃত জাতীয় পদার্থ, ৪ ভাগ থেকে ২ ভাগ আছে ছানা জাতীয় প্রোটিন্‌ পদার্থ, ৩ ভাগ থেকে ৫ ভাগ আছে ল্যাক্‌টোস্‌ জাতীয় পদার্থ, সামান্য একটু আছে লবণ জাতীয় পদার্থ—এ সব কি তুমি জান্‌তে? আমি অনায়াসেই হাস্য করে' বলতুম—না, তা জানতুমও না, জানবার আমার দরকারও নেই, কারণ ওগুলো কিছুই আমি খাচ্ছি না। আমি খাচ্ছি দুধ, সেই দুধই আমার চোখের কাছে প্রত্যক্ষ, আমার স্বাদের কাছে প্রত্যক্ষ; আর তুমি যেগুলো বলছ, সেগুলো একটাও আমার কাছে প্রত্যক্ষ নয়।"

কানাই অট্টহাস্যে বল্লে—"বাঃ, চমৎকার বলেছ! এক এক সময় তোমার বুদ্ধি এমন চমৎকার খেলে যে দেখে' মুগ্ধ হয়ে যাই। কিন্তু তবু আমি বল্‌ব যে দুধটা সত্য ও বাস্তব বলে' তার উপাদানরূপে তার বিশ্লেষণলব্ধ বস্তুগুলি অবাস্তব নয়। বস্তুতঃ সেই বস্তুগুলিরই ন্যূনাধিক্যে পার্থক্য হয় মায়ের দুধের, গরুর দুধের ও ছাগলের দুধের। স্বাদের দ্বারা আমরা দেখি যে মায়ের দুধ, গরুর দুধ ও ছাগলের দুধ তিনটে তিন রকম জিনিষ। তিনটেই সাদা বটে, কিন্তু তাদের স্বাদ, গাঢ়তা, দীপ্তি সম্পূর্ণ পৃথক। তারা যে এক পর্য্যায়ের বস্তু এবং সেই হিসাবে তাদের তিনটেকেই যে দুধ বলা যায় তার কারণ হচ্ছে তাদের

উপাদানগত ঐক্য। এই উপাদানগত ঐক্যের মধ্যে যে একটু পার্থক্য আছে তাতেই এনে দিয়েছে স্বাদগত বৈষম্য। কয়লা তার পরমাণুর সংস্থানভেদে কোনও সময় দেখা যায় পাথুরে কয়লারূপে, কোনও সময় বা কাঠকয়লারূপে, কোনও সময় বা হীরারূপে, কিন্তু মূলে তারা কয়লা। তেমনি প্রেমের একটি সাধারণ ব্যাপকধর্ম্ম আছে এবং সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে সকল রকম প্রেমের মধ্যে যে একটি স্বজাতীয়তা আছে তা আমরা অনুভব করতে পারি। আবার প্রত্যেক প্রেমের মধ্যেই যে একটু একটু পার্থক্য আছে বা একটু একটু অন্য জিনিষের সংমিশ্রণ আছে তার জন্য ঘটে তার স্বাদের বৈষম্য এবং কার্য্যকারিতার বৈষম্য, যেমন দেখা যায় মায়ের দুধের, গরুর দুধের ও ছাগলের দুধের পার্থক্য। তিনটেই দুধ, কিন্তু শিশুকে দেওয়া যায় মায়ের দুধ, গরুর দুধ দিলে শিশুর উপকার না হয়ে অপকার হ'তে পারে। আবার কোনও ত্রিশ বৎসরের বলবান যুবক জননীর দুগ্ধ পান করে' বলিষ্ঠ হ'তে পারে না। অথচ তিনটেই দুধ। দুধের এই সাধাবণ রূপটি হয় ত তার স্বাদে গন্ধে ধরা না পড়তে পারে, কাজেই চিন্তায় ব্যবহার করতে গেলে একটা সাধারণ রূপ খোঁজার প্রয়োজন হয়। অসংখ্য বাস্তব রূপ নিয়ে চিন্তাচালনার সৌকর্য্য হয় না।"

মঞ্জরী জবাব করলে—"দেখ, বিজ্ঞান আলোচনার জন্য বা দর্শন আলোচনার জন্য কি রকম কল্পনার আবশ্যক তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে বসি নি, তা করুন গিয়ে দাড়িওয়ালা পণ্ডিতেরা। আমরা মেয়েমানুষ, বাস্তব অনুভবটা আমাদের কাছে কল্পনার চেয়ে অনেক বেশী সত্য। 'প্রেম' শব্দটা প্রধানতঃই ব্যবহার হয় স্ত্রীপুরুষের ভালবাসার সম্বন্ধে। মেয়েদের মন মাটির প্রদীপের মত। বুকভরা স্নেহ জমে' শুধু হৃদয়কে পূর্ণ করে না, শুধু

মাটির পাত্রের শূন্যতা ভরে' তোলে না, সে জ্বলতে চায় আগুন হয়ে শিখায়। তেল দিয়ে শিখা জ্বলে বলে' তেল শিখা নয়। যতক্ষণ তেল শিখা হয়ে না জ্বলে ততক্ষণ প্রদীপ নিজেকেও আবিষ্কার করতে পারে না, তার চতুষ্পার্শ্বের জগৎকেও আবিষ্কার করতে পারে না। এই শিখা হ'ল মোহ, কামনা, আকাঙ্ক্ষা। এই মোহই সৃষ্টি করে রূপের মাধুর্য্য, অঙ্গের লাবণ্য। এই মোহই টেনে আনে পুরুষকে নারীর কাছে। মোহ বাদ দিলে প্রেমের মূল্য কতটুকু! তা কাজে লাগতে পারে, কিন্তু নিষ্কারণ আনন্দের সৃষ্টি করে না। প্রকৃতির নিয়মে নারী গড়ে' তুলতে চায় তার গৃহ, এই গৃহ-গড়ার কাজে পুরুষ হয় তার সহায়। পুরুষের বুকের মধ্যে যে দাহ্যপদার্থ আছে তা চায় আপনাকে পোড়াতে, আপনাকে রিক্ত করতে। তা সম্ভব হয় নারীর প্রদীপের শিখায়।"

কানাই বল্লে—"কিন্তু পুরুষের এই কদর্য্য দাহ্য পদার্থ নিরন্তর এই শিখার সমীপবর্ত্তী হ'লে এই শিখা হয় ধূম্রমলিন, দুর্গন্ধ ছোটে তার চারিপাশ থেকে।"

মঞ্জরী বল্লে—"দাহ্য পদার্থ যে দগ্ধ হ'লেই সকল সময় কদর্য্য গন্ধের সৃষ্টি করবে তা বলা যায় না। কিসে কদর্য্য গন্ধ হবে সেটা নির্ভর করে দাহ্য পদার্থের প্রকৃতিগত সামগ্রীর উপর। ধূপকাঠিও আমরা ধরাই প্রদীপে, প্রদীপের সামান্য একটু সংযোগে ধূপকাঠি আপনা থেকে থাকে জ্বলতে এবং বিকীরণ করে আপন সুগন্ধ। ধূপকাঠির মধ্যে যা কিছু সামগ্রী থাক্ না কেন, প্রদীপের সঙ্গে সংযোগ না হ'লে সে দিতে পারে না তার সুগন্ধ, তেমনি রমণীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত না হ'লে পুরুষ ব্যক্ত করতে পারে না তার আপন সামর্থ্য। ধূপকাঠি শিখাকে ব্যক্ত করে না, সে চায় তার সংযোগ ও সান্নিধ্য। সেই সান্নিধ্যেই সে আপন

শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রকাশ করতে পারে। আবার হয় ত সে তার নিজের ছাইয়েতে আপনি যায় নিবে। তখনও তার দরকার হয় দীপশিখার সঙ্গে সংযোগ। নারী আছে বলে' পুরুষ তার পৌরুষ, তাব বীর্য্য, তার উচ্চ আশা সফল করতে পারে। নারীর মুখে একটু হাসি আনবে, নিজের মহিমায় তার প্রেয়সীর মুখে গৌরবের একটু ছায়া আনবে, এই জন্য পুরুষ কি না দুঃসাধ্য কাজ করতে পারে! এর মূলে রয়েছে নরনারীগত কামনা। এই কামনাকে অবলম্বন করে' প্রজাপতি স্তরে স্তরে তাঁর বিশ্বের রহস্য উন্মোচন করেছেন, পুরুষকে তার শ্রেয় থেকে শ্রেষ্ঠে আবহন করে' এনেছেন। জৈবধর্ম্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই প্রেম কামনার তৃপ্তির পথ দিয়ে, সুখের পথ দিয়ে মানুষকে উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে টানছে। এই মূল উৎসটি যদি শুকিয়ে যেত তবে জৈব ধর্ম্মের বল উৎপন্ন হ'তে পারত না, আহরণ করতে পারত না জীব তার শক্তি জড়লোক থেকে, আর জৈবধর্ম্মের শক্তি সংক্রান্ত হ'তে পারত না মানুষের বুদ্ধিতে, প্রদীপ্ত করতে পারত না মানুষের বল, মানুষের বীর্য্য, মানুষের তেজস্বিতা। এই জন্যই আমাদের দেশে নারীকে শক্তি বলে' বর্ণনা করা হয়েছে।"

কানাই বল্লে—"যৌন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে একটা মহাশক্তি নিহিত হয়ে রয়েছে তা আমি কখনও অস্বীকার করি নি, করতে চাইও না। কিন্তু আমি অদ্বৈতবাদী নই। মানুষের সমস্ত শক্তি, সমস্ত বল, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যে যৌনবৃত্তিরই রূপান্তর বা যৌনবৃত্তিরই নানা ভঙ্গির প্রকাশ, এই অদ্বৈতবাদে আমার বিশ্বাস নেই। মানুষের অন্তরের বৃত্তি বহুমুখী, সামঞ্জস্যের সঙ্গে চললে এদের হয় ত বিরোধও নেই। একথাও আমি অস্বীকার করি না যে যৌনবৃত্তির শক্তি আপনাকে অন্য অন্য বৃত্তিতে সংক্রান্ত করে' সেই সেই বৃত্তিকে মহিমামণ্ডিত করতে পারে, হয় ত

বা তার সত্তামাত্রেই অন্য অন্য বৃত্তির বিকাশের সহায়তা করতে পারে। তাই বলে' আমি এ কথা স্বীকার করতে পারি না যে মানুষের চিত্ত কোনও সময় নীড়ে আশ্রয় নেয় বলে'ই মহাকালের নির্ব্বাধ গতিতে তার আনন্দ নেই। 'প্রেম' শব্দটিকে যদি তুমি কোনও একটি বিশেষ জাতীয় আনন্দের মধ্যেই আবদ্ধ করতে চাও, সে হবে তোমার একটা শাব্দিক পরিভাষা মাত্র। ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে সে তাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে' যায়। সেখানেও যদি তুমি যৌনবৃত্তির ছায়া দেখতে চাও তবে সে হবে তোমার একটা বৈশ্লেষিক অদ্বৈতবাদ। সেখানে বাস্তবতার রূপ ছেড়ে তোমাকে আশ্রয় করতে হবে বিশ্লেষণকে এবং যে দোষ তুমি দিতে যাচ্ছিলে আমার তর্কের উপর সে দোষ হবে তোমারই।"

মঞ্জরী বিরক্ত হয়ে বল্লে—"এ তোমার হেঁয়ালির প্যাঁচ কষা মাত্র। নারীর মোহ, নারীর কামনা কতদূর পৌঁছেছে, কি সম্পদ দান করেছে মানুষের বিচিত্র বিকাশের মধ্যে, তার ইয়ত্তা করা যায় না। আজ-কালকার বড় বড় পণ্ডিতেরা এর সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে' দেখিয়েছেন যে যত বড় বড় কথাই তোমরা বল না কেন, কবির কাব্য, চিত্রীর চিত্র, ভক্তের ভগবান, সবখানেই নানা মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছে নারীর প্রতি কামনা। এই কামনা ছাড়া একজনের আত্মার আর একজনের আত্মার মধ্যে ব্যাপ্ত হওয়ার অন্য কোনও পথ নেই। নারীর আত্মা আকাশ নয় বা পুরুষের আত্মাও বায়ু নয় যে ছুটে গিয়ে তাকে পূর্ণ করবে।"

কানাই বল্লে—"আমার মনে হচ্ছে তোমার হিসেবে একটু ভুল হচ্ছে। আকাশকে বাতাস ব্যাপ্ত করে, কিন্তু সকল ব্যাপ্তিরই যে একই রূপ তা নয়। আকাশটা নিরাবরণ মাত্র। এই জন্যই বাতাস গিয়ে

সেই আকাশকে পূর্ণ করে, নইলে কোনও জড়বস্তু কোনও জড়বস্তুকে ব্যাপ্ত করতে পারে না। প্রত্যেক জড় পরমাণু ব্যাপ্ত করে' আছে তার আপন আকাশকে। সেখানে সে অদ্বিতীয়, সেখানে তাকে ব্যাপ্ত করবার কেউ নেই। কিন্তু রূপ রয়েছে সমস্ত জড় পরমাণুকে ব্যাপ্ত করে' যে আকাশে, জড়ের পরমাণু সেই আকাশেরই রূপধর্ম্ম। তার কারণ এই যে জড় পরমাণু এবং রূপ অভিন্ন। রূপ জড় পরমাণুর একটি লীলা। তেমনি চেতনারাজ্যে দেখা যায় যে তার সমগ্রকে পূর্ণ করে' আছে হয় ত আর একটি চিত্ত, কি একটি আদর্শ। সেই চিত্তের মধ্য দিয়ে কিংবা সেই আদর্শের মধ্য দিয়ে ছাড়া সেই চেতনা আপনাকে প্রকাশ করতে পারে না, আপনার স্বরূপ অনুভব করতে পারে না। সেই প্রকাশই তার আনন্দ, সে'টিই হ'ল চেতনার জীবন। চেতনালোকে সেইটিই হ'ল প্রধান বৃত্তি, এমন কি একমাত্র বৃত্তি বল্‌লেও বাড়িয়ে বলা হয় না। মানুষের জীবন-প্রবাহ চলেছে তাব অসংখ্য জৈবশক্তির নানা বিচিত্র সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে। হৃদয়, ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ, প্লীহা সেখানে তাদের আপন আনন্দে কাজ করে' যাচ্ছে। রক্তের চলেছে প্রবাহ হৃদয় থেকে ধমনীতে, শিরায় ও উপশিরায় এবং সেখান থেকে পুনরায় হৃদয়ে। পরস্পরের কাজকে সমাপ্ত করবার জন্য, পূর্ণ করবার জন্য চলেছে প্রত্যেকের প্রক্রিয়া। তারই প্রবাহের মধ্যে কোন মর্ম্মকোষ (gland) থেকে ক্ষরিত হ'ল একবিন্দু অজ্ঞাত সামগ্রী এবং তারই ফলে সমস্ত জৈবপ্রবাহে একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হ'ল চেতনাশক্তির মধ্যে। এই জৈব প্রবাহ না থাকলে সে বিন্দুটি ক্ষরিত হ'লেও তার কোনও ফল হ'ত না। তেমনি এ কথা বলা চলে যে আমাদের চেতনার এই স্বাভাবিক ব্যাপ্তিকামনা না থাকলে কামবৃত্তির সংস্পর্শ তাকে তার বিশিষ্ট রূপ ও স্বাদ দিতে

পারত না। কামবৃত্তি ত সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ, তবে মানুষের মধ্যে এসে তার এমন বিচিত্র এবং সুন্দর বিকাশ কেন হয়? তার কারণ এই যে মানুষের চেতনাজীবনের স্বাভাবিক প্রবাহের মধ্যে, তার স্বাভাবিক ব্যাপ্তিকামনার মধ্যে কামসংস্কার এসে মিলিত হয় বলে'ই তার নূতন স্বাদে, নূতন পরিচয়ে চেতনার অভিব্যক্তির বিচিত্রতা দেখা যায়। তাই বলে' সেগুলিকে কামবৃত্তির ফল বলা যায় না। কিন্তু এ তর্ক আর নয়। কিন্তু তুমি আজ এ তর্ক তুল্‌ছ কেন?"

মঞ্জরী বল্লে—"তর্ক আমি তুলি নি, তর্ক তুলেছ তুমি। আমি বলতে চাইছি একটি অত্যন্ত সহজ কথা। তুমি যদি আমাকে পেতে চাও তবে তোমাকে আমারই হ'তে হবে। আমাকেই কেন্দ্র করে' ফুটিয়ে তুলতে হবে তোমার যা কিছু সামর্থ্য আছে তাকে, নিরাকার ধোঁয়ার প্রেরণায় আকাশে ওড়বার চেষ্টা করলে তোমার চলবে না।"

কানাই বল্লে—"তার মানে?"

মঞ্জরী বল্লে—"তার মানে অতি সুস্পষ্ট ও সরল। আর দশজনের মত তোমার জীবন ব্যয় করতে হবে ধনের সাধনায়। ধন ছাড়া সংসারে কিছুই হয় না। আমাকে যদি তুমি ভালবাস তবে আমাকে সুখী করবার জন্য তোমাকে ধনাহরণ করতে হবে, সেই ধনাহরণই হবে তোমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। লক্ষ্মীছাড়ার মত নিজের খেয়ালে ঘুরলে ত তোমার চলবে না। তোমাকে নিয়েই যদি আমার নীড় বাঁধতে হয় তবে তার সমস্ত যোগান যোগাতে হবে তোমাকে, তার জন্য কেন্দ্রীকৃত করতে হবে তোমার চিত্তের সমস্ত বল, সমস্ত আদর্শের শক্তি। তবেই তা নেবে মূর্ত্তি, তবেই তা নেবে রূপ। নারীকে কেন্দ্র করে'ই গড়ে উঠবে তোমার মহিমা।"

কানাই অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্লিষ্টভাবে বল্লে—"জীবনে আমি কোনও

মেয়ের সংস্পর্শে আসি নি। তোমাকেই প্রথম দেখেছি, তোমাকেই প্রথম ভালবেসেছি। আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসাই কি আমাদের চরম সার্থকতা নয়?"

মঞ্জরী ঝঙ্কার দিয়ে উঠে বল্লে—"না, না, কখনই নয়। ভালবাসি আমরা সুখের জন্য, সুখ না হ'লে ভালবাসার মূল্য কি? পুরুষকে ভালবেসে নারী চায় তার গৃহ, তার গৌরব, তার স্বাচ্ছন্দ্য, তার বিলাস, তার আনন্দ। ভালবাসার মধ্যে ভালবাসার পূর্ণতা নেই; অন্য বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে এলে তবেই ভালবাসাকে বাস্তব করে' পাওয়া যায়। শুধু কথায় 'ভালবাসি ভালবাসি'র মধ্যে বা চিত্তের ব্যাকুলতার মধ্যে ভালবাসার কোনও প্রতিষ্ঠা নেই। তুমি যদি বল, নিরন্তর আমাকে ভালবেসে তুমি সর্ব্বদা আমাকে ধ্যান কর, চিন্তা কর, তোমার মনকে নিরন্তর আমি ব্যাপ্ত করে' রয়েছি, তবে সে ব্যাপ্তিতে আমার সুখ কি? যে ব্যাপ্তি সংসারের কাজের মধ্যে আপনাকে প্রতিফলিত করে' তুলতে পারবে না সে ভাবুকতার ব্যাপ্তির কোনও মূল্য নেই। এ কথা ত তুমি নিজেও স্বীকার করেছ।"

কানাই একান্ত আর্ত্তভাবে বল্লে—"তা হ'লে আমি নিরুপায়। তোমাকে আমি ভালবাসি। সেই ভালবাসার আনন্দ মুক্ত করে' দেবে আমার চেতনালোককে, তা প্রবৃত্ত করবে আমাকে সহস্রবিধ কাজের মধ্যে, কিন্তু সে কাজ যে হবে তোমার সুখের সাধনা এবং তাকে সঙ্কীর্ণ করে' আনতে হবে ধনাহরণের চেষ্টার মধ্যে, এ আমার পক্ষে আমি দেখছি অসম্ভব।"

মঞ্জরী বল্লে—"কেন অসম্ভব? দশজনের পক্ষে যা সম্ভব তোমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না কেন? তুমি এমন কি ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি এলে যে সংসারের নিয়মকে অতিক্রম করতে চাও?"

কানাই হতাশ স্বরে বল্লে—"কিন্তু এই যে আমার প্রকৃতি। তোমাকে কেন্দ্র করে', তোমার আকর্ষণে আমার গতি হবে উন্মুক্ত, অনন্ত এবং অসীম, সে ঋতুতে ঋতুতে বিকশিত করবে আমাকে নব নব কুসুমের বিকাশে, আমার চিত্তের নবতর ও কল্যাণতরের ব্যাপ্তিতে। শুধু ধনের দ্বারা যে সুখ হয় সেই সুখকেই একান্ত কাম্য বলে' আমি মনে করতে পারি না। নীড়ের প্রতি যে ভালবাসা আছে সেই ভালবাসারই প্রভাবে পাখী ওড়ে মহাকাশের দিকে, চেয়ে দেখে একবার তাব বৃক্ষস্থ নীড়ের দিকে, আবাব সে ওড়ে উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধতর আকাশে; বাতাস হয়ে আসে হাল্কা, তবু সে ডানার বলে নূতন ছন্দে ওড়ে আকাশে। এই স্বাভাবিক গতির দিকে ছুটেছে আমার সমস্ত চেতনা, তাকে ত আমি ধনের দ্বারে শৃঙ্খলিত করে' রাখতে পারি না।"

মঞ্জরী একটু অসহিষ্ণু হয়ে বল্লে—"এ সমস্ত কাব্যময় কথার পুঞ্জে আমার কোনও তৃপ্তি নেই। আমি চাই বাস্তবকে, আমি চাই জীবনকে রসে আনন্দে ভোগ করতে। সেই ভোগের সঙ্গীরূপে, সেই ভোগের পাথেয় যোগাবার কর্ত্তারূপে পারি আমি তোমাকে ভালবাসতে। নইলে, শুধু হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাসের ভালবাসার উপর আমার কোনও লোভ নেই। তুমি যদি স্পষ্টরূপে বুঝে থাক যে এ তোমার পক্ষে অসম্ভব, তবে বারংবার আমাদের মিলিত হওয়ার কোনও অর্থ হয় না। কথাটা তুমি ভেবে দেখ। আজ ত রাত হয়ে গেল, এখন তবে উঠতে হয়।"

এই কথা বলে' মঞ্জরী উঠে দাঁড়াল। "আচ্ছা, দেখ্‌ব" বলে' কানাইও উঠে দাঁড়াল। তারপর চল্‌ল কানাই মঞ্জরীকে ট্রাম পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে। রাস্তায় তখন লোক চলাচল কমে' এসেছিল। চারিদিক হয়ে এসেছিল নিস্তব্ধ। দু'টি দীর্ঘকালের বন্ধু পাশাপাশি

চলেছে। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। আকাশে মেঘের উপর মেঘ পুঞ্জীকৃত হয়ে আসছে। চন্দ্রতারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আকাশের নৈঃশব্দ্য বিদীর্ণ করে' কদাচিৎ দু' একটি নৈশ পক্ষীর তার চীৎকার শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ একটি বিদ্যুতের দীপ্তিতে মঞ্জরী দেখতে পেল যে কানাইয়ের মুখখানা একেবারে পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে। মঞ্জরী একটু পীড়িতভাবে বল্লে—"বন্ধু, রাগ কর' না, যা বাস্তব তাকেই সম্মুখে রেখে জীবনে চলতে হবে, অবাস্তব কল্পনাকে নয়।"

কানাই একটিও কথা বলল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কিছুদিন কেটে গেছে। আষাঢ়ের কোনও একটা দিন, সেটা প্রথম দিবসও নয়, প্রশম-দিবসও নয়। গ্রীষ্মবিশুষ্ক বনস্পতিরা তৃষ্ণা মিটিয়ে আকণ্ঠ পান করেছে গগনের ভৃঙ্গারবারি। হরিত চারুচিক্কণ পত্রাবলি থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে বনস্পতিলোকের সবুজ স্মিতহাস্য। প্রত্যেকটি পাতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় যেন তাদের প্রসন্নতা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে তাদের কান্ত পেলবতার মধ্যে। দিগ্বিদিকে সঞ্চরণশীল মেঘেরা গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত করে' বিস্তার করেছে বর্ষণ-ঋতুর রাজচ্ছত্র। সপ্তপর্ণীর উগ্র গন্ধের সহিত মিলিত হয়েছে কেতকীর তীব্র সৌরভ। চম্পকের উচ্চ শিখরে দুলছে তার কনককুণ্ডল, সস্মিত-সৌকুমার্য্যে বিকশিত হয়েছে নবমল্লিকা। পৌরবাসিদের অঙ্গনে অঙ্গনে গাঢ় শ্যাম নব দূর্ব্বারাজি পড়েছে চারিদিকে আকীর্ণ হয়ে। কোথাও বা তারই সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হচ্ছে শুভ্রবাহিনী অপরাজিতা-লতার নীল নেত্রদলের। কোথাও বা উদ্ধত নবীন

যৌবনোচ্ছিত আকণ্ঠবেষ্টিত মাধবীলতাকে লক্ষ্য করে' তরুণ নীপতরু নবকদম্বডম্বরে শিহরিত হয়ে উঠ্ছে। আকাশে মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্ছে ঘন মৃদঙ্গনির্ঘোষ। কোটি কবিকুলকণ্ঠোদ্গত বিরহগীতিকা গগনভুবনকে ব্যাপ্ত করে' একটা নবীন উন্মাদনায়, নবীন আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ করে' দিয়েছে সমস্ত ধরণীবক্ষ। পল্বলভূমি হয়েছে আপ্লাবিত, দর্দুরকুলের কলগান তুলেছে তারই প্রতিধ্বনি। সৌধসঙ্কুল মহানগরীর উপকণ্ঠও যেন আজ উপবনের শোভায় মণ্ডিত হয়েছে।

এমনি একটি শুভ বর্ষাঋতুর কমনীয় লগ্নে প্রভা দেবীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয়েছে তার জন্মোৎসবের দিনে সুজাতার। প্রভা ছিল সুজাতার চেয়ে বয়সে ছোট। অনেক পূর্ব্বের পরিচয়। কলেজে আবার দেখাশোনায় সেই পরিচয় গাঢ় হয়ে উঠেছিল। প্রভার পিতা মাখনলাল গুপ্ত ছিলেন একজন আইনব্যবসায়ী। প্রভাদের বাড়ী ছিল কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে। চারিদিক খোলা। সম্মুখে খানিকটা মুক্ত জমি। সুন্দর করে' সাজানো বিবিধ উদ্যানপুষ্প। উদ্যানের পরই উঠেছে দক্ষিণমুখো বাড়ীর সিঁড়ি। দোতলা বাড়ী। মধ্যে একটি 'হল্'-ঘর ; দু'পাশে দু'টি শয়নকক্ষ। চারিদিকে ঘিরে এসেছে বারান্দা। উপরের তলাটিও এই প্ল্যানে নির্ম্মিত। এই বাড়ীতে প্রভার মা, প্রভা ও তার ছোট ভাই রঞ্জন থাকে। প্রভার পিতা কিছু অর্থ এবং বাড়ীটি রেখে গিয়েছিলেন। প্রভা আধুনিকা মেয়ে এবং তার রুচির বৈশিষ্ট্য আছে। সেইজন্য চারিদিকেই সজ্জা ও সৌষ্ঠবের পারিপাট্য। প্রভার ভাই রঞ্জন আই-এ ক্লাশে পড়ে। উন্মত্ত খেলোয়াড়। মাংশপেশীকে সবল করবার জন্য তার অসীম অভিনিবেশ এবং কৃতিত্বও কম নয়। প্রায় প্রত্যহই আখড়ায় যায় ও মুষ্টি ও কুস্তি প্রভৃতির অভ্যাস করে এবং নবোদ্গত বলের দম্ভে

চারিদিকে তুর্দ্দান্ত হয়ে ফেরে, সরল, স্বচ্ছ, হাস্যোজ্জ্বল। প্রভার মা বিধবা মানুষ, প্রায়ই পূজা-অর্চ্চায় থাকেন। মনের পটভূমি সেকাল ও একালের মাঝখানে। প্রভা দেবী দেখতে সুন্দরী, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, চক্ষু আয়ত, নাসিকা পরিস্ফুট ও দীর্ঘ, যৌবনের সশ্রীকতায় পুষ্পস্তবকাবনম্রা লতার ন্যায় পেলব ও সুকুমার, বুদ্ধির দীপ্তিতে চোখ তু'টি উজ্জ্বল অথচ শান্ত।

আজ জন্মবাসরের উৎসবে বৈকালিকের জন্য প্রভা নিমন্ত্রণ করেছে সুজাতাকে। প্রভার মাতা অম্বুজাসুন্দরী নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁর স্বামীর বন্ধুর ছেলে অজয়কে। অজয় অনেকদিন বিলেতে ছিল, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না পেয়ে এবং আই-সি-এস্‌-এ তু'একবার অকৃতকার্য্য হয়ে ব্যারিষ্টারির সনদ হাতে করে' দেশে ফিরে এসেছে। পিতার ক্ষয়িষ্ণু বিত্তের দিকে চেয়ে ও নিজের বিত্তোপার্জ্জন-সামর্থ্যের একান্ত হতাশ্বাসে ছেলেটি বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে। কোনও একটি শুভ সংযোগের দ্বারা অপচীয়মান বিত্তকে হঠাৎ উপচিত করে' তোলবার জন্য ইনি নিরন্তরই নানা স্থানে রন্ধ্র খুঁজছেন। বেশভূষায় ইনি পূরা সাহেব। বেশভূষার নৈপুণ্য ও পারিপাট্যের দিকে এঁর দৃষ্টি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ। ট্রাউজারের ভাঁজটি সর্ব্বদা এমন সযত্নে রক্ষিত যে সব সময়ই মনে হয় যেন সদ্য রজকসংস্কৃত। চুলগুলি back-brush করা। টাই, কলার, সমস্ত নিখুঁতভাবে ফিট্‌ফাট্‌। ধূম ও তরল-দ্রব্যের প্রতি এঁর তুল্য আসক্তি। আদবকায়দা সমস্তই বিলিতি ধরণের। পিতা, পিতামহ, সকলেই ডেপুটিগিরি করে' এসেছেন, সেইজন্য এঁর ধমনীর রক্তে ইংরেজ সরকারের প্রতি একটা অকৃত্রিম প্রীতি ও বশ্যতা সর্ব্বদা প্রবাহিত হচ্ছে। অথচ, ইনি নিজেকে একজন 'পেট্রিয়ট্‌' বলে' মনে করেন। নিজের বুদ্ধির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা এবং প্রত্যেক কথাতেই প্রায় বিলিতি

নজীর খোঁজেন। অকর্ম্মের কর্ম্ম-বাহুল্য কম নয়। যথারীতি হাইকোর্টে গিয়ে বারলাইব্রেরীতে অখণ্ড কালকে গল্পচুর্ণের দ্বারা পূর্ণ করে' থাকেন, পরিশেষে ক্লান্ত হয়ে বাড়ীতে ফিরে রাত্রির প্রথম যাম ক্লাবগৃহের হাস্যকোলাহলে উৎফুল্ল করেন। এঁর বিশ্বাস যে তিনি সকল বিষয়েরই সমঝ্‌দার। এইজন্য কোন বিষয়েই মতামত প্রবলভাবে ব্যক্ত করতে ইনি অকুণ্ঠিত। ইউরোপের অভিজ্ঞতা বশতঃ এঁর মনে এ বিশ্বাসও দৃঢ়মূল যে এঁর তুল্য সুভগ ব্যক্তি অতি দুর্লভ—no woman can possibly refuse him। অম্বুজাসুন্দরীর মনে মনে এই ছেলেটির প্রতি একটু লোভ ছিল এবং সেইজন্য পূর্ব্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে' এই পরিবারে এঁর গতায়াত কিছুদিন ধরে' প্রশ্রয় পেয়ে আসছিল। রঞ্জন জোর করে' তার আখড়ার একজন মস্ত সর্দ্দার হিসেবে কানাইকে নিমন্ত্রণ করেছে।

টেবিলে বৈকালের আসর জমে' উঠেছিল। পাত্রে পাত্রে তরলিত-হেম-সন্নিভ উগ্র উষ্ণ চা-পানীয় দীপ্তি বিকীরণ করছিল এবং বহুবিধ দেশী ও বিলিতি খাদ্য পাত্ররাজির মহিমা পূর্ণ করে' তুলেছিল। কানাই তখনও আসে নি। বৈকালিক প্রক্রিয়া মৃদুমন্দভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। টেবিলে চারজন বসে'—সুজাতা, প্রভা, রঞ্জন ও অজয়। অজয় বিলেতের কথা পেড়েছিল।

অজয় বল্‌ছিল—"ইংরেজের সঙ্গে বাঙ্গালীর তুলনা করা যে একেবারেই হাস্যকর তা বিলিতি জাহাজে পা দিলেই বোঝা যায়। অত বড় জাহাজ, অত লোক, অথচ সমস্ত স্থান নিখুঁত পারিপাট্যে সজ্জিত। কখন যে পরিষ্কার করে, কখন যে সাজায় তা কিছুই টের পাওয়া যায় না। এতগুলো লোকের আহার ঠিক ঘড়ির কাঁটায় অত্যন্ত সুসজ্জিতভাবে সম্পন্ন হয়, অথচ একেবারে নিঃশব্দে। অথচ বিবাহাদিতে

বাঙ্গালীর একটা নিমন্ত্রণে দেখা যায় যে হৈ চৈ গণ্ডগোলের শেষ নেই। কি আমাদের রাঁধবার ব্যবস্থা, কি আমাদের বিতরণের ব্যবস্থা, কি আমাদের পাচক ও পরিবেশনকারীদের ব্যবস্থা, সমস্তই যেন আনন্দ-ভোজের একটি নিরানন্দ বিকট পরিহাস। তার গোলমাল হৈ চৈয়ের ত ইয়ত্তা নেই।”

প্রভা উত্তর করল—“এই তুলনা আপনার সঙ্গত হচ্ছে না।”

অজয় একটু উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করল—“কেন?”

প্রভা বল্লে—“আমাদের দেশের বাঙ্গালী পরিবারে দু’চার দশ বৎসর পরে হয় ত একটা বিবাহের ভোজ উপস্থিত হয়। নিমন্ত্রিত হয় হাজার দু’হাজার লোক। পরিবারে যে ক’টি লোক থাকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমেও তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না, নির্ভর করতে হয় পাড়ার লোকদের সহানুভূতির উপর ও তাদের পরিশ্রমের উপর। তদুপযোগী বাসনপত্র মেলা দুর্ঘট, কাজেই শরণ নিতে হয় কদলীপত্রের, ব্যবস্থা করতে হয় কুশাসনের, বসাবার জন্য। স্থানাভাবে বসাতে হয় মাঠের মধ্যে বা গৃহের প্রাঙ্গণে, অনাবৃত পৃথিবীর কোলের উপর। রান্নার পদ হয় ছত্রিশটি। মধ্যাহ্নের আহার গিয়ে দাঁড়ায় অপরাহ্নে। কাজেই, এ অবস্থায় যে নানারকম বিপর্য্যয় ঘটবে সেটা আর এমন কি অসম্ভব কথা? আজকালকার সহরের নিমন্ত্রণে পয়সা খরচা করে’ আনা যায় decorator। তারা মেরাপ বাঁধে, সামিয়ানা খাটায়, চেয়ার-টেবিল বসায়, কদলীপত্রের স্থান গ্রহণ করে মৃন্ময় পাত্র। বেতনভোগী পাচক এবং চাকরেরা করে সমস্ত কাজ। নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও অনেক সময় হয় নিয়ন্ত্রিত। ফলে সহরের নিমন্ত্রণে এবং গ্রামের নিমন্ত্রণে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। আজকালকার সহরের নিমন্ত্রণে প্রায়ই দেখা যায় যে রাত্রি আটটার মধ্যে হাজার লোকের খাওয়াদাওয়া

সম্পন্ন হয়ে যায়। কোলাহলও যে এমন কিছু বেশী হয় তা বলা যায় না। মৃন্ময়পাত্রে আহারের ব্যবস্থা বলে' দধি ও ঝোল একত্র মিশে যাবার অবকাশ পায় না। কাজেই দেখুন, সামান্য একটু বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তনে এই বাঙ্গালীরই ভোজের ব্যবস্থা কত বিভিন্ন হ'তে পারে। থাকৃত যদি আমাদের বড বড় হল্, থাকৃত যদি সেখানে নানাবিধ স্থন্দর আসনের ব্যবস্থা, থাকৃত যদি সেখানে নানারকম স্থশোভন ভোজনপাত্র, থাকৃত যদি মোটা মোটা মাইনের পাচক ও ভৃত্য, তা হ'লে এদেশের ভোজন ব্যবস্থাও অনেক পারিপাট্যের সহিত নিষ্পন্ন করা সম্ভব হ'ত।"

অজয় বল্লে—"হয় না কেন এসব এখানে? রুচি বলে' পদার্থটাই ত আমাদের নেই। এই রুচিই ত একটা বড culture‌এর লক্ষণ। আমরা আমাদের 'culture culture' বলে' এত গর্ব্ব করি, আব এই ত আমাদের culture, যে একখণ্ড কলাপাতার উপরে ডাল, ঝোল, দই সমস্ত মিশিয়ে গোগ্রাসে হাপুস্‌হুপুস্ করে' আমরা খাই। এ সমস্ত কিছুরই পরিবর্ত্তন নেই, আর আমরা শুধু বড় গলায় চীৎকার করতে থাকৃব যে আমরা ইংরেজের সমান, আমরা স্বাধীন হব। এ সমস্ত একেবারে বাতুলের প্রলাপ।"

প্রভা বল্লে—"এই রুচি জিনিষটা অনেক পরিমাণে অর্থস্বাচ্ছল্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশের লোক ছু' মুষ্টি আহার ছু'বেলা পায় না সে দেশের লোক ঐশ্বর্য্যসাধ্য যে রুচি তার পরিচয় কেমন করে' দেবে?"

অজয় বল্লে—"রুচি থাকলে অল্পের মধ্যেও তার ব্যবস্থা করা যায়। অর্থ যদি না থাকে তবে অত লোককে নেমন্তন্ন করবার দরকার কি? যে ক'জনকে ভাল করে' শোভনভাবে খাওয়াতে পারা যায় সে ক'জনকে নেমন্তন্ন করলেই হয়।"

সুজাতার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে এইখানেই অজয়ের দুই একবার পরিচয় ঘটেছে। সে মৃদুস্বরে বল্লে—"আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে সাহস পাই না। নানা দেশ দেখে আপনার মন উদার হয়েছে, আমরা কুণো লোক, আমাদের দৃষ্টি বেশী দূর অগ্রসর হয় না। কিন্তু রুচি বলতে আপনি কি বোঝেন?"

অজয় বল্লে—"রুচি কি বুঝলেন না? রুচি হচ্ছে এই যাকে বলে taste!"

সুজাতা বল্লে—"ও ত হ'ল একটা ইংরেজী প্রতিশব্দ মাত্র। আমি ত তাই জিজ্ঞাসা করছি যে taste কাকে বলে? তার কি একটা নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি আছে?"

"এই ত আপনি মহা ফ্যাসাদে ফেললেন। Taste হচ্ছে এই taste আর কি, এই যাকে আপনারা বলেন রুচি। এই taste যার থাকে সেই বুঝতে পারে taste কাকে বলে।"

এমন সময় দূর থেকে কানাইকে দেখতে পেয়ে রঞ্জন তড়াক্ করে' লাফ দিয়ে উঠে ছুটে বাইরের দিকে গেল—"এই যে, কানাইবাবু এসেছেন, কানাইবাবু এসেছেন!" কানাইবাবু না আসাতে রঞ্জনের এতক্ষণ কিছুই ভাল লাগছিল না। দিদি, সুজাতা ও অজয়, এদের কাউকেই সে আপন আত্মীয় বলে' মনে করতে পারছিল না। সে প্রতিক্ষণই প্রতীক্ষা করছিল কখন কানাইবাবু আসবে। সকলেরই দৃষ্টি পড়ল বাইরের দিকে, দেখা গেল একটি দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ লোক নিরুদ্বেগে চলে আসছে একেবারে সিধে খাড়া হয়ে। দেহের কোন জায়গায় একটু অবনতি নেই। পরণে খদ্দরের ধুতি, সেটা উঠেছে প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত। একটা খদ্দরের পাঞ্জাবী। আজ হাতে লাঠি নেই আছে একটা ছাতা। অসঙ্কোচে প্রবেশ করে' ছাতাটা সে রাখ্‌ল

মেঝের উপরে এবং কর্দ্দমসিক্ত জুতাজোড়া সেখানেই রেখে শুধুপায়ে প্রবেশ করলে মার্ব্বেলমোড়া হল্‌ঘরের মধ্যে এবং প্রবেশ করে'ই দু'টি হাত একত্র করে' একটি নমস্কার করলে সকলকে লক্ষ্য করে'। তার বেশভূষার অপরিচ্ছন্নতার সহিত সেই ঘরের আসবাবপত্রের এবং যারা বসে আছেন তাঁদের যে একটা ঘোরতর অসামঞ্জস্য আছে তা যেন তার একেবারেই চোখে পড়ল না। খেলার মাঠে বা আখড়ার প্রাঙ্গণে সে যেভাবে ঢুকৃত এখানেও যেন সে ঠিক সেইভাবেই প্রবেশ করল। একান্ত নিরুদ্বেগ মুখ হাস্যোজ্জ্বল করে' সে বল্লে—"আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, তবু রঞ্জনের উৎপাতে আমাকে আসতে হ'ল।"

মেয়ে দু'টি প্রতিনমস্কার করে' তাব অভিবাদন গ্রহণ করলে, কিন্তু অজয় ভ্রূভঙ্গীতে একবার তাকিয়ে দেখলে মাত্র, ভাবখানা এই যে তোমার মত লোকেব এখানে আসবারই বা কি দবকাব ছিল? রঞ্জন একেবারে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে' তার দিদিব দিকে তাকিয়ে বল্লে—"দিদি, এই আমাদের আখড়ার কানাইবাবু। একবার হাত দিয়ে যদি দেখ্‌তে এঁর গুলটা, ঠিক যেন লোহার পিণ্ড! সেবার একটা boxing competitionএ দু'টি ঘুষিতে দু'টি গোরা সাহেবকে দিয়েছিলেন কাৎ করে'।"

প্রভা হেসে বল্লে—"তুই কি ওঁকে আমাদের ঘুষি মারাতে এনেছিস্ নাকি?"

কানাই হো হো করে' হেসে উঠ্‌ল। এ হাসি সেই হাসি, যে হাসিতে প্রকাশ করে গঙ্গোত্রীর গঙ্গার শুচিতা, শিশুর মত স্বচ্ছ, সরল, অনাবিল। রঞ্জন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে—"কি যে তোমরা বল।"

ততক্ষণে প্রভা উঠে এগিয়ে দিলে রঞ্জনের পাশে একটা আসন।

বল্লে—"আমার পরিচয় আপনি পেয়েছেন। ইনি সুজাতা, আমার বন্ধু। ইনি অজয়বাবু, ব্যারিষ্টার এবং এই পরিবারের বন্ধুস্থানীয়। আপনি পথে একটু ভিজেছেন নাকি ?"

"না, বৃষ্টি একটু হয়েছিল বটে, তবে বুদ্ধি করে' ছাতাটা নিয়ে এসেছিলুম। ভিজতে হয়নি তেমন।"

"না, না, সত্যি যদি ভিজে থাকেন ত বলুন, কাপড ছাডবার ব্যবস্থা করে' দিই।"

কানাই আবার হো হো করে' হেসে উঠল, যেন ভারি একটা হাসির কথা হয়েছে। বল্লে—"না, না, ভিজব কেন ? আর এ শরীর তেমন নয় যে দু'চার পশলা বৃষ্টিতে বা গ্রীষ্মের দু'চারটে মধ্যাহ্নের রোদে একে পীড়িত করতে পাবে। আপনাদের মন ত ভারী কোমল।" বলে'ই আবাব হো হো করে' এক ঝলক হাসি।

সুজাতা কানাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে ভাবলে—এরকম অদ্ভুত ধরণের মানুষ ত কখনও দেখি নি! সে তার বলিষ্ঠ সুকু-দা'কে দেখেছে, কিন্তু এ যেন বল নয়, বলের প্রতিভা। পার্শ্বস্থ সমস্ত জিনিষকে অতিক্রম করে' এ যেন প্রতি নিমেষে আপন সত্তাকে অনুভব করছে।

অজয় জিজ্ঞাসা করল—"আপনি কি করেন ?"

আবার সেইরকম হাস্য করে' উঠে কানাই বল্লে—"এই রে, এই জিজ্ঞাসা করছেন, কি করেন, এর পরই হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন, বেতন কত। দুটো প্রশ্নেরই একসঙ্গে উত্তর দিয়ে দিই—কিছুই করি না, তাই বেতনও কিছুই পাই না।" বলে'ই আবার হেসে উঠল, যেন কতই নিজের কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করল। অজয়ের মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল এই নবাগতের রুচিবোধের অভাবে, এর কদর্য্য বেশভূষায় এবং বিনা কারণে এর হো হো হাসিতে। সে কোনও কথা না বলে' চায়ের

পেয়ালায় মনঃসংযোগ করল। ইতিমধ্যে প্রভা তাড়াতাড়ি কানাইয়ের কাছে এগিয়ে দিলে একটি প্লেট, কাঁটা দিয়ে উঠিয়ে দিলে দু'খানা স্যাণ্ডউইচ্ এবং পেয়ালাতে খানিকটা গরম চা ঢেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি ক' চামচ চিনি খান ?"

"তা দিন চামচ দুয়েক।" রঞ্জন কানাইয়ের পাশে বস্‌ল এবং আবার চায়ের আসর জমে' উঠল। এই নবাগত ব্যক্তিটির প্রতি একটু কৌতুকের সহিত দৃষ্টিপাত করে' প্রভা বল্লে—"আমাদের একটা কথা চলছিল।"

কৌতুকে কানাইয়ের চোখ দু'টি চক্‌চক্ করে' উঠল। প্রভা আবার বল্লে—"আমাদের কথা উঠেছিল এই যে taste বা রুচি কাকে বলে।"

কানাই হেসে বল্লে—"ওরে বাস্ রে, দেবেন ত দু'এক পেয়ালা চা আর অল্প কিছু মিষ্টান্ন, তার জন্য এত বড় বড় কথার বক্তৃতা শুনতে হবে বা আলোচনা করতে হবে, এ যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড।"

সকলেই হেসে উঠল। কিন্তু প্রভা ছাড়লে না। সে বল্লে—"আপনার অসামান্য বলের কথা রঞ্জন বলেছে। আপনি দু'টি মুষ্টি-আঘাতে দু'জন সাহেবকে ধরাশায়ী করেছিলেন। সেইজন্য এই কঠিন প্রশ্নটার উত্তর আপনাকেই দিতে হয়।"

কানাই বল্লে—"দিন আপনার প্রশ্নটা লিখে এই চীনামাটির পাত্রটার উপরে, দেখুন কেমন একটি আঘাতে আমি আপনার সমস্ত প্রশ্ন চূর্ণ করে' গুঁড়িয়ে দিতে পারি।"

আবার সকলে হেসে উঠল। কেবল চুপ করে' রইল অজয়। সে একটু বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগল যে এই অসভ্য পরিচ্ছদে অপরিচ্ছন্ন গেঁয়ো ছেলেটি কেমন অনায়াসে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছে,

কেমন করে' এসেই আসর দখল করে' বসেছে তার মত বিলেত-ফেরত লোক সামনে থাকতেও।

সুজাতা বল্লে—"আমাদের তর্ক উঠেছিল যে একটা বিলিতি জাহাজে কেমন সুরুচির সহিত কত লোকের আহারযাত্রা সম্পন্ন হয়ে থাকে, অথচ আমাদের দেশীয় ভোজে তা হয় না। তাই নিয়ে কথা উঠেছিল রুচির বৈষম্যের।"

কানাই বল্লে—"আপনাদের এতখানি তর্ক এগিয়েছে এবং আপনারা এমনই তর্কপিপাসু যে ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করে'ও আপনারা হয়ে উঠেছেন তর্কজিঘাংসু। আমি একেবারে নবাগত, ব্যূহপ্রবেশের মন্ত্র ত আমার জানা নেই।"

আবার সকলে হেসে উঠ্ল। বেচারা রঞ্জন তর্কটার মধ্যে কিছুমাত্র তলিয়ে দেখে নি, কিন্তু তার কানাই-দা' যে জবাব দিতে চেষ্টা না করে' এড়িয়ে যাচ্ছে তাই দেখে' তার ভারী দুঃখ হ'ল, সে মুখ কাঁচুমাচু করে' কানাইকে বল্লে—"বলে' দাও না কানাই-দা তোমার মতটা।"

কানাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে এক নিমেষে তার মনের কথাটা ধরে' ফেল্লে। ইতিমধ্যে অজয় বলে' উঠ্ল—"আমি ত আপনাদের বলে'ই দিয়েছি যে taste জিনিষটা define করা যায় না, যার ওটা থাকে সে ওটার সম্বন্ধে একটা judgment করতে পারে।"

প্রভা তখনই বলে' উঠ্ল—"তা, আপনার ত খুব taste আছে, আপনিই বলুন না যে এই দরিদ্রের দেশে আমরা যেভাবে ব্যবস্থা করি সেটা কুরুচি কিসে হ'ল।"

অজয় বল্লে—"আমি ত বলেছিই যে যেখানে ধনের অভাব, পাত্রের অভাব, সেখানে অত লোককে না খাওয়ালেই হয়।"

সুজাতা বল্লে—"এ আপনার সেইরকম জবাব যেমন জবাব দেয়

dentistরা। আপনার দাঁতের অসুখ করেছে, আসুন দিই দাঁতটা উঠিয়ে ; বহুলোকের ব্যবস্থা ভালরকম করা যাবে না, অতএব লোক খাইয়ে প্রয়োজন নেই।"

এইবার কানাই মুখ খুল্‌লে—"অনেক লোককে সুচারুরূপে জাঁকজমকের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থায় খাওয়াতে হ'লে চাই লোকবল, ঐশ্বর্য্যবল, কল্পনা ও বন্দোবস্ত। যাদের এ চারটেরই অভাব তাদের পক্ষে জাঁকজমকের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাওয়ানো সম্ভব নয়। আব কোনও উৎসবে বহু লোককে খাওয়াব কি কম লোককে খাওয়াব, এইটেই হচ্ছে রুচির কথা।"

অজয় ভ্রূভঙ্গী করে' বল্লে—"কি রকম ?"

কানাই বল্লে—"আমার মনে হয় যে প্রকাশের মহিমাতেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ। কি প্রকাশ হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে দু'টি সুন্দর বস্তুর পার্থক্য, এবং রুচি হচ্ছে সেই বৃত্তি যার দ্বারা কোন্‌টি কি রকম প্রকাশ পেল সেটা আমরা অনুভব করতে পারি এবং সে অনুভব অনুসারে প্রকাশের ত্রুটিবিচ্যুতি, স্খলনপতন সংশোধন করতে পারি এবং তাদের তারতম্যের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করতে পারি।"

কানাইয়ের কথায় সমস্ত তর্কের মোড় ঘুরে গেল। যেখানে তর্কটা গিয়ে যেন একটা দেয়ালে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে মুক্ত হয়ে সে যেন একটা খোলা পথে ছুটবার অবকাশ পেল। সকলেই বিস্মিত হয়ে কানাইয়ের মুখের দিকে তাকাল।

কানাই আবার বল্লে—"পৃথিবীতে বিষয়বস্তুর অভাব নেই। তা সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়। তেমনি, সাপ, দড়ি, রূপো, শুক্তি, এরা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। কিন্তু যখন আমরা বলি এইটে সাপ, তখন সেটা সত্যও হ'তে পারে, মিথ্যাও হ'তে পারে। যদি সেটা দড়ি হয় আর

অন্ধকারে সেটাকে সাপ বলি ত সেটা হবে ভুল। শুধু দড়ি বা সাপ সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। আমাদের মনের দ্বারা যখন কোনও বস্তুকে আমরা গ্রহণ করি, 'সত্য' বা 'মিথ্যা' শব্দ সেই গ্রহণের উপর প্রয়োগ করা চলতে পারে। ইংরেজীতে বলতে হ'লে আমরা বলতুম—Truth and falsehood belong to propositions and not to things themselves। তেমনি বিষয়বস্তুকে যখন আমরা ভাষায়, রূপে বা কার্য্যে প্রকাশ করি তখন সেই প্রকাশের মহিমায় ও তার পূর্ণতায় আমবা সুন্দরের মহিমা ও পূর্ণতার পরিচয় পাই। একটা ছোট চরের উপর ধান হয়েছে। বর্ষাকালে তার চারিদিক ডুবিয়ে নদী বয়ে চলেছে, আর একখানা নৌকোতে একজন চাষী ধান কেটে পূর্ণ করে' দিয়েছে। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে যাদের বাস তাদের পক্ষে এটা একটা প্রাত্যহিক ঘটনা, এর সুন্দর কুৎসিতের কথা তাদের মনে ওঠে না। আমরা এ দেখে' যাই দেখার খাতিরে। আমরা একে মনে বিধারণ করতে চাই না, প্রকাশও করতে চাই না, আর করবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। কিন্তু কোনও কবি যখন এই রূপটিকে বিচ্ছিন্ন করে' হৃদয়ে বিধারণ করে' ভাষায় একে প্রকাশ করেন—

'ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।'

তখন এক মুহূর্ত্তে এর সৌন্দর্য্য আমাদের কাছে ধরা পড়ে। রুচি হ'ল সেই বৃত্তি যার দ্বারা লেখক বা পাঠক, চিত্রী বা দর্শক স্পষ্ট করে' অনুভব করতে পারে যে বিষয়বস্তুটি তার উপযুক্ত পরিচ্ছদে ক্রমে পারিপাট্যে পরস্পরস্পর্দ্ধিতায় প্রকাশ পেয়েছে কি না। এই বৃত্তির দ্বারা শিল্পী তাঁর শিল্পরচনার যথার্থ প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা অনুভব করতে পারেন এবং সেই অনুসারে শিল্পসৃষ্টির পরিবর্ত্তন করতে

পারেন এবং পাঠক বা দর্শকও বিচার করতে পারেন যে বিষয়বস্তু তার আপন ভঙ্গীতে যথার্থ প্রকাশ পেয়েছে কি না। এইটিই হ'ল রুচি, যে রুচির দ্বারা আমরা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিচার করি।"

অজয় বল্লে—"এ আপনার একেবারে অবান্তর কথা—your reply is a total misfit."

কানাই বল্লে—"কেন, misfit কি হিসাবে ?"

অজয় বল্লে—"আহা, এ আপনাকে আমি বোঝাব কি করে'? প্রকাশ আর অপ্রকাশ, এ সব আপনি কি বলছেন? ছবি দেখতে আমি কিছু কম দেখি নি। Tate Gallery, National Gallery, Louvre, এ সব জায়গাতে ত বিস্তর ছবি দেখেছি। আপনি কি বলেন অত বড় বড় সব চিত্রকরেরা তাঁদের ছবিতে কিছু express করতে পারেন নি, কিংবা কেউ অপরের চেয়ে কম express করেছেন? করুন দেখি তুলনা সেই সব ছবির সঙ্গে আমাদের দেশের কোনও একটা ছবির!"

কানাই বল্লে—"আমি ত বলি নি যে তাঁরা express করতে পারেন নি। মুরগী যখন ডিমে তা' দেয় তখন সে থাকে সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত—তার দৃষ্টি স্থির, নিস্পন্দ, শরীর অচঞ্চল। একান্ত চিত্তে সে বসেছে তার জৈব ধ্যানে জৈব সৃষ্টির জন্য। শুনেছি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি 'Last Supper' আঁকবার সময় সাত দিন ছিলেন নির্নিমেষ-ভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর চিত্রপটের সামনে, যা আঁকবেন তাকে ধ্যানে বিধারণ করবার জন্য। সেই ধ্যানে চিত্তের মধ্যে যা প্রকাশ লাভ করে তাই তিনি রঙের ভাষায় অনুবাদ করে' প্রকাশ করেন পটের উপর। সত্যি সত্যি চিত্র আঁকা হয়ে গিয়েছে সমাধির মধ্যে, ধ্যানের মধ্যে। ওদেশেও যেমন বড় বড় চিত্রী আছেন আমাদের দেশেও

তেমনি বড় বড় চিত্রী ছিল। তার প্রমাণ লেখা রয়েছে অজন্তার প্রস্তরগাত্রে, বহু প্রস্তরমূর্ত্তিতে, বহু মন্দিরগাত্রে। এই শিল্পই একসময়ে আপ্লাবিত করেছিল চীন, তিব্বত, তুরফান, তুর্কীস্থান, যব, মালয়, শ্যাম, কাম্বোজ।”

অজয় আবার বল্লে—“আমাদের কথা চলছিল রুচি সম্বন্ধে। আপনি এ সব কি ছবি আঁকাব কথা তুলে সমস্ত প্রসঙ্গটাকে উল্টে দিতে চান ?”

কানাই বল্লে—“আমি মোটেই উল্টে দিতে চাই না, কিন্তু আমি যা বলতে চাই তা ত আমার বলা এখনও হয় নি। সব কথাটা শুনলে হয় ত আপনার আমার কথা এত অসঙ্গত মনে হবে না।”

“বেশ ত, তাই বলুন না।”

কানাই বল্লে—“আমি বলছিলুম এই কথা যে রুচির দ্বারা আমরা জানতে পাবি যা আমবা প্রকাশ করতে চাই তা প্রকাশ পেয়েছে কি না। কিন্তু তার পূর্ব্বে জানা চাই কবি বা শিল্পী কি প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং তার সঙ্গে আরও একটা কথা ওঠে যে যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা প্রকাশের যোগ্য কি না, তা মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত কি না। যে কোনও বিষয়বস্তু যথার্থরূপে প্রকাশ পেলেই তাকে সুন্দর বলতে হবে এবং সেই সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ছাড়া শিল্পীর আর কোনও কাজ নেই। তা মঙ্গলের কি অমঙ্গলের, উপকারক কি অপকারক, শিল্পী-চিত্তের পক্ষে তা একান্ত অবান্তর। একেই আপনারা ইংরেজীতে বলেন—art for art's sake। কিন্তু শিল্পী যে, সে ত শুধু শিল্পী নয়, সে ত মানুষ। তার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে মঙ্গলের প্রেরণা, তারই ফলে সে যাচাই করে' নেয় কোন্ বস্তু প্রকাশের যোগ্য, তার হৃদয়ের দরদ কোন্ দিকে। তাই দেখা যায় যে মধ্যযুগে যখন

যীশুখৃষ্টের জীবনের ছবি ও বাণী সমস্ত ইউরোপখণ্ডকে আপ্লাবিত করে' তুলেছিল তখন চিত্রীরা, ভাস্করেরা তাঁদের বিষয়বস্তু আহরণ করতেন যীশুখৃষ্টের জীবনের চিত্র থেকে। বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষের চিত্রী ও ভাস্করেরা আঁকতেন জাতকের গল্প ও বুদ্ধের জীবন। এইখানে আমরা পাই রুচির দ্বিতীয় বাণী। এই বাণী চিত্রীকে, কবিকে, শিল্পীকে বলে' দেয় কি সে আঁকবে, কি সে বলবে। এই বৃত্তিটি থাকে অভিন্ন হয়ে চিত্রীর সমগ্রপুরুষীয় অনুভবের সহিত, তার দরদের সহিত, তার হৃদয়ের স্রোতের সহিত। কাজেই, ভারতবর্ষের রুচির সহিত ইউরোপীয় রুচিবোধের বৈষম্য আছে কি না বিচার করে' দেখতে হয়। "রুচি" শব্দের যে এই দু'টি অর্থ দেওয়া গেল, এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ভারতবর্ষ ও ইউরোপের পারস্পরিক স্থান কোথায়, ভারতবর্ষ যা প্রকাশ করতে চেয়েছে তা প্রকাশের যোগ্য কি না ও ভারতবর্ষ তা প্রকাশ করতে পেরেছে কি না। ভারতবর্ষ চায় তার আনন্দের উৎসবে সমস্ত পাড়াপড়শী, আত্মীয়, অনাত্মীয়, দীন দরিদ্র সকলে যোগ দেবে, সেটা হবে একটা সর্ব্বজনীন ব্যাপার। আমাদের ভেবে দেখতে হবে এটা প্রকাশের যোগ্য কি না আবার এও দেখতে হবে যে সেটা প্রকাশ পেয়েছে কি না। আমাদের এত দারিদ্র্যের মধ্যে, অসচ্ছলতার মধ্যে দ্বিপ্রহর বলে' অপরাহ্ণে যাদের আমরা খাওয়াই তারা আমাদের আনন্দে যোগ দেয়, না দুঃখিত হয়ে চলে' যায়। কলাপাতায় খেতে দিলাম বলে' তারা কি অসম্মানিত বোধ করে? আমাদের হৃদয়ের স্বচ্ছন্দ নিবেদন যদি তারা তেমনি অন্তরের সঙ্গে সকলে গ্রহণ করেছে বলে' আমরা দেখতে পাই তবে মনে করে' নিতে হবে যে আমরা যা প্রকাশ করতে চেয়েছি তা প্রকাশ হয়েছে।"

অজয় আবার বল্লে—"লোক খাওয়ানোর সঙ্গে ছবি আঁকার কি যে সম্পর্ক তা আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। A feast is a social affair, an artist's job is quite different."

কানাই হেসে বল্লে—"দুটোর মধ্যে যত তফাৎ আপনি মনে করছেন বাস্তবিক ততটা তফাৎ নেই। মানুষের মধ্যে দুটো বৃত্তি প্রধান হয়ে কাজ করে, একটা বহির্লোক থেকে গ্রহণ করা, আর একটা তাকে প্রকাশ করা। এই প্রকাশ আমরা করি ভাষায়, রঙে, ব্যবহারে। মেয়ের বিয়ে দিলুম, দিয়ে মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলুম, তাকে সুখী করলুম, এই আনন্দটা আমরা ব্যক্ত করতে চাই, সমাজের সকল লোককে তার একটু ভাগ দিতে চাই। তাই আমরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে করযোড়ে নেমন্তন্ন করে' আসি যেন তারা আমার বাড়ীতে পদার্পণ করে' আমাকে কৃতার্থ করে। এটা আমারই দেবার গরজ। এইভাবে রিক্তবিত্ত হয়ে আমি আমাকে সার্থক মনে করি। কাব্যের মধ্যেও কবি তাঁর আত্মভাবকে প্রকাশ করে', ব্যক্ত করে' তা দশজনকে শুনিয়ে আপনাকে সার্থক জ্ঞান করেন। কাজেই প্রকারের ভেদ হ'লেও মূলতঃ শিল্পীর কাজের সঙ্গে এই সামাজিক উৎসব ব্যাপারের একটা বিশেষ সাদৃশ্য আছে এবং যে নিয়ম দিয়ে আমরা শিল্পের বিচার করি সেই নিয়ম দিয়ে আমরা সামাজিক এইসব উৎসব ব্যাপারেরও বিচার করতে পারি।"

যতক্ষণ কানাই কথা বল্‌ছিল ততক্ষণ বিস্মিত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সুজাতা ছিল তার দিকে চেয়ে। প্রথমে ভাবছিল যে কথাগুলো বল্‌ছে ভাল, কিন্তু অবান্তর হচ্ছে, কিন্তু ক্রমশঃ যখন দেখতে লাগ্‌ল সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে অতি অনায়াসে সে একটা দুর্গম জটিল সমস্যার এমন একটা ব্যাপক জবাব এনে দিলে তখন সুজাতা অনুভব করল যে

তার মনের একটি কোণ যেন সহসা উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল একটা নবীন জ্যোতিরেখার সঙ্কেতে। একবার মনে এল স্বকু-দা'র ছবিটি, কিন্তু ছায়ায় মলিন হয়ে গেল সে ছবি, বলপূর্ব্বক যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করল এই কৃষ্ণাঙ্গ বলিষ্ঠ যুবকটি তার ওজস্বী শক্তিতে। সে নির্ব্বাক হয়ে মনে করতে লাগল—এ রকম আব একটি মানুষ ত দেখি নি। এই ত পাশেই রযেছে একটি বিলাতফেরৎ ব্যারিষ্টার, সুন্দর, সুসজ্জিত, আধুনিক আদব-কায়দায় দুরস্ত, কিন্তু কত ক্ষুদ্র এ এর কাছে, যেমন তেজস্বী প্রদীপের কাছে জোনাকী! তার রূপের অভাব তাকে স্পর্শ করল না, স্বচ্ছ হয়ে সে মূর্ত্তি প্রবেশ করল তার অন্তরের মধ্যে। পুরুষের পৌরুষ সম্বন্ধে আজ যেন সে নূতন কবে' সজাগ হ'ল, নূতন করে' অনুভব করল যেন সে নারী, আর তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে একটি পুরুষ। তার অলক্ষ্যে তার কপোলে ফুটে উঠ্‌ল ঘর্ম্মবিন্দু, অরুণাভ হয়ে এল তার মুখমণ্ডল। সে একটু হেসে কানাইকে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি এত কথা শিখলেন কোথা থেকে?" কানাই আবার হো হো করে' হেসে উঠ্‌ল।

কানাই বল্লে—"শিখলুম কোথা থেকে? সকলে যেখান থেকে শেখে, সেখান থেকে। আমার যা কিছু শেখা সমস্তই আমার গুরুর কাছ থেকে।"

গুরুর কথা শুনেই সুজাতা একটু দমে' গেল। সে সাহস করে' আবার জিজ্ঞাসা করলে—"আপনার আবার গুরু টুরু আছে নাকি?"

"এই দেখুন, এ কি একটা কথা হ'ল? গুরু না থাক্‌লে যে গরু হয়ে যেতাম!"

"আপনার এই গুরুটি কে?"

"আমার গুরু প্রফেসার ব্যানার্জ্জি।"

সুজাতা বল্লে—"প্রফেসার ব্যানার্জ্জিকে ত সকলেই একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক বলে' জানে।"

কানাই বল্লে—"তাঁর সম্বন্ধে জানতে লোকের এখনও অনেক বাকী আছে। তিনি জ্ঞানের বিশেষ একটি শাখার আলোচনায় যেমন কৃতী, জ্ঞানের বিচিত্রতার অনুসরণেও তেমান তাঁর অসীম কৌতূহল। শাস্ত্রচর্চ্চা দু'রকমে করা যায়। কেউ কেউ আছেন যাঁরা কোনও একটি ক্ষুদ্র প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্য তাঁদের সমস্ত শক্তিকে একই পথে চালিত করেন, ফলে হন তাঁরা বিশেষজ্ঞ (specialist)। তাঁদের সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত কল্পনা খেলে সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীটির মধ্যে, তার বাইরে যেতে তাঁদের প্রবৃত্তি নেই, উৎসাহ নেই। পৃথিবীকে তাঁরা ছোট করে' আনেন একটি মাইক্রোস্কোপের মধ্যে, আর তারই মধ্যে একটি protozoa-র জীবন-প্রণালী তাঁরা পর্য্যবেক্ষণ করেন তাঁদের সমস্ত জীবন দিয়ে, বাইরের জগতের আর কোথাও তাঁরা কোন রস পান না। তাঁরা ছোট ছোট ক্ষেত্রের মধ্যে জ্ঞানের যে গভীরতা সম্পন্ন করেন তাঁদের পরবর্ত্তীরা এসে তাঁদের আহৃত জ্ঞান একত্র করে' তারই অবলম্বনে আরও নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করে' যান। এমনি করে' যেমন একখানি ইটের উপর আর একখানি ইট রেখে প্রকাণ্ড ইমারৎ গড়ে' ওঠে, তেমনি যুগে যুগে এই সমস্ত ঋষিদের চেষ্টায় গড়ে' ওঠে জ্ঞানের মহামন্দির। কিন্তু প্রফেসার ব্যানার্জ্জির বিশেষত্ব এই যে তাঁর জ্ঞান একদিকে যেমন অত্যন্ত ব্যাপক অপরদিকে তেমনি কোনও বিশেষ বিশেষ দিকে তা অত্যন্ত গভীর। একটা ব্যাপক ক্ষেত্রের মধ্যে নানা বিষয়ে অনুশীলন করে' তিনি একটা মহাজ্ঞানের সৌধ নির্ম্মাণ করেছেন।

তাঁর সেই মহাসৌধের বিশেষ বিশেষ প্রকোষ্ঠে চলেছে তাঁর বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের গভীরপ্রসারী গবেষণা।"

সুজাতা আবার বল্লে—"আচ্ছা, তা হ'লে বহু লোকই ত তাঁর কাছে জ্ঞানপিপাসু হয়ে যায়?"

কানাই হেসে জবাব করলে—"আপনি কি পাগল হয়েছেন? আমাদের দেশে জ্ঞানপিপাসু লোক কোথায়? দু'চারজন বাক্য-বিলাসী আছে মাত্র। আর তাদের কাছে তিনি তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করেন না। সকলেই তাঁকে বলে অসামাজিক, বুনো, অহঙ্কারী, কারণ তিনি প্রায় কারুর সঙ্গেই দেখা করেন না। তাঁর কোনও বন্ধু নেই, তিনি কোনও বন্ধুর বাড়ী যান না, কাকেও বাড়ীতে আমন্ত্রণ করেন না বা কারও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান না। তাঁর পরিবারের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক অতি কম। তিনি আছেন নিরন্তর নিমগ্ন হয়ে তাঁর জ্ঞান-সমাধিতে।"

সুজাতা আবার জিজ্ঞাসা করলে—"তা হ'লে আপনি তাঁর দেখা পেলেন কি করে'? তাঁর সঙ্গ বা কি করে' লাভ করলেন?"

কানাই আবার হেসে জবাব করলে—"দেখুন, বিধাতা কাউকে একেবারে বঞ্চিত করেন না। আমার ধন নেই, মান নেই, বিদ্যা নেই, প্রতিষ্ঠা নেই। একটা ত কিছু আমার চাই। আমার বহু জন্ম তপস্যার ফলে ভগবান এই সৌভাগ্যটা আমায় জুটিয়ে দিয়েছেন। কি কারণে জানি না, তিনি আমায় ভালবাসেন। তা আমার এই সৌভাগ্য নিয়ে কেউ ঈর্ষ্যাও করবে না, কাড়াকাড়িও করবে না, এ আমি বিলক্ষণ জানি।"

সুজাতা আবার হেসে বল্লে—"আপনি কি অন্তর্য্যামী যে সকলের মনের খবর রাখেন?"

কানাই আবার স্মিতহাস্যে বল্লে—"না, তা নই বটে, তবে এ পর্য্যন্ত যা দেখে' এসেছি তাতে আমার এ সম্পত্তিতে কেউ ভাগ বসাতে পারবে না।"

সুজাতা আবার হেসে' জবাব করলে—"অমন দুঃসাধ্য বস্তুতে অন্ততঃ অবলা জাতির কোনও লোভ নেই, আপনার ভাগ্যে ভাগ বসাতে অন্ততঃ আমাদের এই ক'জনের মধ্যে কেউ চেষ্টা করবে না, এ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

কানাই আবাব হো হো করে' হেসে উঠ্‌ল। অজয় এ পর্য্যন্ত এই সমস্ত কথোপকথনের মধ্যে প্রবেশ করবার কোনও রন্ধ্র না পেয়ে সিগারেটের পর সিগারেট ধরিয়ে ধূম উদ্গীরণ করছিল, এতক্ষণ পরে তাচ্ছীল্যভবে একটা প্রশ্ন করে' বস্‌ল—"আপনার সবজান্তা অধ্যাপকের কৃপায় আপনি যে দেখছি সব বিষয়েরই খোঁজ রাখেন। বর্ত্তমান political situation সম্বন্ধে আপনার কি opinion ?"

অধ্যাপকের প্রতি শ্লেষোক্তিতে কানাইয়ের মুখ কঠিন হয়ে এল। সে বল্লে—"যাঁর সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না তাঁর সম্বন্ধে শ্লেষোক্তি করা, কি ইংরেজী কি বাঙালী, কোনদেশীয় রুচিতেই সমর্থন করবে না। আর political situation সম্বন্ধে আমার মতামত শুনেই বা আপনার লাভ কি, আর আমিই বা খামাখা আপনাকে আমার মত বলতে যাব কেন ?"

প্রভা দেখলে যে বিনা কারণে অজয় কানাইয়ের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করল। সে ব্যথিত ও লজ্জিত হয়ে অতি কঠোরভাবে অজয়কে বল্লে—"এ আপনার ভারী অন্যায়, অজয়বাবু। আপনি কি আপনার কথার রাশ টানতে জানেন না ?"

অজয় তাকে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রভার তিরস্কারে

এবং সুজাতার কঠোর নয়নভঙ্গিতে সে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠ্‌ল এবং বল্লে—"I am so sorry, I am so sorry."

সুজাতা কানাইকে একটু নরম করবার জন্য সস্নিগ্ধভাবে বলে' উঠ্‌ল—"যে ভাবে কথাটা উঠেছে তাতে এ বিষয়ে আপনাকে আর অনুরোধ করা চলে না, কিন্তু এ বিষয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু শোনবার জন্য আমাদের একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। আপনি সমস্ত বিষয় গুছিয়ে এমন সুন্দর করে' বলতে পারেন যে আপনাব কথাতে মনের মধ্যে একটা নাড়া দেয়।"

কানাই জল হয়ে গেল। সে বল্লে—"না, না, এ কি সব আপনারা বলছেন। তবে politicsএর ক্ষেত্রে আমি নূতন কর্ম্মী, একজন দিনমজুর বল্লেই হয়। এ সম্বন্ধে আমি জানিই বা কি, বলতেই বা পারি কি ?"

প্রভা বল্লে—"আপনি ত নূতন কর্ম্মী, আমরা যে সব একেবারে অকর্ম্মা তার খোঁজ রাখেন ? তবু আপনি এসেছেন বলে' আমার জন্মদিনে দু'একটা ভাল কথা শুনতে পেলুম। বলুন না দু'একটা কথা এ বিষয়ে।"

কানাই গম্ভীরভাবে বল্লে—"আমি নিশ্চয় জানি আমার মতের সঙ্গে হয় ত আপনারা কিছুতেই একমত হ'তে পারবেন না।"

প্রভা হেসে জবাব করলে—"এইবার ত আপনাকে বলতে পারি, আপনি এমন সবজান্তা হ'লেন কি করে' ? কি করে' জানলেন আপনার মতের সঙ্গে আমাদের মত মিলবে না ? আর মত যদি না মেলে তাতে ক্ষতি কি ? আপনার দুরন্ত শত্রুও আপনাকে কখনও চাটুকার বলে' ভ্রম করবে না। আর মত যদি না মেলে তবেই ত আপনার হ'ল নূতন মত বলা। তাই ত শুনতে চাইছি আপনার কাছে। নইলে

যে কথা আমরা সকলেই জানি সেই কথাই আপনার কাছ থেকে শুনে আমাদের লাভ কি ?”

কানাই আবার হেসে উঠ্‌ল। বল্লে—“আপনাদের সঙ্গে কথায় পারবার যো নেই দেখছি।”

প্রভা আবার জবাব করলে—“না পারবার ত এখন পর্য্যন্ত কোনও লক্ষণ দেখি নি। কিন্তু আর কি করে’ আপনার খোসামোদ করব বলুন ত।”

রঞ্জন এ পর্য্যন্ত কোন কথারই কোন তাল করতে পারে নি। সে খালি বুঝেছিল যে এ পর্য্যন্ত যে সব কথার লড়াই চলছিল তাতে কানাই-ই টেক্কা দিযে যাচ্ছিল। বন্ধুর গৌরবে সে গর্ব্ব অনুভব করছিল। কানাইয়ের গা টিপে চুপিচুপি সে বল্লে—“বলে’ দাও না কানাই-দা দু’একটি কথা, অজয়বাবুকে দাও না জব্দ করে’।”

কানাই বল্লে—“আজকালকার রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাটার স্বরূপ বোঝা একটু শক্ত হয়ে উঠেছে। নানা তরফ থেকে নানারকম চীৎকার স্বরু হয়েছে, সকল গুলিরই প্রধান কথা হচ্ছে ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা চাওয়া। গরমপন্থীরা চাইছেন, তাঁদের প্রার্থনা জানাচ্ছেন সহজ সরল মৃদুভাবে নয়, চোখ গরম করে’, রাষ্ট্র অচল করে’ দেব এই ভয় দেখিয়ে। কেউ বা অনশনের উপায়ে চাইছেন ইংরেজের ধর্ম্মবুদ্ধিকে জাগাতে কিংবা দেশের লোকের অসাড় চেতনাকে নাড়া দিতে। নরমপন্থীরা বলছেন—ইংরেজ অতি মহৎ জাতি, তারা চিরকাল স্বাধীনতাপ্রিয়, নিজেদের দেশ তারা যেমন নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীন করেছে সেইরকম ন্যায়ধর্ম্মের খাতিরে ভারতবর্ষকেও তাদের স্বাধীন করে’ দেওয়া উচিত। নানারকম আবেদন নিবেদন জানিয়ে সরকারপক্ষকে তুষ্ট করে’ ছিঁটেফোঁটা যা একটু করুণার

দান তাঁরা পান তাতেই তাঁরা খুসী হন এবং তাঁদের আশা থাকে বাড়তে এবং আবেদন-পত্রের বহর চলে বেড়ে।"

অজয় জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি কি মনে করেন না যে for the good and benefit of India ভারতবর্ষকে এখনও অনেকদিন Britainএর tutelage-এ থাকা উচিত ?"

কানাই বল্লে—"কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে চিরকালই ইংরেজের tutelege-এ থাকলেই বা দোষ কি ? ইংরেজের কবল থেকে কেন আমরা বিচ্ছিন্ন হ'তে যাই ?"

সকলেই বিস্মিত হয়ে কানাইয়ের মুখের দিকে তাকাল। কানাই-য়ের কাছ থেকে এ রকম একটা কথা কেউই শুনতে আশা করে নি। রঞ্জন বিস্মিত হ'ল সব চেয়ে বেশী। অজয় এতক্ষণে একটু প্রশংসমান চক্ষুতে কানাইয়ের দিকে তাকাল। ভাবখানা এই—That's the idea that was at the back of my mind.

সুজাতা বল্লে—"কেন, আপনি দেশের স্বাধীনতা চান না ?"

কানাই বল্লে—"চলিত ইংরেজী বইতে স্বাধীনতার যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তার অর্থ পররাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভ করা, স্বরাষ্ট্রের মধ্যে মুক্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধে তেমন কিছু পাওয়া যায় না।"

প্রভা বল্লে—"সেই কথাই ত আমরা বলছি। ইংরেজ ইংলণ্ড থেকে আমাদের শাসন করবে সেটা কি পরাধীনতা নয় ?"

কানাই বল্লে—"ধরুন যে আমাদের আবেদন নিবেদনে দয়ার্দ্র হয়ে ইংরেজ বল্লে—আমাদেরই একজন সম্রাটপুত্রকে আমরা তোমাদের ওখানে পাঠাব। তিনি যাবজ্জীবন তোমাদের ওখানে থাকবেন এবং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তোমাদের উপরে রাজত্ব করবেন। তোমাদের ওখানেই বসবে তোমাদের পরিষদ, পার্লামেণ্ট থেকে তোমাদের

নিয়ন্ত্রণ করা হবে না। তোমরা তোমাদের দেশের আইনপ্রণালী রচনা করবে। এমনি করে' ইংরেজের সঙ্গে একটা সর্ত্ত হ'লে আপনারা কি মনে করবেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে?"

সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

"দেখুন, এই ব্যবস্থা হ'লে ভারতবর্ষ পররাষ্ট্রের অধীন হ'ল না, কাজেই ইংরেজী কেতাবের লক্ষণ অনুসারে ভারতবর্ষকে স্বাধীনই বলতে হয়। এই সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন করি। মোগল বাদশাহেরা যখন ভারতবর্ষের মসনদ অধিকার করেছিলেন তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল না পরাধীন ছিল?"

প্রভা বল্লে—"পরাধীন।"

কানাই বল্লে—"কেন? মোগল বাদসাহেরা এ দেশেই বাস করতেন। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এই দেশ তাঁরা শাসন করেছেন। ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে কোনও পররাষ্ট্রের ত কোনও অধিকার ছিল না। তবে কেতাবী লক্ষণ অনুসারে কেন বলবেন না যে তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল?"

সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল, কারুরই কোনও উত্তর জোগাল না।

কানাই বল্লে—"তবেই দেখুন, আপনাদের মনে স্বাধীনতার যে আভাস রয়েছে, কেতাবী লক্ষণের দ্বারা তা পরিস্ফুট ও ব্যক্ত হয় নি। কথাটা হচ্ছে এই যে জাতি হিসাবে কি সমাজগঠনে, কি রাষ্ট্রগঠনে, কি সামাজিক ব্যবস্থা অনুষ্ঠানে, শিল্পে, সাহিত্যে, কলায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে, চরিত্রের আদর্শে ও অধ্যাত্ম আদর্শে ভারতবর্ষ আপনাকে যে ভাবে প্রকাশ করতে চায় সেখানে তাকে কেউ বাধা না দেয়, সেখানে সে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে আপন আদর্শকে ব্যক্ত করতে পারে—এইটিই হচ্ছে

যথার্থ স্বাধীনতা। মুসলমান যখন এদেশে ছিল, Semitic ধর্ম্মের প্রভাবে তাদের আত্মপ্রকাশের প্রণালী এবং রুচি ছিল ভারতবর্ষীয়দের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেই জন্য মুসলমানদের অধীনে এসে ভারতবর্ষকে তার প্রাচীন আত্মপ্রকাশের পদ্ধতি অনেক পরিমাণে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। তাদের সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্ম্মপ্রণালী ও অধ্যাত্ম আদর্শ ছিল আমাদের থেকে অনেক বিভিন্ন। সেইজন্য তাদের অধীনে যতদিন ভারতবর্ষ ছিল ততদিন ভারতবর্ষে আত্ম-প্রকাশের প্রণালী ব্যাহত, ক্ষুণ্ণ ও অপমানিত হচ্ছিল।"

অজয় বলে' উঠ্ল—"I must say you are making a mess of the whole thing। ধর্ম্ম একটা জিনিষ আর politics আর একটা জিনিষ। ধর্ম্ম is a personal affair, politics is an affair of the State।"

কানাই হেসে বল্লে—"আচ্ছা, তবে মন্দিরেব সামনে একটা গরু কাটলে আমাদের মধ্যে যাঁরা বিলেতফেরৎ এবং যাঁরা এদেশে ওদেশে যথেষ্ট গোমাংস ভোজন করেছেন তাঁরাও কেন চটে' ওঠেন? একটা মন্দিরের শিবলিঙ্গের উপর কিছু গোরক্ত-পাত কবলে শিবলিঙ্গটা ফেনাইলের জলে ধুয়ে নিলেই ত চলে, তা নিয়ে হিন্দু মুসলমানে এত রক্তারক্তি হয় কেন? অথচ হিন্দুরা গরু অপেক্ষা বৃহত্তর প্রাণী মহিষকে দুর্গাপূজার সময়ে মহানন্দে বলি দিয়ে থাকে।"

অজয় বল্লে—"That is because the cow is held sacred in this country."

"কিন্তু পবিত্র বলতে আপনি কি বোঝেন? গরু যে মহিষ অপেক্ষা পবিত্র তা কোনও প্রাকৃতিক কারণের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। কোন্‌টা কে পবিত্র মনে করে সেটা তার মনে করার উপর নির্ভর করে।

হিন্দুরা যেমন কতগুলি প্রাণীকে পবিত্র মনে করে তেমনি কতগুলি গাছকেও পবিত্র মনে করে, তেমনি কোনও শ্রেণীর মানুষকেও পবিত্র মনে করে। এটা তাদের জাতিগত সংস্কার। এ সংস্কার ভুল কি সত্য সে তর্কের কথা এখানে ওঠে না। গরুকে হিন্দু পবিত্র মনে করে, দেবায়তনকে পবিত্র মনে করে, বেলগাছকে পবিত্র মনে করে। সেই মনে করাটা সে প্রকাশ করতে চায় তার ব্যবহারে এবং সেই ব্যবহার যদি সে না করতে পারে তবে তার সমস্ত চিত্ত বিদ্রোহী হযে ওঠে। আমাদের সমস্ত ব্যবহার যে যুক্তির উপর নির্ভর করে তা নয়, তা নির্ভর করে কুলক্রমাগত সংস্কারের উপর। দেখুন, হাতও আমাদের অবয়ব, পা'ও আমাদের অবয়ব। দুটোর কোনটাই আমাদের কম প্রয়োজনীয় নয়। আমাদের নিয়মানুসারে আমরা গুরুজনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি, কিন্তু তা না করে' যদি গুরুজনের পায়ের উপরে পা'খানা চডিয়ে দিই তবে তা কেন তাঁর প্রতি অসম্মান হবে? বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লে হাত না বাড়িয়ে পা বাড়িযে দিলে কি দোষ হয়? এ যুক্তির অগম্য কিন্তু সমাজে স্বীকার্য্য। ভারতবর্ষের যদি নানা বিষয়ে কিছু নিজস্ব প্রকাশ করবার না থাকত তবে ইংরেজের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গেলে তার কোনও ক্ষতি হ'ত না।"

সুজাতা প্রশ্ন করল—"তবে কি আপনি বলতে চান যে পররাষ্ট্রের সংযোগ থেকে মুক্তি পাওয়াকে স্বাধীনতা বলা যায় না?"

কানাই বল্লে—"না, তা আমি ঠিক বলতে চাই না, কারণ পর-রাষ্ট্রের সংযোগ থাকলে শুধু যে আমরা আত্মপ্রকাশ করবার অবসর পাব না তা নয়, আমরা থাকব সেই পররাষ্ট্রের উপকরণীভূত হয়ে। আমাদের তারা ব্যবহার করবে তাদের আপন উপকারের জন্য, যতটুকু আমাদের বাঁচিয়ে রাখলে তারা আমাদের পূর্ণভাবে দোহন করতে

পারবে ততটুকুই তারা আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে। আমাদের যদি তারা বলিষ্ঠ করে সেটা তাদের নিজেদের বলবৃদ্ধি করবার জন্য, আমাদের যদি তারা ধনী করে সেটা তাদের ধনবৃদ্ধি করবার জন্য। আমাদের দেশে যে ধনস্রোত বইবে তাকে ঢালু করে' দেবে তাদের দিকে, যাতে ভারত সমুদ্রের সমস্ত জল গড়িয়ে গিয়ে পড়ে আটলান্টিকে। আমাদের যদি তারা সুশাসন করে, চোর ডাকাত থেকে রক্ষা করে, সে তাদের ধনার্জ্জনের জন্য। আমাদের তারা শিক্ষিত করবে অল্প মূল্যে তাদের রাজকার্য্য চালাবার উপযোগী কেরাণী সরবরাহ করবার জন্য। সেটা হবে সম্পূর্ণভাবে আত্মহনন, কিন্তু সেটা না হ'লেই যে আমাদের আত্মহননের কিছু অভাব ঘট্‌ল তা বলা যায় না। যে আত্মা আপনাকে প্রকাশ করতে পারে না সে আপনি যাবে ধ্বংস হয়ে। যে গাছ রবিরশ্মির দিকে শীর্ষ উত্তোলন করে' শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে' রবিরশ্মি পান করতে পারে না, তা যায় মুষ্‌ড়ে। তাতে ফুল হয় না, ফল হয় না, তা থাকে কোনক্রমে জীবনধারণ করে'। সে জীবনধারণ মৃত্যুর চেয়েও বড় লাঞ্ছনা।"

অজয় প্রশ্ন করলে—"কিন্তু ইংলণ্ড আমাদের আত্মপ্রকাশের কি বাধা ঘটাচ্ছে শুনি।"

কানাই বল্লে—"এ সম্বন্ধে যদি প্রশ্নের অবকাশ থাকে তবে উত্তর না দেওয়াই শোভন। ইউরোপে প্রকাশ পাচ্ছে এখন ধন ও বলের আভিজাত্য। ধনাহরণই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতার মর্য্যাদা এবং বলের দ্বারা অপরকে নিগৃহীত করাই হয়েছে পৌরুষের প্রধান গৌরব। ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কখনও এ চোখে দেখে নি। ভারতবর্ষে ছিল বিদ্যা ও ধর্ম্মের আভিজাত্য। মহারাজচক্রবর্ত্তীর রাজমুকুটও অনায়াসে অবনমিত হয়ে পড়ত পাংশুলাঞ্ছিত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের চরণপ্রান্তে। সে

অবনতিতে ছিল শ্রদ্ধা ও ভক্তি, সে নম্রতা ছিল হৃদয়ের সহজ অবনতি। সেখানে বল ও ধনের লাঞ্ছনা ছিল না। ইউরোপে বহু জ্ঞানী আছেন, বহু পণ্ডিত আছেন। তাঁরা জগদ্বরেণ্য, সকলের নমস্য। কিন্তু ইউরোপ তাঁদের কি ভাবে ব্যবহার করছে? তাঁদের ব্যবহার করছে ধন ও বল আহরণের জন্য। সেই সমস্ত মনস্বীরা যদি অকৃত্রিম বিদ্যানুরাগে নিত্য নব আবিষ্কার না করতেন তবে ইউরোপ যেত ধ্বংস হয়ে এতদিন।"

প্রভা বল্লে—"ইউরোপের সর্ব্বত্রই ত প্রায় আত্মপ্রকাশের প্রণালী ও রীতি একই প্রকারের, তবে সেখানে কেন এত দ্বন্দ্ব?"

কানাই বল্লে—"রুচির অভাব। আমি পূর্ব্বেই আপনাদের বলেছি যে শুধু প্রকাশ করলেই চলে না, যা প্রকাশ করা হচ্ছে তা প্রকাশের যোগ্য কিনা তা দেখা দরকার। আমারই বল হবে সকলের চেয়ে বেশী—এই অভিমানটি প্রকাশের যোগ্য নয়। এই অভিমান ক্ষুব্ধ করে আর একজনের অভিমান, তাই অভিমানে অভিমানে ঘটে দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বের ফলে হয় ধ্বংস। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮র যুদ্ধের কথা আপনারা শুনেছেন। কিন্তু এই যুদ্ধ বায়না দিয়ে গিয়েছে একটা মহাযুদ্ধের। সেই যুদ্ধ ঘটতেই হবে। শুধু একটা যুদ্ধ নয়, ঘটবে যুদ্ধের পরম্পরা, বয়ে যাবে ধ্বংসের পঙ্কিল আবর্ত্ত। আজ ইউরোপের এই বলপ্রেরণা ও ধনপ্রেরণা আমাদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে, আমাদের আত্মপ্রকাশের মঙ্গল বুদ্ধিকে ব্যাহত করেছে। শুধু যে পররাষ্ট্র আমাদের বাহ্যভাবে শাসন করছে তা নয়, তারা উদ্গীরণ করছে তাদের সমস্ত বিষ আমাদের বায়ুপ্রবাহের মধ্যে। আমরা নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে গ্রহণ করছি সেই বিষ, বিষাক্ত করছি আমাদের ধমনীর রক্ত। আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন হয়ে আসছে লঘু হ'তে লঘুতর, আমাদের আত্মবিশ্বাস

হয়ে আসছে শিথিল, আমাদের চেতনা হয়ে আসছে তন্দ্রাযুক্ত। আমরা চলেছি আসন্ন মৃত্যুলোকের দিকে ভেসে।"

অজয় একটু অসহিষ্ণুভাবে বল্লে—"আজ যদি ইংরেজ আমাদের ছেড়ে চলে' যায় ত what about our Hindu-Moslem communal strife? আমরা একদল আর একদলের টুঁটি ছিঁড়ে রক্ত খাব না like a pack of blood-hounds?"

কানাই বল্লে—"সেটা একটা স্বতন্ত্র কথা, তবে একটা বড় কথা সন্দেহ নেই। আর্য্যেরা যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন এই প্রশ্নটা তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা এসে এমন দেশে উপস্থিত হলেন যে দেশে একদিকে ছিল সুসভ্য অসুরেরা আর একদিকে ছিল অসভ্য দাসেরা। আমাদের সাহিত্য পড়লে এ কথা জানা যায় যে এই অসুরদের সঙ্গে আর্য্যদের অনেক লড়াই হয়েছিল, কিন্তু ক্রমশঃ অসুরেরা গ্রহণ করতে লাগল আর্য্যদের ধর্ম্ম। সংস্কৃত বৈদিক মন্ত্র তারা উচ্চারণ করতে পারত না, কিন্তু চেষ্টা করতে ছাড়ত না। পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় যে দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় জাতিরা সম্পূর্ণভাবে আর্য্যদের সভ্যতা ও ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল এবং সংস্কৃত ভাষা আর্য্যদের মতই প্রায় আয়ত্ত করেছিল। পুরাণকাহিনীর তাৎপর্য্য বিশ্বাস করতে হ'লে মনে হয় যে অগস্ত্য ঋষি প্রথমে চেষ্টা করেছিলেন দু'টি জাতির এই মহামিলনের জন্য। কেউ কেউ মনে করেন যে রামায়ণে রামচন্দ্রের সহিত বানরকুলের মিত্রতার মধ্যে আমরা এই জিনিষেরই আভাস পাই। দ্রাবিড় ও আর্য্যের মিলন ঘটল, দ্রাবিড়েরা আর্য্যসভ্যতা গ্রহণ করল। তবু দ্রাবিড়েরা ছিল একটা মহাজাতি। তারা তাদের আপনাদেরকে আর্য্যসভ্যতার মধ্যে হারিয়ে ফেলে নি, তারা রেখে গেছে তাদের বিশেষ কীর্ত্তি তাদের সঙ্গীতে, তাদের স্থাপত্যে, তাদের শিল্পে,

তাদের কাব্যে, তাদের ধর্ম্মে, তাদের দর্শনে। আমাদের বড় বড় দর্শনশাস্ত্রের অনেকগুলির উৎপত্তি দক্ষিণ দেশ থেকে। শঙ্করাচার্য্য ছিলেন কেরলী, রামানুজ ছিলেন তামিল। আমাদের ভক্তিধর্ম্মের ধারাটা প্রচুর পরিমাণে এসেছে দক্ষিণ দেশ থেকে। দাসদের কিছু দেবার ছিল না, তারা স্থান পেল আর্য্যদের চতুর্থ শ্রেণীর কিংবা তারও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে। এমনি করে' চলতে লাগল জাতিতে জাতিতে সংমিশ্রণ। যেমন এক গ্লাস সরবতের মধ্যে তার বিভিন্ন উপাদান একত্র হয়ে এক অখণ্ড রসের সৃষ্টি করে, তথাপি অনেক সময়ে হয় ত তীব্রগন্ধ কর্প্পূর কিংবা মৃগনাভি রসান্তরের সহিত আপন সংশ্লেষকে ছাড়িয়ে আপন সত্তাকে প্রকাশ করে, তেমনি সমবেত জাতির মধ্যেও বিভিন্ন জাতির আপন আপন ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব যখন প্রকাশ পায়, তখনই সেই জাতির আত্মপ্রকাশ হয় অব্যাহত।"

সুজাতা জিজ্ঞাসা করলে—"কিন্তু মুসলমান যখন ভারতবর্ষে এল তখন তাদের সঙ্গে বিরোধে আমাদের কি গতি হ'ল ?"

কানাই বল্লে—"মুসলমানদের সভ্যতা আমাদের সভ্যতার চেয়ে অনেকটা অন্যজাতীয় বলে' জাতির আত্মপ্রকাশে উভয়ের সমবায়িতা ও সমভাগিতা তেমন করে' প্রকাশ পায় নি। হিন্দুরা যথাসাধ্য মুসলমান সভ্যতার অধিকাংশই বর্জ্জন করতে চেয়েছে। সেকালে আরবী ফারসী জানা লোকের দেশে অভাব ছিল না, অনেক হিন্দু ফারসী ও উর্দ্দু ভাষায় কবিতাও লিখেছেন। কিন্তু সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য পড়লে এক আধটি উল্লেখ ছাড়া এ কথা মনেই হয় না যে এ দেশে মুসলমান বলে' একটি জাতি বাস করত। তাদেব কীর্ত্তি পথ ঘাট শাসন-ব্যবস্থা সংস্কৃত লেখকেরা কিছুই উল্লেখ করেন নি বা অতি অল্পই উল্লেখ করেছেন। সে উল্লেখও মাত্র দেখা যায় ঐতিহাসিক রাজ-

চরিত্রের বর্ণনায়। আরবী ফারসী গ্রন্থের মধ্যে কদাচিৎ দু'একখানা বই সংস্কৃতে অনূদিত হয়েছে। এটা ভাল কি মন্দ সে বিচার আমি করছি না, আমি খালি করছি পরস্পরের সম্পর্ক বিচার। কিন্তু ক্রমশঃ যখন মুসলমানেরা এদেশে স্থায়ী হয়ে বসতে লাগল তখন আমরা দেখতে পাই যে মুসলমান ও হিন্দুধর্ম্মের মিলনে অনেক নূতনপ্রকার সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের উৎপত্তি হ'তে লাগল। দাদু, কবীর, নানক প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। অনেক সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুর ভক্তিধর্ম্ম ও যোগ-ধর্ম্মের প্রভাবেব পরিচয় পাওয়া যায়। দারা শিকো লিখলেন 'যুগ্মসাগরের মিলন'। হিন্দুরাও পীর ফকিরের যথেষ্ট সমাদর করত এবং হয় ত বা অদ্বৈতবাদ থেকে একেশ্বরবাদে আমাদের ধর্ম্মের যে পরিণতি ঘটেছে তার মধ্যেও মুসলমানদের কিছু দান থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু মুসলমানদের সভ্যতার একটা প্রধান দান ছিল তাদের শিল্পরচনা, তাদের ইতিহাস-রচনা, তাদের সঙ্গীতকলা, তাদের স্থাপত্য। এ সমস্ত দিকেই মুসলমানেরা হিন্দুদের সহযোগে বা অসহযোগে আপন জাতীয় ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে। তাদের মধ্যে অনেক মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের অনেকে এখনও প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। মুসলমানদের মন্দির ভাঙা বা মূর্ত্তি ভাঙা দেখে' সাধারণতঃ মনে হয় যে তাদের আদর্শের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য খুব বেশী, কিন্তু একটু নিপুণভাবে বিচার করলে সে কথা ঠিক বলে' মনে হয় না। ওটা হ'ল তাদের ধর্ম্মগত একটা উগ্রতা মাত্র। আমাদের যথার্থ বিরোধ হচ্ছে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সহিত।"

প্রভা বল্লে—"আপনার এ কথা ত সহজে মানতে প্রবৃত্তি হয় না। একজন ইংরেজকে আমরা যত সহজে আত্মীয় মনে করতে পারি একজন মুসলমানকে ত তা পারি না।"

কানাই বল্লে—"সে কথা ঠিক, কিন্তু তারও কারণ অনেক। একটা কারণ এই যে ইংরেজেরা আর্য্যজাতি, তাই তাদের সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের সৃষ্টির সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য আছে। তাদের ধর্ম্ম প্রাচ্যধর্ম্ম, আমাদের ধর্ম্মের সঙ্গে তার বিরোধ নেই। তা ছাড়া, সাধারণতঃ যে সব ইংরেজের সঙ্গে আমরা মিশি তারা সাধারণ মুসলমান অপেক্ষা উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু আর একটা গুরুতর কারণ এই যে অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক কলহের মধ্য দিয়ে, অনেক ত্যাগ, অনেক রক্তপাতের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমানেব যে ঐক্য ঘটে' উঠেছিল, ইংরেজ তা অনেক পরিমাণে ভাঙ্তে সমর্থ হয়েছে তাদের আপন স্বার্থের তাগিদে। যে সমস্ত যুগের বর্ব্বরতাব কথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমাদের চিত্তে আমরা খোদিত করে' রেখেছি সেই সমস্ত যুগের ইউরোপীয়েরা নিজেদের দেশে কি পরিমাণ বর্ব্বরতা কবেছিল সে কথা আমরা একবারও ভেবে দেখি না। দশম থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নামে ইউরোপে যে সমস্ত অত্যাচার ঘটেছিল সে কথা স্মরণ করলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কত সামান্য মতভেদের জন্য কত মানুষকে তাবা পুড়িয়ে মেরেছে! তার তুলনায় মুসলমানদের মন্দির ভাঙা অতি অকিঞ্চিৎকর।"

সুজাতা বল্লে—"কিন্তু আপনি কি এ কথা মানেন না যে ইউরোপীয় জাতিদের আদর্শের সহিত আমাদের আদর্শের ঐক্য আছে?"

কানাই বল্লে—"সে কথা মানিও বটে, মানি না'ও বটে। ইউরোপীয় মহামনীষীদের কথা যখন চিন্তা করি তখন তাঁদের মত, বিশ্বাস ও আদর্শের সঙ্গে সনাতন ধর্ম্মের মত, বিশ্বাস ও আদর্শেব কোনও পার্থক্য দেখতে পাই না। কিন্তু ইউরোপে 'জাত' পদার্থটা তাদের শ্রেষ্ঠ মানবকেও অতিক্রম করছে, অতিক্রম করছে তাদের ধর্ম্ম ও ন্যায়বুদ্ধিকে। ইংরেজের দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ সে দেশে অনাদৃত, রাষ্ট্র শাসন করে

গুটিকত অর্দ্ধশিক্ষিত, চতুর, কুশলী, ফিচেলী-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা। তারা চালিত হচ্ছে ধনিকদের ইঙ্গিতে। এই ধনিকদের ক্ষুধা বিপুল। তারা স্থাপন করেছে ধনের মর্য্যাদা এবং ধনস্থাপনের জন্য বলের মর্য্যাদা। সেই নিয়মে তারা গড়ে' তুলছে তাদের সমাজ, তাদের রাষ্ট্র, সেই নিয়ম ব্যবহার করছে তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি ও বিগ্রহের নীতিতে, শত শত দেশের জাতিকে করছে পরাধীন, সকল দেশের ধনাহরণ করে' করছে নিজেদের উদরের পরিপূর্ত্তি। ধন কেড়ে নিয়ে ধনবিলাসের মর্য্যাদা দিয়েছে বাড়িয়ে, বিদ্যা, চরিত্র ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা দিয়েছে কমিয়ে। এই বিষাক্ত বায়ুতে তারা পূর্ণ করেছে ভারতবর্ষের আকাশ। এইখানেই হচ্ছে ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব, সমগ্র ইউরোপের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব।"

সুজাতা আবার জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি কি মনে করেন যে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মত অনুসারে আমাদের দেশের লোক চলত?"

কানাই বল্লে—"তা কি কখনও সম্ভব হয়? কিন্তু তথাপি একথা বলতেই হবে যে আমাদের দেশের নিম্নতম ব্যক্তির মধ্যেও আমাদের মনীষীদের উপদেশ এমনভাবে সংক্রমিত হয়ে গিয়েছিল যে তাদের ব্যবহারের মধ্যে তাঁদের বাক্যের একটা প্রতিধ্বনি পাওয়া যেত। ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতার জন্য যেখানে তারা তা পালন করতে পারত না সেখানে তারা মনে করত যে তারা আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছে, অধর্ম্ম করছে। কাজেই, আদর্শের দিক দিয়ে সমগ্র দেশের মধ্যে একটা ঐক্য ছিল। আজও তার পরিচয় পাওয়া যায় নিরক্ষর চাষীদের মধ্যে। আদর্শ-হীনতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা প্রধানতঃ ইংরেজীশিক্ষিতদের মধ্যে। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের দিকে তাকালে এর

দৃষ্টান্তের অভাব ঘটে না। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—Everything is fair in love and war। Politicsটা আমাদের দেশের রাজনৈতিকেরা war-এর মধ্যেই গণ্য করেন। কাজেই সেখানে মিথ্যা, ছলচাতুরী কিছুই তাঁরা দোষাবহ মনে করেন না, কারণ তাঁদের ইংরেজ গুরুরা এই বৃত্তিরই অনুসরণ করে' এসেছেন। কয়েকটা ভোট কাড়বার জন্য যে কোনও পরিমাণ উৎকোচ দেওয়া, কি নীচ আচরণ করা আমাদের অনেক শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিকেরা দোষাবহ বলে' মনে করেন না। তেমনি ব্যবসায়ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য মিথ্যা ছলচাতুরী শুধু যে নিরন্তর চলছে তা নয়, লোকে সেটাকে নিতান্ত অন্যায় মনে করে না। ব্যবহারজীবিদের আদর্শ ন্যায়সংরক্ষণ ও ন্যায়বিতরণ, কিন্তু উকীলদের মধ্যে ছলচাতুরীর অভাব নেই। এ বিষয়ে অভিযোগ করা যায় না, অভিযোগের কথা উঠলেই লোকে বলে—উকীলেরা ত ওরকম করবেই। যতখানি মিথ্যা, ছলচাতুরী আমাদের ইংরেজী-শিক্ষিতদের মধ্যে চলছে ততখানি নিরীহ গ্রামবাসীদের মধ্যে চলে না। এর কারণ এই যে আমাদের ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশে, ভূষায়, আচারে, ব্যবহারে, আদর্শে ও ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রবেশ করেছে ইউরোপীয় জাতিদের অশুচিতা এবং পাপ। এই জন্যই ইংরেজের বশ্যতায় আমরা যে শুধু রাষ্ট্রগত স্বাধীনতা হারিয়েছি তা নয়, আমরা হারিয়েছি আমাদের আত্মগত ও অধ্যাত্মগত স্বাধীনতা।"

সুজাতা আবার প্রশ্ন করলে—"মুসলমানেরা আমাদের এই আদর্শকে তেমন হীন করতে পারে নি যেমন করেছে ইউরোপীয়েরা, এই আপনি বলছেন। এর কারণ কি?"

কানাই বল্লে—"আমার মনে হয় এর দুটো কারণ। একটা কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতি হাত করেছে ইংরেজেরা।

মুসলমানদের সময়ে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল আমাদের হাতে, মুসলমানেরা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে হাত দেয় নি। ইংরেজেরা ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে নানা উপায়ে ইংরেজ-জাতির নানা গৌরব এবং সেই গৌরব কতখানি ধন ও বলের উপর প্রতিষ্ঠিত তা এমন করে' আমাদের কাণের মধ্যে ঝঙ্কৃত করেছে, আমাদের চোখের সামনে এমন উজ্জ্বল করে' ধরেছে যে আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত ও মূঢ় হয়ে গিযেছি। আর প্রত্যক্ষতঃ তারা দেখাচ্ছে তাদের ধন ও বলের মহিমা। তাদের বিজ্ঞানকে তারা করেছে ধনের বাহন, তাই বিজ্ঞানের চেয়ে বল হয়ে উঠেছে আমাদের কাম্য, অথচ সে বল আমাদের পাওয়ার উপায় নেই। ধনের লোভ আমাদের যত বেড়েছে, আমাদের জীবনযাত্রার মানদণ্ড আমরা যত উর্দ্ধে উত্তোলন করেছি, ততই হয়েছি আমরা ক্ষীণবিত্ত। অঙ্কের ভাষায় বলতে গেলে, লোভ বেড়েছে geometrical progressionএ আর লাভ ঘটেছে তার inverse progressionএ। এর চেয়ে বড় শোকোদ্দীপক ছবি আর কেউ কল্পনা করতে পারে? এই দিক দিয়ে আসছে আমাদের মৃত্যু ঘনিয়ে, কেবলমাত্র পররাষ্ট্রের পরাধীনতা নয়।"

সন্ধ্যা আসন্ন হয়ে এসেছিল। পশ্চিমের জানালা দিয়ে সোনালি মেঘের ছায়া ক্রমশঃ আসছিল ধূসর হয়ে, যেমন ধূসর হয়ে আসে জীবনের প্রান্তভাগে মরণের ছায়া। পার্শ্বস্থ আম্রবৃক্ষের পাখীরা আসন্ন দৃষ্টিহীনতার নিগূঢ় ব্যথা ব্যঞ্জিত করে' তুলছিল তাদের যৌথ কল-ঝঙ্কারে। বৈকালী মেঘ সমস্ত আকাশকে আচ্ছাদিত করে' এনেছিল। দিনান্তের রজনীগন্ধা সমস্ত দিনের সাধনার ফলে বিকীরণ করছিল তার সুঘ্রাণের মৃদুমন্দ আবেশ, তারই প্রতিধ্বনি আসছিল কমনীয় হেনাকুঞ্জ থেকে। রাস্তার বাতি উঠেছিল জ্বলে'। মেঘের মধ্য দিয়ে

চাঁদের পরিবেশটি জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছিল। কানাই বাইরের দিকে চেয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"দেখুন, আজ আপনাদেব অনেকখানি সময় নষ্ট করলুম, সেজন্য আমি বিশেষ লজ্জিত।" এই বলে' ছু'টি হাত একত্র করে' নম্রভাবে একটি নমস্কার করল।

প্রভা তাড়াতাড়ি উঠে বল্লে—"আপনাকে আজ আমরা কেবলই বকালুম। আপনি ত খেলেন না কিছুই। আমরাও আপনাব কথা এমন মুগ্ধ হয়ে শুনছিলুম যে আপনাকে যে একটু যত্ন করে' খাওয়াব সে কথা মনেই ওঠে নি।"

রঞ্জন বল্লে—"কানাই-দা ত বেশী খায় না, আর খায় ত শুধু নিরামিষ।"

প্রভা আবার বল্লে—"কিন্তু তুই ত বলিস্ ওঁর গায়ে বিলক্ষণ শক্তি।"

কানাই হেসে বল্লে—"নিরামিষ খেলেও যে বল থাকতে পারে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে হাতী।"

রঞ্জন আবার বল্লে—"তোমরা খালি আজে বাজে গল্প করে'ই সময় কাটালে, কানাই-দা'র বলটা একেবারে তোমরা দেখলে না।"

প্রভা বল্লে—"আরে পাগলা ছেলে, বল কি চোখে দেখা যায় নাকি?"

রঞ্জন একেবারে বেঁকে দাঁড়াল। বল্লে—"কানাই-দা, একবার একটা কিছু দেখিয়ে যাও।"

কানাই সস্নেহে তার গলায় হাত দিয়ে বল্লে—"কি দেখাব রঞ্জন?"

রঞ্জন বল্লে—"না, কানাই-দা, একটা কিছু না দেখিয়ে গেলে দিদিরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।"

অজয়ের নিজের মনে একটু শক্তির গৌরব ছিল। সে একটু শ্লেষের সঙ্গে বল্লে—"ওঁর গায়ে খুব জোর নাকি?"

রঞ্জন এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল। দেখতে পেল ঘরের কোণে পুরোণো আমলের একটি লোহার সিন্দুক পড়ে' আছে, তার গায়ে অসংখ্য সিন্দূরের ফোঁটা, অনেক লক্ষ্মীপূজায় সে অর্ঘ্য পেয়েছে। অম্বুজাসুন্দরীর স্বামীর আমল থেকে সে সিন্দুকটি ঐখানেই ছিল, তাই অনেক বলা কওয়া সত্ত্বেও তিনি drawing room থেকে সেটিকে সরাতে দেন নি। প্রভা সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করে' হেসে বল্লে—"পারেন তোর কানাইবাবু ঐ সিন্দুকটা তুলতে? ওটা ছ'মণ চোদ্দ সের।"

কানাই বল্লে—"না, তুলতে পারব না, তবে খাড়া করে' দিতে পারি।"

এই কথায় অজয় লাফিয়ে উঠে বল্লে—"May I try a bit?"

প্রভা বল্লে—"নিশ্চয়।"

অজয় সিন্দুকের এক দিকের কড়া ধরে' অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করে' গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে ফিরে এল। বল্লে—"By Jove, how heavy! Would you try it?"

কানাই হেসে বল্লে—"পারব কিনা জানি না। আচ্ছা, একটু দেখি।" বলে' আস্তে আস্তে গিয়ে দু'হাত দিয়ে কড়াটি ধরে' আস্তে আস্তে সিন্দুকটিকে দিলে একেবারে খাড়া করে'। আবার ধীরে ধীরে তাকে নামিয়ে আনলে মাটির উপরে। একটুও শব্দ হ'ল না। সকলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইল।

রঞ্জন বল্লে—"এবার বুঝলে ত সবাই কানাই-দা'র কত জোর?"

কানাই শব্দমাত্র না করে' আবার একটি নমস্কার করে' ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুজাতা বসে' ছিল তার আসনের উপর, নির্নিমেষনেত্রে দেখছিল শক্তির অনায়াস লীলা। পুরুষের অন্তর-পৌরুষ যেমন নারীর চিত্তকে অভিভূত করে তেমনি অভিভূত করে তার বাহু বল, সাহস ও তেজস্বিতা। আদিম কাল থেকে নারী পুরুষের বাহুর আশ্রয়ে আপনাকে রক্ষা করে' এসেছে। তাই বলিষ্ঠতা, সাহস ও তেজস্বিতার প্রতি নারীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা তার ধমনীর রক্তে তার অনাদিকালের পিতামহীর কাছ থেকে সঞ্চারিত হয়ে এসেছে। আজ একটি স্থানে সুজাতা দেখল বাহুর বল, অন্তরের বল ও বুদ্ধির দীপ্তি এই ত্রিবেণীর পুণ্য সঙ্গম। তার সমস্ত শরীরমন একটা নূতন চাঞ্চল্যে সাড়া দিয়ে উঠল। কানাই যখন ধীর পদসঞ্চারে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সুজাতার ইচ্ছা হ'ল সে দৌড়ে গিয়ে ধরে' এনে তাকে বসায়। এমনি তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল যে সে থম্‌কে গিয়ে নিজের দিকে তাকাল। হঠাৎ যেন তার মনে হ'ল যে সে সত্যই বুঝি এই রকম একটি দুর্ব্বিনীত কর্ম্ম করে' বসেছে। আস্তে আস্তে চারিপাশে অবলোকন করে' তার মনটা সুস্থ হ'ল যে অন্ততঃ এমন একটা কাজ সে করে' বসে নি।

রাত্রে বিদ্যালয়ে ফিরে সুজাতা কিছুই খেলে না, শয্যাশ্রয় করলে। যতবার চোখ বোজে, ভেসে ওঠে কানাইয়ের মূর্ত্তি। বারবার চেষ্টা করতে লাগল স্বকু-দা'কে মনের সামনে টেনে আনবার, কিন্তু যতই টেনে আনতে চায়, মনের মধ্যে ভেসে ওঠে কানাইয়ের মুখ। তার দীপ্তিব্যঞ্জক ওজস্বিনী ভাষা তার কাণের মধ্যে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠতে লাগল। সে আপনাকে তিরস্কার করতে লাগ্‌ল—কোথাকার কে একজন, চায়ের

সভায় দেখা হয়েছে, হোক্ না সে বুদ্ধিমান, বলশালী, বিচক্ষণ, তারই কথা বার বার মনে পড়বে এমন অশৃঙ্খল হবে কেন তার মন? অনেক জোর করে' মনে আজে-বাজে জিনিষ সে ভাবতে লাগ্‌ল। ভাবতে লাগ্‌ল, ধানের ক্ষেতে চরে বেড়াচ্ছে একদল ভেড়া। আরও কত কি ভাবতে ভাবতে শেষে পড়ল ঘুমিয়ে। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে সে হঠাৎ কি একটা স্বপ্ন দেখে' জেগে উঠল—যেন কে একটা কালো লোক তার বিরাট দুই বাহুতে তাকে গ্রহণ করে' একখানা নৌকোয় চড়িয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে তাকে স্রোতের টানে কোন্ মহাসাগরের দিকে। নিজের দিকে তাকিয়ে সে দেখলে তার পরণে চেলির কাপড়, কপালে সিন্দুর। ঘুম ভাঙার পর আবার সেই চায়ের বৈঠকের ছবি তার সামনে ভেসে উঠ্‌ল। সে রাত্রে আর তার ঘুম হ'ল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ক'দিন ধরে' সুজাতা বড় কারও সঙ্গে মেশে না, এমন কি মঞ্জরীর সঙ্গেও নয়। সে এম্-এস্-সি পাশ করেছে, লেখাপড়ার জীবনের চল্‌তি গণ্ডীটা সে পার হয়েছে। এর পর যে কি করতে হবে তার কোনও সুস্পষ্ট ধারণা তার মনে নেই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গতির কেন্দ্র চারটি ষ্টেশনে বিভক্ত। পাহাড়ের উপর থেকে রেল লাইনের উপর ট্রলি ছেড়ে দিলে সে আপন গতিতে ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করে' সমতলক্ষেত্রে এসে দাঁড়ায়। সেখানে আর ঢালু নেই, তাই তার গতি যায় থেমে। তেমনি আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ম্যাট্রিকুলেশন থেকে রওনা হয়ে এম্-এ বা এম্-এস্-সি পর্য্যন্ত ছেলেরা অনায়াসে গড়িয়ে

আসে। তখন পর্য্যন্ত তারা বিরাট যে জীবনের ক্ষেত্র আছে সে সম্বন্ধে সজাগ হবারই অবসর পায় না। সে সম্বন্ধে তাদের সচেতন করতে চেষ্টা করলেও কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। তাদের সামনে থাকে কয়েকটি পাশের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ক'টি বিদ্ধ করতে হবে এই থাকে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য। পাশ করলে উপাধিপত্রের একটা মূল্য আছে এ কথা তারা জানে এবং ভাল উপাধিপত্র অর্জ্জন করার সঙ্গে সঙ্গে যে নগদ বিদায়ের খ্যাতিটুকু আছে তাও তারা জানে। কিন্তু যা পড়াশুনা করেছে, জ্ঞান হিসাবে যে তার কোনও মূল্য আছে তা তারা কখনই প্রায় অনুভব করে না। কি জাতীয় প্রশ্ন পরীক্ষায় আসতে পারে তার একটা statistics কষে' তারা তার একটা ছক্ কেটে নেয় এবং ভাল ছেলেরা সে সমস্ত সম্ভাব্যমান প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করে' মুখস্থ করে' রাখে। তাদের জালে যদি প্রশ্নকর্ত্তার অধিকাংশ প্রশ্ন ধরা পড়ে তবে তারা প্রশংসার সহিত পাশ-মার্কা পেয়ে থাকে। জীবনে যে জ্ঞানের কোনও উপকারিতা আছে তা কিছুতেই তাদের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সেই জন্য জ্ঞান অপেক্ষা পরীক্ষা ব্যাপারে কৌশলই অধিকতর কার্য্যকর হয়ে থাকে। কিন্তু পরীক্ষার প্রান্তে পৌঁছে জীবনের যে বিরাট ক্ষেত্র পড়ে' থাকে, সেই মহাব্যূহে প্রবেশ করবার মন্ত্র তাদের থাকে সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত। নিজেদের কোন্ বিষয়ে শক্তি, কোন্ বিষয়ে রুচি, তা তারা কিছুমাত্র আবিষ্কার করে নি। নানা বিষয়ের অনেক খবর তারা রাখে, শুধু নিজেদের বিষয়ের কোনও খবরই তারা রাখে না। তাই বিরাট জীবনের ক্ষেত্রটা যখন তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন তারা যে কোন্ দিকে চলবে সে সম্বন্ধে একান্ত দিশেহারা হয়। চাওয়ার তাদের কোনও সীমা নেই, কি চায় তা তারা জানে না। তাই, যা পায় তাই নিয়েই তাদের চাওয়ার সীমানা খুঁজতে হয়।

অধিকাংশের পক্ষেই এই পাওয়াটা অর্থপ্রাপ্তি। নিজেদের উপর কোনও ভরসা নেই, কোনও সাহস নেই। নিজেদের বিদ্যাকে কার্য্যে প্রয়োগ করতে তারা অসমর্থ। কোন্ কার্য্যের তারা উপযুক্ত, কোথায় তাদের রুচি, এ সমস্ত বিষয়েই তারা একান্তভাবে অনভিজ্ঞ। ঘোড়াকে যেমন ছোলার তোবড়া দেখালে সে হ্রেষাধ্বনির সহিত সেখানে উপস্থিত হয় তেমনি চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখলে এই সমস্ত উত্তীর্ণপরীক্ষ তরুণেরা তার জন্য আবেদন করে এবং ভাগ্যে যা জুটে যায় সেই জোয়ালটাই কাঁধে নিয়ে আজীবন চোখে ঠুলি লাগিয়ে চাবুকনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটতে থাকে। নিজেদের রুচি, দক্ষতা, আদর্শ, এ সমস্তই তাদের শিক্ষা-জীবনে ধোঁয়ার মত নিতান্ত মিথ্যা হয়ে থাকে, তাই জীবনে সেগুলির তারা সন্ধান পায় না।

মেয়েদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাহ। কাজেই, অধিকাংশ নারী আপন ভাগ্য নির্ণয় করতে অক্ষম। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যে রকম ভার তাদের কাঁধে পড়ে আমরণ সেই ভারটুকু প্রচলিত পন্থা থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত না হয়ে তারা বহন করে' যাবে, এই হ'ল বিবাহিতা মেয়েদের জীবনের তাৎপর্য্য। সৌভাগ্যক্রমে ভাল বিবাহ হ'লে আলস্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও স্বামীর সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হয়ে আপন আপন অভিমান, আলস্য ও বিলাসের প্রশ্রয় দেওয়া—এই হ'ল নারী জীবনের পরিণতি। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে যেটুকু ব্যক্তিত্ব বা চরিত্রবল আছে, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাকে প্রকাশ করে' আপন আপন সংসারকে সুখী করা—এই হচ্ছে নারীর কর্ত্তব্য ও সমাজ ব্যবস্থা।

যাঁরা প্রাণবিজ্ঞান অবগত আছেন তাঁরা জানেন যে, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, উভয়ের মধ্যেই স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব-নির্ণায়ক ধর্ম্ম ন্যূনাধিক পরিমাণে

মিশ্রিত থাকে। কোন কোন পুরুষ, পুরুষ হয়েও চরিত্রে নারী-ধর্ম্মাক্রান্ত এবং কোন কোন স্ত্রী, স্ত্রী হয়েও অন্তরে একটু অধিকভাবে পুরুষধর্ম্মাক্রান্ত। এই জাতীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে নারীসুলভ নিশ্চেষ্টতা বা passivity তেমন থাকে না যেমন থাকে পুরুষসুলভ উৎসাহ। উৎসাহ ও বেগই পুরুষ-নির্ণায়ক ধর্ম্ম। তাই বাহ্যত যাদের পুরুষ বলে' মনে হয় তাদের অনেকের মধ্যে নারীসুলভ নিশ্চেষ্টতা ও নিশ্চেষ্টতাসুলভ বিলাসপ্রিয়তা ও পরাপেক্ষিতা প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। আবার অনেক নারীর মধ্যে দেখা যায় পুরুষসুলভ সচেষ্টতা, স্বাবলম্বিতা, সহিষ্ণুতা ও আদর্শের প্রেরণা।

সুজাতা ছিল এই প্রকৃতির মেয়ে। তার ধনের অভাব ছিল না, রূপসী বিদুষীও বটে। পাত্রও নিকটে উপস্থিত ছিল। ইচ্ছা করলে সে অনায়াসে স্ত্রীসুলভ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে' যেতে পারত এবং মনের আনন্দে বাকীটা জীবন বিলাসের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পারত। পুরুষের জীবনে বিলাস যেমন কাপুরুষতার লক্ষণ ও নিন্দনীয়, স্বামীর মনোহরণ যেখানে প্রধান লক্ষ্য সেই জীবনে বিলাসই হয় আবার তেমনি একটি আদরণীয় গুণ, স্বামীসৌভাগ্যের কারণ। সুজাতার মনে কৈশোর অবস্থা থেকেই জ্বলত একটা আগুন—সে কিছু একটা করবে, তার সমস্ত জীবন সে ক্ষয় করবে না ভর্ত্তৃবাল্লভ্যের অনুসন্ধানে। কিন্তু কি যে সে করবে, কোথায় তার সামর্থ্য, কোথায় তার সার্থকতা, তার কিছুই সে আবিষ্কার করতে পারে নি। মনের এই যে একটা অবস্থা, অভিজ্ঞেরা জানেন সেটা কি কঠোরভাবে পীড়াদায়ক। একটা বড় ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে দড়িতে বেঁধে যদি চাবুক মারতে থাকা যায় তবে সে তার নিষ্ফল বেগের গর্ব্বে ও তাড়নায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে, মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় সে নিজের তেজে নিজে দগ্ধ

হ'তে থাকে। তেমনি সুজাতার অন্তরে ছিল দুর্দ্দমনীয় শক্তি এবং সেই শক্তি জাগ্রত করেছিল শক্তির চেতনাকে, কিন্তু পথ ছিল তার অবিজ্ঞাত। এ সেই শক্তি, যে শক্তি আপনার মধ্যে আপনি উপচিত হ'তে থাকে এবং পরিশেষে আপনার বেগে সেতু, বাঁধ চূর্ণ করে' প্রবাহিত হয় দুর্দ্দাম বেগে গিরিদরীকন্দর চূর্ণ করে', অপেক্ষা করে না কোনও খাল-কাটা ইঞ্জিনিয়ারের।

কৈশোরে ও যৌবনোন্মেষের প্রাগ্‌দশায় সুজাতার বাবা তাকে নানা বিষয়ে নানা শিক্ষা দিতেন। আমরা নানা লোকের কাছে যে নানা শিক্ষা পাই, নানা বই থেকে যা আহরণ করি, জলস্রোতের ন্যায় তা সবই প্রায় যায় ভেসে, কদাচিৎ কোনও একটা কথা এমন একটা রসের সঙ্গে হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে যায় যে তা হয়ে থাকে চিরকালের সম্পত্তি। সুজাতার বাবা সুজাতাকে শেখাতেন 'আত্মানং বিদ্ধি', নিজেকে জান, নিজেকে জানলেই সমস্ত জানার ফল পাবে। কথাটার সে ভাল করে' অর্থ বোঝে নি। অনেকবার কথাটা ভেবেছে কিন্তু তার তাৎপর্য্য বুঝতে পারে নি। তবু কথাটা নিয়েছিল মূল তার হৃদয়ের মধ্যে। যখন সে কানাইয়ের কাছে শুনল যে আমাদের চরম সার্থকতা হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করবার মধ্যে, তখন অবচেতনার কি এক সূক্ষ্ম গতিতে এ কথা গিয়ে মিলিত হ'ল তার পিতার কথার সঙ্গে; বাবা বলেছেন,—নিজেকে জান, এ ভদ্রলোক বলছেন,—নিজেকে প্রকাশ কর। সে ভাবতে লাগ্‌ল—নিজেকে জান্‌ব তবে প্রকাশ করব, না নিজেকে প্রকাশ করব তবে নিজেকে জান্‌ব? সে আরও ভাবতে লাগ্‌ল—জান্‌ছি ত আমরা কিছু না কিছু সকল সময়েই, কিন্তু সে কতটুকু? সে সত্য না মিথ্যা? সে সুন্দর না অসুন্দর? আর জানারও ত কোনও শেষ নেই। সমস্ত জানা শেষ হবে, তবে

প্রকাশ করতে আরম্ভ করব এ ত একটা অসম্ভব ব্যাপার। তা ছাড়া, কেবল জানা দিয়ে যদি নিজেকে পূর্ণ করতে থাকি তবে আত্মপ্রকাশের যে বৃত্তি, যে পথে মনের স্রোত বেরিয়ে আসবে বাইরের জগতে, সে পথ যাবে শেওলায় আচ্ছন্ন হয়ে, আত্মপ্রকাশ হবে অসম্ভব। এজন্য তার মনে হ'ল—যা বুঝি, যা নিজের কাছে সৎ এবং সাধু বলে' মনে হয়, তাকে যদি প্রকাশ করতে চেষ্টা করি, মনের ভাণ্ডে যা জমে' ওঠে তা যদি ঢেলে দিই বাইরের জগতে, তবেই মনের সেই ভাণ্ড পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকবে নব নব রসে, নব নব চেতনায় ও নব নব উদ্যমে। কিন্তু তখনই প্রশ্ন এল—কি প্রকাশ করব? দৈনন্দিন কথাবার্ত্তায় বন্ধুদের কাছে যে সমস্ত আলাপ আলোচনা ঘটে তার মধ্য দিয়ে নিজের সমস্ত সত্ত্বাকে প্রকাশ করা যায় না, সেগুলো যেন স্রোতে-ভাসা ফুল, সেগুলোকে বাইরে নিক্ষেপ করলে স্রোতের পথ উন্মুক্ত হয় না। কথায় যা প্রকাশ করতে হবে তার সামগ্রী যখন অতি কম তখন নিজের স্রোতকে উন্মুক্ত করতে হ'লে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কাজের মধ্যে। শুধু কথায় মত প্রকাশ করা নয়, জীবনের কাজের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের স্রোতকে দিতে হবে উদ্দাম করে', উন্মুক্ত করে'। রাখা ঢাকার কারবারে, পাটোয়ারী বুদ্ধিতে, লাভালাভের বিবেচনায় এ কাজ সম্পন্ন হবার উপায় নেই, এ তার অন্তরের বেদনা, অন্তরের তাড়না। এক নিমেষেই সে যেন আজ তার গুপ্ত রহস্য অনুভব করতে পারল যে তার অন্তরের শিল্পী যে মূর্ত্তি তার অন্তরের মধ্যে গড়ে' তুলেছিলেন আজ তিনি দাবী করছেন যে সে মূর্ত্তি যত অসম্পূর্ণ, যত অসমাপ্ত হোক্ না কেন, তাকে আজ বের করে' আনতে হবে বাইরের বাজারে যাচাই করতে। তার মনে হ'ল তার শক্তি কত ক্ষীণ, তার ক্ষীণ কণ্ঠে সে যে সাড়া দেবে তা শুনবে কে? আবার

সে ভাবলে—কিন্তু কে আসবে না আসবে, কে শুনবে না শুনবে, এ ত বাইরের প্রয়োজন, সে যে একলাই চলতে চায় তার চলার তাগিদে। আবার মনে হ'ল—আচ্ছা, কানাইবাবু কি করে' আত্মপ্রকাশ করেন? তিনি কি করে' নিজের স্রোত জগতের স্রোতের মধ্যে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন? বারবার মনে হ'তে লাগ্‌ল—যদি কানাইবাবুর খোঁজ নিয়ে তার সঙ্গে কথাটা একবার ঝালাই করে' নেওয়া যায়। হয় ত রঞ্জনের কাছে চেষ্টা করলে তাঁর ঠিকানাটা পাওয়া যায়, তাঁকে হয় ত একটা চিঠিও লেখা যায়। তিনি যে রকম সহৃদয় ব্যক্তি তাতে হয় ত অনুরোধ করলে তিনি আসতেও পারেন। কিন্তু এ কথাটা মনে হ'তেই কেমন একটা লজ্জায় তার কর্ণমূল লাল হয়ে উঠল। এ রকম লজ্জা সুজাতার পক্ষে একেবারে অনভ্যস্ত, কোনদিন কোন ব্যাপারে এ রকম একটা লজ্জা সে অনুভব করে নি। আজ তাই এর তাৎপর্য্য সে বুঝতে পারল না। কিন্তু সঙ্কোচের বাধা এমনই প্রবল হয়ে রুখে দাঁড়াল হৃদয়ের সামনে যে এ কাজটা করা হয়ে উঠল একেবারে দুঃসাধ্য। এমনি করে' হৃদয়ের দ্বন্দ্বে কাটতে লাগ্‌ল তার দিন অসহ্য তীব্র যন্ত্রণায়।

এর পরে কিছুদিন কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন মঞ্জরী গিয়ে উপস্থিত হ'ল সুকুমারের বাসায়। মঞ্জরী জিজ্ঞাসা করলে সুকুমারকে —"আর যে একবারও ওদিকে যাওয়া হয় না?"

সুকুমার বল্লে—"All-India Chess Competition-এ যোগ দিয়েছি। এ পর্য্যন্ত ৩৬টা খেলা খেলেছি। এইবার উঠেছি প্রায় 2nd roundএ, তাই একেবারেই সময় পাই না। তা আপনার সঙ্গে ত এর মধ্যে ৩।৪ বার দেখা হয়েছে।"

"আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ত আমি যেচে এসেছি বলে'। আপনার বান্ধবীটির খোঁজ ত একেবারেই নেন না।"

সুকুমার একটু অপরাধীর ভাবে বল্লে—"হ্যাঁ, এই দু'এক দিনের মধ্যেই যাব। ভারী excitement-এর মধ্যে আছি কি না।"

"আপনি ত আছেন excitement-এর মধ্যে, ওদিকে ত ভয়ানক কাণ্ড ঘটে' গেল। সুজাতা যে মহা ফ্যাসাদে পড়ে' গেছে।"

সুকুমাব এই কথা শুনে একেবারে ভয় পেয়ে চম্‌কে উঠল। বল্লে—"ফ্যাসাদ? তার আবার ফ্যাসাদ কি?"

হঠাৎ তার মনে পড়ল, বোটানিক্যাল গার্ডেনে সুজাতার সেই কথা—"আমাকে রক্ষা করবে না ত তোমার বলিষ্ঠ বাহু দু'খানা আছে কিসের জন্য?" তার পৌরুষ হযে উঠ্‌ল মনের মধ্যে উদ্রিক্ত, সে আবার বলে' উঠ্‌ল—"কি ব্যাপাব?"

মঞ্জরী বল্লে—"সে অনেকখানি হাঙ্গামা বাধিয়ে ফেলেছে। সে কিছু-দিন ধবে' কারুর সঙ্গে কথা কয় না, আলাপ আলোচনা করে না। আমাকেও যায় এড়িয়ে। মাছ মাংস ছেড়ে ধরেছে নিরামিষ, বসন-ভূষণ সাজসজ্জা সংক্ষেপ করে' এনেছে কেবল লজ্জা নিবারণের মধ্যে। তা এ খেয়ালও না হয় বরদাস্ত করা যেত। আপনি জানেন যে ছাত্রীসঙ্ঘের সে সভানেত্রী। সেই ছাত্রীসঙ্ঘের সে ডেকেছে একটা বিপুল সভা। সব কলেজের মেয়েদের সে করেছে একত্র, আর সেখানে এমন একটা বক্তৃতা দিয়েছে যে তার প্রতি কথায় ছুটিয়েছে আগুনের কণা, আগুনের হল্‌কা। এ সুজাতাকে যেন আর চেনা যায় না। যে সুজাতা ছিল নীরব, নিরীহ, একেবারে মাটির মানুষ, সেই সুজাতার দেখবেন দানব-দলনী মূর্ত্তি। উগ্রচণ্ডার মত তার ভাষা, আগুন ঠিক্‌রে আসছে তার চোখ থেকে, ক্ষেপিয়ে তুলেছে সে সমস্ত ছাত্রীসঙ্ঘের মেয়েদের।"

সুকুমার বিস্মিত হয়ে বল্লে—"বলেন কি ? কিসের জন্য ক্ষেপিয়ে তুলেছে ?"

মঞ্জরী বল্লে—"কিসের জন্য আর ক্ষেপাবে ? যার জন্য দেশের লোক আজ ক্ষেপে' উঠেছে। সে নেমেছে পলিটিক্সে। কিন্তু তার ক্ষেপাবার মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে। সে বলছে—ইংরেজরা আমাদের দেশে এসে তাদের কলুষিত আদর্শে আমাদের জীবনের স্রোত, জীবনের প্রবাহ দিয়েছে পঙ্কিল করে', কলুষিত করে', বিষাক্ত করে'। সে বলছে—মেয়েরা যেমন একদিকে অবলা, তেমনি অপর-দিকে তারা বলের জননী। যেমন নিশ্চল হয়ে থেকেও চুম্বক লোহাকে আকৃষ্ট করে, উদ্দীপিত করে লোহার বেগশক্তি, তেমনি শক্তিরূপিণী স্ত্রীজাতি উদ্বুদ্ধ করতে পারে পুরুষের শক্তিকে। পুরুষের শক্তি হয়ে এসেছে এ দেশে জড়, অলস, বিলাসপ্রিয়। আজ নারী ও পুরুষ একত্র হয়ে করতে হবে বীর্য্যের সাধনা, প্রকাশ করতে হবে আপনাদের ব্যক্তিত্ব, অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে আমাদের চিরন্তন আদর্শ। এই বিদেশী-য়েরা যে এসে আমাদের কোটি কোটি নরনারীকে তাদের নিজেদের ভোগের, বিলাসের, শক্তির উপকরণরূপে ব্যবহার করবে এ কখনই হ'তে পারে না। সমস্ত ইংরেজ জাতির, সমস্ত ইউরোপীয়দের একচ্ছত্র রাজত্ববাদের বিরুদ্ধে করতে হবে আমাদের বিদ্রোহ ঘোষণা। সনাতন হিন্দুবংশে আমাদের জন্ম, সনাতন বীরদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে আমাদের ধমনীতে। আজ জীবনমরণের সংগ্রাম উপস্থিত হয়েছে। এই জীবনমরণের সংগ্রামে আমাদের মঙ্গলের কাজ আমরা নিজেরা নিষ্পন্ন করব। মুষ্টিমেয় ইংরেজের দাসত্বে আমাদের জীবন আমরা কিছুতেই কলঙ্কিত হ'তে দেব না। সে কি অগ্নিময়ী বক্তৃতা, অগ্নিময়ী ভাষা! আরও বিপদের কথা এই যে মেয়ের দল ক্ষেপে' উঠে হল্-ঘরে

যে সম্রাটের একটা ছবি ছিল সেটাকে ভেঙে চূর্ণ করেছে। মহা কোলাহল, হৈ চৈ। মেয়েরা সব সুজাতাকে কাঁধে করে' নিয়ে সমস্ত প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করছে, দলে দলে মেয়েরা তার কাছে যাচ্ছে। এমনিই ত সে ভারী popular, এবারে একেবারে সকলের নেত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

সুকুমার বল্লে—"তা আপনি চুপ করে' ছিলেন কেন? আপনি গিয়ে তাকে বোঝাতে পারলেন না?"

"ওরে বাপ রে, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা? আমি তার মতের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে গেলে মেয়েরা আমাকে টুকরো করে' ছিঁড়ে ফেলবে না?"

"তা আপনি করলেন কি?"

"আমি ত তার কথার সঙ্গে হাঁ হাঁ করে' সায় দিয়ে গেলুম। তাই ত আপনার কাছে ছুটে এলুম, আপনি যদি বুঝিয়ে শুঝিয়ে কিছু করতে পারেন। সুজাতা ত এখন কলেজের ছাত্রী নয়, বরাবর কলেজে পড়েছিল বলে' এখনও হোষ্টেলে তার জায়গা রয়েছে। প্রিন্সিপাল কড়া warning দিয়েছে এবং সুজাতাকেও হুকুম দিয়েছে হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে যেতে। আনাচে-কানাচে পুলিশের চরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকছে, কখন কি হয় বলা যায় না। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। এমন সব গোয়ার্ত্তুমির মধ্যে যাওয়ার দরকার কি? এখন যদি ধরে' নিয়ে জেলের মধ্যে পুরে রাখে, কোথায় থাকবে ভোগসম্ভোগ, কোথায় থাকবে মান ইজ্জৎ? সুজাতা যে এমন পাগলামি করতে পারে তা কখনও মনে ভাবি নি।"

সুকুমার বল্লে—"তা, আমি কি করতে পারি?"

মঞ্জরী বল্লে—"আপনি ত তার এক রকম অভিভাবক, আপনি গিয়ে দেখুন কি করতে পারেন।"

সুকুমারের গায়ে বিলক্ষণ শক্তি ছিল। অন্তরেও যে সাহস একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু সে বিলাসী এবং আরামপ্রিয়, চিরকাল ঐশ্বর্য্যে ও বিলাসে কেটে এসেছে তার দিন। নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাতে চায় সে তার জীবনটা। সুজাতার দিকে এখনও তার আকর্ষণ ছিল, অথচ তার অনেকখানি ক্ষুধা মিটে যাচ্ছিল মঞ্জরীর সঙ্গে। তথাপি একটা নাড়ীর টান বেঁধে রেখেছিল তাকে সুজাতার সঙ্গে। আজ এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সুজাতাকে বিনা বাক্যব্যয়ে ছেড়ে দেবে এ কথা ভাবতেও তার পৌরুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সে বল্লে—"বেশ. তা হ'লে চলুন, এখনই আমরা দু'জনে যাই তার কাছে।"

মঞ্জরী বল্লে—"আমার আর যাওয়ার দরকার কি? লোকে বলবে আমিই আপনাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছি সুজাতার মত বদলাবার জন্য।"

সুকুমার বল্লে—"তাতে ক্ষতি কি? আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন?"

"আপনি ত বেশ বল্লেন—ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনার ত আর মেয়েদের সঙ্গে থাকতে হয় না। সুজাতার মতের বিরুদ্ধে একটি কথা বললে মেয়েদের মধ্যে আর মুখ দেখাতে পারব? আপনি গেলে সে স্বতন্ত্র কথা।"

সুকুমার জামাচাদর পরে', তার মোটরখানা ডাকিয়ে রওনা দিলে মেয়েকলেজের দিকে। মেয়েকলেজের দরজায় উপস্থিত হওয়ামাত্রই গেটের দারোয়ান দিলে তাকে বাধা। দারোয়ানকে সে জিজ্ঞাসা করল—"সুজাতা কই?" দারোয়ান বল্লে—"সুজাতা বাবা হিঁয়া সে চলি গই, কাঁহা গই কহনে নহি সকতা।"

স্কুমার পড়ল ফ্যাসাদে। কিছুক্ষণ রাস্তার কোণে অপেক্ষা করে' সে বুঝতে পারলে যে প্রিন্সিপালের কোন বিশেষ আদেশে আজ কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বা ভিতরের কাউকেও বাইরে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু পথের এ কোণে সে কোণে সে মেয়েদের জটলা দেখতে পেলে। সঙ্কোচের সঙ্গে ধীরে ধীরে একটি দলের সম্মুখীন হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—"এই হোষ্টেলে স্থজাতা দেবী কোথায় আছেন বলতে পারেন?"

তারা বল্লে—"প্রিন্সিপালটা স্থজাতা-দি'কে হোষ্টেল থেকে চলে' যেতে বলেছে। তাঁকে আমরা অন্য এক জায়গায় নিয়ে গেছি। আপনার তাঁর সঙ্গে কি দরকার?"

স্থকুমার বল্লে—"আমি তার দাদা হই, তার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।"

একটি মেয়ে বল্লে—"এই ত কাছেই তাঁব বাড়ী। আস্থন, আপনাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।"

স্থকুমার ড্রাইভারকে পিছনে আসতে ইঙ্গিত করে' ধীরে ধীরে মেয়েটির সঙ্গে রওনা দিলে। কাছেই একটা দ্বিতল বাড়ী। স্থকুমারকে নীচে রেখে মেয়েটি গিয়ে উপরে খবর দিলে যে স্থকুমার বাবু বলে' একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান। স্থজাতা যেন হাতে স্বর্গ পেল।

মনের উত্তেজনায় কয়েকদিন কাটিয়ে স্থজাতা একদিন দেখতে পেল আনন্দবাজার পত্রিকায় মৈমনসিংহে কানাইলাল সেনের ওজস্বী অভিভাষণ। অভিভাষণের মর্ম্মের সঙ্গে আরও অনেক মন্তব্য দেওয়া ছিল। সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে সে জানতে পারলে যে কানাইবাবু যে কেবলমাত্র দেশের লোককে সচেতন হবার জন্য এবং ইউরোপীয়

আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য ওজস্বী ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছেন তা নয়, তিনি স্থানে স্থানে দল গঠন করে' গ্রামবাসীদের এই সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন এবং নিজেদের দেশের শিক্ষার ভার যাতে সরকারের বিনা সাহায্যে নিজেদের হাতে নেওয়া যায় এইজন্য অর্থসংগ্রহ করছেন, নিরক্ষর লোকদের পড়ার জন্য নৈশ-বিদ্যালয় খুলছেন, বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করে' স্বদেশী দ্রব্যের দ্বারা যাতে নিজেদের সমস্ত অভাব পূরণ করা যায় এবং সেই হিসাবে নিজেদের জীবনযাত্রার আদর্শ যাতে খাটো করে' আনা যায়, সেইজন্য নানা উদ্যোগ আরম্ভ করে' দিয়েছেন। মন্তব্য থেকে আরও একটু আভাস পাওয়া গেল, হয় ত বা কোনও গুপ্ত বিদ্রোহেরও তিনি আয়োজন করছেন। তিনি নিরামিষাশী হ'লেও তাঁর উপায়টি নিতান্ত অহিংস বলে' মনে হ'ল না। অনেক জায়গায় অনেক রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গেও তাঁর দৈহিক সংঘর্ষ ঘটেছে। কানাইয়ের দৃষ্টান্ত দেখে' সুজাতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, কি রকমে নিজেকে প্রকাশ করবে তার যেন একটা পথ খুঁজে পেল। তার হাতে ছিল ছাত্রী-সঙ্ঘ, সেইটেকেই করলে সে আত্মপ্রকাশের অস্ত্র। দাহ্যবস্তু যে চারিদিকে প্রস্তুত ছিল এ কথা সুজাতার তেমন জানা ছিল না। একটা বক্তৃতাতেই যে ছাত্রীদের মধ্যে এতখানি সাড়া জেগে উঠ্‌বে তা সে কল্পনাও করে' উঠতে পারে নি, কিন্তু ফলটা যখন এতখানি উগ্র হয়ে উঠ্‌ল তখন তার নারীস্বভাবে সে একটু ভীত হয়ে উঠ্‌ল। সবচেয়ে সে মুষড়ে পড়ল যখন প্রিন্সিপালের হুকুম এল হোষ্টেল ছাড়বার জন্য। ক্রিয়ামাত্রেরই যে একটা প্রতিক্রিয়া আছে তা জানে যারা কার্য্যকুশলী। যে কোনদিন কিছু করে নি, সে কার্য্যের সুফল কুফল উভয়তেই বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। যখন সাড়াটা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল সমগ্র ছাত্রীদের মধ্যে তখন তার মনে ভয় হ'ল যে এতবড়

ব্যাপারটাকে সে সামলাবে কি করে'। নেতৃত্বের প্রতি তার লোভ ছিল না, কিন্তু নেতৃত্ব যখন এসে পড়ল তার হাতে তখন সেটাকে যদি ঠিকরকম ব্যবহার করতে না পাবে তা হ'লে যা আরম্ভ করেছিল সমস্তই যাবে পণ্ড হয়ে, মধ্য থেকে অনেকগুলি ছাত্রী হয়ে পড়বে অধ্যক্ষের বিদ্বেষভাজন। নিজের জন্য সে ভয় করত না, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার বিপুলতায় সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। প্রথমেই তার মনে হ'ল—পেতুম যদি একবাব কানাইবাবুকে, তা হ'লে তাঁর উপদেশমত বুদ্ধি ঠিক করা যেত। কিন্তু কানাইবাবু যে কোথায় ঘুরছেন, কি কাজ করছেন তা তার কিছুমাত্র জানা ছিল না। তারপরেই মনে এল স্বকুমারের কথা। তিনি যদি একবার কাছে দাঁড়াতেন ত তাঁকে সঙ্গে নিয়েও অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যেত। কিন্তু নিজে এতখানি ফ্যাসাদে জড়িয়ে তাঁকে এখন ডাকা যায় কি করে? সেইজন্য স্বকুমাব নিজে এসেছে শুনে সে যেন অকূলে কূল পেল।

স্বকুমার ঘরে ঢুকেই প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা কবলে—"কি রে স্বজি, এ সব কি ফ্যাসাদ বাধিয়েছিস্?"

স্বজাতা নম্রমুখে বল্লে—"তা তুমি আমাকে বকতে পার। তোমাকে ত আমি বলে'ই রেখেছি যে যখন যে বিপদে পড়ব তোমার দু'খানি বলিষ্ঠ বাহুই আমাকে রক্ষা করবে। এই আশ্বাসেই ত ফ্যাসাদকে ফ্যাসাদ বলে গণ্য করি না।"

স্বকুমার গম্ভীর হয়ে বল্লে—"এ ফ্যাসাদ ত যে-সে ফ্যাসাদ নয়, এ হচ্ছে রাজশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্ব।"

স্বজাতা হেসে বল্লে—"রাজদ্বার থেকে শ্মশান পর্যান্ত একটা সোজা সড়ক আছে, সেইজন্য যথার্থ বন্ধু যে, তার সাক্ষাৎ এই দুই জায়গায়ই

পাওয়া যায়। তাই আজ রাজদ্বারে যখন দাঁড়িয়েছি তখন তুমি এসে দাঁড়িয়েছ তোমার দুই বলিষ্ঠ বাহু নিয়ে।”

সুকুমার বল্লে—“আচ্ছা, একটা কথা শোন্। যা করেছিস্, করেছিস্। চুপচাপ্ করে' এখানে দিনকতক থেকে যা, আর ফ্যাসাদে নামিস্ নি। চল্ আমার সঙ্গে, কোনও একজন বড় প্রফেসারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যোগ দে।”

সুজাতা বল্লে—“এই কথাটা যদি আগে বল্‌তে এবং আগে এসে আমাকে এইরকম একটা কাজ ধরিয়ে দিতে ত সে ছিল অন্য কথা। গবেষণার কাজে আমার প্রচুর আগ্রহ আছে। এ পথে এতদিন তার কোনও হদিস্ না পেয়ে বুকের স্রোত উঠ্‌ছিল ফাঁপিয়ে, বাঁকা পথে ছুটেছে তার গতি। সে গতিকে আমি সামলাই কি করে' ?”

সুকুমার বল্লে—“বাঁকা পথে যদি চলে'ই থাক ত সেখান থেকে সরে' এসে আবার সোজা পথে চল্‌তে তোমাকে ঠেকায় কে ?”

সুজাতা বল্লে—“দেখ সুকু-দা, চলা না-চলা সব নিজের হাতে নয়। আমাদের অলক্ষ্যে আমাদের অন্তর্যামী দেন পথ এঁকে, ছুটিয়ে দেন সেই পথে আমাদের জীবনের বেগ।”

“তুই কি নিজের ইচ্ছাশক্তিকে বিশ্বাস করিস্ নে ?”

সুজাতা বল্লে—“বিশ্বাস যে করি না তাও বলতে পারি না, বিশ্বাস যে করি তাও বলতে পারি না। বাঁধের জল যখন ক্রমশঃ বেড়ে উঠে বাঁধকে ধাক্কা দিতে থাকে তখন সে জলের যদি চৈতন্য থাক্‌ত, সে মনে করত সেই বাঁধ ভেঙ্গেছে। কিন্তু বাঁধ যথার্থ ভাঙে জলের বেগে, সে বেগ বিধৃত হয়ে রয়েছে জলের স্বরূপের মধ্যে। তেমনি অনেক কাজ আছে যা আমরা নিজেরা করি বলে' মনে হয় কিন্তু

যার যথার্থ কর্ত্তা হচ্ছে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি। বেশ একটি ঠাণ্ডা মেয়ের মত সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটিয়ে দেব এটা আমার প্রকৃতি নয়, আমার প্রকৃতি চায় নিজেকে প্রকাশ করতে। এতদিন সেই প্রকাশে পাচ্ছিলুম বাধা, পথ পাচ্ছিল না আমার মন কোনও দিকে ছুটে যেতে। বাঁধাধরা পড়াশুনার পালা এল শেষ হয়ে, অনুভব করলুম, আমি একজন মানুষ। তুমি ত জান, জীবনের একটা ধর্ম্ম হচ্ছে irritation, জীবন চায় বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে' তার আপন পথ কেটে নিতে। তাই, লোকে দুর্গম পাহাড়-পর্ব্বত কেটে পাতে সেখানে রেলের রাস্তা। এতটুকু ঝরণার স্রোতে পাথরের নুড়ি ভেঙে ভেঙে প্রবলবেগে নেমে আসে পর্ব্বতের সানুদেশে, ছুটে চলে সে তার অজ্ঞাত যাত্রাপথে। আমার চিত্তও ছুটেছিল তেমনি একটা যাত্রাপথের খোঁজে, তাই সে বেরিয়ে পড়েছে এই অজানা পথে। ফেরবার উপদেশ দিলে ফল হবে না, তবে সফল করতে পার তুমি আমার যাত্রা, ভবিষ্যৎপথের বার্ত্তা দিতে পার নির্দ্দেশ করে'।"

সুকুমার আবার প্রশ্ন করলে—"তুমি তোমার আত্মাকে চাও প্রকাশ করতে, তার জন্য দশজনকে নিজের সঙ্গে জড়াও কেন? দশজনকে জড়াতে গেলেই বাধে ফ্যাসাদ। একটা নরুণ দিয়েও লোকে নিজেকে খুন করতে পারে, কিন্তু আরেকজনকে খুন করতে গেলে লাগে অস্ত্রশস্ত্র, কলকৌশল।

সুজাতা আবার বল্লে—"কিছু মনে কর' না, কিন্তু তোমার উপমাটা এখানে খাটল না। আমার আত্মা ত শুধু আমার মধ্যে নেই, সে যে জড়িয়ে রয়েছে দশের সঙ্গে। দশের মধ্যে ছাড়া সে আপনাকে প্রকাশ করবে কি করে'?"

"তুমি যদি তোমার মতই প্রকাশ করতে চাও তা ত করতে পার কথাবার্ত্তায় বন্ধুর সঙ্গে। না হয় একখানা বই লিখ্‌তে।"

সুজাতা আবার হেসে বল্লে—"মত প্রকাশ করা আর নিজেকে প্রকাশ করা, এ দুটো এক বস্তু নয়। মত হ'ল জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা জীবনের ক্ষণপ্রতিবিম্বিত একটি ছায়ামাত্র। তার গতি নেই, বেগ নেই, সে জড়। তা পায় তার গতি এবং বেগ যখন তা যুক্ত হয় জীবনের স্রোতের সঙ্গে।"

সুকুমার আবার বল্লে—"তোমার কথা আমি ভাল বুঝতে পার্‌ছি না। কত মহাপুরুষদের বাক্য এবং মত জগতে কত অসাধ্য সাধন করে' গেছে।"

সুজাতা বল্লে—"তখনই মহাপুরুষদের বাক্য সফল হয়েছে, যখন তাঁরা জীবনের ইঞ্জিনটা জুড়ে দিয়েছেন সেই মতের সঙ্গে। নিছক মত হিসাবে মত একান্ত পঙ্গু, তার চল্‌বার ক্ষমতা নেই। যীশুখৃষ্ট যে শুধু উপদেশ দিতেন Forgive thy neighbours, সে মত ত পুরোণো কথা, কিন্তু যখন ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তিনি বল্লেন, 'হে ভগবান, এদের অপরাধ ক্ষমা কর, এরা জানে না যে এরা কি করছে' তখন বোঝা গেল যে তিনি তাঁর জীবনের প্রবাহ দিয়ে তাঁর জড় মতটিকে স্পন্দমান করে' তুলেছেন। সেইজন্য আজও সেই মতের বেগ শান্ত হয় নি, সে দু'হাজার বৎসর ধরে' ভেসে আস্‌ছে আপন দুর্দ্দমনীয় বেগে এবং আজ মহাক্ষোভের দিনেও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সেই মহাপুরুষের জীবনকে।"

সুকুমার আবার বল্লে—"কিন্তু জীবন দিয়ে মতকে সমর্থন করবে বা মতকে বেগ দেবে, এর অর্থ কি? জীবন ত জৈব ধর্ম্ম, রক্তস্রোতের প্রবাহে হৃদয়, ফুস্‌ফুস্‌, প্লীহা যকৃতের সামবায়িক ও পারস্পারিক কার্য্যে হয় তার প্রকাশ। মতের পিছনে তা জুড়ে দেওয়ার অর্থ কি?"

সুজাতা বল্লে—"এ ত অতি সহজ কথা।" নিমেষে তার মনে হ'ল কানাইয়ের সঙ্গে সুকুদা'র পার্থক্য। কানাই যখন তর্ক করছিল তখন সে তার নিজের সত্তাকে ফেলেছিল হারিয়ে, নিজেকে একান্তভাবে অভিভূত করে' অবলীলাক্রমে চলেছিল তার যুক্তিতর্ক। কিন্তু সাধারণ কথাও সুকুমারের বুঝতে দেরী লাগছে। তর্কে সে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ত নয়ই বরং দুর্ব্বল প্রতিদ্বন্দ্বী।

সুজাতা বল্লে—"অনেকগুলি বৃত্তির সামবায়িক ও পারস্পরিক সামঞ্জস্যে প্রকাশ পায় সেই বিশেষ ধর্ম্মটা যাকে আমরা বলি জীবন। সমস্ত জীবনবৃত্তির যে একটা অখণ্ডতা ও সমগ্রতা আছে সেই সমগ্রতার মধ্যে ধরা পড়ে জীবনের রূপ। যেমন আমাদের দেহের একটা জীবন আছে, মনেরও তেমন একটা জীবন আছে। এটা নিছক উপমা নয়, এখানে রয়েছে একান্ত সাদৃশ্য। দেহের মধ্যে দেখা যায় প্রত্যেকটি যন্ত্রের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়াগুলির সামঞ্জস্যে তাদের একটা অখণ্ড এক-রূপতা এবং এরই ফলে প্রকাশ পায় দেহের জীবন। তেমনি আমাদের মনের মধ্যে রয়েছে নানা প্রবৃত্তি। বিভিন্ন প্রবৃত্তি বিভিন্ন দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায় আমাদের মনের গতিকে, কিন্তু তথাপি আমাদের চিত্ত একটি অখণ্ড স্পন্দন। নানা বৃত্তির নানা ক্রিয়ার মধ্যে আছে একটা পারস্পরিক ও সামবায়িক সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যের মধ্যে যেটা ধরা পড়ে সেটাকে বলা যায় personality। সেটা একটা সমগ্রপুরুষীয় অভিব্যক্তি। সেইখানে আমরা বহু হয়েও এক। মত হচ্ছে আমাদের জ্ঞানবৃত্তির ক্ষণপ্রকাশ। সেই ক্ষণপ্রকাশটি যদি তার মধ্যে অভিব্যক্ত করতে পারে সমগ্র চিত্তের সত্তাকে, অর্থাৎ যদি আমাদের চিত্তের অন্য কোনও বৃত্তি তাকে বাধা না দিয়ে অগ্রণী করে' তোলে তাকে তার সমগ্রের মুখপাত্র করে', তা

হ'লেই এ কথা বলা চলতে পারে যে সেই মতটি জীবনের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে—মনোজীবনের দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে এবং দেহজীবনের দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে, কারণ দেহের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি অনায়াসেই আমরা সহ্য করতে পারি আমাদের সেই মতকে স্থাপন করবার জন্য। Bruno যখন বলেছিলেন—'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এবং তার জন্য যখন তাঁকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হ'ল, তাঁর দেহের সমস্ত পীড়া অনায়াসেই তিনি বহন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মত তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নি। এখানে দেখা যাচ্ছে, তাঁর মতের পিছনে শুধু যে তাঁর অন্তর্জীবন সায় দিয়েছিল তা নয়, তাঁর দেহও বিদ্রোহ করে নি। এই জন্যই এমন স্থলে বলা যায় যে তাঁর মতকে তিনি জীবন্ত করেছিলেন তাঁর মনোজীবন ও দেহজীবনের সমস্ত শক্তি সেখানে সংক্রামিত করে'। সেই জন্যই তাঁর মত হয়েছিল জীবনধর্ম্মে স্পন্দমান। শুধু একটা মত মনোজীবনের বুদ্বুদ মাত্র, ক্ষণে তার উৎপত্তি, ক্ষণে তার লয়। এই জন্যই আমি এই কথা বলছিলুম যে কোনও মতকে প্রকাশ করার যথার্থ অর্থ হচ্ছে তাকে সমগ্র জীবনধর্ম্ম দিয়ে জীবন্ত করে' তোলা। আমাদের মত আমাদের চেতনার একটা অংশ। তা যদি জীবন্ত না হ'ল তবে তার প্রকাশ হ'ল না। জীবনের বেগ সঙ্গে না থাকলে শুধু ভাষায় মত প্রকাশ করা হয় একটা কুৎসিত সৃষ্টি। প্রকাশই হচ্ছে যথার্থ সৌন্দর্য্য।"

সুকুমার আবার প্রশ্ন করলে। সে বল্লে—"তুমি Brunoও নও, যীশুখৃষ্টও নও। নিজের মতকে একটা প্রাধান্য দিয়ে জাহির করবার চেষ্টা—সেটা কি একটা অভিমান বা দুর্ব্বিনয় নয়? শুনেছি তুমি আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মে যে সমস্ত প্রাচীন আদর্শ ছিল তার পক্ষপাতী। কিন্তু সেই আদর্শই কি এ কথা বলে না যে জিজ্ঞাসা না

করলে মত প্রকাশ করবে না? মনু কি এ কথা বলেন নি যে মেধাবী ব্যক্তিরা জেনেও যেন কিছু বোঝেন নি, এই রকম ব্যবহার করবে? এ কথা কি তোমাদের উপনিষদ বলে নি যে যথাসম্ভব মৌন আচরণ করবে? তাই ত শোভন হয়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে।”

সুজাতা একটু কঠোরভাবে বল্লে—“তোমার নার্ভগুলি কি দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে? কি রকমভাবে তোমার সময় কাটে আজকাল? চিন্তার এ আলস্য ত তোমার পূর্ব্বে ছিল না। আমি যীশুখৃষ্ট বা Bruno ত নই-ই, কিন্তু তথাপি আমি মানুষ। আর এটাও মনে থাকা উচিত যে প্রাণিবিজ্ঞান-মতে স্ত্রীলোকেরাও মনুষ্যপর্য্যায়ভুক্ত। মনু যেখানে মতামত সহসা দিতে নিষেধ করেছেন সেটা নীতি-শাস্ত্রের দিক থেকে, সাংসারিক সুবিধা অসুবিধার দিক থেকে। উপনিষদ্ যেখানে মৌন থাকতে বলেছেন তা তাঁদের পক্ষেই সত্য যাঁরা জ্ঞানের গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আপনাদের লয় করতে পেরেছেন, যাঁদের ব্রহ্মদর্শন ঘটেছে। এ ত সে কথা হচ্ছে না। স্ত্রীজাতির মধ্যে, স্ত্রীলোকের ব্যবহারে কোন শালীনতার প্রশ্নও আসে না। মেয়েরা যদি মেয়েদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ না করে তবে তারা কোথায় নিজেদের প্রকাশ করবে?”

“কে বারণ করেছে তোমাকে মত প্রকাশ করতে? এই ত আমি আছি, মঞ্জরী আছে, আরও কত বান্ধবী আছে, তাদের কাছে কর না মতপ্রকাশ। সভা করে’ উগ্র বক্তৃতা দিয়ে মত প্রকাশ করতে হবে, এর কি মানে আছে? কার দৃষ্টান্ত তুমি এখানে অনুকরণ করতে চাও।”

সুজাতা বল্লে—“কার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছি সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত এমন অনেক দেওয়া যেতে পারে। আর দৃষ্টান্ত

থাকা না থাকার উপর কোন্ কাজ করা উচিত বা অনুচিত তাও ঠিক করা যায় না। সকলেই যদি প্রাচীন দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে' কাজ করত, নিজে থেকে যদি কিছু না করত, তবে সমাজ হয়ে উঠ্‌ত পঙ্গু এবং অচল। আর তোমাকে এতক্ষণ বসে' আমি বললুম কি ? তুমি কি অন্যমনস্ক ছিলে, না আবার কোনও দাবার championship-এ ঢুকেছ ? মনে মনে ভাবছিলে যে কোথাও পিলের কিস্তি দিচ্ছ ? আমি ত বললুম তোমাকে যে শুধু মত হিসাবে যে মত দেওয়া যায় সেটা বাক্যের বিলাস মাত্র, কিংবা বন্ধুতে বন্ধুতে তর্কের পাঞ্জা কষা। সেটা এবং জীবনের ধর্ম্মে কোনও মতকে প্রকাশ করা, এটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আমার এখন প্রয়োজন হয়েছে জীবনের সমগ্র রূপ দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করা। সেইটেই হচ্ছে আমার ক্ষুধা, সেটা না করলে আমি আমার নিজের কাছে হয়ে যেতাম অসাড়।"

সুকুমার আবার জবাব করলে—"বেশ, না হয় মানলুম তোমার আত্মপ্রকাশ করার দরকার আছে। কিন্তু তা করতে হ'লেই যে এ রকম সভাসমিতি, হাঁকডাক করে' করতে হবে তার কি মানে আছে ? শুনেছি তোমার বক্তৃতা নাকি একেবারে অগ্নিময়ী হয়ে উঠেছিল। এত সমস্তের কি প্রয়োজন ছিল ?"

সুজাতা আবার একটু কঠোরভাবে বল্লে—"প্রয়োজন কি ছিল তা তুমি বুঝবে না, সুকুদা'। আজ বুঝছি, তুমি কোনদিনই আমাকে ভালবাস নি। কেবল পা' পিছলে গেলে দু'হাত দিয়ে লুফে ধরলেই ভালবাসা হয় না, তার মধ্যে চাই মনকে বোঝবার দরদ। আমার ত অনেক নিকট হ'তে চেয়েছিলে তুমি, কখনও একবার অনুসন্ধান করে' দেখেছিলে যে আমার মনের মধ্যে টগ্‌বগ্ করে' কি ফুটছিল ? দিতে ত আমার চুলে হাত বুলিয়ে, আমার মনে কোনদিন হাত বুলোবার

চেষ্টা করেছিলে? কতবার তুমি কতরকম ইঙ্গিত করেছ। তোমায় বলেছি আমি, আমার মন ছুটেছে একটা কর্ম্মসাগরের দিকে। অপরের কাছে আমাকে ছেড়ে দেওয়ার আগে আমার সব চেয়ে বড় প্রয়োজন এই যে যে আমাকে আমি ছেড়ে দেব তাকে আমি আগে আমার মুঠোর মধ্যে ধরব, আর মুঠোর মধ্যে ধরবার আগে আমার প্রয়োজন আমার 'আমি'কে গড়ে' তোলা। আমার 'আমি' যদি আমার মধ্যে গড়ে'ই না উঠ্‌ল তবে আমি মুঠো করে' ধরবই বা কি আর দেবই বা কি? তুমি আমাকে অনেকবার বলেছ, তুমি আমি কি আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারি না? তখন তার মানে আমি পরিষ্কার করে' বুঝতে পারি নি, ভেবেছি—স্নুকুদা' এ বলে কি? আজ তার মানে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তোমার পাশাপাশি অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি আমি বসতে পারি, আঠা দিয়ে জুড়ে' দিতে পারি তোমার শরীর আমার শরীরের সঙ্গে। কিন্তু আজ সচেতন হয়ে বুঝতে পারছি, আমার চিত্ত কখনও তোমার চিত্তের ঘনিষ্ঠ হয় নি, কখনও ঘনিষ্ঠ হ'তে পারে না। যে ব্যথায়, যে আর্ত্তিতে বাইরে হাসির পরিচ্ছদে আমি আমার মনের মধ্যে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছিলুম তার কোনও প্রতিধ্বনিই কি তোমার মধ্যে পৌছেছে? তুমি একবার কি ভেবে দেখেছিলে আমার মধ্যে কি আগ্নেয়গিরির আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠ্‌ছিল? আজ যখন তা বজ্র উদ্গীরণ করল তখন তুমি দিব্যি হেসে হেসে বলছ—এ সবের কি প্রয়োজন ছিল? তোমার মন খোঁজে বিরামের ক্ষেত্র, নির্ঝঞ্ঝাট নিরুপদ্রবের ক্ষেত্র। আমি মূর্ত্তিমতী উপদ্রব। আমার মাংস কঙ্কালের মধ্য দিয়ে হাত যদি ঢোকাতে পারতে আমার হৃদয়ের মধ্যে, দেখ্‌তে সেখানে ফুট্‌ছে টগ্‌বগ্‌ করে' আগুন, সেই আগুনের বাষ্প তার নির্গমনের পথ না পেয়ে আমার ধমনীর শোণিতের মধ্যে

তুলেছিল প্রবল বিদ্রোহের অগ্নিশিখা। তুমি যদি হ'তে আমার আত্মীয়, হ'তে আমার যথার্থ বন্ধু, তুমি সাথী হয়ে দাঁড়াতে এই মহাযাত্রায় আমার সঙ্গে। কিন্তু হয় ত আমি তোমাকে অন্যায়ভাবে দোষ দিচ্ছি, এ তোমার পক্ষে কিছুতে সম্ভব হ'ত না। তোমার মনে ত জাগে নি আপনাকে ব্যক্ত করবার কোনও ক্ষুধা। যদি জাগত, তা হ'লে তুমি পার্‌তে আমার হৃদয়কে চিন্‌তে, আমি অনায়াসে পারতুম তোমার ঘনিষ্ঠ হ'তে। এত কাছে থেকেও যে ঘনিষ্ঠ হ'তে পারি নি তার কারণ এই যে আমার চিত্ত তোমার চিত্তের কাছ থেকে কোনও সাড়া পায় নি। তোমাকে আশ্রয় বলে' জানতুম, রক্ষক বলে' জানতুম, তাই আজকের এই দুর্দ্দিনেও তোমার ভরসা আমি করেছিলুম। সেটা আমার মূঢ়তা। আমি যে পথে পা দিয়েছি সে পথে আমাকে কেউ রক্ষা করবে সে আমার প্রার্থনা নয়, আমার এই প্রার্থনা যে আমার এই যাত্রার পথে যতই বিপদ আসুক, আমি আমার ধৈর্য্য ও মনুষ্যত্ব না হারাই। বিপদ ও দুঃখের মূল্যে আমি যাচাই করে' নিতে চাই আমার আত্মপ্রকাশের অকৃত্রিমতা। বেশ ত সুখে ছিলুম, টাকা পয়সার অভাব ছিল না। বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে থাকতে পারতুম সুখে, তবে কেন নামলুম নিপীড়নের নিয়ন্ত্রণের মহাদ্বন্দ্বের মধ্যে? সেটা আমার জীবনের একটা ট্র্যাজেডি, আমার মনোবৃত্তির সঙ্গে আমার বাহ্য সম্পদের একটা দ্বন্দ্ব। ট্র্যাজেডি ক্লেশবহুল, গম্ভীর, কিন্তু তা অনুশোচ্য নয়। তোমাকে আজ কয়েকটা কঠিন কথা বল্‌লুম, তাতে তুমি দুঃখ কর' না, সুকু-দা। তোমাকে আমি যেমন ভালবাসতুম তেমনিই ভালবাসি। তোমার ভালবাসাকে আমি বরাবর পবিত্র বলে' মনে করে' এসেছি। আজও তোমার ছবি আঁকা থাকবে আমার চিত্তপটে, সমস্ত বাল্যের স্মৃতি থাকবে সেখানে জড়িয়ে।

কিন্তু সেইজন্যই আবশ্যক তোমার আমার মধ্যে কোনও মিথ্যার কুজ্মটিকা যেন আমাদের সত্য সম্বন্ধের কোনও ব্যাঘাত না ঘটায়। আমার মধ্যে তোমার স্থিতি কোথায় সেটা তোমার স্পষ্ট করে' জানা উচিত। আমারও স্পষ্ট করে' সজাগ হওয়া দরকার যে তোমার স্থিতি আমার মধ্যে কতখানি ও কতটুকু। এইটি আমরা বুঝলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে এমন কোনও মিথ্যা আশা বা লোভ এসে দাঁড়াতে পারবে না যা পরিশেষে আনতে পারে হতাশা বা ক্রোধ বা একের প্রতি অপরের অবিচারের বোধ।"

সুকুমারের মুখ অত্যন্ত ব্যথিত ও আড়ষ্ট হ'ল। সে এই সমস্ত কথা শোনবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। আজ যদি মঞ্জরী তার চিত্তের মধ্যে একটা আসন না নিত তবে হয় ত এ আঘাত সহ্য করতে পারত না সে। কিন্তু তবু সে মনে ভাবলে যে যতই শক্ত কথা বলুক, সুজাতাই ত বলছে! কত আবদার তার সে সহ্য করে' এসেছে বাল্যকাল থেকে। আজ তার বিপদের দিনে তার সহযাত্রার সঙ্গী হবে সুকুমার বলে' সুজাতা মনে করেছিল। সে আশ্বাসে আঘাত লাগায় অভিমানে সুজাতা যদিও অনেক রূঢ় কথা বল্‌ল, তথাপি এ হয় ত তার যথার্থ প্রাণের কথা নয়, সে তাকে ভালবাসে বলে'ই রেগে উঠে কতগুলো কঠোর কথা তাকে বলে' দিলে। আজ সে এসেছে সুজাতাকে সান্ত্বনা দিতে, বল দিতে, তার সঙ্গে দ্বন্দ্বকলহ করতে নয়। সে একটু কষ্টহাস্যে বল্লে—"তুমি আমাকে যত খুসী কঠোর কথা বল, আমি তার যোগ্য কি অযোগ্য তার বিচার তোমার সঙ্গে আমি আজ করতে চাই না। আমার দিকটা আমি চাই আজ সম্পূর্ণ করে' ভুলে যেতে। তুমি আমার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবে বা হচ্ছ তা জেনেও তোমাকে আমি এই কথা বলতে চাই যে তোমার হৃদয়ের

মধ্যে আমি প্রবেশ করতে পারি নি সেটা আমার দরদের অভাব নয়, সেটা আমার অক্ষমতা। আজ তোমার মন উত্তেজিত, তাই তুমি আমার অক্ষমতাকে সহানুভূতির অভাব বলে' মনে করছ। যথাকালে তোমার মন প্রসন্ন হ'লে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে তোমার সুকু-দা'র কখনও তোমার প্রতি সহানুভূতির অভাব হ'তে পারে না। তবে একথা হয় ত সত্য যে, যে বিষয়ে তোমার দরদ সব চেয়ে বেশী সেই বিষয়ে আমার অনুভব করবার শক্তিই কম। সেটাও অক্ষমতা, ভালবাসার অভাব নয়। কিন্তু সে কথা যাক্। আমাকে তুমি যত ইচ্ছা তিরস্কার কর, সে আমি মাথা পেতে নেব, কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে এই যে এতদিন ত তোমার স্বাদেশিকতার প্রতি কোনও বিশেষ রোখ দেখি নি। এ সম্বন্ধে তুমি যে বিশেষ আলোচনা করতে তাও ত শুনি নি। স্বাদেশিকতার হাওয়া ত দেশে অনেকদিন থেকেই বইছে। সে সম্বন্ধে আমিও যেমন নিরুদ্বেগ থাকতুম তোমাকেও তেমনি নিরুদ্বেগ দেখেছি। আজ কি এমন ঘট্‌ল যে তুমি স্বাদেশিকতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লে ?"

সুজাতা জবাব করলে—"এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সহজ নয়। অনেকদিন ধরে'ই আমার মন ফুট্‌ছিল টগ্‌বগ্ করে', কোনও একটা উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করব এর জন্যে ঘটেছিল একটা যাতনা। অথচ কোনও কল্পনা ছিল না মনের কাছে, কোনও উপায় ছিল না জানা। আমার হাসিখুসি, আমোদ আহ্লাদ, এ সমস্তই ছিল সেই প্রচ্ছন্ন আগুনকে ঢেকে রাখবার একটা উপায় মাত্র। কোন্ পথে আমাকে আমি প্রকাশ করব আমার কিছুমাত্র জানা ছিল না। আমার মধ্যে আছেন যিনি অন্তর্যামী তিনি গড়ে' তুলছিলেন আমার মধ্যে আমার আদর্শ এবং আমার শক্তির বেগ। নদীর জল যখন

বেড়ে ওঠে, লোকে দেখে ভরা জল। তাতে ভয়ের কোনও কারণ নেই। আনন্দে দেখা যায় ভাদ্রমাসের ভরা দামোদরের লীলা। সে যখন বাঁধ ভাঙ্গে তখন তা সম্পন্ন করে নিমেষের গর্জ্জনে! বৈশাখের সন্ধ্যায় গুমোট গরমে আকাশ হয়ে আসে নির্ব্বাত, নিস্তব্ধ। হঠাৎ ওঠে ঝড়ের তাণ্ডবলীলা, প্রকাশ পায় তা শাল-তাল-গুবাক-নারিকেলের নৃত্যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহের উন্মূলনে। এই যে ঝড়ের নিস্তব্ধতা, এর মধ্যেই জমে' উঠ্‌ছিল তার শক্তিসঞ্চয়ের লীলা। শক্তি যখন সঞ্চিত হয়, কখন যে তার স্থিরত্ব দূর হয়ে আসে ঘূর্ণীর ঘোর গর্জ্জন, তা অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও বলতে পারেন না। যে কোনও বস্তুকে উপলক্ষ্য করে'ই ধৈর্য্য পরিণত হ'তে পারে অধৈর্য্যে। বারুদের স্তূপের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দিয়াশালাইয়ের আগুনে ঘটতে পারে একটা মহামারী কাণ্ড। তখন তার অনুসন্ধান করলে সেই দিয়াশালাইয়ের কাঠিটিকে আর পাওয়া যাবে না।"

সুকুমার বল্লে—"তা হ'লে তুমি স্বীকার কর যে তোমার এ উন্মাদনা আকস্মিক?"

সুজাতা বল্লে—"করি। আকস্মিক যা, তা ত মিথ্যা নয়। আমরা তখনই কোন জিনিষকে বলি আকস্মিক যখন তার সমস্ত কারণ-কলাপ আমরা জানি না। আকস্মিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে জড় থেকে জীব, তাই বলে' জীবও মিথ্যা নয়, জড়ও মিথ্যা নয়। জড়ের মধ্যেই আছে জীবের কারণ, শুধু সেই কারণ-কলাপের ঘটনা-পরম্পরা আমরা জানি না।"

"কিন্তু এ কথা তা হ'লে স্বীকার করতে হয় যে তুমি জ্ঞানবুদ্ধিপূর্ব্বক ভেবে চিন্তে এইভাবে তোমাকে প্রকাশ করবে তার কল্পনা করে' কাজে নাম নি।"

সুজাতা বল্লে—"তা ঠিক। এই রকম কাজে নামবার দু'চারদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি নিজেই জানতুম না আমি কি ভাবে নাম্‌ব।"

কিন্তু সুকুমার আবার বল্লে—"তবে আত্মপ্রকাশ হ'তে পারে আত্মপ্রতারণা।"

"হ'তে পারে, কিন্তু হয়েছেই যে, এ কথা বলা চলে না। কবি লেখেন তাঁর কাব্য, অস্ফুট হয়ে থাকে তাঁর বেদনার তীব্র অনুভব, তাঁর ভাবের স্পন্দন তাঁর ধ্যানলোকের নিস্পন্দতায়। হঠাৎ সেই নিস্পন্দতা স্রোতের ধারে বেরিয়ে আসে তাঁর কবিতারূপে, ভাষায় ছন্দে রসে মূর্ত্তিমতী হয়ে, যেমন বেরিয়ে আসে অসংখ্য চিত্রলেখায় ভুবনের সৌন্দর্য্য নৈশ শূন্যতার মধ্য থেকে। হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে বলে' তা প্রকাশ নয়, সত্য নয়, এ কথা বলা চলে না। আরও একটা কথা এই যে যা বেরিয়ে এল তা সত্য কি মিথ্যা তা তার আকস্মিকতা দ্বারা প্রমাণিত হয় না, প্রমাণিত হয় তার আপন প্রভাবের দ্বারা। নৈশ-লোক থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে এসেছে বলে' ভুবনের সৌন্দর্য্য মিথ্যা নয়, যেমন মিথ্যা নয় হঠাৎ বাঁধভাঙা জলপ্লাবন। তার প্রমাণ তার প্রত্যক্ষ ফলে, সৌন্দর্য্যের প্রাত্যক্ষিক পরিতৃপ্তিতে এবং প্লাবনের অজস্র ক্ষয়-ক্ষতিতে। তেমনি আজ যা বেরিয়ে এসেছে আমার অন্তর থেকে, তার সত্যতা আমি অনুভব করছি আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে। আকস্মিক বলে' ত তাকে মিথ্যা মনে হচ্ছে না, মনে ত কোনও অনুশোচনা আসছে না। তবে কেমন করে' বলব এটা আত্ম-প্রতারণা?"

সুকুমার আবার বল্লে—"তুমি কিছু মনে কর' না, কিন্তু হয় ত এমন হ'তে পারে যে এই হঠাৎ-পাওয়া নেতৃত্বের লোভ, প্রশংসা বা বাহবা পাওয়ার আগ্রহ তোমার দৃষ্টিকে করেছে আচ্ছন্ন। হয় ত পরে তুমি

আবিষ্কার করবে যে, যে পথে তুমি আত্মপ্রকাশ করতে চলেছ সে পথ যথার্থ ন্যায়ধর্ম্মের পথ নয়।"

সুজাতা আবার বল্লে—"তা ত হ'তেই পারে। চলতে যাকে হবে তার প্রধান কাজ হচ্ছে পথে বেরিয়ে আসা। ভোলানাথের ঝুলিঝাড়া ভুল বিকীর্ণ হ'তে পারে তার পথের মধ্যে, উদ্‌ভ্রান্ত করতে পারে তার দিঙ্‌নির্ণয়কে। পূবকে সে মনে করতে পারে পশ্চিম, উত্তরকে মনে করতে পারে দক্ষিণ, কিন্তু পথে চলতে চলতে তার হয় পথের পরিচয়। ভুলে ভুলেই হয় ভুলের ক্ষয়। সব চেয়ে বড় প্রয়োজন চলা। চলাই চলবার ভুল দেখায় এবং চলার দৃঢ়তা সম্পাদন করে। শিশু যখন প্রথম চলতে আরম্ভ করে তখন পদে পদে হয় তার পদস্খলন, যেখানে যাবার সেখানে না গিয়ে আর এক স্থানে গিয়ে হয় উপস্থিত। তাই বলে' শিশুকে যদি রাখা যায় বসিয়ে বা খালি দেওয়া হয় তাকে হামাগুড়ি দিতে, সে কখনও চলতে পারবে না। চলবার সামর্থ্য হয়েছে বলে'ই শিশু হামাগুড়ি ছেড়ে চলতে আরম্ভ করে এবং চলার সহস্র বিপদ অতিক্রম করে' চলাকে করে' আনে সম্পূর্ণ। তাই, আমি যে ঠিক পথেই চলেছি এ কথা বলতে পারি না। চলাতে পাচ্ছি আমি আনন্দ। হয় ত এই চলার আনন্দকেই মনে করছি ঠিক পথে চলার আনন্দ। যখন দেখব যে চলার পথটা ঠিক নয় তখন পথটা যাবে আপনি বদ্‌লে, কিন্তু চলাটা দেবে আমায় অফুরন্ত আনন্দ। চলা বন্ধ করে' চিরকাল স্থির হয়ে কখনও ঠিক পথ আবিষ্কার করব এ ভরসা নেই। মানুষ যখন প্রথম সাঁতার শিখতে যায় তখন সে জলে ভাসান দিতে জানে না। ডুবে যায়, নাকানি-চোবানি খায়, আবার ডোবে, আবার ভাসে, তবে সে শেখে সাঁতার। ডাঙায় বসে' সাঁতারের কল্পনা দ্বারা সাঁতার শেখা যায় না।

তবে আমাকে আমি এটুকু যাচাই করে' দেখেছি যে নেতৃত্বের আমার কোন লোভও নেই, সামর্থ্যও নেই। কিন্তু হঠাৎ নেতৃত্ব এসে পড়েছে আমার ঘাড়ে। হঠাৎ দলে দলে মেয়েরা আসছে, চাইছে আমার পরামর্শ, চাইছে আমার সাথে যোগ দিতে। এ দায়িত্ব আমি নিতে পারি না। এইখানে আমি অনুভব করছি আমার বিপদ। তাই ত আমি আকুল হয়ে খুঁজছি এমন একজন লোক যে এ দায়িত্ব আমার কাঁধ থেকে নিয়ে আমাকে মুক্তি দিতে পারে, ছেড়ে দিতে পারে আমাকে চলতে আমার স্বতন্ত্র পথে, হয় ত বা উপদেশ দিয়ে সফল করে' তুলতে পারে আমার গতির চরম উদ্দেশ্য।"

সুকুমার আবার বল্লে—"কিন্তু তোমার কাজের দ্বারা তুমি যা ঘটিয়েছ তার জন্য ত তুমিই দায়ী। এতগুলি মেয়ের মধ্যে যে বিপর্য্যয় এনেছ, যে কোলাহল সৃষ্টি করেছ, তার জন্য দায়িত্ব ত তোমার।"

সুজাতা বল্লে—"একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সে কথা সত্য বটে, কিন্তু তবু তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কোন ব্যক্তি তার কাজ এবং তার ফল এমন করে' বিচার করতে পারে না। সে তার সেই কাজে বা কাজের ফলে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা সম্পূর্ণভাবে বিচার করতে পারে না। একজনে অর্থব্যয় করে' করলে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা, আর সেই মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজে বলে' লাগ্‌ল হিন্দুমুসলমানে মহা দাঙ্গা। মুসলমানেরা চায় শিবলিঙ্গ চূর্ণ করতে, হিন্দুরা চায় তা রাখতে। হাজার হাজার লোক হ'ল হতাহত। তাই বলে' কি যে মন্দির গড়েছে তাকে সেই জন্য দায়ী করব? নিকটবর্ত্তী কালে কি দূরবর্ত্তী কালে ঘটবে একটা অশুভ পরিণাম, এই কালের দূরত্ব অনুসারে বিচার করে' এর বিচার করা যায় না। হয় ত যে দিন মন্দির করেছে তার পরের দিনই ঘটতে পারে এই দুর্ঘটনা, হয় ত ঘটতে পারে পঁচিশ

বছর পরে। তা নির্ভর করে ঘটনাচক্রের উপর। বিচার করে' দেখতে হ'বে যে, যে মন্দির গড়েছিল তার মনে এই রকম কোনও অশুভ কল্পনা ছিল কি না। তা মনে না করে' কার কাজের কখন্ কোন্ অশুভ ফল ঘটবে তা যেমন কল্পনা করা যায় না, আবার সেই অশুভে যে কত শুভাশুভ ঘটনা ঘটবে তারও কোন বিচার করা যায় না। অনেকে বলে' থাকেন, যে কাজের দ্বারা অধিকতম মানুষের অধিকতম হিত ঘটে সেই কার্য্যই সাধু। কিন্তু কোন্ কাজের দ্বারা অধিকতম মানুষের অধিকতম কল্যাণ ঘটবে তা একান্তভাবে দুর্জ্জেয়। সেইজন্য সেই দিক দিয়ে কোনও বিচার করা চলে না। যে ঘটনা আমরা ঘটাই তার চারিপাশের এতটুকুমাত্র আমরা দেখতে পাই, কিন্তু সেই ঘটনা বহির্লোকে ভেসে চলে অনন্ত কালস্রোতে। এই অনন্ত কালস্রোতে নানা অবস্থার বিবর্ত্তনে অন্য নানা ঘটনার সঙ্গে সজ্ঘাতে সেই ঘটনা কতখানি শুভাশুভ উৎপন্ন করবে এবং সেই শুভাশুভের মধ্যে জমাখরচ কষে' শুভের ভাগই অধিক হবে কি অশুভের ভাগই অধিক হবে, তা বলা যায় না।"

সুকুমার আবার বল্লে—"চুলচেরা বিচারে অবশ্য তুমি তোমাকে সমর্থন করতে পার, কিন্তু এখনই যে চোখের সামনে এতগুলি মেয়ের প্রিন্সিপাল-এর সঙ্গে বিদ্রোহ ঘট্‌ল সে বিদ্রোহ হয় ত এর চেয়েও বেশী অনর্থ আনতে পারে। শুনেছি যে পুলিশ আনাচে-কানাচে ঘোরা-ফেরা করছে।"

সুজাতা বল্লে—সেইজন্যই ত প্রয়োজন এমন একজন লোক যে এ সময় হাল ধরতে পারে। কে বলতে পারে, সে-রকম লোক হয় ত জুটেও যেতে পারে। তবে যে সমস্ত মেয়েরা ক্ষেপে' উঠেছে তারা প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক। তাদের সকলের মধ্যেই আছে 'দাহ্য পদার্থ এবং

চারিদিকের বাতাস থেকে আসছে দহনের উত্তেজনা। তা নইলে, আমার একটা বক্তৃতায় এতখানি তারা ক্ষেপে' উঠ্‌ত না। তবে তারা যে ভাবে ক্ষেপে' উঠেছে তার জন্যে আমাকে আমি দায়ী করতে পারি না। আমি তুলেছিলুম ইউরোপের এবং আমাদের দেশের দ্বন্দ্বের কথা। সেটা প্রচলিত পলিটিক্যাল্ মতের চেয়ে অনেকখানি বিভিন্ন। তারা গুলিয়ে ফেলেছে আমার মতের সঙ্গে প্রচলিত পলিটিক্যাল্ মতের। হয় ত তারা যখন দেখবে এবং বুঝবে যে প্রচলিত পলিটিক্যাল্ পন্থার সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও এই সমস্ত পলিটিক্যাল্ মত এবং এই সমস্ত পলিটিক্যাল্ মতবাদীদের কার্য্যপ্রণালীর সঙ্গে আমার মত ও কার্য্যপ্রণালীর নির্দ্দিষ্ট পার্থক্য আছে, তখন তারা অনায়াসে আমাকে ছেড়ে দেবে এবং আমি মুক্ত হব আমার নেতৃত্বের অবসর থেকে। বাস্তবিক দেখতে গেলে আমার বক্তৃতা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। এটা কোন না কোন কারণে ঘট্‌তই। যেমন অন্তরের প্রেরণায় আমার মধ্যে এই সমস্ত ভাব উদ্বেল হয়ে উঠেছে তেমনি তা উদ্বেল হয়ে উঠেছে আরও দশজনের মধ্যে। কোন্‌টাকে উপলক্ষ্য করে' কার মন উদ্বেল হয়ে উঠবে তা নির্ণয় করা যায় না। আর প্রত্যেকের চিত্তের স্বতন্ত্রতায়, প্রত্যেকের চিত্তের গঠনভঙ্গিতে নির্ণয় করবে সেই জলে' ওঠার ভঙ্গি। তারা যা বলবে, যা চাইবে, সে আমার বলাও নয়, আমার চাওয়াও নয়। এমনি করে' হয় ত আমি মুক্তি পাব এদের নেতৃত্বের কবল থেকে। চিত্ত থেকে যে সমস্ত ধূম উঠে এখন আমার চিত্তকে আচ্ছন্ন করছে, আমার সামনে থেকে সরে' গেলে হয় ত তা আমাকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না, তখন আমি হয় ত এসে দাঁড়াতে পারব সূর্য্যকরস্নাত মহাপ্রান্তরের মধ্যে, সেখান থেকে বিচার করবার অবসর পাব যে পথ আমি নিয়েছি সে পথ

আমার সত্য কি না। তখন যদি দেখতে পাই যে এ পথে আমার চলা হবে অবরুদ্ধ, তা হ'লে হয় ত পথ যাবে আমার বদ্‌লে। তাতে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হব না। আমার মধ্যে যে সত্য তাকে চাই আমি প্রকাশ করতে, সে সত্য ছোট হোক্, বড় হোক্, তাতে কিছু আসে যায় না। ছোট হোক্, বড় হোক্, সেইটিই একান্তভাবে আমার। অন্যের সঙ্গে ছলচাতুরী করা চলে, নিজের সঙ্গে চলে না, অথচ নিজেকে আবিষ্কার কবাই সব চেয়ে কঠিন। সেই আবিষ্কারের পথে আমি পা দিয়েছি। জানি এতে দুঃখ আছে, বিপদ আছে, ভয় আছে, লাঞ্ছনা আছে, আছে আঘাত এবং নিষ্পেষণ, কিন্তু সেগুলোকে এড়িয়ে আমাকে ত আমি আবিষ্কার করতে পারব না। তোমাকে চিরকাল ভক্তি করে' এসেছি, তাই এই নবযাত্রার দিনে চাই আমি তোমার আশীর্ব্বাদ যেন আমার এই আত্মাবিষ্কারের অভিযান হয় সফল।"

সুকুমার আবার বল্লে—"তুমি কি দেখছ না যে এতে ঘট্‌বে রাজার সঙ্গে দ্বন্দ্ব? সেই দ্বন্দ্বে তুমি হয় ত হবে একান্তভাবে নিষ্পেষিত। আমি এটা চোখে দেখি কি করে'?"

সুজাতা আবার বল্লে—"জীবনের স্বভাবই হচ্ছে দ্বন্দ্ব, নইলে জীবনই হ'ত না সম্ভব। আদত কথা হচ্ছে এই যে দ্বন্দ্ব বড় হবে, না জীবন বড় হবে। প্রাণস্রোতের ইতিহাসের পরিণামে দেখা গেছে যে জীবের সঙ্গে ঘটেছে তার প্রাকৃত পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বে কত জীব গেছে ধ্বংস হয়ে, বিনষ্ট হয়ে, কিন্তু তাতে জীবধারা বিনষ্ট হয় নি, সে দেখা দিয়েছে নবতর, কল্যাণতর রূপে। আবার জীবনের এই দ্বন্দ্বে যদি ভাগ্যে থাকে ধ্বংস তবে তা এড়াবারও কোনও উপায় নেই। নিশ্চিন্তভাবে বসে' থাকে মানুষ, তথাপি এ প্রাকৃতিক

দ্বন্দ্বের অবসান নেই। শরীরের মধ্যে ঢোকে টাইফয়েডের বীজ, আসে মৃত্যুপুরঃসর ক্যানসার রোগ, ঢোকে যক্ষ্মার বীজাণু ফুস্‌ফুসের মধ্যে, সে দ্বন্দ্বে নিশ্চিন্ত মানুষ হয় ধ্বংসস্তূপ। বেঁচে থাকলেই এক হাতে আছে ধ্বংস আর এক হাতে আছে জয়ের মহাসঞ্জীবনী। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই মানুষকে দিতে হয় আত্মপরিচয় এবং পেতে হয় আত্মপরিচয়।"

সুকুমার আবার বল্লে—"সমাজ থাকলেই থাকে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র থাকলেই থাকে রাজা, থাকে রাজশাসন। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, রাজশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, সেটা হয় একটা আত্মঘাতী প্রতিশোধ।"

সুজাতা বল্লে—"এখানে তুমি আমাকে টেনে আনতে চাইছ একটা বৃহত্তর তর্কের প্রান্তরে। এর মধ্যে আমি প্রবেশ করতে পারি আমার এমন সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই, সামর্থ্যও নেই। তবে একটা কথা জেনে রাখ। ভেবে দেখ রাষ্ট্রের মূল কোথায়। প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্বোতোমুখী প্রবৃত্তিকে সকলের অবিরোধে একটা সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ উন্নত আদর্শের দিকে নিয়ে যাবে, সেগুলির আত্মপ্রকাশকে সফল করবার সুযোগ দেবে, এইটিই হচ্ছে রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে রাষ্ট্র বলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, বলের দ্বারা বিধৃত এবং যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনও বিদেশীয় জাতিবিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্য কোনও দেশের লোককে উপকরণীভূত করা, সে রাষ্ট্র হারিয়ে ফেলেছে তার ন্যায়ধর্ম্মের দাবী। তার বিরুদ্ধে তাকে সংশোধন করবার জন্য কেউ দাঁড়ালে সে বলের দ্বারা নিগৃহীত হ'তে পারে কিন্তু সেটা নৈতিক নিগ্রহ নয়। যেখানে এই রকম দুর্ঘটনা ঘটে সে দেশের লোকের এইটিই হওয়া উচিত প্রধান কর্ত্তব্য যে তারা সে রাষ্ট্রকে পরিবর্ত্তন করবে। ব্যক্তির

স্বার্থের বাইরে রাষ্ট্র যেখানে তার একটা নূতন স্বার্থ রাখবার জন্য ব্রতী হয় সে রাষ্ট্র হয় আত্মঘাতী। ব্যক্তিসাধারণের বৃত্তিনিচয়ের পরস্পর সামঞ্জস্য পরিস্ফূর্ত্তি করাই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য। যেখানে কতিপয় ব্যক্তি রাষ্ট্রের শক্তিকে দখল করে' সেই শক্তি দ্বারা কোনও কল্পিত উদ্দেশ্য অনুসারে বা কোনও শ্রেণীবিশেষের উপকারের জন্য বা কোনও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বলাভিমান বা ধনাভিমান স্থাপনের জন্য প্রয়োগ করে সেই শক্তি সকলকে নিয়ন্ত্রিত করতে তখন সেই রাষ্ট্র বিচ্যুত হয় তার আপন আদর্শ থেকে। তখন প্রজাবর্গের হয় এটা কর্ত্তব্য যে তারা সংশোধন করবে সেই রাষ্ট্রকে। তখন দ্বন্দ্ব ঘটে রাষ্ট্রে ও প্রজাতে। তাতে দুঃখ অনেক। তার পীড়া আনে প্রভূততম যন্ত্রণা, কিন্তু তার উদ্দেশ্য মহৎ। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাস্থ্যে ফিরে যাওয়া। দেহের মধ্যে যখন ঢোকে জীবাণু, অসংখ্যেয় বংশবিস্তারে যখন তারা হয়ে ওঠে প্রবল, তখন তা নষ্ট করে' ফেলতে চায় জীবনের আত্মবিশ্বাসকে, তাই জীবনের সঙ্গে ঘটে তার দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বে দেহের ঘটে নানা যন্ত্রণা, উৎপন্ন হয় তীব্র জ্বর। এটা হচ্ছে জীবনের প্রতিক্রিয়া স্বাস্থ্যে ফিরে যাবার জন্য। যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ছাড়া স্বাস্থ্যে ফিরে যাবার আর কোনও উপায় নেই, তাই অপরিহার্য্য বলে' এই দুঃখ আমাদের প্রতিনিয়ত ভোগ করতে হয়। এইরকম দ্বন্দ্বই ওঠে আমাদের চিত্তের মধ্যে যখন প্রবৃত্তির অমঙ্গল তাড়নার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা ফিরে যেতে চাই প্রবৃত্তির একটি মঙ্গলময় আত্মবিকাশের মধ্যে। তখন চিত্তের মধ্যে চলে প্রবল সংগ্রাম, অনেক অনুতাপ, অনেক অনুশোচনা, অনেক স্খলনপতনের মধ্য দিয়ে আমরা ফিরে যেতে পারি চিত্তের স্বাস্থ্যের মধ্যে।"

এই সময় প্রভা এসে প্রবেশ করল ঘরের মধ্যে। সুজাতা প্রভাকে

দেখে' বলে' উঠল—"কোত্থেকে ?" পরিচয় করিয়ে দিলে সুকুমারের সঙ্গে। বল্লে—"ইনি আমার সুকুমার দাদা, ইনি প্রভা, আমার বান্ধবী।"

প্রভা বল্লে—"তুমি যে একেবারে একটা ঘূর্ণীর মধ্যে এসে পড়েছ। তোমার পেটে যে এত ছিল তা ত জানি নি, দিব্য শান্তশিষ্ট মেয়েটি। তোমাকে নিয়ে কাগজওয়ালারা একটা পেয়ে বসেছে। তোমার ছবি উঠেছে কাগজে কাগজে ; তোমার বক্তৃতার কথা, তোমার তেজস্বিতার কথা আজ সকলের মুখে মুখে। পড়ে' ও শুনে আমাদের এত গর্ব্ব হয় যে তোমাকে আমরা আমাদের বন্ধু বলে' পরিচয় দিই।"

সুজাতার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্লে—"মরণ আর কি! এই উপদ্রবগুলোতেই ত আমার মনে যত অশান্তি এনে দিচ্ছে, নইলে ভাবনার কোন কারণ ছিল না।"

প্রভা বল্লে—"উপদ্রব বড় কম নয়। ভূতনাথের ভূতপিশাচ পেয়েছে ছাড়া, পুলিশের অনুচরেরা ঘুরছে আনাচে-কানাচে। আমাদের ভয় কোন্ দিন বা আবাব তোমাকে ধরে' নিয়ে রাখে।"

সুজাতা বল্লে—"ধরে' যদি নিয়ে যায়, শান্তশিষ্টভাবে যাব, রাজ-গৃহের আতিথ্যসেবা করব। আমি ত ছ'মণি সিন্দুক তুলতে পারি না যে কানাইবাবুর মত একটা মুষ্টিযুদ্ধ বাধিয়ে দেব।"

প্রভা বল্লে—"আরে, শোন শোন, সুজাতা-দি। ভাল কথা মনে পড়্‌ল। কানাইবাবু একখানা চিঠি লিখেছেন রঞ্জনকে তোমার অনেক সুখ্যাতি করে'। চিঠিখানা আমি সঙ্গে এনেছি, তোমাকে পড়ে' শোনাই।"

সুজাতার কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। সে দাঁড়িয়ে ছিল, যেন অসমর্থ হয়ে একটা চেয়ারে বসে' পড়্‌ল। প্রভা চিঠিখানি পড়্‌তে লাগ্‌ল :—

কল্যাণীয়েষু।

স্নেহের রঞ্জন!

নানা জায়গায় ঘুরছি, নানা হাঙ্গামায় আছি। ইতিমধ্যে কাগজে পড়লুম সুজাতা দেবীর কথা। সেদিন চায়ের টেবিলে বসে' যে-সমস্ত আলোচনা হয়েছিল তা যে এমন মূর্ত্ত হয়ে এত অল্পকালের মধ্যে তাঁর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে তা আমি ভাবতে পারি নি। আমাদের জীবন ভেসে যায় জলরেখার মত, তার মধ্যে অজস্র ঝরে' যায় হৃদয়ের বীজ। সেগুলির কোন্‌টি কখন গিয়ে কোন্ হৃদয়ে শ্যামলশোভন রূপে আত্ম-প্রকাশ করে তা আমরা কিছুতেই অনুমান করতে পারি না। তাঁর সাহস ও তেজস্বিতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। কোনও সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার তাঁকে জানাবে। ইতি—

তোমাদের

কানাই-দা।

রঞ্জন ত চিঠিটা পেয়ে অবধি লাফাচ্ছে।"

চিঠিটা শুনতে শুনতে সুকুমারের মুখ ক্রমশঃ কঠিন হয়ে আসছিল। সে এক নিমেষে বুঝতে পারল কার প্রভাবে সুজাতার হৃদয়ের মধ্যে আজ এই তীব্র আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে। সুজাতা হয়ে পড়েছে তখন একান্ত অন্যমনা। চারিদিকে যে কেউ আছে মুহূর্ত্তের জন্য সে তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে—"কানাইবাবুটি কে?"

সুজাতা কলের পুতুলের মত জবাব দিলে—"সে তুমি চিনবে না।"

কিছুক্ষণের জন্য তিনজনেই নির্ব্বাক। সুকুমার এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে' বল্লে—"বেলা হয়ে গেল, আজ তবে আসি। সুখে থাক।"

এই বলে' একটুমাত্র উত্তরের অপেক্ষা না করে' হন্ হন্ করে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কয়েকদিনের মধ্যে একটা হুলুস্থুল বেধে গেল। নেতৃবর্গ স্থির করেছেন যে সরকার প্রবর্ত্তিত দ্বৈত শাসন রোধ করতে হবে এবং তার জন্য এক বিরাট আন্দোলন বাধাতে হবে। বিরাট আন্দোলন বাধাতে হ'লে প্রয়োজন হয় লোকবল। অশিক্ষিত জনসাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলনের মর্ম্ম বোঝে না। তাদের অনেকেই নিরক্ষর, অনশনে ক্ষীণদেহ, ক্ষীণবীর্য্য, কোনরকমে দু'মুঠো অন্ন দু'বেলা পায়, জীর্ণবস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করে। এর বেশী তারা কিছু বোঝেও না এবং চায়ও না। তাদের আত্মা আছে তাদের দেহের মধ্যে লীন হয়ে, কূট রাজনৈতিক চক্র তারা কিছু জানে না। রাষ্ট্রীয় শাসন কাকে বলে, রাজার সঙ্গে প্রজার কি সম্বন্ধ, প্রজার কি অধিকার, রাজার কি অধিকার, এ সমস্ত বড় বড় কথা তাদের চিন্তার অগম্য। বাল্যকাল থেকে তারা বিধিনিষেধের ব্যবস্থায় গড়ে' উঠেছে এবং কোনদিন কোন বিধিনিষেধের কোন কারণ তারা অনুসন্ধান করে নি এবং করতে চায় নি। অমুকের ছোঁওয়া খাওয়া যায় না, অমুকের ছায়া মাড়ান যায় না, অমুক বস্তু খাওয়া যায় না, এই তারা শুনে আসছে, অমুক কাজ করলে পাপ হয় এ তারা শুনেছে। দোষ ও পাপের যে কোনও

ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে তা তারা জানে না। যেমন ঠাকুর ঘরে প্রণাম করতে হয় তেমনি সাহেব ও পুলিশ দেখলে প্রণাম করতে হয়। ব্রাহ্মণের চেয়েও বড় নমস্য সাহেব। দেবতা-ব্রাহ্মণকে অপমান করলে তার ফলের জন্য পরকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু সাহেব পুলিশকে অপমান করলে তার ফল পাওয়া যায় সদ্য সদ্য লাথি, গুঁতো, কীলচড়ে। সেইজন্য এই সমস্ত নিরীহ প্রজাবর্গ, যত কঠোরই হোক্ না কেন যে কোনও নিয়ম, কোনও শাসন, বিনাবাক্যে তা পালন করে' যায়। সরকারের কোনও শাসন-প্রণালী ব্যর্থ করবে এ রকম কল্পনা তাদের মনে স্থান পায় না। সমাজের ভয়, পুরোহিতের ভয় ও দারোগা-পুলিশের ভয়, এই ত্রিবিধ ভয়ের ত্রিবিধ দুঃখ অনুধাবন করে' কোনও বিধিনিষেধই তাবা লঙ্ঘন কবতে চায় না। শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত যাঁরা আফিসে আদালতে কাজ করেন, তাঁরা বাড়ীতে বসে' খবরের কাগজ পড়বার সময় অনেক গরম গরম মত প্রকাশ করে' থাকেন। কিন্তু চাকরীই তাঁদের একমাত্র পন্থা। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—তাদের চলবার আর দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। কোনও রকমে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বিপন্ন হ'লে তাঁদের অনেকেই খুসী। সরকার বিপন্ন হ'লে তাঁরাও যে আপন্ন হবেন এ কথাটা তাঁরা তলিয়ে দেখেন না। কিন্তু মত প্রকাশের সময় যতই তাঁদের সহৃদয়তা থাক্, তাঁরা মনে মনে নিশ্চিত জানেন যে অসহযোগ অর্থ অনাহারযোগ। কাজেই তাঁরা কেউ বা ধুতি পরে', কেউ বা চাপকান এঁটে, কেউ বা পূরাদস্তুর সাহেবী চালে নিয়ত আদালতে যাতায়াত করেন এবং সকাল বেলা চায়ের পেয়ালার সঙ্গে সঙ্গে 'আনন্দবাজার' 'অমৃতবাজারের' উষ্ণ, কবোষ্ণ ও অত্যুষ্ণ মত পরিপাক করে' থাকেন। যাঁরা ব্যবসায়ী আছেন তাঁরা এ সব দিকে বড় একটা ঘেঁসেন না, কারণ এ সব দিকে

ঘেঁস্‌লেই অর্থহানি। কোনও কোনও বিশেষ দিনে যদি সকলেই দোকান বন্ধ করে, তবে তাঁরাও দোকান বন্ধ করে' হরতাল জ্ঞাপন করে' থাকেন। বিশেষতঃ, কর্পোরেশনে দেশীয় লোকের প্রভুত্ব হবার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড বা ক্ষতির ভয়ে দোকান বন্ধ করে' হরতাল করে' থাকেন এবং অনেকে হয় ত পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে ন্যূনাধিক কিছু কিছু ব্যবসা চালিয়ে থাকেন। ডাক্তার, উকীল, মোক্তার, এঁরাও এদিকে ঘেঁসতে পারেন না, কারণ ফল অর্থহানি ও অনর্থ প্রাপ্তি। কাজেই বাকী থাকেন ছাত্রের দল। এদের অনেকেই কলেজে যায় আসে পরস্পরের সঙ্গলোভে, ক্রীড়া-কৌতুকের লোভে এবং দিনটাকে কোনক্রমে ক্ষয় করবার জন্য। অনেকেই সারা বৎসর পড়াশুনা করে না। ভাল ছেলে যারা তারা পরীক্ষার তিন চার মাস পূর্ব্ব থেকে পড়া আরম্ভ করে এবং মন্দ ছেলেরা তারও অবসর পায় না। অনশনের এদের কোনও ভয় নেই, মাতার যত্নে ও পিতার অর্থে আহারের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। তা ছাড়া কোন রকমের উত্তেজনা স্থষ্টি হ'লে এরা বেঁচে যায়, তা সে উত্তেজনা যে জাতীয়ই হোক না কেন। এদের কোনও কার্য্যে কোনও অসামঞ্জস্যের বোধ নেই, দেশের দুঃখে বিগলিতপ্রায় হয়ে অত্যুষ্ণ বক্তৃতা দিয়ে পরক্ষণেই "প্রিয়বান্ধবী" দেখতে যায় সিনেমা হাউসে। বাইশ তেইশ বছর পর্য্যন্ত এদের জীবনে কোন দানা বাঁধে না, উচ্ছল জলের মত ছুটে যায়, ফিরে আসে, কোথাও বাঁধা থাকে না। কঠোর সত্যের সামনে এরা দাঁড়াতে চায় না। মধুর চাটুবাক্যে এদের ফুলিয়ে তুললে এরা বেপরোয়া হয়ে যা কিছু করতে প্রস্তুত। এই হ'ল সাধারণ নিয়ম। ব্যক্তিবিশেষে এর ব্যতিক্রম আছে, তারা নগণ্য এবং উল্লেখযোগ্য নয়। এরা অনেক পরিমাণে হাউয়ের মত, পল্‌তেয় একটু আগুন ধরিয়ে দিলে অকস্মাৎ আকাশে উঠে যায় তীব্র বেগে, নেমে

আসতেও দেরী হয় না। প্রকৃতি এদের শান্তশিষ্ট, চেহারা নাদুস্-নুদুস্ অথবা অনাহারে ক্ষীণপাণ্ডুর। স্বভাবতঃ মোলায়েম, মৃদু, কিন্তু ক্ষেপে' উঠ্‌লে যে কোনও রকম প্রলাপ বকতে বা মত্তোন্মত্তের মত কাজ করতে এদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। তাই আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ এদের নিয়ে ব্যবহাব করেন তাঁদের শোভাযাত্রার আসর সরগরম করবার জন্য, কর্ত্তৃপক্ষকে বোঝাবার জন্য যে কি রকম একটা mass movement আরম্ভ হয়েছে। এরা সত্য সত্যই inert mass এবং বেগ দিলে inertiaর ধর্ম্মে প্রতিহত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সবেগে ছুট্‌তে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে কোনও ছুটির দু'একমাস পূর্ব্বে যখন কোনও অসহযোগ নীতি প্রচার করা যায় তা যেমন চালু হয় এমন অন্য সময়ে নয়। এদের মধ্যে যারা মোড়লজাতীয় তারা জানে যে কিছুদিন হৈ চৈ করে' কলেজে না গেলেই কর্ত্তৃপক্ষ দেবে কলেজ বন্ধ করে', দু'মাসের জায়গায় পাবে চারমাসের ছুটি অথবা পরীক্ষাটা যাবে পেছিয়ে। মনের চাহিদার সঙ্গে বাইরের তাগিদের একটু মিল ঘটলে উপস্থিত হয় মণিকাঞ্চনযোগ। রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্নদের সাহায্যে এরা গড়ে' তুলেছে একটা সর্ব্বকলেজীয় গোষ্ঠী বা Federation। রাজনৈতিকেরা রাখেন সেই Federation-এর মোড়লবর্গকে হাতে এবং তাদেব মধ্য দিয়ে অনায়াসে বাধিয়ে দেন অগ্নিকাণ্ড কলেজে কলেজে। খবরের কাগজওয়ালারা আপন পণ্যবিক্রয়ের স্বার্থে এই ছাত্র-বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে সাহস করে না, রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে কার্য্য, অকার্য্য, কুকার্য্য, অপকার্য্য যা তারা করে তারই অতি ভূয়সী প্রশংসা তারা কাগজে কাগজে প্রকাশ করে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাবের বিরুদ্ধে কাগজে বেরোয় প্রতিবাদ, ছাত্রেরা সভা করে' করে তার সমর্থন। ফলে বাধে ছাত্রে অধ্যাপকে দ্বন্দ্ব, ধ্বংস হয়

বিদ্যালয়ের পবিত্রতা। খবরের কাগজে এদের নানা কার্য্যের যে প্রশংসা বেরোয় সেগুলি প্রায়ই হয় অতিরঞ্জিত বা মিথ্যারঞ্জিত, কারণ সেগুলি প্রায়ই এরা নিজেরা লিখে দিয়ে আসে সাংবাদিকদের হাতে। পরের দিন সকালে নিজেদের কৃত নিজেদের প্রশংসাই সংবাদ-পত্রের মারফতে পাঠ করে' অজস্র আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। ফলে রাজনৈতিকেরা ও সাংবাদিকেরা মিলে কঠোর আত্মসংযম, বিদ্যানিষ্ঠা ও গুরুনিষ্ঠার হাত থেকে ছেলেদের মুক্তি দিয়ে স্তাবকতার পণ্যে ছেলেদের হৃদয় জয় করে' তাদের লাগিয়ে দেন সোরগোলের ব্যাপারে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সোরগোলের যে কোনও মূল্য নেই তা বলা যায় না, কিন্তু যথার্থ ক্ষোভ ও অযথার্থ ক্ষোভ এ দুয়েরই একটা পরিচয় আছে এবং সে পরিচয় আমাদের সূক্ষ্মবুদ্ধি শাসকদের নিকট সুবিদিত। এই ব্যাপারে যেটুকু ছেলেদের পক্ষে মঙ্গলকর সেটুকু হচ্ছে এই যে তাদের জীবনের কোমল কিশলয়ে দেশভক্তির একটা দাগ বসে' যায়। সে দাগের মূল্য তারা তখন বুঝতে না পারলেও উত্তরকালে তা তাদের জীবনের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই প্রভাবটা দেশের যথার্থ মঙ্গল অনুসন্ধানের দিকে তেমন নয় যেমন শাসকবর্গের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার করার জন্য। সেইজন্য উত্তরকালে এদের চিত্তে সেই বিদ্বেষের ধূম ও বিষ যে পরিমাণে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে তদনুপাতে কোনও যথার্থ উৎসাহ দেখা যায় না দেশের যথার্থ মঙ্গলের অনুধ্যানে। কিন্তু ফলে এই প্রসঙ্গে এদের অনেকের চিত্ত অকালপক্ক হয়ে ওঠে। বিদ্যানুরাগ থেকে এরা হয় ভ্রষ্ট, শ্রদ্ধেয় লোকের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে যায় ভুলে, সোরগোলকে মনে করে দেশ-হিতৈষণা এবং পুলিশের অত্যাচারে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে অনেকে লাঞ্ছিত, বিপর্য্যস্ত ও এমন নিগৃহীত হয় যে জীবনে আর তার উঠে দাঁড়ান সম্ভব হয় না। দেশ-হিতৈষণার

স্তাবকতায় এরা ওঠে ফুলে, অনুশোচনা জাগবার হয় না অবসর। অবশ্য ব্যক্তিবিশেষে হয় ত এর ব্যতিক্রম আছে।

আমরা শব্দ যতটা করি তার চেয়ে বড় করে' তুলতে চাই তার প্রতিধ্বনি। তাই এই বিপুল ছাত্রবাহিনীকে বিদ্যালয়ভ্রষ্ট করে' বড় বড় সভায় এদের দ্বারা সভ্য-জনতার বৃদ্ধি করে' তার প্রতিধ্বনি তুলি খবরেব কাগজে এবং সেই প্রতিধ্বনিতে আত্মপ্রসাদ লাভ করি আমাদের দেশহিতৈষণার সাফল্যে। সেই সাফল্য আমরা সার্থক করি আমাদের ব্যক্তিগত ভোট সংগ্রহে কিংবা লম্বা লম্বা টেলিগ্রামে সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন-নিবেদনের পাদপূরণে।

ভারতবর্ষ চিরদিন ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষিত। আমাদের সনাতন ধর্ম্ম বলে—ত্যাগের দ্বারা পাওয়া যায় অমৃত। এর মর্ম্ম আমরা ভুলে গিয়েছি, কিন্তু আমাদেব রক্তে বয়ে গেছে তার দীক্ষার মন্ত্র। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করতে হ'লে দেখাতে হয় ত্যাগের নজির। সে ত্যাগটা যার যত বেশী তাকে সেই পরিমাণে অকৃত্রিম দেশবন্ধু বলে' মনে করে' থাকি। এ ত্যাগের একটা পরিচয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিভয়ে মতামত প্রকাশ করে' জেল বরণ করা এবং তার পবে সেই জেলে যাওয়া উপলক্ষ্য করে' আপন অনুচরদের দ্বারা নানা আন্দোলন করে' জেল থেকে মুক্তিলাভের জন্য নানা কোলাহল সৃষ্টি করা ও সেই কোলাহলকে প্রতিদিন খবরের কাগজে প্রতিধ্বনিত করা। বাগ্‌বলই যেখানে প্রধান বল সেখানে কোলাহল সৃষ্টির শুভ লগ্ন কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। আর একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগ অবলম্বনে কে কতটা পরিমাণে আর্থিক ক্ষতি সহ্য করেছে। আমাদের শাস্ত্রে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে দরিদ্র যখন তার জীর্ণ বস্ত্রখানি দান করে কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে, তখন সেই দানই

হ'ল শ্রেষ্ঠ দান, শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে ইউরোপীয় অর্থ-মর্য্যাদা। তাই আমরা ত্যাগের মহিমা বিচার করি অর্থের পরিমাণগত ত্যাগের দ্বারা, ত্যাগ-প্রবৃত্তির আতিশয্যের দ্বারা নয় বা ত্যক্ত ধনের উপকারিতার দ্বারা নয়। আমাদের শাস্ত্রে বলে—ত্যাগটা অন্তরের বস্তু, ত্যাগ মরণের ধর্ম্ম নয়, জীবনের ধর্ম্ম, অমৃতত্বের ধর্ম্ম। ত্যাগের দ্বারা পাওয়া যায় অমৃতত্ব, ত্যাগের দ্বারা পাওয়া যায় শ্রেষ্ঠ ভোগ। লোভের দৈন্যে যে চিত্ত থাকে শতচ্ছিদ্র হয়ে সেই পূর্ণপাত্র থেকে প্রাপ্তি যায় জলধারার বেগে নিঃসৃত হয়ে। ত্যাগের প্রলেপে, অন্তরের রসে পাত্র আপনি হয়ে ওঠে পূর্ণ। সে জন্য শাস্ত্র বলেছে—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে। কিন্তু আমাদের দেশে দেশ-হিতৈষণার সমস্ত ত্যাগবৃত্তিকে জাগ্রত করে' তোলবার চেষ্টা হয়েছে শাসকদের প্রতি বিদ্বেষবহ্নিকে সন্ধুক্ষিত করে' তোলবার জন্য। দেশ-হিতৈষণার সিংহাসনে বসানো হয়েছে রোষ এবং দ্বেষ। এই শাসকদের ব্যবহারকে ব্যর্থ করবার জন্য যে উপায়ই আমরা অবলম্বন করি না কেন, সেইটিকেই অনেক সময়ে মনে হয় দেশহিতৈষণার অমোঘ মন্ত্র। কোনও বিষয়ে কোনও ব্যক্তি যখন আপন মতপ্রকাশের জন্য ক্ষয়ক্ষতি-লাঞ্ছনা বরণ করেন তিনি চিরদিন নমস্য। কিন্তু যখন এই ক্ষয়ক্ষতি কেউ বরণ করে অপরের প্রতি দ্বেষকে চরিতার্থ করবার জন্য তখন তাকে আর এই মহাসিংহাসন দেওয়া যায় না। ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে সহস্র সহস্র লোক প্রত্যহ ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করছে। সে ক্রোধ কোন্ বিষয়কে অবলম্বন করে' হয়েছে, পারিবারিক গণ্ডীতে হয়েছে, ব্যবহার-ক্ষেত্রে হয়েছে, কি জাতিগত বিদ্বেষের জন্য হয়েছে, যেভাবেই হোক্ না কেন, শত্রু হিসাবে যারই প্রতিস্পর্দ্ধিতায় আমরা দাঁড়াই না কেন, সেই প্রতিস্পর্দ্ধিতার ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি আমরা ভোগ করি তা যথার্থ-

ভাবে আত্মপ্রকাশের মহিমামণ্ডিত নয়। সেটা হচ্ছে ক্রোধের অভিব্যক্তি। কামক্রোধের অভিব্যক্তিতে ক্ষয় অনিবার্য্য। সেই ক্ষয়ক্ষতি স্বীকারে প্রকাশ পায় অভিমান এবং দম্ভ। যথার্থ ত্যাগের মহত্ত্ব ও শুচিতা সেখানে নেই। বহু বৎসরের প্রচেষ্টায় আমরা সমর্থ হয়েছি কতক পরিমাণে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে। সেই জন্য আমাদের কোনও দেশবরেণ্য নেতা বারংবার এই কথাটি বলতে চেষ্টা করেছেন—যা অন্যায়, যা পাপ, যা অহিতকর, এবং যারা তার প্রবর্ত্তন করেছে, এ সমস্তকেই আমরা প্রতিরোধ করব, কিন্তু ঘৃণার দ্বারা নয়, হিংসার দ্বারা নয়, মৈত্রীর দ্বারা। এই ছিল আমাদের ভারতবর্ষের সনাতন মন্ত্র। এ মন্ত্র যে সকলে পালন করত তা নয়, কিন্তু এই ছিল আদর্শ। বলের দ্বারা বল প্রতিরোধ করব, চক্ষুর বদলে চক্ষু, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা উচ্ছিন্ন করব—ইহুদী জাতির এই আদর্শ আজ ব্যাপ্ত করেছে খৃষ্টান ইউরোপকে এবং সেই আদর্শ জাহাজে করে' চালান হয়েছে নিরীহ দুর্ব্বল ভারতবর্ষে। আমাদের দেশে বল নেই, আছে আস্ফালন, পৌরুষ নেই, আছে আক্রোশ, হনন করার শক্তি নেই, আছে জিঘাংসা।

রাজনৈতিকদের নির্দ্দেশ এল, শাসকপ্রবর্ত্তিত দ্বৈত শাসন প্রতিরোধ করতে হবে, সেই জন্য হুলস্থূল সোরগোল বাধিয়ে দিতে হবে। হুলস্থূল করবে কারা?—সমস্ত কলেজের ছাত্রেরা। ফতোয়া জারী হ'ল কলেজে কেউ যাবে না এবং কাউকে যেতে দেওয়া হবে না। কলকাতার কলেজে কলেজে ছাত্রমহলে উঠ্‌ল উত্তাল ঢেউ। নিরীহভাবে যেখানে চলছিল পঠনপাঠন সেখানে সমূহভাবে উঠ্‌ল বিক্ষোভ। কোনও একটা ইংরেজ অধ্যক্ষ পরিচালিত কলেজে এই

বিক্ষোভ উঠ্‌ল চরম সীমায়। প্রধান নেতার আদেশ ছিল অহিংস প্রতিরোধ। তাই দলে দলে ছেলেরা গিয়ে শুয়ে পড়্‌ল গেটের সামনে। পুলিশ এসে ঘা কতক করে' রুলের বাড়ি দিয়ে তাদের অহিংস বুদ্ধিকে জর্জ্জরিত করে' তুলল এবং চ্যাংদোলা করে' prison vanএ ভর্ত্তি করে' তাদের চালান করতে লাগ্‌ল লালবাজার। দরজার সামনে অহিংস প্রতিরোধের অনেক ফ্যাসাদ দেখে' ছেলেরা কলেজের হাতার মধ্যে অহিংস প্রতিরোধ সুরু করল। বলা বাহুল্য, পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অহিংস হ'লেও সতীর্থদের সম্বন্ধে সকল সময় অহিংস থাকৃত না। কিন্তু ব্যাপার এখানে শেষ হ'ল না। শ্বেতমুখ নন্দীভৃঙ্গীরা কলেজের হাতার মধ্যে ধাওয়া করে' গিয়ে ছেলেদের ধরপাকড় আরম্ভ করে' দিল। একটা ছেলের মাথায় দিলে বাড়ি, মাথা কেটে একটু রক্তপাত হ'ল। রব উঠ্‌ল যে দোতলা থেকে সাহেব অধ্যক্ষ দেখিয়ে দিয়েছিল সার্জ্জেণ্টদের ঐ ছেলেটিকে মারবার জন্য। সাগরের বন্যা উঠ্‌ল তুমুল হয়ে কলেজের মধ্যে। কাতারে কাতারে ছেলে দাঁড়িয়ে গেল কলেজের প্রাঙ্গণে, সোপানে এবং বারান্দার উপরে। এই ভিড়ের প্রধান কেন্দ্র হ'ল অধ্যক্ষের উপবেশন-গৃহের দরজায়। 'মার মার' ধ্বনি উঠ্‌তে লাগ্‌ল চারিদিকে। ছেলেদের ঘন ঘন ধ্বনি উঠ্‌তে লাগ্‌ল—অধ্যক্ষের রক্ত চাই, সেই রক্ত মেশাতে হবে ঐ আহত ছেলেটির রক্তের সঙ্গে। পুণ্যব্রত ছাত্রদের সেদিন প্রধান তর্পণ হবে অধ্যাপকের রক্তে। অনেক মান্যগণ্য অধ্যাপক চেষ্টা করলেন ছেলেদের থামাতে, তাঁদের ভাগ্যে জুট্‌ল কীল, চড়, চাঁটি। স্বয়ং ডিরেক্টর সাহেব উপস্থিত হলেন রণাঙ্গনে কিন্তু এসেই দেখলেন যে তাঁর সেখানে উপস্থিতি একান্ত misdirection। তিনি পলায়ন করলেন অশুচিগৃহের অশুচি সোপান দিয়ে। অধ্যাপক জীবনে ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছনাভোগ করবার সৌভাগ্য

তাঁর ঘটেছিল। সেই আঘাতের দাগ বোধ হয় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। তাঁর এ কথাও স্মরণে ছিল যে তাঁর প্রহর্ত্তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়েছেন এখন রাজনৈতিক রথের সারথি। তিনি ইংরেজ, তৎক্ষণাৎ তাঁর স্মরণ হ'ল প্রসিদ্ধ ইংরেজী প্রবাদবাক্য—discretion is the better part of valour। তাই তিনি অধ্যক্ষকে নিরাশ্রয় করে' সরে' পড়লেন আপন প্রাণ বাঁচাতে অকথ্য ঘরের অকথ্য দ্বার দিয়ে। তুমুল আন্দোলন উঠ্‌ল কলেজের মধ্যে। ছেলেরা দিল টেলিফোনের তার কেটে পুলিশের সঙ্গে অধ্যক্ষের সংযোগ নিবারণের জন্য। কলেজের বাইরে রাস্তায় টহল দিচ্ছিল ইংরেজের মেশিন্ গান্। ছেলেরা এতক্ষণ তাদের অধ্যক্ষকে আসনচ্যুত করত, শুধু তাদের আশঙ্কা ছিল অধ্যক্ষের হাতে যদি থাকে রিভল্‌ভার। এই জন্য তারা অবলম্বন কর্‌ল অবরোধ নীতির। কেউ কেউ এমনও পরামর্শ দিচ্ছিল যে এক সঙ্গে পঞ্চাশ ষাট জন প্রবেশ করে' সহর্ষে ও সগর্ব্বে অধ্যক্ষকে পদাহত করে' তার বিনাশ সাধন করবে। এমন সময় দু'একজন অধ্যাপকের সন্ধিচেষ্টার ফলে অধ্যক্ষ রাজি হ'লেন আহত ছেলেটির বাড়ী গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইতে। অতি কষ্টে রক্ষা হ'ল তাঁর প্রাণ। কিন্তু ছেলেদের ক্রোধ সহজে শান্ত হবার নয়। সেই ক্রোধ গিয়ে পড়্‌ল সেই সব অধ্যাপকের উপর যাঁরা কলেজে কঠোর শাসনের পক্ষপাতী। এই রকম পক্ষপাতিতা কোন্ অধ্যাপকের ছিল সে বিষয়ে তাদের কোনও সাক্ষাৎ জ্ঞান ছিল না, তাদের সন্দেহই তাদের প্রমাণ। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন কর্ম্মক্লান্ত দিনের অবসানে একজন নিরীহ অধ্যাপক তাঁর বাড়ীর গলিতে প্রবেশ করেছেন তখন পাঁচ-ছ'টি ছাত্র মিলে তাকে ইচ্ছাসুখে প্রহার করে' ছাত্র-জীবনের কীর্ত্তি জাজ্বল্যমান করে' রাখ্‌ল। গোপনে করেছিল এরা অনুসরণ, সন্ধ্যার অন্ধকারে

সমাধা করল এরা এদের কাজ এবং গোপনে অনুভব করল এরা আত্মপ্রসাদ। এই রকম করে' কলকাতার মহানগরীতে উঠল ছাত্রদের বিক্ষোভ। অধ্যয়ন অধ্যাপনা হ'ল বন্ধ। ছাত্রসমাজের সাড়া নাড়া দিলে গিয়ে ছাত্রীদের অবলা গোষ্ঠীকে। তারাও হয়ে উঠল সবলা।

ইতিমধ্যে কানাই পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে বিচরণ করে' ফিরছিল। সে কংগ্রেস্ বা অ্যান্টি-কংগ্রেস, কোনও দলভুক্তই ছিল না। সে যা করত তা তার আপন তাগিদে, কোনও দেশনেতার ফতোয়ার সম্বল তার ছিল না। তার প্রণালীই ছিল একেবারে অন্যরূপ। কোনও গ্রামে গিয়ে সে অতিথি হ'ত কোন সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে। তারপর ধীরে ধীরে ভাব করে' নিত গ্রামের প্রধানদের সঙ্গে, হাত করে' নিত গ্রামের তরুণদের। গ্রামের কি অভাব অভিযোগ তা করত আবিষ্কার এবং কি করে' তা দূর করা যায় সেই বিষয়ে গ্রামের লোকদের চিত্ত আকর্ষণ করবার জন্য তাদের আমন্ত্রণ করে' করত সভা। তারপর কতগুলি কর্ম্মঠ তরুণকে নিয়ে নিজেই লেগে যেত গ্রামের নানা অভাব অভিযোগ সংস্কারের কাজে। কখনও বা খুলতে চেষ্টা করত ছোট ছোট পাঠশালা বা নৈশবিদ্যালয়। উত্তেজক বক্তৃতা সে মধ্যে মধ্যে দিত, কিন্তু তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গঠনমূলক কার্য্য। বিদেশীয়দের অধীনতা আমাদের হয়ে গেছে মজ্জাগত। তার একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে তাদের বিরুদ্ধে নিষ্ফল রোষপ্রকাশে, অভিমান প্রদর্শনে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অকর্ম্মণ্যতা আমরা এইভাবে প্রমাণ করি যে সমস্ত বিষয়ে আবার এদেরই শরণাপন্ন হই। নিজেদের যা কিছু অভাব অভিযোগ প্রত্যেকটির জন্য আমরা সরকার বাহাদুরের দ্বারস্থ হই। এমনি করে' আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের নিজেদের মঙ্গল করবার অধিকার।

কানাইয়ের মনে বিশ্বাস ছিল যে বিদেশীয় রাজার নিকট নিরন্তর আবেদন নিবেদন ও নিষ্ফল রোষপ্রকাশ একান্তই অর্থহীন। আমাদের নিজেদের কাজ আমরা নিজেরা না করতে চেষ্টা করে' কেবল দেব রাজার দোহাই, এতে কখনই আমাদের আত্মশক্তির বোধ জাগে না। এইভাবে কাজ করতে গিয়ে কানাই কিছু কিছু সাফল্যও লাভ করেছিল। দেশের তরুণদের উপর তার বেশ একটু প্রভাব জমে' উঠেছিল এবং খবরের কাগজের মারফত তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দেশময়।

কলকাতায় ছাত্রদলের যে হাঙ্গামা উপস্থিত হ'ল তার ফলে কোতোয়ালের অত্যাচার উঠ্ল বেড়ে। দলে দলে ছেলেদের ধরে' নিয়ে যেতে লাগ্ল জেলে। পুলিশের বিরুদ্ধে লোকের যত অসন্তোষ ও অভিযোগ তার কিছু কিছু এসে পড়ল দেশের নেতাদের উপর। তাঁরা ভাবতে লাগলেন—এ যৌবনজল-জোয়ার রুধিবে কে? আন্দোলন তাঁরা বন্ধ করতে পারেন না, কারণ ক্ষোভিত ছাত্রদল তাঁদের শাসন না মেনে নিজেরাই যদি কোনও দিকে নিজেদের গতি স্থির করে' নেয় তবে তাঁরা হয়ে পড়বেন একান্ত নিরুপায়। তা হ'লে এই শক্তিকে তাঁরা ব্যবহার করতে পারবেন না, বরং এই শক্তি কোনও কারণে হয় ত তাঁদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পারে। যজ্ঞের অপরাধে বধ্য যে ঘাতক হয়ে দাঁড়ায় পুরাণে এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কলকাতার নেতাদের দৃষ্টি পড়্ল কানাইয়ের উপর। তাঁরা দেখলেন যে কানাই বাইরের লোক, তার হিতাহিতে তাঁদের বড় কিছু আসে যায় না, অথচ ছাত্রসমাজে কানাইয়ের প্রচুর প্রভাব রয়েছে। কানাইকে যন্ত্র করে' হয় ত এই ছাত্রবাহিনীকে হাতে রাখা যায়। কানাইকে যন্ত্র করা এমন কিছু কঠিন হবে না। সে বাইরের লোক, একটু পিঠ চাপ্ড়ে দিলেই সে এসে তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করবে, কথা অনুসারে

কাজ করবে। খবর দিয়ে আনানো হ'ল কানাইকে। কানাই দেখা করতে গেল কলকাতার কোনও এক প্রধান জননায়কের সঙ্গে।

নায়ক মহাশয় কানাইকে বল্লেন—"আপনি মফঃস্বলে যে সমস্ত কাজ করেছেন তা অত্যন্ত বিস্ময়কব। ছাত্রদের উপর আপনি অসাধারণ প্রভাব অর্জ্জন করেছেন, আপনাকে আমাদের মধ্যে পেলে আমাদের কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। আপনিও হয় ত ভবিষ্যতে আমাদের বিশেষ আত্মগোষ্ঠীর মধ্যে স্থান পেতে পারবেন।"

কানাই ঈষৎ হাস্যে জবাব করলে—"আমি শুধু কাজ আরম্ভ করেছিলাম মাত্র, এখনও কোনও সাফল্য লাভ করতে পারি নি। আমাকে এখানে ডেকে আনাতে যে কাজ করতে আরম্ভ করেছিলুম তার ক্ষতি হয়ে গেল। তবু, আপনারা দেশের নেতা, আপনাদের আদেশ সহজে অমান্য করা যায় না। তা, আমাকে আপনারা কি করতে বলেন?"

নাযক মহাশয় জবাব করলেন—"ছাত্রদের ত তোলা গেছে ক্ষেপিয়ে। আমাদের প্রধান অধিনায়ক যিনি তিনি বলেন যে যে রকম আন্দোলনই কবি না কেন, সেটাকে সম্পূর্ণ অহিংস রাখতে হবে।"

কানাই আস্তে আস্তে জবাব করলে—"কিন্তু ছাত্রদের এভাবে একটা হুলস্থূল ব্যাপারে ভিড়িয়ে দিয়ে কি লাভ হবে?"

নায়কমহাশয় বল্লেন—"সে আপনি সহজে বুঝবেন না। এ আমাদের একটা warfareএর মত। আপনারা কাজ করবেন আমাদের Lieutenant রূপে, তবেই কাজ সুসম্পন্ন হবে। আপনারা প্রত্যেকে যদি 'কেন', 'কেন' জিজ্ঞাসা করেন তবে আপনাদের বোঝাতেই যাবে আমাদের সময়, কাজ আর সমাধা হয়ে উঠবে না। এখানে চাই একটা military disciplineএর মত unswerving allegiance।

এ কথা আপনাকে বলতে পারি যে এটা ঘটিয়ে তুলতে পারলে আপনার পুরস্কার আপনি পাবেন কেবল যে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতায় তা নয়, অন্য উপায়েও।"

কানাই জবাব করলে—"সামরিক ব্যাপারের সঙ্গে আপনাদের এ ব্যাপারের কোনও সাদৃশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি না। সামরিক ব্যাপারের উদ্দেশ্য থাকে নির্দ্দিষ্ট। কর্ম্মচারীরা থাকে বেতনভোগী এবং এই সর্ত্তে তারা নিযুক্ত হয় যে নায়ক যা করতে বলবে তাই তাদের করতে হবে। কিন্তু সামরিক ব্যাপারে এমন অনেক বড় বড দৃষ্টান্ত আছে যেখানে আপন বুদ্ধি অনুসারে ছোট ছোট নেতারা প্রধান নায়কের মত উপেক্ষা করে' সমরে বিজয়লাভ করেছেন এবং প্রশংসার্হ হয়েছেন।"

"দেখুন, দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকে সর্ব্বথা মিল কোথাও ঘটে না। আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে শাসকসম্প্রদায়ের সঙ্গে। আমরা দলবদ্ধ হয়েছি তাদের বিরুদ্ধে।"

"কিন্তু আপনারা ত যুদ্ধ করছেন না।"

"যুদ্ধ নয় কেন? আমাদের অসহযোগ-নীতির দ্বারা ইংরেজের শাসনকে আমরা অচল করে' তুল্‌ব।"

"এর দুটো দিক আছে। যারা অসহযোগ করলে রাজশাসন অচল হবে তারা ত অসহযোগ করছে না। দ্বিতীয়তঃ, ধরে' নিলুম আপনারা সমর্থ হলেন রাজশাসন অচল করতে কিন্তু যতক্ষণ ইংরেজ এদেশে আছে ততক্ষণ তার বদলে আপনারা একটা সুশাসন স্থাপন করতে পারবেন না, তবে অশাসনে দুঃখ পাবে দেশের জনসাধারণ। স্কুল, কলেজ, আইন আদালত, পুলিশ, যানবাহন সমস্ত হবে অচল, অনাহারে এবং দস্যুর অত্যাচারে অল্পক্ষণের মধ্যেই পীড়িত হয়ে পড়বে দেশের জনসাধারণ। তবে এতে সুফল কি প্রত্যাশা করেন?"

নায়কমহাশয় এরূপ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এরূপ প্রশ্ন কথনও কেউ করে নি এবং তাঁর মাথায়ও কখনও আসে নি। তিনি একটু চিন্তা করে' বল্লেন—"ইংরেজ তা হ'তে দেবে কেন ?"

কানাই বল্লে—"তবে আপনারা জানেন যে এ যুদ্ধে আপনাদের বিজয় নেই ? এটা কেবলমাত্র যুদ্ধের ভাণ ?"

নায়কমহাশয় বল্লেন—"কিন্তু বেটারা জব্দ ত হবে, নাকানি-চোবানি ত খাবে !"

"কিন্তু তারা যত জব্দ হবে তার চাইতে বেশী জব্দ হব ত আমরা।"

"এ-সব politicsএর চাল আপনারা সহজে বুঝবেন না।"

"সহজে ত বুঝবই না, অত্যন্ত কষ্ট করে'ও ত বুঝতে পারছি না, সেইজন্যই ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

নায়কমহাশয় আবার বল্লেন—"আমাদের শক্তির পরিচয় পেলে ব্যাটারা ভয় পেয়ে যাবে এবং ভয় পেয়ে হয় ত আমাদের দু' একটা নূতন অধিকার দিয়ে দিতে পারে। ভাবতে পারে যে স্বস্তিতে থাকতে হ'লে আমাদের কিছু অধিকাব দিয়ে দেওয়াই তাদের পক্ষে উচিত হবে।"

কানাই আবার বল্লে—"তা হলে, এটা বলুন চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষে করা। তবে যে আপনারা বলেন নিজের বলে আদায় করে' নেব ?"

"দেখুন, politicsএ বলা ও করার মধ্যে অনেক তফাৎ। যা বলি তা আমরা করি না, যা করি তা আমরা বলি না। এই ত politicsএর game।"

কানাই বল্লে—"তা হলে ত এটা অসত্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া। অথচ প্রধান অধিনায়ক বলেন যে সত্যাগ্রহের পথই দেশহিতৈষণার পথ।"

নায়কমহাশয় বল্লেন—"এদেশের লোক এখনও মধ্যযুগের অবস্থায় আছে, এখানে এখনও সত্য, ন্যায়, ত্যাগ, ধর্ম্ম, এই সমস্ত বুলিতে দেশের লোককে যত হাতে পাওয়া যায় এমন অন্য কিছুতে নয়।"

কানাই বল্লে—"তা হ'লে ত ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে আমাদের দেশের লোকের মনে এখনও যে সাধু আদর্শটা আছে সেইটেকে অবলম্বন করে' ছলনাপূর্ব্বক তাদের আপনাদের কোনও সঙ্কল্প বা ফন্দির মধ্যে টেনে আনতে চান? শাসকেরা একরকম কৌশল অবলম্বন করে, আপনারাও আর একরকম কৌশল অবলম্বন করেন। উভয়েরই মুখ্য উদ্দেশ্য দেশের লোককে ছলনা করা।"

"দেখুন, কার্য্যসিদ্ধিই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সেটা ঘটাতে হবে যেন তেন প্রকারেণ।"

জবাবে কানাই বল্লে—"কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি যে হবে তার প্রমাণ কি? আপনারাই যে ছলনায় রাজরাজেশ্বর এমন ত বলা চলে না। যাদের সঙ্গে আপনারা লড়াই করতে চান তারা যে ছলচাতুরী প্রতারণায় আপনাদের ছাড়িয়ে যাবে না তার কি কোনও প্রমাণ আছে? তা ছাড়া, তাদের হাতে আছে দণ্ডশক্তি। সেটা আপনাদের হাতে নেই।"

নায়কমহাশয় আবার বল্লে—"দেখুন, ইংরেজ জাতির একটা স্বাভাবিক honesty আছে, একটা integrity আছে। তারা একটা প্রতিজ্ঞা করে' বসলে তার ব্যত্যয় হবে না।"

"তা হ'লে বলতে হয় যে প্রতিপক্ষের সাধুতা ও ন্যায়নিষ্ঠার ভরসায় আপনারা ছলচাতুরী প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেছেন? তাতে আমাদের কত হীন প্রমাণ করা হয় এবং ওদেরও কতখানি বাড়িয়ে তোলা হয়!"

নায়কমহাশয় একটু বিব্রত হয়ে জবাব করলেন—"এ ছাড়া আর

উপায় কি? নিরুপায় হয়েই না আমরা এই অহিংস অসহযোগ অবলম্বন করেছি!”

কানাই বল্লে—“আপনারা নিরুপায়, এ কথা মেনে নিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তা বলে' এইটেই যে উপায় তা ত প্রমাণ হয় না।”

নায়ক বল্লেন—“কোনও দিক দিয়ে ত চেষ্টা করে' দেখতে হবে।”

কানাই আবার বল্লে—“কিন্তু এই উপায়েই আপনারা চেষ্টা করতে পারছেন কোথায়? যারা অসহযোগ করলে সরকারের শাসন অচল হবে তারা ত অসহযোগ করছে না। আপিস্ আদালত, দোকানপাট, কোতোয়ালী, এর কোন জায়গায়ই ত অসহযোগ নেই। বুঝতুম আপনারা এদের সকলকে অসহযোগে নামাতে পারতেন অন্ততঃ ছ'মাস কিংবা এক বছর! তা হলেও আপনাদের চেষ্টা মনে হ'ত কতকটা সফল হয়েছে।”

“আরে মশাই, তা হবে কেন? এক দিন চাকরী গেলে যারা না খেয়ে মারা যাবে তারা শুনবে কেন আপনাদের কথা?”

“আপনাদের কাজকে আপনারা তুলনা করতে চান যুদ্ধের সঙ্গে। যুদ্ধ যারা করতে যায় তাদের প্রধান দৃষ্টি থাকা উচিত রসদের উপর। এমন ব্যবস্থা আপনাদের করা উচিত যাতে সমস্ত চাকরী-জীবিদের আপনারা ছ' মাস কি এক বছর খাইয়ে রাখতে পারেন। বিগত জার্ম্মাণযুদ্ধে জার্ম্মাণরা ত বীরত্ব কম দেখায় নি, হেরে গেল শুধু রসদের অভাবে। আপনারাও তেমনি মারা পড়বেন রসদের অভাবে, আপনাদের সমস্ত প্রচেষ্টা দাঁড়াবে বাতুলের আস্ফালনে।”

“কিন্তু সম্প্রতি আমাদের চেষ্টা হচ্ছে এই দ্বৈত-শাসনকে নিষ্ফল করা।”

“কেমন করে' করবেন আপনারা নিষ্ফল?”

"সে অনেক রকম কায়দা আছে, তা আপনি সব বুঝতে পারবেন না।"

"বুঝতে ত পারছিই না, কিন্তু আপনার মত একজন মনীষী যদি ব্যাখ্যা করে' দেন তা হ'লেও যে বুঝতে পারব না এ কথাটা মনে ভাবতে পারি না।"

"আপনার পড়াশুনা কতদূর? বি-এ'টা কি পাশ করেছিলেন?"

কানাই বিনীতভাবে বল্লে—"আমি এম্-এস্-সি পাশ করেছি।"

নায়ক মহাশয় একটু থম্‌কে গেলেন। তিনি বি-এ তিনবার ফেল করে' করতেন মফঃস্বল কোর্টে ওকালতি, এখন স্বদেশীতে যোগ দিয়ে ব্যবসাটি একটু ফাঁপিয়ে তুলেছেন। তিনি বল্লেন—"তা হ'লে ত আপনি quite educated। কথাটা তা হ'লে হয় ত আপনি ধরতে পারবেন।"

কানাই বল্লে—"হয় ত বা পারতে পারি।"

নায়ক মহাশয় বল্লেন—"দ্বৈত শাসন চালাতে হ'লে সরকার পক্ষে অধিক ভোট প্রয়োজন। আমরা চাইছি সরকারের প্রতিপক্ষের ভোট বাড়িয়ে তুলতে। তা হ'লেই মন্ত্রীপরিষদ হবে অচল।"

"এই বিরুদ্ধ পক্ষের ভোট বাড়াবেন কি করে'?"

"ছলে বলে কৌশলে। আপনি ত Science-এর লোক, সংস্কৃত জানেন না। সংস্কৃতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে—যে লুব্ধ তাকে অর্থ দ্বারা বশ করবে, সাধু ব্যক্তিকে বশ করতে হয় স্তবস্তুতি ও ভদ্রতার দ্বারা, মূর্খকে বশ করতে হয় তার কথায় সায় দিয়ে, আর পণ্ডিত ব্যক্তিকে যথার্থ হক্ কথা বলে' বশ করতে হয়।"

কানাই বল্লে—"আমি সংস্কৃতও জানি না, পণ্ডিতও নই। কিন্তু আমাকে যেটুকু দেবেন তা ঐ শেষের পদার্থটা। পূর্ব্বের গুলির উপর আমার লোভ নেই।"

নায়ক বল্লেন—"তাই ত আপনাকে হক্ কথাটাই বলে' দিয়েছি।"

কানাই আবার বল্লে—"রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবেশ করে' দেশের মঙ্গলের জন্য ব্রতী হয়ে আপনারা অসত্য এবং অসাধুতার দ্বারা যে জয়লাভ করতে চান তাতে কি দেশের মঙ্গল হবে? ইংরেজদেরই আপনারা এই গালাগালি করে' এসেছেন যে তারা ছলনাপরায়ণ, শঠ, অসাধু। এখন আপনারা যে সেই উপায়েই তাদের উপর জয়লাভ করতে চান, স্বাধীনতার নামে এর চেয়ে বড় পরাধীনতা আর কি হ'তে পারে?"

নায়ক বল্লেন—"পরাধীনতাটা আবার এর মধ্যে আপনি কি দেখলেন?"

কানাই বল্লে—"ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মনীতিতে এই কথাই বলে যে সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে জয় করবে, মৈত্রীর দ্বারা বৈরতাকে জয় করবে। ভারতীয় সভ্যতার এই প্রধান মন্ত্রকে একান্তভাবে পরিত্যাগ করে' অসাধুতাকে বরণ করে' নিয়ে আপনারা স্বীকার করে' নিলেন যে ইউরোপের যেটা কুৎসিত দিক সেইটাই যথার্থ বড় এবং ভারতবর্ষের যেটা ধর্ম্মের দিক সেইটাই হচ্ছে নিকৃষ্ট।"

নায়ক আবার বল্লেন—"এই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে'ই ত ভারতবর্ষ গেল। মনে করেছিলুম যে আপনি যখন এম্-এস্-সি পাশ তখন অন্ততঃ ধর্ম্মের ভূতটা আপনার ঘাড় থেকে নেমেছে।" এই কথা বলে'ই তিনি হো হো করে' হেসে উঠ্লেন এবং বল্লেন—"you must get rid of this ধর্ম্ম once for all—আমরা চাই কার্য্যক্ষমতা, কার্য্যকারিতা, ধর্ম্ম নয়।"

কানাই বল্লে—"আপনি কি মনে করেন ধর্ম্ম জিনিষটা কার্য্যক্ষমতা বা কার্য্যকারিতার বিপক্ষ?"

নায়ক মহাশয় একটু উষ্ণ হয়ে বল্লেন—"নিশ্চয়ই মনে করি। যান্ না, কালীবাড়ী যান্, পাঁঠাবলি দিন্, নইলে মালাচন্দন পরে' নামাবলী গায়ে দিয়ে হরিনামের ঝুলি ঠক্‌ঠক্ করুন, নয় ত নেংটি পরে' সন্ন্যাসী হয়ে বনে বনে বেড়ান। এই ত সব আপনাদের ধর্ম্ম। নয় ত 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' বলে' যমুনার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। হ্যাঁ, এই করে'ই আমাদের দেশটা উচ্ছন্ন গেল।"

কানাই বল্লে—"যারা ধর্ম্মের একটা বিশেষ পথ ধরে' মোক্ষমার্গকে অবলম্বন করতে চায় তাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু গৃহস্থের কি একটা ধর্ম্ম নেই? ধর্ম্ম যদি না থাকৃত তা হ'লে সমাজ কি একদণ্ডও থাকতে পাবত? এই ধরুন, আপনি আমাকে একটা কাজ করতে পাঠালেন, আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করে' গেলুম কাজটা করব। স্বীকার করলুম ছাত্রবাহিনীকে আপনাদের কার্য্যের অনুকূল করে' তুলতে। তারপর ছাত্রদের মধ্যে গিয়ে আপনারই বিরুদ্ধে নানা কথা বলে' লেলিয়ে দিলুম তাদের আপনার বিরুদ্ধে। আপনাকে উল্টে দিয়ে আমি হ'তে চেষ্টা করলুম আপনাদের নেতা। সেটা কি ভাল হবে বলে' আপনি মনে করেন?"

নায়ক মহাশয় যেন একটু ভীত হয়ে বল্লেন—"এ সব কি বলেন, মশায়, এ যে একটা মস্ত betrayal হ'ল। এ ত হবে আপনার পক্ষে একটা ভয়ানক অন্যায় কাজ করা।"

কানাই বল্লে—"কিন্তু এই ত আপনি বল্লেন ন্যায়বুদ্ধি, ধর্ম্মবুদ্ধি, কিছু ভাল নয়, যা কার্য্যকরী হয় তাই ভাল। আমার পক্ষে আমার নিজের নেতা হওয়াই ত সব চেয়ে কার্য্যকরী।"

নায়ক মহাশয় বল্লেন—"আপনার বয়স অল্প কি না, আপনি সব গুলিয়ে ফেলেন। আমি কি বলেছি আমাদের পরস্পরের প্রতি

অধর্ম্ম করার কথা? আমাদের পরস্পরের মধ্যে ত রাখতে হবে নিশ্চয়ই loyalty ও ধর্ম্মবুদ্ধি, কেবল ঐ ইংরেজ ব্যাটাদের সঙ্গে ছলচাতুরী, জুয়াচুরি, যা করা যায় তাতে কোনও দোষ নেই।"

কানাই আবার বল্লে—"ওদের সঙ্গে ছলচাতুরী প্রবঞ্চনায় দোষ হয় না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে ছলচাতুরীতেই দোষ হয়, এর কারণটা কি?"

নায়ক মহাশয় বল্লেন—"কারণ ত অতি সহজ। ওদের সঙ্গে ঘটেছে আমাদের স্বার্থের একটা সংঘর্ষ। কাজেই আমাদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য আমরা যে কোন রকম ব্যবহারই ওদের সঙ্গে করি না কেন, তাতে দোষ হয় না।"

এই কথা বলে' যেন একটা মস্ত আবিষ্কার করেছেন এইভাবে প্রসন্নতার হাসিতে চারিদিক মুখরিত করে' নায়ক মহাশয় আবার বল্লেন—"Everything is fair in love and war."

কানাই আবার বল্লে—"যদি স্বার্থের খাতিরে ছলনা প্রবঞ্চনা মার্জ্জনীয় হয় তবে আপনার সঙ্গে আমার যেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব হবে সেখানে আমারও ছলনা প্রবঞ্চনা মার্জ্জনীয়।"

নায়ক বল্লেন—"কিন্তু এখানে যে একটু তফাৎ আছে। এখানে যে হ'ল আমাদের দেশের স্বার্থ। আমাদের দেশের স্বার্থের জন্য ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম কিছুই আমরা মানব না।"

কানাই বল্লে—"প্রথমতঃ আমি এইটেই বলতে চাই যে যে কোন কারণেই হোক্ না কেন, ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম না মানা দেশের স্বার্থ ত রক্ষা করবেই না, বরং এতে মহান্ অনর্থ আনয়ন করবে। তা ছাড়া, এমন বিভাগ করা কি সম্ভব যে দেশের স্বার্থের বেলা যত খুসী মিথ্যা বলতে পারি, নিজের স্বার্থের বেলা বলব না? সকল সময়ে

নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন এমন লোক ক'জন আছেন ? মানুষের চিত্তের মধ্যেও এমন কোনও mark দেওয়া নেই যে তার একটি কোঠায় চলবে মিথ্যার তাণ্ডব নৃত্য আর আর একটি কোঠায় থাকবে ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্যের শান্ত রূপ ।"

নায়ক মহাশয় একটু বিব্রত হয়ে আবার বল্লেন—"দেখুন, এ সব ফ্যাসাদে তর্কের আর শেষ নেই, কিন্তু সত্য সত্যই আপনি কি এ কথা মনে করেন না যে এ ব্যাটারা আমাদের উপর যে রকম অত্যাচার আরম্ভ করেছে তাতে ন্যায়ধর্ম্ম কিছুমাত্র না মেনে আমাদের প্রধান কাজই হওয়া উচিত যাতে আমরা সকলে একত্র হয়ে যেন তেন প্রকারেণ এদের উৎপাটিত করি ?"

কানাই বল্লে—"তর্কের খাতিরে না হয় আপনার কথাটা মেনেই নিলাম, কিন্তু ন্যায়ধর্ম্ম যদি আমরা পরিত্যাগ করি তবে আমাদের নিজেদের মধ্যেই এমন দুর্ব্বলতা, এমন শিথিলতা, এমন একযোগিতার অভাব আসবে যে সেই জন্যই একত্রিত হয়ে এদের উৎপাটিত করা হবে অসম্ভব। ন্যায়ধর্ম্ম শুধু কথার কথা নয়, সেটা হচ্ছে চরিত্রের বল। দুর্ব্বল যারা, নিরস্ত্র যারা, তাদের পক্ষে কোন বলই তেমন বল নয় যেমন চরিত্রবল। চরিত্রবল এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই হচ্ছে যথার্থভাবে দুর্ব্বলের বল। আমাদের পুরাণে যে সমস্ত কাহিনী আছে ঘটনা হিসাবে তারা অশ্রদ্ধেয় হ'তে পারে, কিন্তু তাদের তাৎপর্য্য এই যে তপস্যার বলের দ্বারা দুঃসাধ্য সাধন করা যায়, ইন্দ্রের সিংহাসন কম্পিত করা যায়। যেমন থাকা প্রয়োজন আমাদের চরিত্রবল তেমনই থাকা উচিত চরিত্রবলে বিশ্বাস। যে অস্ত্র নিয়ে আপনি শত্রুর সম্মুখীন হবেন সে অস্ত্রে যদি আপনার বিশ্বাস না থাকে, সে অস্ত্র আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না। আপনার হাতে আছে

বন্দুক, কিন্তু আপনি যদি ভাবেন যে বন্দুকের গুলি বাঘের মাথা যে বিদ্ধ করতে পারবে তার প্রমাণ কি—বন্দুকের গুলি লাগ্‌লে তার যদি কিছু না হয়—তবে কোন্ ভরসায় আপনি স্থির ও দৃঢ় হয়ে বাঘের মাথায় গুলি চালাবেন ? আপনি হয় ত ভাববেন, তার চেয়ে বেশী নিরাপদ পশ্চাদ্দিকে পলায়ন। ফলে আপনার মৃত্যু হবে অনিবার্য্য। যে বল, যে শক্তি, যে অস্ত্র আপনার আছে, শুধু থাকলেই তার কাজ সম্পন্ন হবে না, চাই সেই বলে, সেই অস্ত্রে বিশ্বাস। এ কথা আমি মানি যে আধুনিক উপায়ে সশস্ত্র ইংরেজ কোটি কোটি নিরস্ত্র ভারতবাসীর উপর অনেক অত্যাচার করতে পারে। একটা দুটো দৃষ্টান্ত নিলে মনে হয় চরিত্রবলের দ্বারা এ অত্যাচারকে নিবারণ করা যায় না। দু'টি সশস্ত্র জাতি যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন যন্ত্রবলের প্রয়োগেও কি সহজে দু'চারটি যুদ্ধে তাদের কোনও একটি জাতি অপরটির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে ? এই যে বলে বলে যুদ্ধ হয় সেখানেও দেখা যায়, যে পক্ষে চরিত্রবল, দৃঢ়তা, বুদ্ধি এবং সংযম মিলিত হয়েছে সেই পক্ষেরই ঘটে জয়। Xerxesএর প্রকাণ্ড বাহিনীকে মুষ্টিমেয় গ্রীক্ সৈন্য প্রতিহত করেছিল। বিগত যুদ্ধেও দেখা গেছে যে প্রথমে যারা জয়ী হয় তারা যে চিরকালই জয়ী থাকে এমন নয়। এই সংসারের সংগ্রামে ভগবান যাকে যে অস্ত্র দিয়েছেন সেই অস্ত্রের উপরই তাকে বিশ্বাস রেখে লড়তে হবে। যারা দুর্ব্বল, অস্ত্রশস্ত্রবিহীন তাদের পক্ষে চরিত্রের দৃঢ়তাই প্রধান অস্ত্র। দশবার যদি হটে' যায় তবুও সেই অস্ত্রেই তারা জয়ী হবে। অন্ততঃ ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে থাকে। অধর্ম্মের দ্বারা দু' একবার সুবিধা হ'তে পারে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদেরই সুবিধা হবে যাদের আছে চরিত্রের ধৈর্য্য। শ্বাপদসঙ্কুল পৃথিবীতে

নখীদন্তীশৃঙ্গীর মধ্যে ভগবান সৃষ্টি করলেন একান্ত অসহায় মানুষকে, কিন্তু তার মগজে দিলেন একটু বুদ্ধি। আদিম কালের কত মহাযুদ্ধে এই নখীদন্তীশৃঙ্গীরা মানুষকে বধ করেছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বুদ্ধিরই হয়েছে জয়, মানুষই শাসন করছে নখীদন্তীশৃঙ্গীদের। তেমনি আর একটা স্তরে মানুষের উদ্ভূত হ'ল আর একটা বল। সেটা হ'ল চরিত্রবল, ধর্ম্মবল। আজ এসেছে সেই যুগ যে যুগে যে রকম করে'ই হোক্ না কেন, প্রত্যক্ষের দূরলোকে ভবিষ্যতের মহারাজ্যে আমরা এইটেই প্রত্যক্ষ করব যে চরিত্রবল ও ধর্ম্মবলই হবে শেষ পর্য্যন্ত জয়ী, যত সূক্ষ্ম হোক্ না এর প্রকাশ। প্রকাণ্ড পাথরের ফাটলে পড়েছে একটা বটের বীজ। উঠেছে তার অঙ্কুর, গজিয়েছে তার শিকড়। সে শিকড় অত্যন্ত কোমল, পাথরের সঙ্গে তার কোনও তুলনাই হয় না। তথাপি সেই শিকড় যখন জলধারায় পুষ্ট হ'তে থাকে তখন তারই চাপে প্রকাণ্ড পাথর যায় ভেঙ্গে দু' ফাঁক হয়ে। একটা dynamite যা সম্পন্ন করে এক মুহূর্ত্তে, দীর্ঘকাল লাগলেও তাই সম্পন্ন করে বটের কোমল শিকড়ে। পাথরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে আপন শক্তি সঞ্চয় করে। গাছকে ভগবান দিয়েছেন এই শিকড়ের বল, সে তাকেই অবলম্বন করে' কঠোর মৃত্তিকাপ্রস্তর ভেদ করে' উর্দ্ধলোকে প্রসারিত করে তার শাখাপ্রশাখা, পত্রাঞ্জলি পূর্ণ করে' পান করে সূর্য্যের জ্যোতি।"

নায়ক মহাশয় বল্লেন—"দেখুন, অনেক lecture দিতে দিতে আপনার মাথাটা একটু গরম হয়ে গিয়েছে। এ সব তর্কে লাভ কি? Let us learn to differ here, কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে আপনি এই ছাত্রদের ভার নিয়ে এই আন্দোলনটা সফল করে' তুলুন।"

কানাই বল্লে—"তর্ক আমি অনেক করেছি বলে' সেজন্য আমাকে

ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার মূল প্রশ্নটার ত আপনি কোনও উত্তর দিলেন না।”

নায়ক মহাশয় বল্লেন—“কি আবার আপনার মূল প্রশ্ন?”

কানাই আবার বল্লে—“ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে তুলে বিদ্যালয়ভ্রষ্ট করায় দেশের কি মঙ্গল সম্পন্ন হবে? এই ছাত্রেরাই আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের প্রধান আশ্রয়। আমরা যা পারি নি এরা তা সম্পন্ন করবে, শুধু এই ভরসাতেই ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করা যায়। এই লড়াই দু’একদিনের লড়াই নয়, এ লড়াই চলবে generationএর পর generation। আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের গড়ে’ তোলা এবং সেই গড়ে’ তোলার স্থান হচ্ছে বিদ্যালয়। সেখানে শিখবে তারা বিদ্যা, অধ্যাপকের সাহচর্য্যে তারা গড়ে’ তুলবে তাদের চরিত্র। তারা হচ্ছে সরস্বতী মাতার দুগ্ধপোষ্য শিশু, সেই মায়ের কোল থেকে তাদের ছিন্ন করে’ আনলে তারা হবে শীর্ণ কঙ্কালসার, ভবিষ্যৎ কার্য্যের অনুপযুক্ত।”

নায়ক মহাশয় বল্লেন—“আরে মশায়, আপনার মত তার্কিক ত আমি দেখি নি, কি কথাতেই আপনি তর্ক জুড়ে’ দেন। ঘরে যদি লাগে আগুন তবে সকলকেই আসতে হয় সে আগুন নিভাতে।”

“কিন্তু আপনার উপমাটা লাগল না। কোন্ আগুন নিভাবে আপনার ছেলেরা দলে দলে কলেজ থেকে বেরিয়ে, রাস্তায় টো টো করে’, সোরগোলে সহর উত্তেজিত করে’? আর জল যদি না থাকে তবে সকলে ‘আগুন নিভাব’ ‘আগুন নিভাব’ বলে’ সোরগোল ও তর্জ্জনগর্জ্জন করলে আগুন কি থেমে যায়? এ আমাদের আপৎকাল। দেশে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে আগুন, এ কথা কে অস্বীকার করবে? সে আগুন নিভাবার শক্তি সঞ্চিত হ’তে দিন ছেলেদের মধ্যে। গড়ে’

তুলুক তারা তাদের বিদ্যা, তাদের চরিত্র। তাদের মধ্যে করুন কূপ খনন, যে কূপের মধ্য দিয়ে ভোগবতীর বারি অজস্রভাবে উৎফুল্ল হয়ে প্রকাশিত হবে। তবে ত নিভবে আগুন। তা না করে' আগুন লেগেছে বলে' যেখানে জল সঞ্চিত হচ্ছিল সেই সঞ্চয়ের মূল যদি দেন বন্ধ করে' তবে কি করে' আশা করেন যে কোন কালেও আমাদের আগুন নিভবে ?"

নায়ক মহাশয় আবার বল্লেন—"আপনার এই একটা দোষ যে, যে কোন একটা উপমা দিলেই আপনি চারিপাশ থেকে তাকে চেপে ধরতে চান।"

কানাই আবার বল্লে—"কিন্তু উপমা দ্বারা ত কোনও সত্য প্রমাণিত হয় না।"

নায়ক মহাশয় আবার বল্লেন—"একবার ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতাটা আদায় করে' নিতে পারলে সব আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।"

কানাই আবার বল্লে—"এখানেও দু'টো প্রশ্ন। প্রথমটা হচ্ছে—স্বাধীনতা আদায় করবেন কি করে'। দ্বিতীয় হচ্ছে, স্বাধীনতা এলেই বা তা রাখবেন কি করে'। পকেটের তলায় যদি থাকে ছেঁড়া এবং সেই পকেটে যদি মণিমুক্তা আপনি ঢালেন তাতে আপনার লাভ হবে কি ? শতচ্ছিদ্র পাত্রে জল ধরে' রাখলে কি পিপাসা মেটে ? স্বাধীনতার সংগ্রামে যদি নামতে চান আপনারা নামুন, ছেলেদের রেখে দিন ভবিষ্যতের জন্য reserve power করে'। অল্পদিনেই ত আপনারা বার্দ্ধক্যের নিকটস্থ হবেন, আপনাদের শরীর অস্বীকার করবে মনের তাগিদকে বহন করতে। তখন আপনাদের ভার যারা নেবে তাদের দিন তৈরী হ'তে। তারপর আর একটা কথা। এদের যে স্কুল কলেজ থেকে বের করছেন, এর পর এদের লাগাবেন কোন্

কাজে? দেশে দেশে যখন যুদ্ধ বাধে তখন তরুণেরা আসে ভলাণ্টিয়ার হয়ে, ঘাড়ে বন্দুক ফেলে' যায় যুদ্ধ করতে, প্রাণ দেয় দেশের জন্য। যারা যুদ্ধে যেতে অসমর্থ তারা দেশ ও নগরে অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ করে। সে কাজে ছেলেরা মেয়েরা উভয়েই দেয় যোগ। তার একটা অর্থ আছে, কারণ সেখানে তাদের চেষ্টা, তাদের উদ্যম সফল করা যায় দেশের রক্ষাকার্য্যে, দেশের মঙ্গলকার্য্যে। কিন্তু আপনারা ত কোনও কার্য্যে তাদের নিয়োগ করতে পারছেন না। আপনাদের সমস্ত যুক্তি-পরামর্শ একটা 'না'তে পরিণত হচ্ছে। কলেজে যেও না, কলেজে কাউকে যেতে দিও না—বেশ ত, তারা না গেল কলেজে, না দিল কাউকে যেতে। তারা টহল দিল নিশান ঘাড়ে করে' বাগবাজার থেকে ওয়েলেস্‌লি পর্য্যন্ত, চাই কি, টালিগঞ্জ পর্য্যন্তও যেতে পারে। কিন্তু শুধু এই কলেজ না যাওয়াতে ও রাস্তায় টহল দেওয়াতে দেশের কি মঙ্গল হবে?"

"আহা, আপনি বুঝছেন না কেন? এ কত বড একটা demonstration!"

কানাই বলে—"কার কাছে demonstration? আপনারা মনে করেন যে ইংরেজ একটা democratic জাতি, প্রজাপ্রীতি এদের অবচেতনার মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে। দেশের লোক ক্ষেপে' উঠেছে, এই আতঙ্ক তাদের জন্মাতে পারলে সেই অবচেতনাগত সংস্কারের ফলে তারা একটু নরম হবে। কিন্তু আপনিও যেমন জানেন তারাও তেমন জানে যে এটা একটা ক্ষেপিয়ে তোলা ব্যাপার। আজ আপনারা অঙ্গুলি-সঙ্কেত করলে তারা কলেজে যাওয়া বন্ধ করবে আবার কাল কলেজে যাওয়া সুরু করবে সুড়্‌সুড়্‌ করে'। দীর্ঘকাল পাঠের বিচ্ছেদ ঘটাতে গেলে তারাও আপনাদের মানবে না, তাদের

পিতামাতারা তাদের সজ্ঞাগ করে' দেবে যে তা হ'লে ভবিষ্যতে আছে তাদের অনাহার। এ অবস্থায় ছেলে ক্ষেপানোর demonstrationটা কি যথার্থভাবে শাসকবর্গের বুদ্ধিকে নাড়া দেবে? তারা বলবে—বেশ ত, কলেজে ছেলে আস্‌ছে না, দাও কলেজ ছ'মাসের জন্য বন্ধ করে'। ছেলেরাও কলেজ বন্ধ করে' যথারীতি আহারাদি করে' দিবানিদ্রার পর বৈকালিক বিশ্রাম নেবে সিনেমা-হলে। কি উপকার সাধিত হবে তার দ্বারা দেশের?"

নায়ক মহাশয় বল্লেন—"যে কারণেই হোক্‌, আপনাকে দেখছি কথাটা বোঝানো শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তা আপনার বিবেকের বিরুদ্ধে ত আপনাকে দিয়ে কিছু করানো সম্ভব হবে না। আচ্ছা, তা হ'লে আপনি আসুন। আশা করে' রইলুম অন্য একটা অবসরে আপনার সাহায্য আমরা পাব। আপনার ন্যায় ধর্ম্মবিশ্বাসী ও চরিত্রবান্ লোক দুর্লভ।"

কানাই নমস্কার করে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নায়ক মহাশয় ব্যর্থচেষ্টায় বিরক্ত হয়ে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বল্লেন—"যত সব silly cadaverous!"

এই সব political-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা যতই কারুর উপর চটুন না কেন, মৌখিক ভদ্রতা বা চাটুবাক্যের এদের কখনও অভাব হয় না। মনের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা ভাব থাকে—যদি কখনও একে দিয়ে কোনও কাজ হয়।

কানাই ওখান থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে ভাবতে ভাবতে ছেলেদের মোড়লদের অনুসন্ধানে গিয়ে উঠ্‌ল তাদের সর্ব্বকলেজীয় গোষ্ঠীগৃহে। সেখানে দেখা হ'ল চাঁই দু'চারজন ছেলের সঙ্গে। কানাইকে তারা বলিষ্ঠ বলে'ও জান্‌ত এবং স্বাদেশিক বলে'ও জান্‌ত এবং একথাও

জানত যে কানাইকে কলিকাতায় ডাকা হয়েছে ছাত্রবাহিনীর ভার দেওয়ার জন্য। কানাইকে তারা মহা আদর আপ্যায়ন করে' ঘিরে ধরল। কানাই বল্লে—"ব্যাপার কি? তোমরা কি সব বাধিয়েছ?"

তারা বল্লে—"ভারি মজার ব্যাপার! অনেকগুলো বোকা ছেলে কলেজের গেটের সামনে চিৎপাত হয়ে পড়ে' অহিংস অসহযোগের চেষ্টা করছিল, পুলিশ তাদের রুলের গুঁতো দিয়ে prison van-এ নিয়ে গিয়েছিল, দু' তিন দিন হাজতে রেখে ছেড়ে দিয়েছে।"

কানাই বল্লে—"কেন?"

তারা বল্লে—"নয় ত কি? হাজতে আর জায়গা কত? কত লোককে ধরে' রাখতে পারে? হাজতে একদল নিচ্ছে, আর একদল বের করে' দিচ্ছে।"

কানাই আবার বল্লে—"আচ্ছা, এই অহিংস অসহযোগটা তোমরা কি রকম করে' পালন করছ শুনি।"

তারা বল্লে—"দেখুন দেখি মশাই, বুড়োর হয়েছে ভীমরতি, নইলে কখনও এমন হুকুম করে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাও? এ কি রসগোল্লা সন্দেশ? আমরা অবশ্য মার খাই নি, আর খাবও না। আমরা সব এমন কায়দাসে চলি যে ধরবে কি, পুলিশ আমাদের দেখতেই পায় না। তারপরে বেটাদের বেকায়দায় কোনও গলির মধ্যে পেলে পেছন থেকে দুই এক ঘা মেরে দিই চম্পট। শুধু তাই নয়, কত বড় একটা প্রফেসারকে সুবিধামত জায়গায় পেয়ে ঘা কতক বেশ কষিয়ে দেওয়া গেছে।"

কানাই বল্লে—"তোমরা কি প্রফেসার দেখলেই মার, না বেছে টেছে মার?"

"না, না, সবাইকে মারব কেন বলুন? দু' এক বেটা আছে

ভারি কঞ্জুষ, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেটাদের নম্বরই গলে না, যেন বাপের ধন বিলিয়ে দিচ্ছে আর কি। আবার কতগুলো আছে সব প্রিন্সিপালের spy, কাণে কাণে ফুস্‌ফুস্ করছেই সর্ব্বদা।"

কানাই বল্লে—"কিন্তু শুনলুম, সেই বড় কলেজটার উপদ্রবে দু' একজন ভাল ভাল অধ্যাপকও চড় চাপড খেয়েছেন?"

"হ্যাঁ, দেখুন, সে কাজটা ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। ঝোঁকের মাথায় দু'একজন ভাল প্রফেসারও অপদস্থ হয়ে গেছেন। তা কি করবে ছেলেরা বলুন? তাদের ঘাঁটাতে গেলেন কেন ওঁরা?"

"তা তোমরা প্রিন্সিপালকে ত দিলে ছেড়ে, আর মার খেয়ে মর্‌ল অধ্যাপকেরা?"

"সে, মশাই, একটা কি যে হয়ে গেল, সকলেই বল্লে ছেড়ে দাও ত ছেড়ে দিলে। নইলে কুড়িপঁচিশ জন মিলে' জাপ্‌টে ধরে' সাহেবটাকে আধমরা করে' ছেড়ে দিতুম।"

কানাই বল্লে—"এ কি কথা তোমরা বল্‌ছ? কুড়িপঁচিশ জন মিলে একজনকে মারতে?"

তারা বল্লেন—"এই দেখুন, আমরা কি এক একজন আপনার মত বলিষ্ঠ নাকি? ওরা হ'ল গরু শূয়োর খাওয়া জাত, একলা পেরে উঠ্‌ব কেন ওদের সঙ্গে?"

কানাই বল্লে—"ও, সেইজন্য তোমরা কুড়িপাঁচশ জন মিলে একজনকে মারতে?"

তারা বল্লে—"নয় ত কি করি বলুন? আর একটা মজা হয়েছে দেখুন। সুজাতা দেবীর নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন। তিনি আজ ভারি একটা রগড় বাধিয়েছেন। একটা মেয়েকলেজের সামনে দাঁড়িয়ে কোনও মেয়েকেই ঢুকতে দেন নি কলেজে। সার্জেণ্ট টার্জেণ্ট

অনেক জমা হয়েছিল। শুনেছি তিনি মেয়েদের নিয়ে রাস্তায় একটা শোভাযাত্রা বের করবেন।”

কানাই একটু উদ্বিগ্নভাবে বল্লে—“তাই নাকি?”

তারা বল্লে—“হ্যাঁ, আমরা ত সেই দিকেই যাচ্ছিলুম। আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে?”

কানাই বল্লে—“আচ্ছা চল, দেখা যাক্ ব্যাপারটা কি রকম হয়।”

সুজাতা কয়েকদিন প্রায় ঘরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে ছিল। চারিদিক থেকে প্রতিদিন নানা উত্তেজক খবর আসছে। ছেলেদের কলেজগুলোতে জোর strike সুরু হয়ে গেছে। কলেজে কলেজে মেয়েরা পিকেটিং করে' বেড়াচ্ছে। তাদের রুক্ষ কেশ, রুক্ষ বেশ, বিবর্ণ মুখ, পাংশুতে পূর্ণ সমস্ত-দেহ। অথচ চোখ দেখলে মনে হয় প্রত্যেকেই এক একজন রণচণ্ডিকা। ইতিমধ্যে একটা বড় কলেজে দুর্দ্দান্তরকম ব্যাপার হয়ে গেছে। কোন কোন অধ্যাপক হয়েছেন প্রহৃত এবং কোন ছাত্রের কাছে নাকে খত দিয়ে কোন রকমে অব্যাহতি পেয়েছেন স্বয়ং ইংরেজ অধ্যক্ষ মহাশয়। সেই কলেজটা করে' দিয়েছে বন্ধ, কতদিনের জন্য ঠিকানা নেই। যে মেয়েকলেজটিতে সুজাতা থাকত সে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। তিনি হুকুম দিলেন তাঁর কলেজের মেয়েরা পুরুষকলেজের ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হরতাল করতে পারবে না। এই হুকুমে পূর্ব্বে যা ছিল ধূমায়িত, তা হয়ে উঠ্‌ল প্রজ্জ্বলিত। মেয়েরা বল্লে—“যখন হরতাল করতে বারণ করেছে তখন হরতাল করবই।” সুজাতা এখন আশ্রয় নিয়েছে কলেজের বাইরে। দলে দলে মেয়েরা তার কাছে আসতে লাগ্‌ল এই হরতালের ব্যাপারে নেতৃত্বের অনুরোধ জানাতে। প্রথম দিনের ব্যাপারের পরই সুজাতা পড়েছিল ক্লান্ত হয়ে।

কানাইয়ের চিঠিতে যেমন একটু পেয়েছিল উৎসাহ, তেমনি চির-দিনের বন্ধু সুকু-দা' যে আজ সরে' দাঁড়াল এতে সে অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছিল। মঞ্জরী আসত প্রায় রোজই। কানাইয়ের চিঠির কথা সে শুনেছিল এবং তখনই সন্দেহ করেছিল যে কানাই ও সুজাতার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন একটা ঘটনা ঘটেছে। সে ঘটনা যে ঠিক কি রকম তা জানবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। প্রভাকে, সুজাতাকে, এমন কি, প্রভাদের বাড়ী গিয়ে রঞ্জনকে পর্য্যন্ত সে নানা নিপুণ প্রশ্ন করে' গোপনীয় তথ্য আহরণের চেষ্টা করতে লাগ্‌ল, কিন্তু কোন ক্রমেই সেই একটি দিন চায়ের টেবিলের দেখা ছাড়া তাদের সম্বন্ধে সে কোনও তথ্য আবিষ্কার করতে পারল না। নিরন্তর নানাপ্রকার সন্দেহ তার মনে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে নানা রকম কল্পনা করে' করে' ক্লান্ত হয়ে মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করল যে নিশ্চয়ই কানাই তার চায়ের টেবিলের গরম বক্তৃতায় সুজাতার মনকে শক্ত করে' নাড়া দিয়েছে। এখন শুধু এইটুকু লক্ষ্য রাখতে হবে যে সুজাতা ও কানাইয়ের চট্‌পট্‌ দেখাশোনা যাতে না হয়। অর্দ্ধভুক্ত দ্রব্যের ন্যায় সে কানাইকে মনে মনে একরকম পরিত্যাগ করেছিল, কারণ কানাইকে না ছাড়লে সুকুমারের স্কন্ধে আরোহণ করা অসম্ভব। কিন্তু অনেক এমন প্রকৃতির লোক আছে যে নিজের জন্য যা আসে তা নিজে না খেতে পারলেও অপরে যে খাবে সেটা সহ্য করতে পারে না। একটা কাল্পনিক দখলী স্বত্ব তাদের পড়ে'ই থাকে। একটা জায়গা হয় ত আমি কিন্‌ব কিন্‌ব করে' কিনতে পারলুম না, কিন্‌লে আর একজন লোকে। খেতে খেতে খানিকটা খেতে পারলুম না, রাখলুম ঢাকা দিয়ে, যদিও নিশ্চিত জানি যে দ্বিতীয়বার খাবার সময় যাবে সেটা পচে', তবু প্রাণে ধরে' সেটা কাউকে দিতে পারি না।

তেমনি মঞ্জরী একটা ঈর্ষ্যার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল সুজাতার আচরণ। এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে নেতৃপক্ষীয়েরা এই ছাত্রদলের ব্যাপার নিয়ে তাদের পরিচালনার জন্য কানাইকে কলকাতায় আনিয়েছে। মঞ্জরীর মনে দু'একবার ইচ্ছা হয়েছিল যে কানাইয়ের সঙ্গে কোন রকমে দেখা করে' সে পক্ষের কথা কিছু বের করা যায় কি না, কিন্তু একে ত কানাই কোথায় থাকে তার হদিস্‌ করা কঠিন, তা ছাড়া এরূপ চেষ্টায় ভাল হবে কি মন্দ হবে তা ঠিক করে' বলা যায় না। তাই সে মনে করলে যে সব চেয়ে বড় কথা হবে সুজাতাকে আগ্‌লানো। তাই সে লেগে গেল সুজাতার পরিচর্য্যায়, হাত করে' ফেল্লে' তার অনুবর্ত্তিনী সব মেয়েদের। কিন্তু সুজাতার, কি কারণে সে নিজেও বুঝল না, মঞ্জরীকে যেন তত আর ভাল লাগ্‌ত না। এইজন্য সে অবশ্য মনে মনে নিজেকে তিরস্কারও করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনের বিমুখতা দূর করতে পারত না। এটুকু চতুরা মঞ্জরীর দৃষ্টি এড়ায় নি। সে মনে মনে ভাবছিল,—আমারই ধনে ভাগ বসিয়ে আমারই উপর চোখরাঙানি! কি উপায়ে হাতে নাতে ধরবে সেইজন্য রইল সে ওৎ পেতে। সে মনে করেছিল যে কোন না কোন সময়ে সুজাতা হয় ত তাকে কানাইয়ের কথা বলবে। কিন্তু কানাই ছিল একরকম তার নিজেরও অধৃষ্য হয়ে অন্তরের কোন্‌ নিভৃত মন্দিরে। কানাইয়ের কথা সে অনেক সময়েই ভাব্‌ত, কিন্তু ভাবছে যে তা নিজের কাছে স্বীকার করাও কঠিন হ'ত। কানাইয়ের সম্বন্ধে কোন কথা উঠ্‌লে সে কথায় সে যোগ দিত না, সে এড়িয়ে যেত সে কথার প্রসঙ্গ সর্ব্বপ্রযত্নে। চতুরা মঞ্জরী তা লক্ষ্য কর্‌ত, ভাব্‌ত—ও বাবা, এত বুদ্ধি তোমার পেটে? মেয়েরা যখন দলে দলে এসে তাকে অনুরোধ করতে লাগ্‌ল এই হরতালের ব্যাপারটা ভালরকম করে' ঘটিয়ে

তুল্‌তে, তখন সুজাতা প্রথমটা রইল নিশ্চেষ্ট হয়ে। সে নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করতে পারলে না, ভাব্‌লে—আমার যা বলবার তা ত আমি বলেছি। এখন এই মেয়েদের কলেজ বন্ধ করে' তাদের আমি কি করি? কি কাজে তাদের আমি লাগাব? যে অবসর পূর্ণ হ'ত বিদ্যাগ্রহণের আনন্দে তাকে রিক্ত করে' তুল্‌ব আলস্য ও উত্তেজনার দৈন্যে? এ প্রস্তাব তার একটুও ভাল লাগছিল না। তার বার বার মনে হচ্ছিল সমস্ত ব্যাপারটার নিঃসারতা। অধ্যক্ষের সঙ্গে প্রতিবাদ করে' জোর করে' তাঁর সঙ্গে বিদ্রোহ ঘটানোতে কোনই মঙ্গল নেই, সেটা আত্মপ্রকাশের কোন মঙ্গল রূপ নয়। যতক্ষণ সে যুক্তির বল পাচ্ছিল ততক্ষণ অফুরন্ত ছিল তার উৎসাহ, কিন্তু যুক্তির বল যেই এল নেমে, জমাট উৎসাহ তেমনিই যেতে লাগল কর্পূরের মত উবে'। এদিকে ছাত্রীদের তাগিদ হয়ে ওঠে অসহ্য, কোন যুক্তির কথা, ধৈর্য্যের কথা তাদের কাণে অবাচ্য ও অশ্রাব্য। সুজাতার হয়ে উঠ্‌ল একটা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব। ইতিমধ্যে যখন সে কাগজে পড়ল যে কানাইকে কলকাতায় আনানো হচ্ছে ছাত্র-বিদ্রোহ পরিচালনা করবার জন্য, তখন তার মনে হ'ল যে নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা কিছু যুক্তি আছে। নির্যৌক্তিক কাজে কানাইবাবু কখনও নামতেন না, এই কথা ভেবে সুজাতা যেন অকূল সমুদ্রে পারের আলো দেখতে পেলে। সে তার মনশ্চক্ষে কল্পনা করলে যে সে তার অবলা-বাহিনী নিয়ে বিজয়কেতন উড়িয়ে অগ্রসর হবে, আর বিপরীত পথ দিয়ে সবল বাহিনী নিয়ে তার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে কানাই। অবলা ও সবলের মিলন হবে একটা যুদ্ধের লগ্নে। এ কথা মনে করতে রক্তে এল তার একটা উত্তেজনা। তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত উঠল শিউরে এইরকম একটা ক্ষণমহোৎসবের কল্পনায়। সে

রাজী হ'ল মেয়েদের প্রস্তাবে। আনন্দের কলরোল উঠ্‌ল মেয়েদের মধ্যে। তার পরদিন ন'টার সময় বীরবালাবৃন্দ অবরোধ করলে মেয়ে কলেজটি। আগমনির্গমের পথ বন্ধ করে' হাতে হাতে শিকৃলি বেঁধে চার সারি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েরা। রাস্তায় ট্রামগাড়ী হ'ল অচল। কলেজের মহিলা অধ্যক্ষ টেলিফোন করলেন পুলিশকে। পুলিশের নাম শুনে মেয়েরা উঠ্‌ল আরও ক্ষেপে, দাঁতে দাঁত চেপে মেয়েরা দাঁড়িয়ে গেল পুলিশের অপেক্ষায়। উত্তেজনায় তাদের মুখমণ্ডল হয়ে উঠ্‌ল আরক্ত। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ বিকীর্ণ হচ্ছিল আকাশ থেকে, পিচ্‌-ঢালা রাস্তা হয়ে উঠেছিল গরম। গরম বাতাসে চূর্ণকুন্তল এসে পড়ছিল মেয়েদের মুখের উপরে। কিন্তু তারা ধীর অকম্প হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেন দীঘিকার কালো জলে প্রস্ফুটিত সারি সারি রক্তপদ্ম এবং তার উপরে উড্ডীন হয়ে পড়ছে বাতাসে শৈবালগুচ্ছ। একদল সার্জেণ্ট এসে মেয়েদের বাস নিয়ে এল কলেজের গেটের সামনে, মেয়েরা দুড়দাড় করে লাফিয়ে পড়তে লাগল বাস্‌ থেকে, অবলাবাহিনী পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকল তাদের বৈপুল্যে। ঘোড়ায়-চড়া সার্জেণ্ট সামনে এগিয়ে এল, বাড়িয়ে দিল ঘোড়াটা তার মুখ সুজাতার মুখের সামনে। সুজাতা ধরলে ঘোড়াটার লাগাম, স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বল্লে—"Well sir, you are armed and on horse-back, you can trample on our body." যে সার্জেণ্টটা এগিয়ে এসেছিল সে মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট ধ্বনি করল, তারপর ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে বল্লে—"We are men—We don't fight with ladies. You may stand here till Doomsday."

এই কথা বলে' সার্জেণ্ট তার পুলিশবাহিনী নিয়ে ধীর মন্থর গতিতে রওনা হল উত্তরদিকে। প্রতিরোধের উত্তেজনা ক্ষান্ত হওয়াতে

ওখানকার অবরোধ হ'ল ভঙ্গ। কিন্তু উত্তেজনা তখনও রয়েছে যথেষ্ট, সেটাকে মুক্ত করে' দেবার জন্য প্রোগ্রাম ঠিক হ'ল যে মেয়েরা কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে মার্চ্চ করে' যাবে দক্ষিণ দিকে, বেণীর সঙ্গে বিজয়কেতন দেবে উড়িয়ে। সুজাতাও এই প্রস্তাবে সায় দিল। মনে মনে তার এই ক্ষীণ আশা ছিল যদি কানাইয়ের দলের সঙ্গে দেখা হয়। সার্জেণ্টরা সরে গিয়েছে দেখে' মেয়েরা বিজয় উল্লাসে দৃপ্ত হয়ে উঠেছে, বীরাঙ্গনাদের পদভরে ধরণীমাতা উঠলেন টল্‌মল্‌ করে'। বাহিনী ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল। পথে কোনও বাধা নেই। ধীরবিক্রমে তারা এগিয়ে এল কলেজ স্কোয়ারের মোড় অবধি। সেইখানে দাঁড়িয়েছে কতগুলো দেশীয় সিপাই এবং দেশীয় ইন্সপেক্টর। অবলাবাহিনী এসে সম্মুখীন হ'ল এই পুলিশবাহিনীর। এই পুলিশবাহিনীর এপাশে ওপাশে বহু লোক দলবদ্ধ হয়েছে, তার মধ্যে ছিল সুকুমার। সুজাতার দৃষ্টি পড়ল তার চোখেব উপর, তার মনে হ'ল যেন সুকুমারের দৃষ্টি আতঙ্কিত। কিন্তু তথাপি সে মনে সাহস পেল। তার বাল্যগত অভ্যাস ছিল সুকুমারের উপর নির্ভর করবার, সেটা হয়ে গিয়েছিল সংস্কারগত। সে আজও এই বিপদের সামনে সুকুমারকে দেখে' বুকে যেন সাহস পেল। এগিয়ে এল সে ইন্সপেক্টরের সামনে, বল্লে—"পথ ছাড়ুন, আমরা সামনে এগিয়ে যাব।"

ইন্স্‌পেক্টর বল্লে—"আপনাদের আমি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু আর এক পা এগিয়ে এলে আমি বাধ্য হব বেত্রাঘাত করতে।"

এর পর আর দাঁড়িয়ে থাকলে মান থাকে না। সুজাতা এগিয়ে এল একেবারে ইন্সপেক্টরের মুখের সামনে। তার অবলাবাহিনীও ধীরে ধীরে অনুসরণ করছিল। ইন্স্‌পেক্টর বেত তুলে এগিয়ে এল

তাকে মারতে। কিন্তু ইন্সপেক্টরের বেত সুজাতার পিঠে পড়বার আগেই যেন অলৌকিক উপায়ে বেতটা গেল ছুটে আকাশের দিকে। ইন্সপেক্টর পড়্‌ল চিৎ হয়ে। চক্ষের নিমেষের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে' গেল। কোথায় ছিল কানাই তা কেউ জানে না, বেত পড়ার আগেই সে বেতটি নিল কেড়ে, আর যে ঘুষিটি সে মারলে তাতে ইন্স্‌পেক্টরের বাঁ চোয়ালটি গেল স্থানভ্রষ্ট হয়ে। আরও দুই তিন জন পুলিশ এল কানাইকে আক্রমণ করতে। তাদের হাতে সব রুলের ব্যাটন্, কানাইয়ের শুধু হাত, কিন্তু তুলো-ধোনা হয়ে তারা ধূলিশায়ী হ'ল। জনতার মধ্যে ধ্বনি উঠ্‌ল—"বন্দে মাতরম্।" দেহের বল কাকে বলে তা প্রত্যক্ষ করল সেই বিরাট জনতা। সাত আট জনকে কানাই ধরাশায়ী করলে বটে, কিন্তু অবশেষে অনেকে যুগপৎ আক্রমণ করে' হাতকড়া পরিয়ে prison vanএ কানাইকে নিয়ে গেল বন্দী করে'। নারীবাহিনীর গতি সেদিনকার মত স্থগিত হ'ল।

অষ্টম পরিচ্ছদ

বাসায় ফিরে' অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় সুজাতা সেই যে বিছানার উপর পড়ল, উঠ্‌ল তার পরদিন প্রভাতে। যদিও সে সাধারণভাবে ব্যায়ামপটু ছিল তথাপি এতখানি দৈহিক ও মানসিক উত্তেজনা, কঠোর সূর্য্যসন্তাপে পিচ্‌ঢালা রাস্তার উপর এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ও কথা বলা তার শরীরের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কলেজের দ্বারে অবরোধের ফলে যখন সার্জ্জেণ্টরা সরে' গেল তখন সাফল্যের উৎসাহে সকাল-বেলার ক্লেশকে সে ক্লেশ বলে' গণ্য করে নি, পরন্তু যেন উজ্জীবিত হয়েই উঠেছিল। কিন্তু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে' যখন কলেজ ষ্ট্রীটের

মোড়ে এসে দাঁড়াল তখন যে অভাবনীয় ঘটনাটা ঘট্‌ল তার জন্য এরা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ইংরেজ সার্জেণ্টরা যেখানে নিঃশব্দে ফিরে গেল সেখানে বাঙ্গালী পুলিশ এসে যে চাবুক চালাবে এ কথা সে কিছুতেই মনে করে' উঠতে পারে নি।

প্রথমটা সে সুকুমারকে দেখে' একটু সাহসই পেয়েছিল। সুকুমার চলেছিল আপন কাজে। সে সুজাতার কলেজ অবরোধের সংবাদ কিছুমাত্র জান্‌ত না। সাধারণ রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে সুজাতার মতবাদের যে একটু পার্থক্য আছে তাও সে অনুভব করেছিল, কাজেই সে মনে করতে পারে নি যে সুজাতা মেয়েদের একত্র করে' কলেজের প্রতি বিদ্রোহ দাঁড় করাবে। সে লক্ষ্য করেছিল যে কলেজের সঙ্গে ছাত্রীদের যে একটা সংঘর্ষ ঘটেছে সে কথা অনুভব করে' সুজাতা বিপন্ন বোধ করছিল। তারপর যে আজ হঠাৎ বিপুল অবলাবাহিনীর নেত্রী হয়ে সুজাতা কলেজ অবরোধ করবে বা রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা বের করবে এ কথা সে কোনক্রমেই কল্পনা করতে পারে নি। এর মধ্যে সে গিয়েছিল কলেজের মেয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ করতে, তার ইচ্ছা ছিল অধ্যক্ষের মন নরম করে' যদি সে কোনক্রমে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল্‌তে পারে। সে পরিচয় দিলে গিয়ে সুজাতার অভিভাবক বলে'। সসম্মানে মহিলা-অধ্যক্ষ তাকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা করলেন।

সুকুমার বল্লে—"আজ দেশের চারিদিকে যে রকম বিক্ষোভ উঠেছে তাতে তার ঢেউ পরিণত-বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে উঠবে না এটা কি সম্ভব হ'তে পারে? এরাই ত আজ বাদে কাল দেশের ভার নিজেদের কাঁধে নেবে। তার সূচনা ত পঠদ্দশা থেকেই আরম্ভ হবে। দেশের লোক থেকে ছাত্রছাত্রীদের ত বিচ্ছিন্ন করে' রাখা যায় না। এ অবস্থায় তাদের দণ্ডিত করে' লাভ কি? বরং

আপনি যদি চরিত্রের মহত্ত্বে ও ঔদার্য্যে প্রশ্রয়ের সঙ্গে এদের দেখে' ভালবাসার সহিত এদের ক্ষমা করেন তা হ'লেই আপনি পারবেন এদের মন জয় করতে।"

ইংরেজ মহিলা অধ্যক্ষটি বল্লেন—"আপনি যা বলেছেন তা ঠিক, সে কথা যে আমি বুঝি না তা নয়। অন্য দেশে সমাজে ও রাষ্ট্রে কোনও পার্থক্য নেই। সমাজের মঙ্গলের জন্যই গঠিত হয়েছে রাষ্ট্র এবং সমাজের চিত্তভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মনোভাবের হয় পরিবর্ত্তন এবং সেইজন্য বিলাতেব প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করতে ছেলেদের যথেষ্ট প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আপনাদের দেশ ত তা নয়। রাষ্ট্র ত এখানে সমাজের দেহ থেকে উৎপন্ন হয় নি, বরং রাষ্ট্রই এখানে প্রধান, সমাজই তার দেহে মূলহীন হয়ে উপ-লতারূপে তাকে জড়িয়ে রয়েছে। আমাদের এ বিদ্যালয় রাষ্ট্র দ্বারা স্থাপিত, এর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে রাষ্ট্র, এবং অধ্যক্ষদের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রবিদ্রোহ উৎপন্ন হ'লেই তাকে সমূলে উৎপাটন করা।

উত্তরে সুকুমার বল্লে—"রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের যে যথার্থ সম্বন্ধ সহজভাবে সর্ব্বত্র রয়েছে সেই সম্বন্ধটিই যাতে এ দেশেও বর্দ্ধিত হয়ে ওঠে এইটিই ত হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য।"

অধ্যক্ষ বল্লেন—"কিন্তু সে সম্বন্ধ ত এখানে নেই। রাষ্ট্র-স্থাপিত বিদ্যালয়ের এটা কর্ত্তব্য নয় যে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ যথার্থ-ভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রকে বলিষ্ঠ করতে পারে, উদ্যোগী হয়ে সে বিষয়ে উৎসাহ দেবে। সেটা দেশের জনসাধারণের কাজ। বলের দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত, রাষ্ট্রের দ্বারা যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত, তার প্রধান উদ্দেশ্য হবে রাষ্ট্রের সংরক্ষণ।"

সুকুমার আবার বল্লে—"কিন্তু রাষ্ট্রের স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থ বিভিন্ন হওয়া উচিত নয়।"

অধ্যক্ষ হেসে বল্লেন—"উচিত নয় তা আমি জানি, কিন্তু এই রকম সম্বন্ধই ত এ দেশে চলেছে। কোন সরাসরিভাবে চুক্তি না থাকলেও এটা এক রকম ধরে' নেওয়া যেতে পারে যে কোনও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের একটা প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে এই যে তিনি রাষ্ট্রের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করবেন।"

সুকুমার বল্লে—"সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়া ত রাষ্ট্রের যথার্থ স্বার্থ নয়।"

অধ্যক্ষ হেসে আবার উত্তর করলেন—"কার কোন্‌টা স্বার্থ, কার কোন্‌টা স্বার্থ নয়, এটা বোঝবার অধিকার ত তারই।"

সুকুমার আবার বল্লে—"কিন্তু জাতির সঙ্গে রাষ্ট্রের এই দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রের পক্ষেও মঙ্গলকর হ'তে পারে না, জাতির পক্ষেও মঙ্গলকর হ'তে পারে না।"

অধ্যক্ষ বল্লেন—"যখন দু'জনে পরস্পর লড়াই হয় স্বার্থ নিয়ে তখন প্রত্যেকের কর্ত্তব্য অপরকে বোঝানো তার নিজের স্বার্থ কতটুকু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। দ্বন্দ্ব হচ্ছে এখানে জাতিতে ও রাষ্ট্রে, প্রজাতে ও শাসক-সম্প্রদায়ে। এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা করবে তারা। আমি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, এ মীমাংসার মধ্যে আমার প্রবেশ করা অশোভন ও অসঙ্গত।"

সুকুমার আবার বল্লে—"আপনি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। আপনার এইটিই আদর্শ হওয়া উচিত যা'তে সহজ, সরল এবং সুস্থভাবে জাতীয় রাষ্ট্রের মঙ্গলের অনুকূলে ছাত্রীদের মন গড়ে' উঠ্‌তে পারে। শিক্ষকের আদর্শ ও কর্ত্তব্য অতি পবিত্র। শিক্ষক কেবলমাত্র বেতনভোগী

কর্ম্মচারী নয় যার উদ্দেশ্য হবে প্রভুর মনস্তুষ্টি। মঙ্গলের সঙ্গে যেখানে বিরোধ ঘটবে প্রভুর মনস্তুষ্টির সেখানে শিক্ষকের চিত্ত মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। এ কথা মানি যে আপনি ইংরেজ এবং আমাদের দেশের রাষ্ট্র ইংরেজ জাতির স্বার্থসংবর্দ্ধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত। সেই হিসাবে আপনার জাতীয় স্বার্থের সহিত এদেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ জড়িত রয়েছে। তাই শুধু বেতনের জন্য নয়, আপনার জাতীয় স্বার্থ হিসাবে আপনি ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের স্বার্থ দেখা আপনার কর্ত্তব্য মনে করতে পারেন। কিন্তু এতগুলি ছাত্রীর চরিত্র গঠনের দায়িত্ব নিয়ে আপনি যে আসনে বসেছেন সে দিক দিয়ে এদের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য বড় কম নয়।"

অধ্যক্ষ আবার বল্লেন—"দেখুন, আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। আমি যীশুখৃষ্টের বাণীতে বিশ্বাস করি। জাতি বা রাষ্ট্র বলে' যা গড়ে' উঠেছে এটা একটা নূতন পদার্থ। এ দ্বারা অনেক মঙ্গল সাধিত হলে'ও অমঙ্গল কম হচ্ছে না। সে জন্য হচ্ছে প্রতিনিয়ত জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব, হিংসার বিদ্বেষবহ্নি উঠ্‌ছে জ্বলে, অসংখ্যেয় হচ্ছে প্রাণক্ষয়। রাষ্ট্র ও প্রজার দ্বন্দ্বে রাষ্ট্রকে অবলম্বন করতে হচ্ছে এমন পথ যাতে সে শ্রেণী-বিশেষের স্বার্থ রাখবার জন্য সাধারণ প্রজাবর্গের উপর করছে অত্যাচার। এক স্থলে করছে পর্ব্বত প্রমাণ অর্থসঞ্চয় অপর স্থানে সর্ষপকণা বিতরণ করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে। এই যে দ্বেষ, এই যে হিংসা, এই যে বৈষম্য, এটা খৃষ্টের বাণীর সম্পূর্ণ বিরোধী। যে খৃষ্টের বাণীতে বিশ্বাস করে তাকে চোখ রাখতে হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের ঊর্দ্ধতন ভূমির দিকে, সমগ্র মনুষ্যজাতির মঙ্গলের দিকে। সে জন্য আমার কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্বে আমার ছাত্রীদের প্রতি দায়িত্ব, তাদের মঙ্গল অনুধ্যানের ব্রত, অপর কোনও কর্ত্তব্যের চেয়ে আমার কাছে কম

নয়। এই কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব এক সময় একটা সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হবে, তখন এটা আমার বিচার্য্য হবে যে এখানে বেতনভোগী শিক্ষক হয়ে থাকা আমার পক্ষে চলবে কিনা। কিন্তু যতক্ষণ আমি রাষ্ট্রের বেতনভুক্ ততক্ষণ আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা আমাকে যে আদেশ দেবেন আমি তা করতে বাধ্য। মেয়েদের সম্বন্ধে, বিশেষতঃ সুজাতা সম্বন্ধে আমার অভিযোগ এই যে আমি ইংরেজ বলে' তারা অধ্যক্ষের যে ন্যায্য সম্মান পাওনা আছে, যে শ্রদ্ধার দাবী তাদের উপর আমার আছে তা আমাকে দেয় নি, অথচ পূর্ব্বে এমন কোনও ঘটনা কখনও ঘটে নি যখন ইংরেজ হিসেবে স্বার্থরক্ষার জন্য আমি চেষ্টা করেছি। দেখুন, প্রশ্ন এখানে একটা নয়, অনেকগুলি। একটা হচ্ছে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র বলে' ইংরেজ রাষ্ট্রনায়কদের আমার কাছে একটা জাতিগত দাবী আছে। দ্বিতীয়তঃ, আমি তাদের বেতনভুক্ বলে' ভৃত্য হিসাবে তাদের প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য আছে। তৃতীয়তঃ, স্নেহের পাত্রী হিসাবে ছাত্রীদের মঙ্গল অনুধ্যানের যে ব্রত আমি গ্রহণ করেছি সেই ব্রতের দাবীতে ছাত্রীদের প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য আছে। এই কর্ত্তব্য কি রূপ গ্রহণ করবে তাও বহুধা বিচার্য্য। একটা হচ্ছে তাদের আপাতমঙ্গল বিধান করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বিদ্যানুরাগের পথ থেকে এবং অধ্যাপকদের নিকট তাদের যে কর্ত্তব্য আছে, তাদের যে আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য, তাদের সেই পথ থেকে তারা যাতে ভ্রষ্ট না হয় সেটা দেখা। তৃতীয়তঃ হচ্ছে উত্তরকালে জাতির অনুপ্রেরণা অনুসারে তারা যাতে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, গড়ে' উঠতে পারে, সেই বিষয়ে তাদের উৎসাহ দেওয়া।"

সুকুমার বল্লে—"এই শেষোক্তিটিকে আপনি শেষে বলেছেন বলে' এটিকে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন বলে' মনে করেন ?"

অধ্যক্ষ বল্লেন—"না, আমি কোনটিকেই ন্যূন বলে' মনে করি না। আমি শুধু এইটুকু বলি যে এই কাজে নামার পূর্ব্বে মেয়েদের আমার সঙ্গে বিচার করে' দেখা উচিত ছিল যে পূর্ব্বের দু'টির সঙ্গে অবিরোধে শেষেরটি সম্পন্ন করা যায় কিনা। হয়ত তা সম্ভব হ'ত যদি মেয়েরা যথার্থ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে আমাদের দেখত। সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি বড় বড কথা বাদ দিলেও একটা সহজ কথা রয়েছে যে ছাত্রীরা আমার আদেশ অমান্য করে' বিদ্যালয়ের নিয়ম ভেঙ্গেছে।"

সুকুমার আবার বল্লে—"কিন্তু সেজন্য কি তাদের ক্ষমা করা যায় না?"

অধ্যক্ষ বল্লেন—"নিশ্চয় ক্ষমা করতে হবে, নইলে কি বলে' শত শত অপরাধ নিয়ে আমরা প্রভু যীশুর চরণমূলে ক্ষমার দাবী করব? কিন্তু ক্ষমা পাওয়ার পূর্ব্বে চাই ক্ষমা চাওয়া, চাই অনুতাপ। বিনা অনুতাপে কেউ ক্ষমার যোগ্য হয় না।"

সুকুমার দেখলে যে আর তর্ক করা বৃথা। অধ্যক্ষের দৃঢ়তা এবং সদাশয়তা দেখে' সে মুগ্ধ হয়ে ফিরে গেল, বলবার উপযুক্ত আর কোনও কথা তার মুখে যোগাল না। সুকুমার যখন ছাত্রীবাহিনীর অগ্রণীরূপে সুজাতাকে দেখ্‌ল তখন পুলিশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব আশঙ্কা করে' তার চিত্ত হয়ে উঠেছিল আতঙ্কিত। সুকুমার সাহসী ছিল কিন্তু কর্ত্তব্য নির্ণয় করতে তার হ'ত বিলম্ব। তার শক্তি ছিল বাঁধে ঘেরা শক্তি, বাঁধ কেটে খাল না করে' দিতে পারলে সে শক্তি আপন নির্গমপথ খুঁজে পেত না। নদীর জল যখন অকস্মাৎ তার গতির পথে একটা পর্ব্বতে প্রতিহত হয় তখন সে ছল্‌ছল্‌ করে' বেড়ে উঠ্‌তে থাকে, ফিরেও যেতে পারে না, অগ্রসরও হ'তে পারে না, কিংবা পার্শ্বস্থ পথেও প্রবাহিত হ'তে পারে না। সে থাকে থম্‌কে। সুকুমারেরও মনের

বেগ তেমনি করে' গেল থমকে, কি ভাবে সে তাকে প্রকাশ করবে তা তার কল্পনায় এল না। ইতিমধ্যে যে ঘটনাটি ঘট্‌ল তা ঘট্‌ল নিমেষের মধ্যে। সুকুমার যতক্ষণ হতস্তব্ধ হয়ে ছিল ততক্ষণে নিমেষ মধ্যে কানাই কেড়ে নিল ইন্‌স্‌পেক্টরের চাবুক, একটি ঘুঁষিতে করলে তাকে ধরাশায়ী। কানাইয়ের শক্তি ছিল সেই জাতীয় যে রকম শক্তি থাকে আকর্ণবিশ্রান্ত আকৃষ্ট জ্যার উপরে বিন্যস্ত বাণের। তিলমাত্র শৈথিল্যে সে বাণ ছুটে যায় বিদ্যুদ্বেগে, বিদ্ধ করে তার লক্ষ্য, বিচার কল্পনার সে অপেক্ষা রাখে না। এ যেন সেই শক্তি যা দেখা যায় গিরিচূড়ায় নিবদ্ধ উপলবেষ্টিত জলরাশির, তিলমাত্র উপলখণ্ডটি সরে' গেলেই সে জলরাশি আপন স্বাভাবিক বেগে মুক্ত হয়ে ঝরে' পড়তে থাকে; অপেক্ষা ঈষন্মাত্র আবরণ মোচনের। যখন ঘটনাটা ঘটে' গেল সুকুমার রইল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে, তার সাহস হ'ল না সুজাতার সঙ্গে মিলিত হ'তে। সে লজ্জিত বোধ করল তার সঙ্গে গিয়ে বাড়ীতে দেখা করতে।

আপন ক্লান্তিতে যখন আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল সুজাতা তখন তার সমস্ত ক্লান্তি ভেদ করে' তার চোখে ভেসে উঠতে লাগল বলিষ্ঠ কানাইয়ের কীর্ত্তি। সুকুমারকে যে সে একবার দেখেছিল সে কথা সে বিস্মৃত হ'ল না, কিন্তু সুকুমারের হতস্তব্ধতা ও নিশ্চেষ্টতার যথার্থ কারণ সে উপলব্ধি করতে পারলে না। তার মনে হ'ল যে এতকাল যে সুকুমার সর্ব্বদা তার সঙ্গে ঘুরেছে কত সময়ে কত বিপদে উদ্ধার করেছে, কত কাজে তাকে উৎসাহ দিয়েছে, প্রশ্রয় দিয়েছে, আজ একটা কঠোর কর্ত্তব্যের ক্ষণে তার অতখানি ভালবাসা, অতখানি স্নেহ তার কোন মর্য্যাদা পেল না তার হৃদয়ে, স্থান পেল ভীরুতা! ভীরুতা ও সাহসের অভাব পুরুষকে নামিয়ে আনে নারী-হৃদয়ের শ্রদ্ধার আসন

থেকে। নারী-হৃদয়ের ভালবাসা যখন শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই সে যায় মহাপুণ্য তীর্থসঙ্গমে। তার মনে হ'ল, কানাইবাবু তার একান্ত অপরিচিত ; একদিন মাত্র চায়ের টেবিলে দেখা, সেইটুকুতেই কানাইবাবু জীবন তুচ্ছ করে' পুলিশের হাতের দণ্ড নিলেন কেড়ে। তার চোখের সামনে ভেসে যেতে লাগল চলচ্চিত্রের মত কানাইয়ের বীরত্বের সোপানপরম্পরা, চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল জনে জনে পুলিশের আক্রমণ ও তাদের ভূমিনিপাত। শেষ মুহূর্ত্তে আট দশ জন লোক পড়েছিল তার উপরে, কেবলমাত্র দেহের ভারের দ্বারা করে' ফেলেছিল তাকে অবনমিত। স্মরণ হ'তে লাগ্‌ল তার রক্তাক্ত দেহ, চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল আপন অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতে তার বসনপ্রান্ত সিক্ত করে'। তার একবার মনে হ'ল—কানাইবাবু কি তাকে ভালবাসেন? পরক্ষণেই তার মনে হ'ল—সে অসম্ভব। বক্ষ তোলপাড করে' যেন একটা আক্রন্দন হৃদয়ের শূন্যতার মধ্যে ধ্বনিত হ'তে লাগ্‌ল। তার মনে হ'ল যে, যে-কোনও আর্ত্ত রমণীর রক্ষার জন্য কানাইবাবু এ কাজ করতে পারতেন এবং এখানেও তাই করেছেন। একথা ভাবতে একদিকে যেমন কানাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধায় তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে আসতে লাগ্‌ল অপরদিকে তার মনে হ'তে লাগল তার ব্যক্তিগত মর্য্যাদা ত তার কাছে কিছুই নেই। তার মনে হ'তে লাগ্‌ল কানাই যে শুধু মতপ্রকাশে নির্ভীক তা নয়, সে যে শুধু বলিষ্ঠ তা নয়, তার মন যে শুধু বিদ্যুদ্‌গতিতে খেলে তা' নয়, তার সমস্ত দেহের বল ঝড়ের মত ছুটে যেতে পারে ক্ষুদ্রতম মনের ইঙ্গিতে। এ ত শুধু নির্ভীকতা নয়, এ হচ্ছে দেহ ও মনের বলের একটা অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য, একটা অপূর্ব্ব একাত্ম মিলন, যেমন মিলন দেখা যায় শব্দ ও অর্থের মধ্যে। শক্তি ও শক্তিমান যেন এখানে অভিন্ন হয়ে পেয়েছে প্রকাশ।

কানাইয়ের রূপ ছিল না। কিন্তু বাহ্যিক রূপ ত চর্ম্মবাহী মাত্র। সমস্ত অন্তরের সম্পদ এসে প্রতিফলিত হয়ে পড়েছিল তার মুখের উপরে। সেই রূপে জ্যোতিষ্মান্ আদিত্যের মত কানাই আলোকিত করে' তুল্ল সুজাতার হৃদয়ের অন্তঃপুর।

কানাইকে পুলিশে ধরে' নিয়ে গিয়ে হয় ত কত অত্যাচার, কত লাঞ্ছনা করেছে এই কথা মনে করে' তার নিজের সমস্ত কাজগুলির উপর অনুতাপ ও ধিক্কারের মলিন পাখা পড়্ল বিস্তৃত হয়ে। তার মনে হ'তে লাগ্ল—আমি মেয়ে, আমার কি প্রয়োজন ছিল এই সমস্ত অনুচিত কার্য্যে যোগদান করা? ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয়ে তার মনে হ'ল যে এত বড় একটা মহাপ্রাণের লাঞ্ছনা ও অপমানের নিমিত্ত হয়ে সে যা অপরাধ করেছে তার যেন আর প্রায়শ্চিত্ত নেই।

কানাইকে যখন ধরে' নিয়ে গেল থানায়, হাতকড়ি দিয়ে রাখা হ'ল হাজতে বন্ধ করে', সমস্ত কলকাতা সহরে সোর পড়ে' গেল। রাজনৈতিকদের গোষ্ঠী থেকে থানায় লাগ্ল তদ্বির চলতে কানাইয়ের পক্ষে। সে তদ্বিরে বাধা দিল স্বয়ং কানাই। সে বল্লে—"আমি দুর্ব্বল নই, অসমর্থ নই; আমার যে আঘাত লেগেছে তা অতি সামান্য, তার জন্য কোন শুশ্রূষার প্রয়োজন নেই, আপনারা আমার জন্য কখনও মাথা নীচু করতে পারবেন না। আমি যে কাজ করেছি সে কোন রাজনৈতিক হিতৈষণার জন্য নয়। একজন অসহায় নিরস্ত্র নারীকে সশস্ত্র পুলিশ এসে আক্রমণ করবে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করা ও আততায়ীকে আহত করা। এটা রাজাপ্রজার দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রজার পক্ষ নিয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানও নয়, এটা কেবলমাত্র একটি অসহায় মেয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা। আর হাজতে অশন-বসনের যে ক্লেশ তা যখন দোষে বিনা

দোষে আমাদের দেশের অসংখ্য নরনারী প্রত্যহ ভোগ করছে তখন আমার নিষ্কৃতির জন্য আপনাদের এতটা চেষ্টা করা অশোভন।”

এই বলে সে দিলে প্রত্যাখ্যান করে' তার স্বপক্ষে যত চেষ্টা হয়েছিল জামিনের জন্য, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হ'ল কর্ম্মচারীদের বামহস্তাগত সমস্ত লাভের লোভ। পরদিন কানাইকে হাজির করা হ'ল আদালতে। ম্যাজিষ্ট্রেট কেম্পিস্ সাহেব একজন আইরিশ্ ম্যান্, বূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ। কানাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে সে পুলিশের কাজে বাধা দিয়েছে এবং পুলিশদের অনেককে আহত করেছে। পুলিশ ছিল শান্তিভঙ্গ নিবারণের চেষ্টায়, কানাইয়ের কাজে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ কানাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি উকীল দিতে আপত্তি করছ কেন?”

কানাই বল্লে—“উকীলেরা প্রায়শঃই উভয়পক্ষের কথাই অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা রঞ্জিত করে' প্রকাশ করতে চায়। আসামীকে আশ্রয় দেওয়া হয় তাদেরই ছায়ার মধ্যে, কারণ ইংরেজের আইনে আসামী নির্দ্দোষ হ'লেও দোষী বলায় মিথ্যা হয় না। উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের সত্য ঘটনা ধর্ম্মাধিকরণে প্রকাশ করবে এবং ধর্ম্মাধিকারী উভয় পক্ষের কথা শুনে যথার্থ বিচার করবে। যেখানে আইনের কূট তর্ক থাকে সেখানে বুদ্ধিজীবি উকীলদের প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু আমার এ ব্যাপার শুধু ঘটনার কথা।”

রাজনৈতিক পক্ষ থেকে কানাইয়ের স্বপক্ষে ভাল ভাল উকীল ও ব্যারিষ্টাররা কোমর বেঁধে লড়তে এলেন, কানাই অতি বিনীতভাবে তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে করলে তা প্রত্যাখ্যান। কানাইয়ের সকল কাজই দ্বিধানির্ম্মুক্ত, কোন বিষয়েই তার দ্বিধা নেই, চিন্তা নেই। কোন কাজ করবার পূর্ব্বে যেন সে ভাবে না। তার কাজ

করার দ্বারাই অনুমান করে' নিতে হয় যে সে হয় ত ভেবেছিল, কিন্তু তা প্রমাণ করবার কোন উপায় থাকে না। ম্যাজিষ্ট্রেট কেম্পিস্ সাহেব সমস্ত দেখে শুনে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করেছিলেন। মনে মনে ভাবলেন—By Jove, the accused must be an interesting one; at least he seems to be funny। তিনি এরূপ আসামী আর দ্বিতীয়টি দেখেন নি। তিনি কানাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার পেশা কি ?"

কানাই বল্লে—"কিছু না।"

"তবে তোমার চলে কি করে' ?"

কানাই বল্লে—"পিতা কিছু অর্থ রেখে গিয়েছিলেন, তাই দিয়ে।"

"পড়া শুনা কত দূর ?"

"কেমিষ্ট্রিতে এম্-এস্-সি।"

"I see you are an educated man. তুমি পুলিশের কাজে বাধা দিয়েছিলে কেন ?"

কানাই বল্লে—"ক্ষমা করবেন। আপনার প্রশ্নটা কি leading question হচ্ছে না? আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে যাই জবাব দিই না কেন, তাতে হয় আমাকে দোষ স্বীকার করতে হয়, নয় মিথ্যা বলতে হয়।"

কেম্পিস্ সাহেব বল্লেন—"কি রকম ?"

কানাই বল্লে—"আপনি যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন যে পুলিশের কাজে বাধা দিয়েছিলুম কি না তবে আমি জবাব দিতে পারি। কিন্তু আমি বাধা দিয়েছিলুম ধরে' নিয়ে প্রশ্ন করলে সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া চলে না।"

কেম্পিস্ বল্লেন—"আচ্ছা বেশ, সেই প্রশ্নেরই জবাব দাও।"

কানাই বল্লে—"না, পুলিশের কার্য্যে আমি বাধা দিই নি।"

"তুমি ইন্‌স্পেক্টরের হাতের ব্যাটন্ কেড়ে নাও নি ?"

"নিয়েছি।"

"তুমি ইন্‌স্পেক্টরকে ঘুষি মার নি ?"

"মেরেছি।"

সাহেব হো হো করে' হেসে উঠে বল্লে—"তবে যে বল্‌ছ বাধা দাও নি ?"

কানাই বল্লে—"আপনি যদি ক্ষমা করেন তবে আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বেশ একটু কৌতুক অনুভব করে' বল্লেন—"আমাকে ?"

কানাই বল্লে—"আজ্ঞে হঁ্যা।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হাসতে হাসতে বল্লেন—"আমি যখন তোমাকে এতগুলি প্রশ্ন করলাম তখন অবশ্য তুমিও আমাকে একটা প্রশ্ন করতে পার।" বলেই আবার হাসলেন।

কানাই বল্লে—"ইন্‌স্পেক্টর অর্জ্জুন সিংএর জামার মধ্যে যদি একটা বোল্‌তা প্রবেশ করে' তাকে কামড়াত তবে সে কি তাকে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর হিসাবে কামড়াত না নিছক মানুষ অর্জ্জুন সিং হিসাবে কামড়াত ?"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আবার একটু কৌতুক অনুভব করে' হেঁয়ালিটার অর্থ না বুঝেই বল্লেন—"নিছক মানুষ অর্জ্জুন সিং হিসাবে কামড়াত।"

কানাই আবার প্রশ্ন করলে—"সেই কামড়ানোর ফলে অর্জ্জুন সিংএর শরীরে এমন জ্বালা হ'তে পারত যাতে ইন্‌স্পেক্টর অর্জ্জুন সিংএর সরকারী কার্য্য থেকে ভঙ্গ দিতে হ'ত। এ অবস্থায় সে বোল্‌তার কার্য্যকে রাজকার্য্যে বাধা দেওয়া বলা যেত কি ?"

কেম্পিস্ সাহেব হেসে বল্লেন—"না।"

কানাই বল্লে—"আমারও সেই রকম।"

কেম্পিস্ বল্লেন—"কি রকম?"

কানাই বল্লে—"আমি দেখলুম অর্জ্জুন সিং ডাল-রুটি-খাওয়া একজন পালোয়ান ব্যক্তি। হাতে তার লাঠি। তার সামনে এসেছে একটি নিরস্ত্র মেয়ে। সে দণ্ডপাণিও ছিল না, শূলপাণিও ছিল না। তার গায়েও সে হাত দেয় নি। ইন্স্পেক্টর সেই মেয়েটিকে মারতে গেল কেন? আমি আর কিছু দেখি নি, আমি দেখেছি একজন সশস্ত্র পুরুষ একটি নিরস্ত্র মেয়ের উপর অত্যাচার করতে যাচ্ছে। আমি তাকে বাধা দিয়েছি, তার ফলে পুলিশ কর্ম্মচারীর কাজে হয়েছে বাধা। কিন্তু আমার বিবেচনায় আমি পুলিশ কর্ম্মচারীকে বাধা দিই নি।"

ম্যাজিস্ট্রেট হেসে বল্লেন—"I see you are very clever. You should change your dhoti for a barrister's gown."

এরপর তিনি বল্লেন—"আচ্ছা লাঠি না নয় কেড়ে নিলে, ঘুষি চালালে কেন?"

"লাঠি কেড়ে নিয়ে বাঁচালুম মেয়েটিকে সদ্য আক্রমণ থেকে আর ঘুষি চালিয়ে বাঁচালুম পরবর্ত্তী আক্রমণ থেকে। ঘুষি ছিল অর্জ্জুন সিং-এর উপরি পাওনা।"

ম্যাজিস্ট্রেট সরকারী পক্ষের উকীলকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কানাই-বাবু ক'জনকে ধরাশায়ী করেছেন? তারা কোথায়?"

উকীল বল্লেন—"আটজনকে ধরাশায়ী করেছেন। তারা হাঁসপাতালে, কারুর নাক ভেঙ্গেছে, কারুর চোয়াল ভেঙ্গেছে, কারুর দাঁত গিয়েছে উপড়ে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বল্লেন—"কানাইবাবুর হাতে যে লাঠি ছিল তা ত exhibit-এ দেখতে পাচ্ছি না, সে লাঠি কোথায় ?"

সরকারী উকীল একটু হেসে বল্লেন—"লাঠি ত ওঁর হাতে ছিল না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বল্লেন—"পুলিশের হাতে কি ছিল ?"

সরকারী উকীল বল্লেন—"যেমন থাকে, বড় বড ব্যাটন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বিস্মিত হয়ে বল্লেন—"সে সব পুলিশের কনষ্টেবলরা কোন্ দেশী লোক ?"

উকীল বল্লেন—"পাঞ্জাবী আছে, ভোজপুরী আছে।"

"এই সমস্ত পুলিশের লোক ব্যাটন দিয়ে ওঁকে আক্রমণ করতে এল, আর উনি একলা শুধু হাতে তাদের ধরাশায়ী করলেন ?"—বলে' সাহেব হো হো করে' হেসে উঠলেন—"Kanai Babu, I should like to shake hands with you were you not in the position of an accused now."

তারপরে কথা উঠ্ল, যে মেয়েটিকে আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য কানাই পুলিশের কার্য্যে বাধা দিয়েছিল সে মেয়েটির সঙ্গে কানাইয়ের কি সম্পর্ক। পুলিশ অনেক চেষ্টা করল এই কথা প্রমাণ করবার জন্য যে এরা অনেকদিন থেকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। ঐ যে একদিন চায়ের টেবিলে তাদের পরস্পর আলাপ হয়েছিল সে কথাটা পুলিশ আবিষ্কার করতে পারে নি, কাজেই কানাইয়ের কথার সত্যতা প্রমাণ হ'ল যে সে ছিল একজন রাস্তার পথিক, অপরিচিতা একটি মেয়ের প্রতি পুলিশের অত্যাচারে বাধা দিয়েছে। এই সময়ে কানাই বাধা দিয়ে বল্লে যে মেয়েটি তার একেবারে অপরিচিতা নয়, একদিন এক চায়ের টেবিলে তার সঙ্গে

সামান্য একটু আলাপ হয়েছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট কানাইয়ের সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করলেন কিন্তু এই পরিচয়কে তিনি গণনার মধ্যে আনলেন না।

কানাই তাঁকে বল্লে—"আমার একটি বক্তব্য আছে, তা শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নয়। সে বক্তব্য এই যে যাকে আপনারা পুলিশের কাজ বলে' বলছেন এবং যার বিরুদ্ধে বাধা দিয়েছি বলে' আমার বিরুদ্ধে এসেছে অভিযোগ, সে কাজ নয়, অপকাজ। সে কাজের দ্বারা সরকারের সুনাম হয় ব্যাহত, রাষ্ট্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা আছে লোকের সে শ্রদ্ধা যায় বিনষ্ট হয়ে এবং তার ফলে হয় নানাপ্রকার অনর্থপাত। কতগুলি মেয়ে চলেছে শোভাযাত্রা করে', তাদের বেণীতে তুল্‌ছে রঙীন্ বিজয়কেতন। তারা যদি সমস্ত কলকাতা সহর সাতবার প্রদক্ষিণ করে তবে সরকারের তাতে ক্ষতি কি, পুলিশেরই বা তাতে বাধা দেওয়ার দরকার কি? আজ যদি সত্যি পুলিশ এই মেয়েদের উপর অত্যাচার করতে পারত, কাগজে কাগজে কত লেখা-লেখি হ'ত। শুধু আমাদের দেশের মন্ত্রীসভায় নয়, পার্লামেন্টে উঠ্‌ত তার আলোচনা। সেটা কি সরকার পক্ষে শোভন হ'ত? এ কথা মেনে নিতে প্রস্তুত আছি যে সরকারের যন্ত্রবল অসীম, কিন্তু যত বড়ই বলিষ্ঠ কেউ হোক্ না কেন, অনর্থক নিন্দাবিদ্বেষ কুড়িয়ে সরকারের লাভ কি? এগুলিই ত ক্রমশঃ বেড়ে বেড়ে পরিশেষে একটা ভীষণ আকার ধারণ করতে পারে। যদি পুলিশ নিরুদ্বেগে তাদের ছেড়ে দিত টহল দিয়ে ফিরতে, তারা করত কি? কলেজ স্কোয়ার পর্য্যন্ত গিয়েছিল, না হয় ওয়েলেস্‌লি পর্য্যন্ত গিয়ে ঘর্ম্মসিক্ত বসনে, তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে, রুক্ষকেশ ও বিবর্ণমুখে ফিরে যেত যার যার আপন বাসায়, মনে করত তারা একটা মস্ত কাজ করে' এসেছে। ক্লান্তির দ্বারা উত্তেজনা হ'ত ক্ষয়, সরকারের কি লোকসান?"

ম্যাজিষ্ট্রেট বল্লেন—"You may be talking quite sensibly, Kanai Babu, but that is an affair of the Political Department. I can at best comment upon it. কিন্তু আপনার স্বপক্ষে আপনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা অত্যন্ত clever হ'লেও এ কথা বলতেই হবে যে সেটা sophism। একটা মানুষ প্রধানতঃ জন্তু, তারপর সে হয় মানুষ। জন্তুর উপর একটা অতিরিক্ত ধর্ম্ম চড়লে সেই জন্তুকে বলা যায় মানুষ। তাই বলে' রাস্তায় যেমন করে' আপনি একটা ছাগলকে চাবুক মারতে পারেন সেই রকম করে' কি একটা মানুষকে চাবুক মেরে বলতে পারেন—মানুষ হিসাবে তাকে চাবুক মারি নি, জন্তু হিসাবে চাবুক মেরেছি? পুলিশ কর্ম্মচারী আসলে একজন মানুষ, কিন্তু সে যখন পুলিশের বেশ ধরে' রাস্তায় দাঁড়িয়েছে তখন তার নূতন ধর্ম্ম নিযেই তাকে বিচার করতে হবে, সে তখন প্রধানতঃ পুলিশই, শুধু মানুষ নয়। প্রত্যেক জিনিষেরই সত্তা যায় বদ্‌লে' যখন নূতন নূতন উপাধি এসে তার স্বরূপকে দেয় বদ্‌লে'। এই জন্যই মানুষ হিসাবে আপনি পুলিশ কর্ম্মচারীকে মেরে থাকলেও পুলিশ কর্ম্মচারী হিসাবে তার কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। আমি এখানে এসেছি আইন অনুসারে মুক্তি বা দণ্ড দেবার জন্য। আপনার সহৃদয়তার প্রশংসা করি, ভবিষ্যতে ক্ষেত্রান্তরে দেখা হ'লে আপনাকে মানুষ হিসাবে সম্মান করতে কখনই ভুলব না, কিন্তু আজ আইনের নিয়মে শাস্তি দিতে আমি বাধ্য। তবু সমস্ত দিক বিবেচনা করে' আপনাকে লঘু দণ্ডই দিতে চাই। আপনাকে দেওয়া গেল তিনমাস অশ্রম কারাবাস।"

কানাই বল্লে—"ধন্যবাদ।"

কানাই ত গেল জেলে। মঞ্জরীর ইচ্ছা ছিল কোনও না কোনও

অবসরে কানাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে, সঙ্গে সঙ্গে সুজাতা সম্বন্ধে তার মনোভাব যদি পারে আবিষ্কার করতে। কিন্তু পুলিশের ঝামেলা দেখে' সে সাহস করল না এ কাজে এগিয়ে যেতে। আদালতে পাঠিয়েছিল সে তার একজন আত্মীয়কে, সেখানে বাদানুবাদের ফলে যদি কোন বিষয়ের রহস্য পড়ে উন্মুক্ত হয়ে। কানাইয়ের সমস্ত বিবরণ শুনে, কানাইয়ের বীরত্বের কথা ভেবে সে মনে মনে বেশ গৌরব অনুভব করল। এ হেন বীরবিক্রমী কানাইকে সে ত অনায়াসে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে এবং এখনও যত ইচ্ছা পারে। এই চরিত্রের দীপ্তির তুলনায় সুকুমারের চিত্র এল নিষ্প্রভ হয়ে। সুকুমারকে নিয়ে থাকতে গেলে অর্থ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব থাকতে পারে, কিন্তু গৌরব কোথায়, গর্ব্ব কোথায়? অনেক শ্রেণীর নারী আছে যারা পুরুষকে মনে করে সুরভি গাভী। তারা কেবলমাত্র তারা যে আছে এ দ্বারাই আপনাদের চরিতার্থতা সম্পন্ন করবে, আর যত প্রকারের ভোগ আছে সমস্ত নেবে দোহন করে' পুরুষজাতীয় সুরভি গাভীর নিকট থেকে। ধন চাই, বিলাস চাই, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বতন্ত্রতা চাই, শুধু তাই নয়, মান চাই, গৌরব চাই, গর্ব্ব চাই। এ সমস্তই নেমে আসবে পুরুষের উচ্চভূমি থেকে ঢালুপথে নারীর পাদপদ্মে। পুরুষের নিকট থেকে আহৃত সম্পদ সে ইচ্ছামত ভোগ করতে পারবে, দেশের ও দশের কাছে মান হবে, যশ হবে, গর্ব্ব এবং গৌরব অনুভব করবে, অমুকের স্ত্রী বলে' তার সর্ব্বসম্পদের অধিকারিণী হবে বিনা আয়াসে। যে পুরুষ তাকে বহন করবে সে হবে ভারবাহী মাত্র, তাকে ছাড়িয়ে উঠবে তার নাম, তার প্রভাব। চন্দনলতা অন্য তরুকে আশ্রয় করে' তার উপলতা হয়ে বাঁচে। যে গাছের রসে সে জীবনধারণ করে দশের নিকট সে গাছের কোনও প্রতিপত্তি নেই। সে কেবল চন্দন-

লতাকে রস যুগিয়েই খালাস, লোকে আসে চন্দনলতার কাছে তার সুগন্ধের জন্য। এই রকম সর্ব্বংধুক্ স্বামী পেলে তবে না নারীজন্মের যথার্থ সাফল্য! সুকুমার এখন প্রায় তার করতললব্ধ হয়েছে, আর একটু হ'লেই সে মনে করছে যে সুজাতার দিকের সমস্ত শিকড় ছিঁড়ে এনে তার নিজের জমিতে লাগাতে পারবে। কিন্তু এখন এসেছে তার একটা নিস্পৃহতা। সে মনে করছে তার কল্পনার ছবিতে, যে সুকুমারকে ত সে ইচ্ছা করলে যখন তখনই বিয়ে করতে পারে কিন্তু তাকে বিয়ে করে' ফল হবে কি? কলকাতায় একখানা বড় বাড়ী, দার্জ্জিলিং সিমলায় বাড়ী, একখানা বড় মোটর গাড়ী, দাস দাসী, বেশ ভূষা সজ্জা। কিন্তু এ সব ত হ'ল, ততঃ কিম্? এসব জিনিষ-গুলো একবার আসে বটে, কিন্তু এগুলোকে ক্রমশঃ বাড়াবার কোন উপায় নেই। ক্রমশঃ বাড়াবার জিনিষ হচ্ছে খ্যাতি, যশ, গৌরব। তা অফুরন্ত, যতই কেন তা বাড়ুক না তা আরও বাড়ানো যায় এবং তা জীবনে আনে নূতন রস, নূতন উত্তেজনা। উত্তেজনা না থাকলে সুখভোগ ব্যর্থ, আর সে সুখ হয়ে যায় মলিন, রসবর্জ্জিত। এই যে কানাইটা জেলে গেল, কেমন ড্যাং ড্যাং করে' চলে' গেল। জেলে ত কোন খাটুনি খুটুনি নেই, দিব্যি আরামে থাকবে। আর চারি-দিকে কাগজে কাগজে কেমন ঢি ঢি পড়ে' গেছে কানাইয়ের তেজস্বিতার। কিছুদিন ধরে' লোকের মুখে আর কোনও কথা নেই কানাইয়ের কথা ছাড়া। তা কানাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকলেই বা ফল কি? আর ওর যে হতচ্ছাড়া বুদ্ধি, ও যে কোন দিন টাকা রোজগার করতে পারবে তার কোন আশা নেই। উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তিও কেউ হাজির নেই। এবার চেষ্টা করতে হবে যদি সুকুমারকে বিলেতে পাঠিয়ে সেখানকার একটা বড় ডিগ্রী আনানো যেতে পারে,

আর পাশ করিয়ে আনা যেতে পারে ব্যারিষ্টারিটা। তা হ'লে ঘরে ত টাকা আছেই, পলিটিক্সে তাকে নামিয়ে দিয়ে অর্থ ও কল-কৌশলের সাহায্যে যদি তাকে একটা রাজনৈতিক নেতা করে' খাড়া করা যেতে পারে তবে সব দিক বজায় থাকে। কানাই ত একজন রাজনৈতিক কর্ম্মী মাত্র, স্বকুমার হয় ত তার টাকার জোরে হ'তে পারবে একজন দেশের নেতা, তখন কানাইকেই করতে হবে তার অধীনে কাজ। তা হ'লে আর কানাইয়ের সামনে তার মুখ কোন দিন হেঁট হবে না। এই জন্য সে ভাবলে যে এবার দেখা হ'লে স্বকুমারের কাছে আর নিজেকে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া চল্‌বে না।

যতদিন মঞ্জরী কলেজে স্বজাতা প্রভৃতির সঙ্গে ছিল, সব বিষয়ে চাইত সে সবাইকে টেক্কা দিতে। তাই সে একজন উৎসাহী সভ্য হয়েছিল ছাত্রীসঙ্ঘের। মধ্যে মধ্যে সেও দিত গরম গরম বক্তৃতা, কিন্তু আজ যে ছাত্রীসঙ্ঘের মধ্যে একটা মহা আগ্নেয়গিরির নির্ঘোষ হবে তা সে স্বপ্নেও মনে করতে পারে নি। কিন্তু পুলিশ কুচকাওয়াজ করতে লাগল ছাত্রীসঙ্ঘের প্রতি সভ্যের পিছনে পিছনে। চর লাগল প্রতি ছাত্রীর পিছনে, ফলে মঞ্জরীর পিছনেও লাগল চর। চরেরা অল্প দিনের মধ্যেই আবিষ্কার করে' ফেল্লে কানাইয়ের সঙ্গে মঞ্জরীর অনেকদিনের ব্যবহার। মঞ্জরীর সমস্ত নাড়ীনক্ষত্র তারা করে' ফেল্লে আবিষ্কার। এমন কি সেদিন যে তারা ইডেন গার্ডেনে একত্র হয়ে বসে' ছিল সে কথাটাও তারা আবিষ্কার করে' ফেল্লে। মঞ্জরীর ডাক হ'ল লর্ড সিংহ রোডে। সেখানে I. B. Departmentএর লোকেরা জেরায় জেরায় মঞ্জরীকে একেবারে করে' ফেল নাকাল। যখন সে একেবারে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে তখন তারা জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করল স্বজাতা সম্বন্ধে। তারা স্বজাতা সম্বন্ধে

অনেক চেষ্টা করে'ও কোন খবর পায় নি। সুজাতাকে তারা চায় গ্রেপ্তার করতে। জানে আদালতে মোকদ্দমা টিকবে না, কিন্তু Ordinanceএর বলে গ্রেপ্তার করে' রাখতে হ'লেও অন্ততঃ উপর-ওয়ালাদের কিছু বোঝান দরকার, এজন্য তারা সুজাতা যে অনেকদিন ধরে' নানাভাবে রাজনৈতিক ধ্বংসবাদীদের সঙ্গে জড়িত এই কথাটা বলিয়ে নিতে চায় মঞ্জরীর মুখ দিয়ে। তারা বল্লে এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে তাদের হাতে। প্রমাণের জন্য মঞ্জরীর কোন দরকার হবে না কিন্তু মঞ্জরীর চরিত্র যে যথার্থ ফিরেছে এবং সে যে যথার্থ-ভাবে ওসব দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না তার মুচলেকা স্বরূপ সুজাতার বিরুদ্ধে এই জাতীয় স্বীকারোক্তি করে' লিখে সই করে' দিতে হবে। মঞ্জরী জিজ্ঞাসা করলে এই নিয়ে বাইরে কোন ঘাঁটাঘাঁটি হবে কিনা এবং সে যে লিখে দিয়ে গেল তা বাইরে প্রকাশ পাবে কিনা। I. B. কর্ম্মচারী বল্লে যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি কোনও কালে এ সম্বন্ধে কিছু জানতে পারবে না এ সম্বন্ধে সে নিশ্চয় করে' বলতে পারে। মঞ্জরী ভেবে দেখলে যে প্রথমতঃ তার মুক্তির জন্য যা আবশ্যক তা তাকে করতেই হবে; দ্বিতীয়তঃ সুজাতা সম্বন্ধে এই সব কথা যদি সে লিখে দেয় এবং সে কথা যদি কখনও প্রকাশ না পায় তবে সুজাতাকে ধরে' নিয়ে রাখবে জেলে অনেককাল। তখন সে সুকুমারকে পাবে একেবারে আল্‌গা করে'। এতে তার হিত ছাড়া অহিত নেই। এই সমস্ত চিন্তা করে' সে দিলে একটা ঐরকম স্বীকারোক্তি লিখে আর সঙ্গে সঙ্গে দিলে মুচলেকাপত্রে সই করে' যে ভবিষ্যতে সে কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেবে না বা যারা যোগ দেয় রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের সঙ্গ করবে না, কিন্তু সে বল্লে যে পূর্ব্ব বন্ধুতা রাখবার জন্য দু'চার দিন সে সুজাতার কাছে যাতায়াত করবে এবং

কোনও খবর জুটলে তা পুলিশকে জানাবে। পুলিশ এমনিই দিত তাকে ছেড়ে, কারণ তার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ ছিল না, উপরন্তু তারা পেয়ে গেল অনেকখানি আশার অতিরিক্ত। মঞ্জরীকে তারা দিলে রেহাই কিন্তু দৃষ্টি রাখতে ছাড়ল না তার উপর।

এদিকে মহা হুলস্থূল বেধে গেছে সুজাতার কলেজে। নিস্তারিণী দেবী যদিও ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী তথাপি সমস্ত মেয়েরা তাঁকে ভক্তি করত ও ভালবাসত বলে' মেয়ে হোষ্টেলেও ছিল তাঁর প্রধান কর্ত্তৃত্ব। তা ছাড়া সকল মেয়েদেরই তিনি ছিলেন অভিভাবিকা-স্বরূপ। কোথায় কোন্ মেয়ের অসুখ করেছে, তার শয্যার পার্শ্বে নিস্তারিণী দেবী, কোথায় কে বেতন দিতে পারছে না, নিস্তারিণী দেবীর ব্যাগ্ থেকে বেরুল টাকা। কোথায় কোন্ মেয়ের মা মারা গিয়েছে বা অন্য কোন নিকট আত্মীয় মারা গিয়েছে, নিস্তারিণী দেবী দখল করে' বসলেন তার মায়ের স্থান। আচারে তিনি ছিলেন হিন্দু, বিশ্বাস ছিল তাঁর সর্ব্বজনীন। শরতের শেফালির মত পবিত্র একটি হাসি থাকত মুখখানিকে তাঁর আলো করে'। বিদ্যার ছিল না তাঁর কোন প্রগাঢ়তা কিন্তু তাঁর বোধ ছিল অসাধারণ। সে বোধের প্রধান প্রেরণা ছিল প্রেম ও সহানুভূতি। ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যে জ্ঞান আহরণ করি বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে, সংস্কারের দ্বারা সেগুলি জমা হ'তে থাকে আমাদের চিত্তভূমির নানা স্তরের মধ্যে। স্মৃতি ও কল্পনার দ্বারা আমরা সেগুলি আনি মনের সামনে, তাদের পরস্পরকে গ্রথিত করি নানা সম্বন্ধজালের মধ্যে এবং সেই সমস্ত সম্বন্ধপরম্পরার অনুশীলনের দ্বারা আমরা সেই আহৃত জ্ঞানগুলিকে নব নব জ্ঞানসৃষ্টির কার্য্যে নিয়োগ করে' থাকি। পুস্তকে আমরা যা পড়ি তাতে সংগৃহীত হয় নানা উপাদান এবং সে উপাদানগুলিও আমরা ব্যবহার করি ঐ

একই উপায়ে। আমাদের পরস্পরের বুদ্ধির মধ্যে একটা গতির পার্থক্য আছে। আমাদের পরস্পরের মস্তিষ্কের মধ্যে যে জ্ঞানবহা নাড়ীগুলি আছে সেগুলির বেগ সমান নয়। এই বেগ যেখানে বেশী সেখানে জ্ঞানসৃষ্টির চলে নূতন নূতন প্রক্রিয়া, কল্পনার সাহায্যে চলে ভাষাশিল্পের নূতন সৃষ্টি। কিন্তু কারুর কারুর হৃদয়ের মধ্যে অনুভবের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকে এমন একটি জারক রস যা জ্ঞানের পথে প্রতিবিম্বিত না হয়েও অতি সহজে উন্মুক্ত করতে পারে একটা নবোন্মেষের দ্বার। ভক্তি যেখানে হয়ে ওঠে প্রবল সেখানে ভক্তি-ভাজন সম্বন্ধে যুক্তিতর্কের আবশ্যক হয় না, সেই ভক্তিভাজনের যথার্থ স্বরূপটি স্বচ্ছ হয়ে দেখা দেয় সমস্ত আবরণকে ভেদ করে' ভক্তের হৃদয়পটে। শাস্ত্রে একটি কথা আছে—ভক্তিজ্ঞানায় কল্পতে, ভক্তি দেখা দেয় জ্ঞানরূপে। মা যখন ছেলেকে ভালবাসেন তখন তার সহস্র দুষ্প্রবৃত্তির আবরণের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রেমের তারল্যে তিনি প্রবেশ করতে পারেন সন্তানের হৃদয়ের মধ্যে। তার দোষগুণের অন্তরালে রয়েছে তার স্বচ্ছ স্বরূপটি, সেটি অনায়াসে ধরা পড়ে তাঁর চোখে। এমনি করে' দরদ দিয়ে যারা দেখতে পারে তারা আনায়াসে পারে মানুষকে চিন্‌তে, যদিও কেমন করে' চিন্‌ল তা তারা পারে না বলতে। তেমনি যারা হৃদয়কে মুক্ত করে' দিয়ে বসতে পারে মহাকাশের নিম্নে ভক্তিনত হৃদয়ে, কোটি জ্যোতিষ্কের আলোকরেখা পড়ে গিয়ে তাদের হৃদয়ের উপরে, প্রকৃতি ব্যক্ত করেন তাঁর অন্তরের রূপ সেই ভক্তের কাছে, জ্ঞানে নয়, অনুভবে। সেই অনুভবের বলে জুটেও যায় তার ব্যক্ত করবার ভাষা। নিস্তারিণী দেবী ছিলেন এই প্রকৃতির নারী। দরদ দিয়ে দেখতেন তিনি সকলকে, তাই সকলেরই ছিলেন তিনি গুণপক্ষপাতিনী, দোষকে আড়াল করে'

তাঁর চক্ষুতে গুণটি হত সমুদ্ভাসিত। এই পৃথিবী তাঁর কাছে ছিল মধুময়, বিশ্বাসে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ, কর্ম্মে তিনি ছিলেন দৃঢ়, তেজস্বী ও নিঃস্বার্থ ছিল তাঁর হৃদয়। অধ্যক্ষের নিকট উপর থেকে হুকুম এল, এই ব্যাপারে যারা প্রধান তাদের নাম সংগ্রহ করে' কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। অধ্যক্ষ নিজে মেয়েদের চেনেন না, কাজেই তিনি হুকুম জারী করলেন নিস্তারিণী দেবীর উপর। নিস্তারিণী দেবীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করতে বিলম্ব হ'ল না। তিনি দাখিল করলেন পদ-পরিত্যাগপত্র অধ্যক্ষের নিকট এবং অস্বীকার করলেন এই কার্য্যে অধ্যক্ষকে সাহায্য করতে। পদপরিত্যাগ-পত্র প্রেরণ করে'ই তিনি যেন মুক্তির আনন্দ অনুভব করলেন। প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তাঁর বেতন বড কম ছিল না। আয়ের কোন দ্বিতীয় পন্থাও ছিল না, পোষ্যও ছিল তাঁর অনেকগুলি। কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্বে এসে পৌছে আপন পথ বেছে নিতে তাঁর তিলমাত্র বিলম্ব হ'ল না। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে' তিনি সুজাতার কাছে এসে উপস্থিত হ'লেন তাকে সান্ত্বনা দিতে। সুজাতা সমস্ত শুনে অস্থির হয়ে উঠ্‌ল, তার মনে হ'ল, তার এই আকস্মিক কাজটাতে চারিদিকে যে বিভ্রাট ঘটেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। সমস্ত মেয়েগুলি বিপন্ন, নিস্তারিণী দেবী ছাডলেন চাকরী, কানাই গেল জেলে। আরও কি ঘনিয়ে আসবে ঠিক নেই। সে আপন বুদ্ধিকে বারবার ধিকার দিতে লাগ্‌ল। কিন্তু নিস্তারিণী দেবী ধীর স্থিরভাবে বল্লেন—"ভগবান যা করেছেন তা মঙ্গলের জন্যই করেছেন।"

সুজাতা বল্লে—"আপনার ধর্ম্মনিষ্ঠা গভীর, আপনি সব জিনিষেই ভগবানের মঙ্গলময় অনুষ্ঠান দেখতে পান। এর মধ্যে মঙ্গল কোথায়?"

তার জবাবে নিস্তারিণী দেবী বল্লেন—"জগতে অধিকাংশ ঘটনার

মধ্যেই একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য বল্লেই যে ব্যক্তি বিশেষের উদ্দেশ্য বুঝায় তা নয়। যেটা যাতে পরিণত হয় সেইটিই তার উদ্দেশ্য। কোরকের উদ্দেশ্য বিকশিত কুসুম, আবার অনেক বিকশিত কুসুমের উদ্দেশ্য ফল, ফলের উদ্দেশ্য তার পরিণতি তার বীজ ও সেই থেকে পুনরায় অঙ্কুরের উদ্গমন। মানুষেরও জীবনে সে চায় কতগুলি প্রবৃত্তির প্রেরণাকে সার্থক করতে। সেই প্রেরণা সার্থকের পথে থাকে অনেক বিঘ্ন, সে বিঘ্নে আনে দুঃখ। কিন্তু নিজের অন্তরের প্রেরণাকে সার্থক করে' তুলতে না পারলে আমরা অন্তরের মঙ্গলকে পেতে পারি না। এই হিসাবে দুঃখ মঙ্গলের বিপরীত নয়। পৃথিবীতে দেখা গেছে যে অনেক সাধু মহাপুরুষ আপন অন্তরের শুভ প্রেরণাকে বাইরের বিঘ্নময় জগতে সার্থক করতে গিয়ে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, এমন কি, নিষ্পেষিত হয়েছেন। তাঁদের সেই দুঃখ ও নিষ্পেষণের মধ্য দিয়ে তাঁরা যে নিজের প্রেরণাকে অভিব্যক্ত করেছিলেন সেটা হয়ে আছে জগতের চিরদিনের মঙ্গলের সম্পত্তি। তাঁদের নিষ্পেষণের মধ্যেও তাঁরা সেই মঙ্গলের অনুভবকে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁদের আত্মপ্রেরণার পূর্ণতার তৃপ্তিতে। যখনই আমরা সুখকে একান্ত কাম্য বলে' মনে করি এবং মনে করি যে আমরা কেবল সুখই চাই, তখনই আমরা দুঃখকে মনে করতে পারি অমঙ্গল। কিন্তু একটু বিবেচনা করে' দেখলেই আমরা দেখতে পাই যে আমরা চাই আমাদের প্রেরণার সার্থকতা। আমাদের অন্তরে যে প্রেরণা আছে সেই প্রেরণা আপন সার্থকতার জন্য বহির্লোকে আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। এই শুভ প্রেরণা অনুসরণ করে' যখনই আমরা দুঃখ বা ক্ষয়ক্ষতিকে তুচ্ছ মনে করি, তখনই আমাদের অন্তর পায় তার চরিতার্থতা। সেইটিই হচ্ছে মঙ্গল।"

সুজাতা বল্লে—"আমাদের প্রবৃত্তির সবগুলো ত ভাল নয়।

আমাদের অনেক প্রবৃত্তি পশুসাধারণ। সেগুলোকে মুক্ত করায় আমাদের কি চরিতার্থতা ?”

নিস্তারিণী দেবী বল্লেন—“আমাদের পশুপ্রবৃত্তির কতকগুলি শরীর-রক্ষামূলক, যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি। এগুলি আমরা পূর্ণ না করে’ পারি না এবং অন্যের অবিরোধে এগুলির পরিপূরণ করা আমাদের কর্ত্তব্যও বটে মঙ্গলেরও বটে। যখন আমাদের এই সমস্ত দৈহিক প্রবৃত্তি অপরের বিরুদ্ধে ধাবিত হয় তখন তার ফলে আমরা পৃথিবীতে আনি দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘাত। সে দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘাতে হয় আমরা নিজেদের ক্ষতি করি, নয় আমরা অপরের ক্ষতি করি। এইটি হচ্ছে আমাদের বর্ত্তমান সমাজের অপূর্ণতা। আমাদের সমাজ বন্ধনের প্রধান উদ্দেশ্যই এই যে আমরা যৌথভাবে চেষ্টা করব যাতে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রবৃত্তিগুলি এইভাবে আত্মঘাতী হয়ে উঠতে না পারে। সমাজের বর্ত্তমান চেষ্টায় যদিও এটা সফল হয়ে ওঠে নি, তথাপি একথা মানতেই হয় যে সেই দিকেই চলেছে সমাজের গতি এবং বর্ত্তমান সমাজে দশের জন্য একের বলিদান অনেক সময় হয়ে পড়েছে প্রয়োজন সকলের সুখ ও শান্তির জন্য। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে এই সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তিকে বাধা দেওয়ার জন্য নিরন্তরই আমাদের মধ্যে আমাদের শুভ প্রবৃত্তি কাজ করছে। দুষ্প্রবৃত্তির উপেয় হচ্ছে সুখ, অপরকে বর্জ্জন করেও আমার নিজের প্রভাব প্রাপ্তি। তাই এর বিরুদ্ধে নিরন্তরই আমাদের মধ্যে চলেছে শুভ প্রবৃত্তির একটা প্রতিঘাত। সেই প্রতিঘাত আত্মার মধ্যে যে অস্বস্তি আনে, সংসারের সঙ্গে নিজেকে যেভাবে বিচ্ছিন্ন করে’ দেয়, সেইটিই হচ্ছে অমঙ্গল।”

সুজাতা আবার বল্লে—“এই সুপ্রবৃত্তি দুষ্প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের অর্থ কি ?”

নিস্তারিণী দেবী বল্লেন—"যে কোন জিনিষের অর্থ বুঝতে হ'লেই সেটা বোঝা যায় তার ইতিহাসের মধ্যে—তার অতীত ইতিহাস ও তার ভাবী ইতিহাস। ইতিহাস পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন করে' নিলে কোনও বর্ত্তমান ক্ষণবিশেষের কোনও অর্থ বা তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। সমস্ত ঘটনাগুলো ছুটেছে একটা উদ্দেশ্য এবং ফলকে লক্ষ্য করে'। প্রথম মুহূর্ত্তে যা থাকে উদ্দেশ্য পরের মুহূর্ত্তে তা হয় ফল। সেই ফল আবার ছোটে পরের মুহূর্ত্তের ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে'। দু'টি উদ্দেশ্যের মাঝখানে থাকে একটি ফল। এই উদ্দেশ্যের মধ্যেই ফলের তাৎপর্য্য। উদ্দেশ্য দুটিকে বাদ দিয়ে কোন ফলের তাৎপর্য্য নির্ণয় করা যায় না।"

সুজাতা বল্লে—"আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছিলুম তার সঙ্গে আপনার এ কথার সামঞ্জস্য কোথায় ?"

জবাবে নিস্তারিণী দেবী বল্লেন—"মানুষ উঠেছে পশুলোক থেকে, কাজেই তার মধ্যে রয়েছে পশুলোকের দেহ এবং পশুলোকের প্রবৃত্তি। মানুষ পশুলোকে থেকেও পশুলোককে অতিক্রম করেছে তার বুদ্ধি দিয়ে। পশুলোকের সঙ্গে সংগ্রামে সে এই বুদ্ধিকে ব্যবহার করেছে অস্ত্ররূপে। কাজেই এই বুদ্ধির মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে পাশবিক প্রবৃত্তি ও পাশবিক চরিত্র! শুধু বুদ্ধি হিসাবে বুদ্ধির মধ্যে কোনও উচ্চতর আদর্শের দাবী নেই, কিন্তু মানুষ যে কেবলমাত্র বুদ্ধি অস্ত্রের দ্বারা পশুলোককে অতিক্রম করেছে তা নয়। পশুলোক থেকে যে সে উচ্চতর আদর্শের জন্য প্রয়াণ আরম্ভ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় মানুষের অধ্যাত্ম চেতনাতে। সে অধ্যাত্ম চেতনা শুধু সুখদুঃখের শুধু হিতাহিতের বিবেচনা করে না, সে বিবেচনা করে একটা উচ্চতর আদর্শের। সেই উচ্চতর আদর্শ প্রকাশ পায় আমাদের ভাল মন্দ,

সুন্দর কুৎসিত বোধের মধ্যে। এই দোটানায় পড়েছে বলে'ই মানুষের মধ্যে দুটি বিজাতীয় ভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।"

সুজাতা বল্লে—"সে দোটানায় পড়ে' মানুষ যাবে কোথায়?"

নিস্তারিণী দেবী বল্লেন—"যে ইতিহাসের ফলে মানুষ উৎপন্ন হয়েছে এবং যে ইতিহাস মানুষের ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত করে' আছে, তার ফল এই যে মানুষকে চলতে হবে চিরন্তন দ্বন্দ্বের পথে।"

সুজাতা বল্লে—"এ দ্বন্দ্বটা কি রকমের?"

নিস্তারিণী দেবী বল্লেন—"পশুলোকেব দ্বন্দ্ব হচ্ছে তার প্রাকৃতিক জড় ও জীবলোকের সঙ্গে, কিন্তু তার নিজের মধ্যে নিজের প্রবৃত্তির কোনও দ্বন্দ্ব নেই। তার দ্বন্দ্বে সে হয় জয়ী, না হয়, হয় তার ক্ষয়। এই জয় ও ক্ষয়ের দ্বারা পশুলোকে গড়ে' উঠেছে তার পরিণতির ইতিহাস। মনুষ্যলোকে শুধু যে এই জাতীয় দ্বন্দ্ব আছে তা নয়, সেখানে এর সঙ্গে ওঠে আর একটা নূতন রকমের দ্বন্দ্ব। সেটা তার নিজের মধ্যে একটা বিরোধ, তার পশু-স্বভাবের সঙ্গে তার মনুষ্য-স্বভাবের বিরোধ। এই বিরোধেব মধ্য দিয়েই মানুষ ক্রমশঃ চেষ্টা করছে অতিক্রম করতে তার পশুস্বভাবকে, সার্থক করতে চেষ্টা করছে তাব মনুষ্য-স্বভাবের চরম পূর্ণতাকে। সেই জন্যই যখন আমবা মানুষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে সামনে না রেখে কেবল তার বর্ত্তমান দ্বন্দ্বকে দেখি তখন সেই দ্বন্দ্বের কোনও অর্থ খুঁজে পাই না। মনুষ্যজাতির নানা ব্যক্তির মধ্যে এই দু'টি প্রবৃত্তিকে ন্যূনাধিক থাকতে আমরা দেখতে পাই। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে অনেক সময় হয় ত আমরা দেখতে পাই যে সাধু প্রবৃত্তির প্রেরণাকে সফল করতে গিয়ে মানুষ দুঃখ ও ধ্বংসকে বরণ করেছে, কিন্তু চরম উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এই দুঃখ ও ধ্বংসকে আমরা অমঙ্গল বলতে পারি না। শিশু হাঁটতে চেষ্টা করতে গিয়ে হয় ত কোন সময়

আছাড় খেতে পারে, যেতে পারে তার পা ভেঙ্গে, কিন্তু তবুও এ কথা বলা চলবে না হাঁটতে চেষ্টা করে' সে অমঙ্গলের পথে চলেছিল। এই জন্যই স্বাভাবিক শুভ প্রেরণার বশবর্ত্তী হয়ে যখন মানুষ দুঃখ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন সে দুঃখ ও ক্ষতিকে সাফল্যেরই একটি পর্য্যায় বলে' মনে করতে হয়। প্রাকৃতিক বিরোধ বশতঃ যদি কোন সময় দুঃখ বা ক্ষতি এত প্রচুর পরিমাণে আসে যাতে সেই ব্যক্তি তার জীবনে আর সুখ না পায় এবং একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়, তথাপি তার আত্মসুখ প্রেরণার বিশ্বাসের মধ্যে সে আপন অধ্যাত্ম মঙ্গলের সাক্ষাৎ পেয়ে তৃপ্ত হয় এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির অগ্রসরের পথ মুক্ত করে' দেয়।"

সুজাতা আবার প্রশ্ন করলে—"জাতির সাফল্যের জন্য ব্যক্তি কেন আত্মবিনাশ স্বীকার করবে?"

নিস্তারিণী দেবী বল্লেন—"জাতি বলে' কোন একটা বিশেষ বস্তু ব্যক্তির সঙ্গে পৃথক হয়ে তার প্রতিস্পর্দ্ধী রূপে আকাশে দাঁড়িয়ে নেই। মনুষ্য হিসাবে মনুষ্যের যে বিশেষ ধর্ম্ম সেইটিকেই বলি আমরা জাতি। সেটা একদিকে যেমন ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে সকল মানুষের মধ্যে, তেমনি রয়েছে একজন মানুষের মধ্যে। অমনুষ্যোচিত ধর্ম্মগুলির মধ্যে মনুষ্যোচিত ধর্ম্মটি চাইছে প্রকাশ লাভ করতে, এই প্রকাশলাভ করার চেষ্টার মধ্যেই রয়েছে তার মঙ্গল। যেমন প্রতি যুদ্ধে ব্যক্ত হয় বীরের বীরত্ব, ধ্বংস হ'লেও বীরের বীরত্ব নষ্ট হয় না, তেমনি এই মনুষ্যোচিত ধর্ম্মটি আত্মপ্রকাশ লাভ করতে চেষ্টা করে' যেখানে অসমর্থ হয় সেখানেও তার আত্মপ্রকাশের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না। যে যা, তার সেইভাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টাই তার মঙ্গল, কারণ সেইখানেই হয় তার উদ্দেশ্যের পরিপূরণ। মানুষের মধ্যে যে পশূচিত প্রবৃত্তি রয়েছে তারও মঙ্গল হচ্ছে সেই পশূচিত ভাবপ্রকাশে। সেই প্রকাশের মধ্য

দিয়ে সে পাবে তার জয় এবং সার্থক করবে তার ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে, ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যকে মনুষ্যোচিত ভাবের প্রকাশে, পরম গৌরবের মধ্য দিয়ে।"

সুজাতা আবার জিজ্ঞাসা করলে—"সুখ আর মঙ্গলের মধ্যে মনে হচ্ছে আপনি একটা ঘোরতর পার্থক্য আছে বলে' মনে করেন, কিন্তু আমরা চলিত কথায় সুখ ও মঙ্গল একই অর্থে ব্যবহার করে' থাকি।"

নিস্তারিণী দেবী বল্লেন—"যেমন আনন্দ আর সুখ এক নয়, মঙ্গল ও সুখও এক নয় এবং মঙ্গলের বিপরীত দুঃখ নয়। যে কোনও প্রকারের দ্বন্দ্ব থেকেই আসে দুঃখ। দ্বন্দ্ব হ'ল জীবনের ধর্ম্ম, তাই দুঃখ অপরিবর্জ্জনীয়। জীবলোকের আদি থেকে ভবিষ্যৎ মানুষের চরম পরিণতি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই রয়েছে দুঃখ, সেইজন্যই আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—সর্ব্বং দুঃখময়ং জগৎ। জীব অজীব সর্ব্বত্রই চলেছে একটা ভাবনা, একটা পরিবর্ত্তন, একটা ক্রিয়া, এবং ক্রিয়া-মাত্রের মধ্যেই রয়েছে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব চেতনার মধ্যে প্রতিফলিত হ'লে যে অনুভবের সৃষ্টি করে তাকে বলি দুঃখ। দুঃখ জীবনের প্রতিকূল ধর্ম্ম। এই প্রতিকূল ধর্ম্মকে ক্ষণে ক্ষণে আমরা করি পরাজিত এবং সেই দুঃখ পরাজয়ের যে অনুভব তাকে বলি আমরা সুখ। এইজন্য এক হিসাবে সুখকে বলা যায় সাফল্য, কিন্তু ক্রিয়াপ্রবৃত্তির মধ্যে যে প্রেরণা আছে, সেই প্রেরণা যে নিজেকে মুক্ত করে, সেই মুক্তির যে অনুভব, তাকে বলি আনন্দ, তাকে বলি মঙ্গল। প্রেরণা যখন তার আপন বহির্ভূত কোনও কারণের দ্বারা প্রতিহত হয় তখন সেই দ্বন্দ্ব আনে দুঃখ। কোনও দুঃসহতম কঠোর দুঃখের কালেও আমরা আমাদের প্রেরিত করে' তৃপ্তিলাভ করি। সেটা আত্মপ্রকাশের আনন্দ, প্রেরণার আনন্দ। সেটিই হচ্ছে যথার্থ মঙ্গল। সেইজন্য

দুঃখ যেমন ব্যাপ্ত হয়ে আছে জগতে তেমনি মঙ্গলও ব্যাপ্ত করে' আছে জগৎকে। সহস্র সুখে জীবন স্বচ্ছন্দে চলে' যেতে পারে, তবু যদি সেখানে আত্মপ্রকাশের মহিমা না থাকে সে জীবন হবে নিরানন্দ এবং অমঙ্গল। জীব যে আপন জৈব ধর্ম্মকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে, আহারের অন্বেষণে চারিদিকে ধাবমান হয়, সেটা জৈব প্রকাশের আনন্দ, আর এই ইতস্ততঃ পরিধাবনের সঙ্গে সঙ্গে থাকে জীবদেহের যান্ত্রিক ক্লান্তি, যান্ত্রিক দুঃখ। এই দুঃখের মধ্য দিয়ে ছাড়া জীব তার জৈবধর্ম্মের স্বস্তি খুঁজে পায় না। এ কথা আমি একবারও বলতে চাই না যে ভগবান যা করেন সবই আমাদের সুখের জন্য। চলবার সময় এক পা যখন আকাশে থাকে, আর এক পা থাকে ভূমিতে তখন অনুভব করি দুঃখ, দ্বিতীয় পা'টি যখন মাটিতে পড়ে দুঃখ তখন হয় অতিক্রান্ত, আসে সুখ। তবু চলতে হ'লে এক পা তুলতেই হবে, সে দুঃখ পেতেই হবে। সে দুঃখ কোথায় বেশী হ'ল, কোথায় কম হ'ল, সেটা নির্ভর করে প্রাকৃতিক কারণের উপর। পিচ্ছিল ভূমিতে আছাড় খেলুম বলে' বিশ্বনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা যায় না, কারণ সেটা নিয়মের অন্তর্গত। তুমি যে নিজের মনের মধ্যে আত্মপ্রকাশের বেদনা অনুভব করছিলে সে তোমার অধ্যাত্ম জীবনেব বেদনা। গভীর গুহার মধ্য থেকে তাকে আজ তুমি মুক্ত করে' দিয়েছ প্রান্তরের মধ্যে, সে এখন তার পথ খুঁজে নেবে আপন বেগে। তাতে তুমি দুঃখ পেলে, কি আর কেউ দুঃখ পেল, সে কথা ভাববার প্রয়োজন নেই। আপন আত্মপ্রকাশের চেষ্টায়, আপন মঙ্গলের চেষ্টায় আমরা যদি সৃষ্টি করি দুঃখ এবং মৃত্যু, তবে তা শোচনীয় নয়। কারণ-পরম্পরার মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে সেই দুঃখ ও সেই মৃত্যু। সেইজন্য গীতাতে অর্জ্জুন যখন স্বজনহিংসার ভয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত হ'তে

চেয়েছিলেন, অর্জ্জুনের সে চেষ্টাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাপুরুষতা ও ক্লৈব্য বলে' ঘোষণা করেছিলেন। অর্জ্জুন ছিল ক্ষত্রিয়, সে এসেছিল ন্যায়ধর্ম্মের অধিকারকে রক্ষা করবার জন্য। সেইটিই ছিল ক্ষত্রিয়ত্বের স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্মপ্রকাশের পথে পরিপন্থী হয়ে যা দাঁড়াবে, দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘর্ষের ফলে হয় ত সেখানে আসবে মৃত্যু। সেখানে বিধেয় ছিল স্বধর্ম্মপ্রকাশ, হিংসা নয়। হিংসা যদি ঘটে তার ফলে, সেজন্য স্বধর্ম্মপ্রকাশের চেষ্টাকে দোষ দেওয়া যায় না। এজন্য ভগবান্ বলেছিলেন—এরা পূর্ব্ব থেকেই মরে' আছে, মহানিয়মের মধ্যে এদের মৃত্যু অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে, অর্জ্জুন কেবল সেই অঙ্কনকে পরিস্ফুট করে' তুলবেন মাত্র। হিংসা উদ্দেশ্য করে' যখন আমরা হিংসা করি, অন্তরের সেই জিঘাংসাবৃত্তি পাপ। হিংসা না থাকলেও সেই জিঘাংসা-বৃত্তি হয় পাপ। আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম করতে গেলে তার ফলে যদি হয় জিঘাংসা, তাকে পাপ বলা যায় না। মানসিক হিংসা বর্জ্জনীয়, কিন্তু কার্য্যতঃ হিংসা অবর্জ্জনীয়। প্রতি পদক্ষেপে লক্ষ প্রাণী বধ হচ্ছে, কিন্তু সেখানে হিংসার প্রবৃত্তি নেই, জিঘাংসা নেই। তাই ফলতঃ হিংসা হ'লেও, যে হাঁটে তার চলার জন্য কোন পাপ হয় না।"

সুজাতা বল্লে—"এ সমস্ত গভীর কথা বুদ্ধিতে বুঝলেও হৃদয়কে বোঝান কঠিন। হৃদয় আর্ত্ত হয়ে ওঠে চারিদিকে দুঃখ দেখে', যে দুঃখের নিমিত্ত বলে' আমাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। তবে আপনি যে এসেছেন তাতে আমি খুব স্বস্তি বোধ করছি। আপনি এখন এখানেই থাকুন। আপনাকে কাছে পেয়ে আমার মনে হচ্ছে যেন আমার মাকে ফিরে পেলুম।"

নিস্তারিণী দেবী স্নিগ্ধভাবে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। এমন সময় এল প্রভা। সে বিস্তারিত করে' বল্লে কানাইয়ের বিচারের

দিনের কথা, সে কি রকম তেজস্বিতার সঙ্গে জেলে গিয়েছে এবং বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা করে নি, বা নিজেকে বাঁচাবাব চেষ্টা কবে নি। সুজাতা স্থির হয়ে সব কথা শুনতে লাগল, তার চোখ এল জলে ভরে'। প্রভা আবাব বল্লে—"শুনেছিস্ আর একটা কথা ?"

সুজাতা বল্লে—"কি ?"

"আমাদেব অধ্যক্ষ নাকি পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন সবকাবেব কাছে। তিনি বলেছেন, এতগুলি মেয়ের বিরুদ্ধে আমি কোনও কঠোব শাস্তি দিতে অক্ষম।"

সুজাতা ও নিস্তাবিণী দেবী উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। নিস্তারিণী দেবী বল্লেন—"দেখ, মানুষকে বিচাব কবতে আমবা কত ভুল করি। এই অধ্যক্ষেব বিরুদ্ধে মেয়েদেব ছিল কত রোষ, কত আক্রোশ। কিন্তু এই ইংরেজমহিলা আমাদের মেয়েদেব সঙ্গে ব্যবহারে যে মহত্ত্ব ও তেজস্বিতা দেখালেন তাতে চিবকাল উজ্জ্বল কবে' রাখবে ইংরেজ জাতির মহত্ত্ব।"

সুজাতা বল্লে—"এমন অধ্যক্ষের কাছে মেয়েদের ক্ষমা চাওয়া উচিত তাঁর আদেশ পালন কবে নি বলে'।"

নিস্তারিণী দেবী বল্লেন—"সে কথা তুমি কিছুতেই মেয়েদের বোঝাতে পারবে না। তাদের মাথা রয়েছে গরম হয়ে। তারা ত স্থিরবুদ্ধিপূর্ব্বক কোন কাজ করে নি। দেশময় চারিদিকের উত্তেজনা দিয়েছে তাদের নাড়ীতে আগুন ধরিয়ে, সে আগুন নেবানো সহজ নয়। যাক্, এ আর তোমাব বিষয় নয়, এ জন্য তোমার মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই।"

এই সময় মঞ্জরী এসে উপস্থিত হ'ল। মঞ্জরীকে দেখে' সুজাতা বল্লে—"তুই এতদিন কোথায় ছিলি ?"

সে বল্লে—"আমাকে ধরে' নিয়ে গিয়েছিল পুলিশে। আমি তাদের স্পষ্ট শুনিয়ে দিয়ে এলুম, দেশের জন্য আমি যে কাজে নেমেছি তার থেকে আমি কিছুতেই ফিরব না। তারা আমাকে ভয় দেখালে জেলে নিয়ে পুরবে। আমি বল্লুম,—তোমাদের শক্তি আছে, তোমরা পুরতে পার, তাই বলে ন্যায্য যা তা থেকে আমাকে বিচলিত করতে পারবে না; বিশেষতঃ, আমার বন্ধু সুজাতা যে কাজে এত বড় দায়িত্ব নিয়েছে সে কাজে তাকে একলা ফেলে' আমি কিছুতেই সরে' আসতে পারব না।"

সে বল্লে বটে অত্যন্ত দম্ভের সঙ্গে এসব কথা তার স্বাভাবিক অভিনয়-নৈপুণ্যের সহিত, কিন্তু তার হৃদয়ের সূত্র ছিল ঢিলা হয়ে বাঁধা, বাজনায় যেন বোল উঠ্‌ল না, ঢ্যাব্‌ ঢ্যাব্‌ করতে লাগ্‌ল সমস্ত আওয়াজটা। সুজাতা বিস্মিত হয়ে তাকাল মঞ্জরীর দিকে, চেষ্টা করল তার চোখ দুটিকে প্রশংসমান করে' তোলবার জন্য, কিন্তু ঠিক যেন পারল না। কোথায় যেন তার কথার মধ্যে কি ছিল, তার হৃদয়কে সাড়া দিতে পারল না। সে চুপ করে' রইল।

প্রভা জিজ্ঞাসা করলে—"সুজাতা-দি'র কথা তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে নি তারা?"

মঞ্জরী এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। একটু যেন ঢোক গিলে বল্লে—"হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করেছিল বৈ কি। আমি কিছু বলি নি।"

প্রভা বল্লে—"বলবে আবার কি? বলবার কি আছে? সুজাতা-দি' যা করেছে সকলের চোখের সামনেই করেছে, আড়ালে ত কিছু করে নি। তা, তোমাকে তা জিজ্ঞাসা করার মানে কি?"

মঞ্জরীর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্লে—"তাই ত, দেখ না ব্যাটাদের আক্কেল।"

প্রভা কট্‌মট্‌ করে' তাকিয়ে রইল মঞ্জরীর মুখের দিকে। অনেক সময় আমাদের মনের মধ্যে অকস্মাৎ সত্যের এমন সব ছায়া পড়ে যে-সব ছায়া হৃদয় গ্রহণ করতে পারে অস্ফুটভাবে, কিন্তু স্ফুটভাবে যাকে আমরা চেতনালোকে পারি না গ্রহণ করতে, প্রকাশ কবতে পারি না তার মর্ম্ম ব্যক্ত ভাষায়।

প্রভা আবার বল্লে—"শুনেছ সুজাতা-দি', অজয়বাবুব একটা মস্ত সুবিধে হয়ে গিয়েছে?"

সুজাতা নিরুৎসাহভাবে বল্লে—"কি রকম?"

"অজয়বাবুর মামা একজন মস্ত ব্যারিষ্টার লক্ষ্ণৌতে। অগাধ সম্পত্তি, জমাট প্র্যাকটিস্। লক্ষ্ণৌয়ের তালুকদারেরা সব তাঁর বাঁধা মক্কেল। তিনি অজয়বাবুকে সেখানে বসাতে চান তাঁর সমস্ত প্র্যাকটিস্ দিয়ে। তিনি বুড়ো হয়েছেন, নিজে কাজ করতে প্রায় অক্ষম হয়েছেন। অজয়বাবু হঠাৎ রাতারাতি প্রকাণ্ড ধনী হয়ে পড়েছেন। তাঁর মতলব এই যে তিনি ওখানে গিয়ে ব্যারিষ্টারীও সুরু করবেন ও টাকার বলে পলিটিক্যাল জগতেও একটা কেষ্টবিষ্টু হয়ে বসবেন। আজকালকার দিনে পলিটিক্সে নামলে ব্যবসারও যেমন সুবিধে, নামখ্যাতিরও হবে ঢের।"

সুজাতা একটু হেসে বল্লে—"তবে আর কি! এখন দু' হাত এক হয়ে গেলেই হয়!"

প্রভা একটু রেগে উঠে বল্লে—"তুমি কি যে বল, সুজাতা-দি'! ঐ বাঁদরমুখো অপদার্থ হতভাগাটাকে বিয়ে করব আমি টাকার লোভে?"

সুজাতা বল্লে—"কেন, ক্ষতিটা কি?"

প্রভা আবার বল্লে—"ওর মধ্যে কি মনুষ্যত্ব আছে? কেবল সাহেবিয়ানায় পূর্ণ। উনি আবার হবেন রাজনৈতিক নেতা! না

আছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, না আছে সৌজন্যবোধ। আমি ওকে স্পষ্ট বলে' দিয়েছি—সরে' পড়, এদিকে তোমার কোনও আশা নেই।"

মঞ্জরী অজয়কে চিন্‌ত না, তার নাম শুনেছিল মাত্র। সে এই কথাগুলি উৎকণ্ঠিত হয়ে শুনতে লাগল এবং দেবলোকের কোন সাক্ষী সেখানে উপস্থিত থাকলে তিনি নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করতে পারতেন যে তার অন্তর্লোকে একটা বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে' গেল।

এইসব কথা যখন হচ্ছিল তখন সিঁড়ির উপর শোনা গেল কতগুলো ভারী ভারী বুটের শব্দ। প্রভা বারান্দায় গিয়ে রাস্তায় তাকিয়ে দেখল সমস্ত বাড়ী ঘেরাও করেছে বন্দুকধারী পুলিশ। একটা মেশিন-গান্‌ও সামনে আছে। ঘরে ফিরে আসতে না আসতে দেখা গেল রিভলভারধারী চার-পাঁচজন সার্জেণ্ট ও দেশীয় পুলিশ কর্ম্মচারী এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। জিজ্ঞাসা করলে—"কার নাম সুজাতা দেবী?"

মেয়েরা সকলেই ভীত আড়ষ্ট হতবুদ্ধি হয়ে উঠে দাঁড়াল। সুজাতা ধীর ও অকম্পিত কণ্ঠে বল্লে—"আমার নাম সুজাতা।"

পুলিশ কর্ম্মচারীদের অগ্রণীটি বল্লে—"আমাদের ওয়ারেণ্ট আছে এই বাড়ী সার্চ করবার।"

সুজাতা বল্লে—"করুন ইচ্ছাসুখে সার্চ।"

অনেকক্ষণ বসে' চল্‌ল এই নিষ্ফল কর্ম্ম। কিছু না পেয়ে পুলিশ বল্লে—"এই আপনার সমস্ত, না অন্য কোথাও কিছু আছে?"

সুজাতা বল্লে—"না, অন্য কোথাও কিছু নেই।"

একটা আনন্দবাজার পত্রিকা পড়েছিল, সেখানায় ছিল কানাইয়ের একটা ছবি। ইন্‌স্পেক্টর্ সে ছবিটা হাতে নিয়ে তাকে বল্লে—"এঁর সঙ্গে আপনার কতদিনের মেলামেশা?"

সুজাতা বল্লে—"একদিন মাত্র দেখা হয়েছিল, কোনদিন কোন মেলামেশা হয় নি।"

পুলিশ কর্ম্মচারীটি বল্লে—"আপনাকে আমরা arrest করছি, আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।"

নবম পরিচ্ছেদ

কানাই জেলে গিয়েছে তিন মাসের জন্য। সুজাতা আটক পড়েছে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য। মঞ্জরী ও সুকুমারের চলেছে অবাধ মেলামেশা। মঞ্জরীর আদর আপ্যায়নের অভাব নেই। সে চায় তার বিজয় সম্পূর্ণ করতে। বিজিত বস্তুটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত হ'লে তাকে সে চায় শিকেয় তুলে রাখতে, তার পর এর চেয়ে সুস্বাদু আহার আর না পাওয়া গেলে যথাকালে একে ভোগ দখল করতে। কিন্তু সুকুমারের মনে সম্পূর্ণ স্বস্তি ছিল না। যখন মঞ্জরী আসত তার সান্নিধ্যে তখন তার তরুণ দেহ হয়ে উঠ্‌ত উত্তেজিত। সে সেই মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় ভুলে যেত সমস্ত ভিতরের দ্বন্দ্বের কথা। উজ্জ্বল লাবণ্য ও চটুল ভঙ্গীতে, আদর সোহাগের ইঙ্গিতে মঞ্জরী ভাসিয়ে তুলত সুকুমারের যৌবনকে। কিন্তু যখনই সুকুমার থাকত একলা তখনই সে অনুভব করত একটা দরিদ্রতা। সুখোপনত সহজলভ্য মঞ্জরীকে হাতের কাছে পেয়ে তার মন ইতস্ততঃ করত সম্পূর্ণ মন নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে। কি যেন একটা তুষার স্পর্শ অনুভব করত সে তার হৃদয়ের মধ্যে যাতে তার উদ্দাম আবেশ হত রশ্মিসংযত। অন্তস্তুষার কুন্দফুলের চারিপাশে লুব্ধ ভ্রমর প্রভাতে এসে বারংবার ডানা নেড়ে বস্‌তে চায় কিন্তু তাকে যেমন ছেড়ে যেতে পারে না তেমনি ভোগ করার জন্য কাছে এগিয়েও যেতে পারে

না। সে একান্তে গভীর রাত্রে অনেক সময়ে তার হৃদয়ের মধ্যে একটা হাহাকার অনুভব করত। সে হাহাকারের স্বরূপ সে বুঝতে পারে নি। একটা অভিযোগ ঘন মেঘের ন্যায় তার চিত্তকে মসীলিপ্ত করে' দিত। কিন্তু যখনই চিন্তা করত তখনই দেখত এ অভিযোগের কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। সে যেভাবে চেয়েছিল সুজাতাকে, সুজাতা কখনও সেভাবে তাকে প্রশ্রয় দেয় নি। তার বাল্যগত সংস্কার তাকে নিরন্তর নিবিড় করে' তুলত সুজাতার ছায়াশ্রয়ের জন্য। কিন্তু যখনই সে সুজাতার কাছে এই বিষয়ের কোন ইঙ্গিত করেছে তখনই সুজাতা গেছে এড়িয়ে। হয় ত কাছাকাছি আরও অনেক থাকলে ঘট্‌তে পারত এমন অনেক সুযোগ যাতে সুজাতাকে আরও কাছাকাছি পাওয়া যেত। সুজাতার যখন বিপদের সময় তখন সুকুমার বাইরের লোকের মত দিয়ে এল তাকে কতগুলো অপ্রীতিকর উপদেশ। সেই উপদেশের কর্কশতা স্মরণ করে' সে পীড়া অনুভব করত। কিন্তু কানাই লোকটা কে? এর ত কোনদিন খোঁজ পাওয়া যায় নি। মঞ্জরী ত সুজাতার এত বড় বন্ধু কিন্তু সে ত কোন দিন কানাইয়ের কথা কিছু বলে নি। পুলিশ যখন উদ্যত হ'ল সুজাতাকে মারতে তখন তারই ত উচিত ছিল লাফিয়ে পড়া। আবার ভাবলে, সে ত ছিল খানিকটা পিছনে', হঠাৎ লাফিয়ে পড়া চলত না। কিন্তু সে তার মনকে জিজ্ঞাসা করলে—সেদিন সামনে থাকলেও সে কি লাফিয়ে পড়তে পারত? দ্বিধা করল তার মন জবাব করতে। কিন্তু পূর্ব্বে ত এমন দিন গিয়েছে যে সময় সে অনায়াসে সুজাতার জন্য লাফিয়ে পড়তে পারত যে কোনও বিপদের মধ্যে। তবে কি তার মন শিথিল হয়ে এসেছিল সুজাতার প্রতি? সে কথাও ত তার মন স্পষ্ট করে' স্বীকার করতে পারে না। পদ্মানদী যখন পাড় ভাঙ্গে তখন সে জলবেগ ঢোকে সেই পাড়ের নিম্নতম বালুর

স্তর দিয়ে, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে যায় বালু ধুতে ধুতে ; ক্রমশঃ অন্তর্দেশ দিয়ে ঢোকে জল, প্রবেশ করে গিয়ে গ্রামের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত, বাইরে থেকে পাওয়া যায় না কোনও চিহ্ন। পাড়ের উপর খেলা করে ছেলে-মেয়েরা, চাষারা যায় তার উপর দিয়ে নিরুদ্বেগে, গৃহস্থ বধূ দেয় তুলসী মঞ্চে তার প্রদীপ, সন্ধ্যায় কেরোসিন-কূপীর চারিদিকে বসে' যায় গ্রাম্য বধূদের বৈঠক, চলে রামায়ণ পাঠ—সীতার বিবাহ। হঠাৎ দেখা দেয় গ্রামের মাঝখানে একটা ফাটল। তখন গ্রামবাসী বুঝতে পারে আর ভাঙ্গনের দেরী নেই। অতি দ্রুত গতিতে তারা সরে' যায় গ্রামান্তরে, আর কোনও নিশীথ রাত্রিতে নিস্তব্ধ গ্রামের বুকখানি বজ্রনির্ঘোষে পদ্মা করে গ্রাস। স্নকুমারের হৃদয়ের বালু কোন্ স্রোতে যে ধুয়ে যাচ্ছিল তা সে নিজেই টের পায় নি। কিন্তু মঞ্জরীকে কি সে ভালবাসে না? মঞ্জরীর আকর্ষণ, মঞ্জরীর লাস্যলীলাযুক্ত গতিভঙ্গী, তার উদ্দাম রূপ, তার অযত্নকৃত খরস্পর্শ তার হৃদয়কে কি তরঙ্গিত করে' তোলে নি? আবার সে শক্ত হয়ে নিজের মনকে দিত বাধা। মঞ্জরীকে ভাল লাগে বৈ কি। কিন্তু এ হ'ল অন্য কথা। নৃত্যগীতের কলোৎসবে আমাদের চিত্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে বলে' সে কি স্নিগ্ধ-ভাবে মন্দিরের মঙ্গলারতির সামনে স্থির হয়ে বসতে পারে না? কিন্তু স্নজাতা ত তাকে ভালবাসে না। আবার মন বল্‌লে—ভালবাসে না বল কি করে, তার কি তুমি ছাড়া দ্বিতীয় গতি ছিল? কোরক যখন ফোটে না তখন সে কি পরাগধূসর হয়ে ভ্রমরকে করতে পারে আমন্ত্রণ? ভ্রমর আসে যায়, অপেক্ষা করে কখন কোরকের হৃদয় হবে বিকসিত। সেটিই হল আসল লগ্ন। তখন ছিল তার শিশুভাব, তার মাতৃভাব। কৃত্তিকারই স্নেহক্ষীরের ন্যায় সে ঢেলেছে কত না স্নিগ্ধ ভালবাসার ধার! তার বলিষ্ঠ সেনানীতুল্য স্নকুমারদা'র প্রতি এই কৃত্তিকার উদয় দেখে'

সুকুমারের কি অনুমান করা উচিত ছিল না যে রোহিণীর উদয় হয়েছে আসন্ন? ভেসে উঠ্‌ল আবার তার হৃদয়ের মধ্যে মঞ্জরীর রূপ। সে কি আকর্ষণ, সে কি দহন দাহ্ তোলে রক্তের স্রোতের মধ্যে! আগুনের মত প্রজ্জ্বলিত করে যৌবনের ক্ষুধা! আর সুজাতা! সে ত আগুন নয়, সে ত দহন-জ্বালা তোলে না ধমণীর রক্তের মধ্যে, সে ত পুড়িয়ে দেয় না হৃদয়কে—তবু সে থাকে যে দীপ্যমান হয়ে হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্যোতিতে! সে জ্যোতি দুর্দ্দাম অগ্নিজ্বালার ন্যায় হঠাৎ জ্বলে' ওঠে না, হঠাৎ নেভবারও কোনও সম্ভাবনা নেই। সে থাকে স্থির, দৃঢ়, অচঞ্চল, তেজস্বী। সে তার স্থির দ্যুতিতে, স্নিগ্ধ জ্যোতিতে, হরণ করে অন্ধকার তার স্বপ্রকাশের মহিমায়, দগ্ধ করার জন্য নয়। কোন্ ছলে যে তার আত্মভোলা মন অসহিষ্ণু হয়ে এল, দূরে সরে' এল এই মহৎ হৃদয়ের কাছ থেকে, তার কারণ সে অনুভব করতে পারলে না। অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছিল তার হৃদয়ের মধ্যে মঞ্জরীর আকর্ষণ। অন্ধকার রাত্রিতে অন্ধ করে' দেয় যখন চক্ষু অতি তীক্ষ্ণ তীব্র বৈদ্যুতিক রশ্মিতে, তখন মানুষ হয় দিকভ্রান্ত, স্তম্ভিত; তার চেতনা হয় জড়, কর্ম্মশক্তি হয় খর্ব্ব। আবার তার মনে হ'ল, ভালবাসার কথা ছেড়ে দিলেও সে যে ছিল সুজাতার অভিভাবক। আজ কি বলে' তার লাঞ্ছনার দিনে সে রইল গা ঢাকা দিয়ে? তার সুপ্ত চেতনা জাগ্রত হয়ে তাকে বল্‌লে—তুমি ত একটা কাপুরুষ। পুলিশের ভয়ে, ঝঞ্ঝাটের ভয়ে তুমি এগোওনি তার কাছে। আর কেমন অনায়াসে এই অপরিচিতার জন্য আত্ম-বলিদান করলে কানাই, ভাব্‌লে না এক মুহূর্ত্ত তার বিপদের কথা! আর কি বীর এই কানাই—একলা কর্‌লে আটজনকে ভূমিশায়ী! কিন্তু কে বল্‌বে কানাই সুজাতার একান্ত অপরিচিত? সেদিন যে

কথার ইঙ্গিতটুকু শুনেছিল, কানাইয়ের কথা শুনে উদ্ভিন্ন-স্বেদ-বিন্দু সুজাতার পাণ্ডুর মুখখানি কেমন কমনীয় হয়ে উঠেছিল, কে জানে তার পিছনে রয়েছে কি রহস্য জড়িত! আবার ভাবলে, হ'তই যদি কানাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাকে জয় করে' সুজাতাকে অর্জ্জন করার অধিকার ত ছিল তারই। কানাই ত গিয়েছিল জেলে, এই সুযোগে সে ত আবার চেষ্টা করতে পারত তার রাজ্য পাততে। না-না, সে কিছুতেই হ'ত না, জেলে গিয়েই ত সে দিয়েছে টেক্কা। তার জন্য জেলে গিয়েছে বলেই ত কানাইয়ের মূর্ত্তি দীপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে সুজাতার হৃদয়ের মধ্যে। এমনি করে' সুকুমার হৃদয়ের মধ্যে যতই এ বিষয়ের আলোচনা করত ততই একটা তীব্র বেদনার ছায়া রেখে দিত তার অভিসম্পাত তার হৃদয়ের মধ্যে।

কোনও এক শরতের অপরাহ্নে যখন সূর্য্য দিনব্যাপী দুঃসহ ঘর্ম্ম বিতরণের পর ঘনপল্লবপুঞ্জের অন্তরালে আম্রবীথিকার যবনিকার পশ্চাতে পশ্চিমের প্রান্তে দিনান্তে অবতরণ করে' যাচ্ছিল তখন প্রভা উপস্থিত হ'ল সুকুমারের বাসায়। পুলিশে ধরে' নিয়ে যাওয়ার পূর্ব্বে সুজাতা মঞ্জরী ও নিস্তারিণী দেবীর অসাক্ষাতে প্রভাকে একবার বলেছিল সুকুমারের খোঁজ নিতে। অনেক দিন সুকুমার আসে নি, সেজন্য সুজাতার মন কেমন যেন একটা গুপ্ত ব্যথায় টন্ টন্ করছিল, অথচ সে একটি কথাও মঞ্জরীকে বলে নি। প্রভার সঙ্গে সুজাতার পূর্ব্বে যে পরিচয় ছিল সেটা মাঝারি রকমের। সে ছিল day scholar, তাই কলেজে মাঝে মাঝে দেখা হ'ত। সেই চায়ের দিনের পর থেকে প্রভা প্রত্যহই প্রায় সুজাতার কাছে আসে। সে যে দুঃসাহসিকভাবে বক্তৃতা করেছে এবং মেয়েদের নেতৃত্ব করেছে এতে বন্ধুর গৌরবে প্রভা গর্ব্বিত হয়ে উঠেছে। কেউ নিজে যা না করতে

পারে অথচ করবার উৎসাহ থাকে সেইটি যদি অপরে করে' তোলে তবে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার মধ্যে সে যেন নিজের অস্ফুট ছবি প্রতিবিম্বিত দেখ্‌তে পায়। অনেক সন্ধ্যায়, অনেক প্রভাতে, অনেক মধ্যরাত্রে প্রকৃতি আমাদের হৃদয়ের দ্বারে নানা প্রকার ভাবের অনুপ্রেরণা ধ্বনিত করে' তোলে—কিন্তু তা প্রকাশযোগ্য নয়, অনুভবের মধ্যেই তা বিলীন। কিন্তু সেই রকমের অনুভব যদি আমরা দেখ্‌তে পাই ভাষায় ছন্দে মূর্ত্তিমান হয়ে উঠেছে কবির কাব্যে, তবে সে কবিতা আমাদের বড় ভাল লাগে এবং নিষ্কারণে আমরা সেই কবিকে ভালবাসি। এই জন্য কবিরা যত আমাদের হৃদয় অধিকার করতে পারে এমন আর কেউ নয়। গভীর গবেষণার শক্তিতে, গভীর বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে আমরা বিস্মিত হই, আমরা অনুভব করি সেই বুদ্ধির মহত্ত্ব, কিন্তু তাকে তেমন করে' আপনার বলে' মনে করতে পারি না যেমন আপনার বলে' মনে করতে পারি সেই কবিকে যে আমাদের হৃদয়ের একটি ছবিকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে তার ভাষার মধ্যে। হঠাৎ প্রভা আবিষ্কার করেছিল যে তার মনেও সে যেমন একটা আবেগ অনুভব করে, তেমনি একটা অনুভব দেখা দিয়েছে সুজাতার মনে এবং সে তাকে দিয়েছে একটা বিস্ময়কর ও উত্তেজক রূপ। এই আবেগ যখন কারও মনে স্ফুট হয়ে উঠে অভিসন্ধিরূপে প্রকাশ পায় এবং এই অভিসন্ধি অনুসারে যখন কেউ আপনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে অসমর্থ হয়ে নিজের ন্যূনতা বোধ করে, তখন সেই বিষয়ে যে সক্ষম হয়েছে সেই ব্যক্তির উপর তার মনে হ'তে পারে ঈর্ষ্যা। কোনও একটা বহির্বস্তুকে যখন আমরা আঁকড়ে ধরতে চাই অথচ পারি না, মনের দখলিস্বত্ব তার উপর বিস্তার করি কিন্তু সত্যভাবে তার নাগাল পাই না, তখন সেই রকম

ভাবে যে তাকে পেয়েছে তার উপর হয় আমাদের ঈর্ষ্যা। তাই দু'জন উদীয়মান কবি বা উদীয়মান রাজনৈতিক বা দু'জন সমব্যবসায়ীর মনে আস্‌তে পারে ঈর্ষ্যা, কিন্তু যখন একটা ভাব একজনের মনের মধ্যে শুধুই একটা উত্তেজক কল্পনাবিলাস অথচ অস্ফুট এবং সে চায় তাকে স্ফুটভাবে উপলব্ধি করতে কিন্তু প্রতিহত হয়ে আসে তার মন অস্ফুটতার অন্ধকারে, তখনই সেই অস্ফুটলোকের মূর্ত্তিকে যে তোলে স্ফুট করে' তার জ্যোতিঃরেখায়, তাকে সে বন্ধুভাবে বরণ করে। এমনি করে' দুটি হৃদয় পরস্পর সম্মুখীন হয়ে আস্‌ছিল। কিন্তু প্রভার দিকের গতিবেগ ক্রমশঃ বেড়ে উঠ্‌ল। সে একদিকে অভিভূত হ'ল সুজাতার নারীপ্রকৃতিব কমনীয়তায়, সমস্ত মেয়েদের কথা স্মবণ করে' তার সহজ এবং অকৃত্রিম আর্ত্তিতে; অপর দিকে সে তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করল এমন একটা স্বচ্ছতা যার মধ্যে লেশমাত্র নেই দম্ভ, লেশমাত্র নেই অভিমান। নেতৃত্ব যখন ক্রমে পৌছল তার হাতে, সে পূর্ণপাত্রের প্রতি তার বিন্দুমাত্র ছিল না লোভ। নেতৃত্বের প্রস্তাবে সে আপনাকে অসহায় মনে করতে লাগল। আর আত্মপ্রকাশের পথে ঐটিই হ'ল তার প্রধান বিপদ ও তার গতির প্রধান পরিপন্থী। এর সঙ্গে সে অনুভব করলে সুজাতার হৃদয়ের সর্ব্বতঃ প্রসারী স্বচ্ছন্দ বিলাসী প্রেমের স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতার আকর্ষণ। সে মুহূর্ত্তে হয়ে গেল তার পরম আত্মীয়। যেমন প্রদীপের তেলের সঙ্গে সল্‌তেব থাকে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক যার ফলে সে সল্‌তেকে দেয় পূর্ণ করে' তার প্রতি রন্ধ্রে, এবং একটা আকস্মিক অগ্নিকণাকে উপলক্ষ্য করে' একটি স্নিগ্ধ দীপশিখা জ্বলে' ওঠে কুটিরের প্রশান্ত বাতাসে, তেমনি যেন এই দুটি হৃদয় তাদের আকস্মিক মিলনে মিলিত হ'ল। একটি হৃদয়ের স্নেহ অপরটিকে পূর্ণ করে' তুল্‌ল রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ভেদ রইল না তখন

সল্‌তেয় আর তেলে, ভেদ রইল না দুটি হৃদয়ে। তারা মিলিত হয়ে জ্বালাল একটি স্নেহের দীপ যার শিখার মধ্যে একে অপরকে পেল পরম আত্মীয় করে'।

সুজাতা যে কেন সুকুমারের কথা মঞ্জরীকে জিজ্ঞাসা করলে না, কেন যে তারই হাতে ভার দিলে না সুকুমারের দেখাশুনা করবার, তার জবাব হয়ত সুজাতা নিজেও দিতে পারত না। মূষিক যে কেন বিড়ালকে দেখে' গর্ত্তের মধ্যে পালায় অথচ প্রকাণ্ড একটা মানুষের কাছে লাফ দিয়ে যায়, তা মূষিক-মনের অগম্য। যিনি অন্তর্য্যামী, যিনি জানেন হৃদয়ের প্রতি গোপন পর্দ্দায় অজ্ঞাতকে লক্ষ্য করে' অস্ফুট নীহারিকার মেঘের ন্যায় অস্ফুট ভয়, আশঙ্কা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতির লহর খেলে' যায় এবং সঙ্গে করে' নিয়ে আসে একটা আদিম প্রত্যয় বন্ধুতার বা শত্রুতার, তিনিই বলতে পারতেন কেন সুজাতা মঞ্জরীকে ফেলে' প্রভাব হাতে ভার দিলে সুকুমারকে দেখাশুনা করবার।

চাকর এসে খবর দিল, "একঠো বিবি আয়ী হৈ।" সুকুমার কিছুতেই মনে ধারণা করতে পারল না যে বিবিটি কে, কারণ একমাত্র মঞ্জরী এখানে আস্‌ত। কিন্তু সে আস্‌ত বিনা সংবাদে, বিনা এত্তেলায়। হয়ত এমন দিনও ঘটেছে যে সুকুমার নিশ্চিন্ত মনে পড়ছে, মঞ্জরী এসে পিছন থেকে ধরেছে তার চোখ টিপে। অবশ্য আবিষ্কার করতে সুকুমারের দেরী হ'ত না কারণ এই একটি মাত্র বান্ধবীরই এখানে হ'ত গতায়াত, তবু সে চাকরকে জিজ্ঞাসা করল, "ও যো বিবি আতী হায়, ওহি বিবি।"

ভৃত্য বল্‌ল, "নেহী হুজুর, দুস্‌রী।"

"হল্‌-কামরামে বৈঠাও।"

নিজে তাড়াতাড়ি উঠে গেঞ্জীর উপর একটা পাঞ্জাবী চড়িয়ে

আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। বিবির আগমন সংবাদে মনটা একটু সচকিত হয়েছিল সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে, চুলটি নিলে একটু তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে। সে প্রবেশ করতেই প্রভা উঠে দাঁড়িয়ে দুটি হাত একত্র করে' কপালের কাছে নিয়ে ছোট্ট একটি নমস্কার করে' বল্‌লে, "আপনারই নাম সুকুমার বাবু?"

সুকুমার বল্‌লে, "বসুন; হ্যাঁ, আমারই নাম সুকুমার।"

মেয়েটি ঈষৎ হেসে বল্‌লে, "আমার নাম প্রভা।"

সুকুমার বল্‌লে, "হ্যাঁ, আপনাকে আমি চিনি। একদিন আপনাকে দেখেছিলুম, সুজাতার ওখানে। আপনি কানাই বাবুর একখানা চিঠি নিয়ে এসেছিলেন।"

প্রভা বল্‌লে, "হ্যাঁ, আমি সুজাতার বন্ধু। তাই আপনার সাথে পরিচয় না থাক্‌লেও পরিচয়ের সেতু আছে।"

সুকুমার একটু বিষণ্ণভাবে বল্‌লে, "কিন্তু সেতুটি ত অদৃশ্য হয়েছে।"

প্রভা বল্‌লে, "পৃথিবীতে যত বড় আকর্ষণ আছে সমস্তই প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু অদৃশ্য বলে' তার প্রভাব কম নয়; তার প্রমাণ দেখুন এইখানে যে আপনি আপনার গৃহে নিশ্চিন্তে করছিলেন বিশ্রাম, আমি তপ্ত রৌদ্রে বহু দূর থেকে খুঁজে খুঁজে আপনার বিশ্রাম ভঙ্গ করে' আপনার উপদ্রব ঘটালুম। তার কারণ শুধু এই, যে পরিচয়, যে বন্ধুতা সুজাতা এবং আমাকে মিলিত করেছে সে সমাপ্ত হ'তে চাইল না আমার মধ্যে, সে তার পূর্ণতা পেতে চায় আপনার মধ্য দিয়ে সুজাতায় ফিরে গিয়ে।"

সুকুমার একটু লজ্জিত বোধ করে' বল্‌লে—"এ আপনি কি বলছেন! সুজাতাকে আমি কত ভালবাসি তা হয়ত আপনি জানেন না। সুজাতা কি আমার কথা আপনাকে বলেছিল কখনও?"

প্রভা বল্‌লে—"পুলিশ যখন তাকে গ্রেপ্তার করে' নিয়ে গেল, তখন সে একটিবার নিজের কথা ভাবে নি বা কারুর কথা ভাবে নি। তার মনে হয়েছিল শুধু আপনার কথা এবং আমাকেই সে বলেছিল আপনার দেখাশুনা কর্‌তে। আমাকে আপনি জানবেন তারই প্রতিনিধি। আপনি আমাকে স্নেহ করেন না করেন তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমার মধ্যে রয়েছে যে সুজাতা সে আপনাকে চাইবে সর্ব্বদা সুখী কর্‌তে। তবে আমি মেয়ে, সর্ব্বদা যদি আসতে না পারি, আপনি যাবেন আমাদের ওখানে যখন আপনার অবসর হয়। সেখানে আমার মা আছেন, ভাই আছে।"

সুজাতা যে কোতোয়ালের দ্বারা ধৃত হওয়ার সময়েও তারই কথা চিন্তা করে' একটা দারুণ বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অথচ সর্ব্বক্ষণ সে ছিল একেবারে নিশ্চেষ্ট, তার নিজের এই দুর্ব্যবহারে সে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করল। সে কিছুতেই স্থির কর্‌তে পারল না যে সে কি রকমে সহজভাবে প্রভার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুল্‌বে। এই প্রভা তার একান্ত অপরিচিতা অথচ একমাত্র সুজাতাকে সুখী করবার জন্য সে অসঙ্কোচে এসেছে একজন অপরিচিত পুরুষের কাছে। সুজাতা কি তার ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে তার অসঙ্কোচটুকুও তার বন্ধুর মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছে! তিনটি মেয়ের ছবি এক নিমেষে ভেসে উঠ্‌ল সুকুমারের মনে—সুজাতা, এই প্রভা আর মঞ্জরী। প্রভার মুখখানি কি স্নিগ্ধ, কি সারল্যে মণ্ডিত, কি সহজ ও স্বচ্ছ! সুজাতার কথা ভেবে কাজ নেই, সে আছে তার আপন কক্ষা জুড়ে, ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় তার জ্যোতি ম্লান অথচ স্থির। কিন্তু মঞ্জরী? সে ত একলা নয়। সে একলাই যে এক লক্ষ। সে ত একটি গ্রহ বা তারার ন্যায় শুধু দীপ্তিতে ঝল্‌মল্‌ করে না, তার গায়ে যে জড়ানো

আছে নীহারিকার ওড়্না। সে নীহারিকার স্রোতে, বিলাসবিভঙ্গে, ফেনপুঞ্জের চটুলতায় মনকে সে যে নেয় ভাসিয়ে, পায়ের তলা থেকে মাটি যায় সরে'; শরীর ছুটতে থাকে শূন্যের মধ্য দিয়ে, শুধু টের পাওয়া যায় একটা আবেগের ঘূর্ণীর—এই ঘূর্ণীর মধ্যে যখন পড়া যায়, তখন কূলে ফিরবার ইচ্ছা থাক্‌লেও, থাকে না সামর্থ্য, বীর্য্য যায় বিলুপ্ত হ'য়ে; তবু ভাল লাগে এই ঘূর্ণীতে ঘুরপাক খেতে খেতে তলহীন সাগরের বক্ষে ছুটে যেতে। প্রভার ব্যাপ্তি নেই সুজাতার মত, তবু সুজাতার যেমন একটা দূরের গভীরতা নিরন্তর পৃথক করে' রাখত সুকুমারকে তার অতিসন্নিধি থেকে, প্রভার মধ্যে তা নেই। প্রভার মধ্যে আছে একটি সহজ নৈকট্য, তার মধ্যে যেন কোনও হেঁয়ালি নেই, শুধু একটি স্বচ্ছ দীপশিখা। সে দীপশিখা বরণডালার দীপ, তা হল্‌-ঘর আলোকিত করবার বিপুল আলো নয়। তাকে কপালের কাছে আন্‌লে তার মৃদু উত্তাপটুকু সহ্য করা যায়, কারণ তার আলোও যেমন মৃদু, তার দাহিকা শক্তিও তেমনই অল্প।

প্রভা আবার জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি এমন থম্‌কে গেলেন কেন? আমার ত মনে হয় না সুজাতাকে তারা ক্লেশ দিতে পারবে। ও রকম মেয়ে যেখানে যাবে সেখানেই সে দখল করে' নেবে নির্বাধায় তার মহত্ত্বের আসন। তার ঘাড়ে ওরা যতই অপরাধের বোঝা চাপাক্ না কেন, সে তথাপি যাবে সকলের মাথার উপর দিয়ে, ছাড়বে না তার উপস্থিতিতে সকলকে আনন্দ দিতে, প্রভাবিত করতে সকলকে আপন পবিত্রতার দ্বারা। কলঙ্কী বলে' চাঁদের অপবাদ আছে, তবু সে কি সকলের মাথার উপর দিয়ে সর্ব্বদা ভ্রমণ করে না, হরচূড়ামণিতে কি তার আসন নেই? সুজাতা হ'ল সেই মেয়ে, যাকে অস্বীকার করলেও অস্বীকার করা যায় না। ওর জন্য কিছু দুঃখ করবেন না আপনি।"

স্কুমার বল্‌লে—"আমি ত তার জন্য কিছুই করতে পারলুম না। আমার অর্থ আছে, শরীরে বল আছে, সাহসও আছে, কিন্তু তথাপি আমার সমস্ত আন্তর ধাতুর মধ্যে কিসের যেন একটা শৈথিল্য এসেছে যাতে আমার বুদ্ধিকে করেছে জড়, আমার শক্তিকে নিয়ে গেছে আমার নাগালের বাইরে, আমার সাহসকে করেছে পঙ্গু। সেই যে মানুষের একটি সহজ সরল রূপ আছে, যার দ্বারা মুহূর্ত্তের ইচ্ছা-শক্তির মধ্যে সে নিয়ে আসতে পাবে তার সমস্ত চরিত্রের বল, তার বুদ্ধির দীপ্তি, প্রকাশ করতে পাবে আপনাকে একটা গোটা মানুষ-রূপে, দেহ ও মনে অনুভব করতে পাবে একত্ব, আমার সেই স্বরূপটিকে যেন আমি ফেলেছি হারিয়ে। অথচ আমার মনে পড়ে আমি ত এ বকম . লুম না।"

প্রভা জবাব করলে—"হয়ত স্বজাতা-দি'র এ রকম আকস্মিক ব্যাপাবে আপনার মনটা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। এখন আপনার দেহটা না ভেঙ্গে পড়ে সেটা দেখতে হয়। আপনার খাওয়া-দাওয়া দেখে কে?"

স্কুমার হো হো করে' হেসে বল্‌লে—"আমাব আবার খাওয়া-দাওয়া দেখবে কে? চাকর বামুনে দেখে, আমি নিজে দেখি। আমার কোন অজীর্ণ নেই, কোন অম্ল নেই, কোন ব্যাধির উপসর্গমাত্র নেই। আমার এই দেহখানা দেখলে ব্যাধি ত ব্যাধি, যমের দূতেরাও ভয় পেয়ে পালায়। তা ছাড়া চিরকাল ত আমার এ রকম চল্‌ছে। মা মারা গেছেন বাল্যকালে, ভগ্নীটগ্নীও নেই। ব্যাচিলার মানুষ। আমার আবার দেখাশুনা করবে কে?"

প্রভা একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে—"তা এত বয়স পর্য্যন্ত ব্যাচিলারই বা রইলেন কেন? বাঙ্গালীর ঘরে এমনটি ত বড় হয় না।

মনের মতন দেখে' শুনে কোথাও একটি বিয়ে করে' ফেল্‌লেই ত পারেন।"

সুকুমার হেসে বল্লে—"আপনি ত বল্লেন বিয়ে করে' ফেল্‌লেই হয়, এমন হতভাগাকে বিয়ে করে কে?"

প্রভা হেসে বল্লে—"পাত্রীর অভাব? তা আপনি আমাকে ঘটকালীর ভার দিন, আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনার পাত্রী যোগাড় করে' দেব।"

"আপনি ত বললেন পাত্রী যোগাড় করে' দেবেন, কিন্তু পাত্রী যদি আমাকে দেখে' শুভদৃষ্টির সময়ে চোখ খুল্‌তে অস্বীকার করে বা আমারই মুখখানা যায় পাত্রীকে দেখে' বেঁকে?"

প্রভা হেসে বল্‌লে—"তা হলেই ত' হয়েছে দেখছি মুস্কিল।' আপনি কি চান—বাণাহত হতে না বাণবিদ্ধ করতে?"

সুকুমার বল্লে—"শর-ব্যবসায়ে আমার কোনও নৈপুণ্য নেই, তবে কোথাও বিদ্ধ হ'লে অবশ্য নিরুপায়। সেইজন্যই আমি যথাসম্ভব চলি নারী-কটাক্ষকে এড়িয়ে।"

প্রভা বল্লে—"আপনি এড়ালেও কটাক্ষ ত আপনাকে এড়াতে না পারে। একচক্ষু হরিণ থাকৃত ডাঙ্গার দিকে তাকিয়ে, শরাঘাত হ'ল অকস্মাৎ নদীর মধ্য থেকে।"

সুকুমার বল্লে—"তা যদি ঘটে কোনদিন, তা হ'লে মনে করব—'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর, সবে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর'। কিন্তু সে রকম কেউ যদি ঘরে আসেন ত তিনি যে আমাকেই যত্ন করবেন তার প্রমাণ কি? তিনি হয়ত আশা করে' থাকবেন, আমিই করব তাঁর সেবা। আমাকেই হয়ত তিনি মনে করবেন তাঁর জীবনের

প্রধান উপকরণ, এখন যেটুকু প্রভুত্ব আছে আমার নিজের উপর, সেটুকু পরিণত হবে দাসত্বে।”

“আপনি কি জানেন না মেয়েরা দাসী হয়েই আসে পুরুষের ঘরে, স্বামীর সেবা করতে?”

“সে দাসীত্ব অনেক সময়ে হয় খেতাবী দাসীত্ব। অনেক সময়ে সত্যের লেশমাত্রও সেখানে পাওয়া যায় না, যেমন লাট সাহেব চিঠি লেখেন—‘Your most obedient servant’, অথচ সেই most obedient servant-এর অনুচরদের রুলের গুঁতোয় প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।”

প্রভা আবার হেসে বল্লে—“বেশ ত, থাকুন আপনি ব্যাচিলারদের মহাস্বর্গে। নারদমুনি যাতায়াত করবার সময় মধ্যে মধ্যে হরিগুণগান করে’ যাবেন আপনার কাছে। আপনি সুজাতা-দি’র বন্ধু মঞ্জরীকে চেনেন?”

সুকুমার একটু থতমত খেয়ে বল্লে—“হ্যাঁ, চিনি বৈকি? কতবার দেখেছি তাকে সুজাতার সঙ্গে।”

“তার সঙ্গে এখন আর আপনার দেখাশোনা হয় না? তার ত উচিত আপনার একটু দেখাশুনা করা।”

সুকুমার এ কথার জবাব না দিয়ে বল্লে—“আপনি ত রোদে খুব কষ্ট পেয়েছেন, আপনার মুখখানি হয়েছে স্থলপদ্মের মত!”

প্রভা একটু যেন লজ্জা পেয়ে বল্লে—“দেখুন আপনি ও রকম করে’ কথা বলবেন না। আমরা মেমসাহেব নই যে আমাদের কমনীয়তার প্রশংসা করা একটা কর্ত্তব্য কাজ আপনাদের পক্ষে। আর ক্লান্ত ত হয়েছিলুম তখন যখন এসে উঠলুম আপনার বাড়ীতে, এখন ত অনেকক্ষণ পাখার হাওয়ায় ঠাণ্ডা করে’ নিয়েছি শরীরটাকে।”

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, কানাইবাবু কে বলুন ত।"

প্রভা বল্লে—"সে এক আশ্চর্য্য রকমের মানুষ। তার বড় পরিচয়টা আপনারা খবরের কাগজে পড়েছেন, আর পুলিশের সঙ্গে সুজাতা-দি'র সংঘর্ষের দিন চোখেও প্রত্যক্ষ করেছেন। তার ছোট পরিচয়—সে আমার ছোট ভাই রঞ্জনের বন্ধু। আমার ছোট ভাই রঞ্জনকে আপনি দেখেন নি, তার কাছে ছোটবড়র বিচার নেই, সে হয় ত আপনাকে দেখলেও 'Hallo সুকুমার-দা' বলে' hand-shake করে' বসত।"

সুকুমার বল্লে—"সুজাতার সঙ্গে কানাইবাবুর পরিচয় হ'ল কি করে'?"

প্রভা বল্লে—"সে একটি মজার ব্যাপার। আমার জন্মদিনে নেমন্তন্ন করলাম সুজাতাকে। রঞ্জন নেমন্তন্ন করেছিল কানাইবাবুকে। চায়ের টেবিলে বসে' কানাইবাবু তার মতামত ব্যাখ্যা করেছিলেন। সুজাতা-দি' খুব impressed হয়েছিলেন তাঁর কথায়।"

"তারপর? পরে আরও বোধ হয় অনেকবার দেখাশোনা হয়েছে?"

প্রভা বল্লে—"না, আর একবারও দেখা হয় নি।"

সুকুমার বল্লে—"আর একবারও দেখা হয় নি?"

"আমি যতদূর জানি আর একবারও দেখা হয় নি। আর তিনি এখানে ত ছিলেন না, তিনি ঘুরছিলেন মফঃস্বলে।"

সুকুমার কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে রইল। সে যেন হেঁয়ালিটির কোনও অর্থ বুঝতে পারল না। তবে কি সুজাতার মন এখনও কোথাও পড়ে নি? কিন্তু তথাপি সেদিকে আশান্বিত হয়ে থাকতে তার মন হ'ল দ্বিধাগ্রস্ত। সে অনুভব করল কিসের যেন বান ডেকে উঠেছে তার ধমনীর রক্ততরঙ্গে, কিন্তু সেটা একান্ত বিপরীত দিকে।

মঞ্জরীর সঙ্গে সুকুমার পেত না বিশ্রাম। সেখানে চলত নিরন্তর

যেন একটা উৎসবের ধারাবর্ষণ। তাই সুকুমারের মন অনেক সময় খুঁজত বিশ্রামের স্বচ্ছতা ও অনায়াস আনন্দ। আজ প্রভার সঙ্গ পেয়ে তার মনে হ'ল যে প্রভা এমন একটি মেয়ে যার কাছে থাকলে চিত্ত উত্তেজনায় কণ্টকিত হয় না, পায় বিশ্রাম। প্রভার মধ্যে বুদ্ধির সে তীক্ষ্ণতা নেই যার জন্য মনকে সর্ব্বদা থাকতে হবে সজাগ হ'য়ে, বর্ম্ম এঁটে, যে রকমটা ঘটত সুজাতার সান্নিধ্যে। প্রভার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ নেই, পত্রদলের নানা আবরণের মধ্য থেকে সে কদাচিৎ তাকে ব্যক্ত করে না, উগ্র গন্ধে সকলকে আকৃষ্ট করে'ও দুর্গম কণ্টকাবরণের মধ্যে থেকে সে করে না আত্মরক্ষা। তার সম্পদও কম, সামর্থ্যও কম, কিন্তু তার যেটুকু আছে তা ব্যক্ত হয় অবিলম্বে। তার মধ্যে কি স্বাভাবিক, কি কৃত্রিম, কোনও রকমের দুর্গমতা নেই। সে পদ্মও নয়, কেতকীও নয়, সে শিথিলবৃন্ত শেফালি। তাই প্রভাকে সুকুমারের বড় ভাল লাগল। তার ক্লান্ত মনের পক্ষে প্রভা এল যেন নবনীত-প্রলেপ। সে প্রভাকে বল্লে—"এখনই ত সন্ধ্যা হয়ে এল, আপনার বাড়ী কত দূরে ?"

প্রভা ঈষৎ চিন্তিতভাবে বল্লে—"বাড়ী ত সেই বালিগঞ্জের এক কোণে, সে এখান থেকে ত বেশ খানিকটা দূর হবে। মনে করেছিলাম সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরতে পারব।"

সুকুমার বল্লে—"আমার ঐদিকে একটু কাজ আছে। চলুন, আপনাকে আমি নিজেই রেখে আসি। অমনি আপনার বাড়ীটাও দেখে' আসব।"

এই বলে' প্রভাকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল তার মোটরে। লেকের চারিপাশে দু'চার পাক ঘূর্ণী দিয়ে সন্ধ্যাসন্ধি সে রেখে এল প্রভাকে তার বাড়ীতে। প্রভার সঙ্গে তার যাতায়াতের বিচ্ছেদ হ'ল না, কিন্তু

মঞ্জরীকে সে কিছুমাত্র জানাল না প্রভার কথা। প্রভার সঙ্গে তার ঘট্‌ল একটি স্নিগ্ধ বন্ধুতা, সেটুকু যেন হ'ল তার তপ্ত মনের পক্ষে সঞ্জীবনী, হৃদয়ের একটু বিশ্রামস্থল, কিন্তু তার বেশী আর কিছু নয়, কারণ ক্ষুধিত মনের খোরাক জোগাবার মত উত্তেজক সামগ্রী ছিল না প্রভার। এই মেয়েকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে গৃহধর্ম্ম পালন করা যায় সুখে ও শান্তিতে, কিন্তু প্রেমের আবর্ত্তে হাবুডুবু খাওয়া চলে না। বিশ্রাম ও শান্তির দ্বারা চিত্তকে অনুদ্বিগ্ন করে' দুগ্ধের মত স্বাস্থ্য বিতরণ করবার ক্ষমতা প্রভার ছিল, কিন্তু উগ্র নেশা জাগাবার মাদকতা তার ছিল না। অনেক পুরুষ আছে যাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকে সুপ্ত হয়ে এক একজন সেকেন্দার শা। তারা তেমন ভোগলিপ্সু নয় যেমন বিজিগীষু। সেকেন্দার শা'র যেমন দেশের পর দেশ জয় করে'ও বিজয়লিপ্সার শেষ ঘটে নি তেমনি এই সমস্ত পুরুষেরও মনে নব নব নারীহৃদয়ের উপর অধিকার বিস্তার করার একটা স্বাভাবিক লোভ থাকে। তাদের গৃধ্নু চিত্ত সেইজন্য নূতন নারীর সন্নিধিতে এলেই জাল পাতে তাদের বদ্ধ করবার জন্য, কিংবা পুষ্পশরাসন থেকে মুক্ত করতে চায় চূতকলিকার বাণ তাকে বিদ্ধ করবার জন্য। কিন্তু সুকুমার এ জাতীয় লোক ছিল না। নারী দ্বারা সে আকৃষ্ট হতে পারত কিন্তু নারীকে আকর্ষণ করবার জন্য সে তৎপর হয়ে উঠতে পারত না। নারী সম্বন্ধে সে অনেকটা ছিল passive। কাজেই তার বিপদ ছিল সেইখানে যেখানে সে এমন নারীর সন্নিধিতে এসে পড়েছে যে আপন ঘূর্ণাবর্ত্তে তাকে টেনে নিয়ে যাবে। সুকুমারের মন যাই বলুক না কেন, তেমন অবস্থায় আত্মরক্ষা করা তার দুঃসাধ্য। সে বিপদ ঘটেছিল তার মঞ্জরীকে নিয়ে। প্রভা সম্বন্ধে সে ছিল নিরাপদ। প্রভা সম্বন্ধে তার হৃদয় নরম হ'তে পারত, কিন্তু তরল হয়ে প্রবাহিত হ'তে পারত

না। প্রভা দিতে পারত না সে উত্তাপ যে উত্তাপে বস্তু নরম হয়ে গলে' যায় কিংবা জ্বলে' ওঠে। সে উত্তাপ ছিল মঞ্জরীর।

ইতিমধ্যে মঞ্জরীর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। মঞ্জরীর মায়ের অসুখ, মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সুকুমার অনবরত গিয়েছে মঞ্জরীর কাছে, সর্ব্বদা দিয়েছে তাকে সান্ত্বনা, দাঁড়িয়েছে তার স্বাভাবিক অভিভাবক হয়ে এবং মঞ্জরী সম্পূর্ণ আশ্রয় করেছে তাকে। সমস্ত ভার সে ছেড়ে দিয়েছিল সুকুমারের উপর। তাই ডাক্তার ডাকা, নার্স দিয়ে শুশ্রূষা করান থেকে আরম্ভ করে' শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা সম্পন্ন করেছে সে আগ্রহের সহিত। তার হাতে কোনও কাজ ছিল না। চিরকাল সে নানা বিষয়ে পড়াশুনা করে' চিত্তবিনোদন করত, কিন্তু আজকাল তার মন হয়ে এসেছিল শিথিল ও নিশ্চেষ্ট। জ্ঞানের পিপাসা গিয়েছিল নিবে, মন হয়ে উঠেছিল আয়েসী ও বিলাসী। তাই কতগুলো কাজ পেয়ে সে বেঁচে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় হয়ে এল তার প্রীতি মঞ্জরীর উপর। যেখানে ছিল শুধু আকর্ষণ সেখানে জমাট বেঁধে উঠল স্নেহ ও মমতা, পুরুষোচিত একটা অভিভাবকতার বোধে অতি সহজে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল মঞ্জরীর উপর তার একটা দখলী স্বত্ব। মনের গ্রন্থন প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছিল, শুধু বাইরের একটি ক্ষীণ কঙ্কণ-সূত্রের সঙ্গে দক্ষিণ হাতটি বাঁধা পড়া ছিল বাকী। প্রজাপতি ও মন্মথ মিলে যে সৃষ্টি সম্পূর্ণ করে' আনছিলেন সেটা অত্যন্ত অনুকূল এবং দ্রুত হ'ল মঞ্জরীর সাবলীল নির্ভর-শীলতায়। সে আপনাকে একান্তভাবে এলিয়ে দিয়েছিল সুকুমারের বাহুখানির উপরে, যেমন এলিয়ে দেয় মাধবীলতা আপনাকে সহকারতরুর উপরে।

এমনি করে' কাটল কিছুদিন। হেমন্তের কুজ্ঝটিকাবরণের মধ্য থেকে অবগুণ্ঠন মোচন করে' ধীরে ধীরে দেখা দিলেন বসন্তসুন্দরী।

এল সেই ঋতু যখন ভ্রমরেরা পাগল হয়ে ওঠে পুষ্পরন্ধ্রে প্রবেশ করে' মধুপানের জন্য, যখন আতাম্র-হরিতপাণ্ডুর কিশলয়দলে সমাচ্ছন্ন হয় বনস্পতিকুঞ্জ ; অশোকবন আচ্ছন্ন করে জ্বলন্ত অঙ্গারকণা, কর্ণিকার বীথিতে ছড়িয়ে পড়ে পাবকের উর্ম্মিশিখা, শ্বেতহংসের ন্যায় মন্দ বায়ুতে আন্দোলিত হয়ে ওঠে গন্ধরাজ, সবুজ পত্রাবলিকে আবৃত করে' দেয় তার সুধাশুভ্র ধবলতা, প্রসারিত আমোদে স্তব্ধ সোৎসুকনেত্র চলন্ত পথিকের গতি হয় রুদ্ধ। হরিত পত্রাচ্ছাদনের মধ্য দিয়ে দূরশীর্ষে দেখা দিয়েছে হেমাঙ্গ চম্পক, লুব্ধ পথিক হতাশ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখছে। সে ফুল তার নাগালের বাইরে, সে ঝরে না, তাকে তুলে নিতে হয়। মাধবী আলিঙ্গন করেছে সহকারকে তার সহস্র লতাশাখার দ্বারা, পুষ্পিত হয়ে উঠেছে তার নবযৌবন বিলুব্ধ করতে তার সুগন্ধে সহকারকে, আর তারই উদ্বৃত্ত অংশ উড়ে যাচ্ছে বাতাসে আর সেই সুগন্ধে স্বপ্নাঙ্কিত করে' দিচ্ছে পথিকের মন মোহের বাসনায়। পারাবতবধূ কূজনমত্ত হয়ে চঞ্চুতে চঞ্চুতে স্পর্শ করছে আপন সহচরকে। বিলুপ্তপত্র কৃষ্ণচূড়া লাল চেলিতে সমস্ত গাত্র আবৃত করে' স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে অনাদিকালের বধূস্বয়ংবর। প্রলুব্ধ ভ্রমর পরাগপিশঙ্গ হয়ে পথ হারিয়েছে ঈষন্মুকুলিত পদ্মিনীর পত্রদলের গোলকধাঁধার মধ্যে। চূতমুকুলের গন্ধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে মধুপশ্রেণী। পুষ্পধনু যেন আজ তাঁর পঞ্চবাণকে উন্মুক্ত করে' দিয়েছেন সমগ্র ধরাতলে মিথুনহৃদয়কে বিদ্ধ করবার জন্য। পরাগ-রজঃপূর্ণা হয়েছেন পৃথিবী।

এমনি একটি বসন্তঋতুর অপরাহ্নে চাঁদপাল ঘাটের একটি ষ্টীমারে প্রথম শ্রেণীতে পাশাপাশি বসে' মঞ্জরী ও সুকুমার। ষ্টীমার চলেছে রাজগঞ্জ ঘাটের দিকে। প্রথম শ্রেণীতে আর লোক নেই। ক্ষীণতোয়া ভাগীরথীর বক্ষে অতিকায় ষ্টীমারখানি জলরাশি আলোড়ন করতে

করতে চলেছে মন্থরগতিতে। তটভূমি ব্যাপ্ত করেছে সর্ষেক্ষেতের পীত পুষ্প, পীতবসন বনমালী যেন ক্লান্ত হয়ে শয়ন করেছেন ধরণীর বক্ষে আর তাঁর বংশীধ্বনি উদ্‌গীর্ণ হচ্ছে সুষির বংশরাজির মধ্য দিয়ে। কোথাও বা হংসমিথুন সিক্ত সৈকতে চঞ্চুপুটে উদ্ভিন্ন করছে তাদের শুভ্র পক্ষমালিকা, লীন হয়ে গেছে যেন তাদের ধবলতা পাণ্ডুর বালু-তটের সঙ্গে। এই ভাগীরথী যখন নেমে আসেন হরিদ্বারের উত্তরে উপলবহুল শৈলমালার মধ্য দিয়ে, তাঁর জল থাকে কাকচক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল, দুগ্ধের ন্যায় স্বাদু। সে জল আকণ্ঠ পান করলে মনে হয় মূর্ত্ত পুণ্যধারা যেন পান করছি। আজ সাগরের সম্মুখীন হয়ে এই অনাবিলতার ঋতুতেও ভাগীরথীর সে স্বচ্ছতা আর নেই, প্রবেশ করেছে সেখানে দুর্দ্দাম পঙ্কিলতা। মলিনতার বিসর্গে জগৎপাবনীর তীরস্থিত নরনারীরা তাঁকে করেছে বিষাক্ত, পঙ্কিল, কৃমিজর্জ্জরিত। অর্থগৃধ্নু যবনেরা কুৎসিৎ পণ্যযন্ত্র স্থাপন করে' তাঁর তটভূমি করেছে ধূমরেখাঙ্কিত, অন্তরের নির্ম্মল স্রোত যেন কলুষিত হয়ে উঠছে বিষাক্ত ধূমবাষ্পে, বাসনার পঙ্কিল আবর্ত্তে, দক্ষিণ-সাগরের মন্দবাহী পবন জর্জ্জরিত হচ্ছে মনুষ্যত্যক্ত বিষবর্জ্জনে।

ঠাকুরঘরে মাটির প্রদীপে বিশুদ্ধ গব্যঘৃতে হাতে তৈরী করা সল্‌তেতে আমরা যে আরতির প্রদীপ জ্বালি সে দীপশিখা ছায়ামসৃণতায় কোমল স্নিগ্ধ। তা গাঢ়কে প্রকাশ করে, করে তার অন্তররূপকে ব্যক্ত। ব্যক্ত ভাষার পিছনে যেমন দ্যোতিত হয় ব্যঞ্জনা তেমনি সেই আলোতে সূচিত করে ঠাকুরঘরের গভীরতা ও পবিত্রতা, সূচিত করে এ আলো আঁধারের মধ্য দিয়ে সেই অসীম দুর্জ্ঞেয় রহস্য যা মন্দিরের দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে ভক্তের হৃদয়াসনে। প্রকাশের মধ্যে অপ্রকাশের মহিমা সেখানে হৃদয়কে উত্তানদীর্ঘ করে' করে গভীরের

দিকে প্রসারণ। ব্যবহারিক জীবনে যেখানে উদ্দাম বাসনা ফিরছে দুর্দ্দাম হয়ে, যেখানে গভীরের চেয়ে প্রকটের মহিমা বেশী, সেখানে আমরা জ্বালি বড় বড় আলো। সে আলোতে আছে তেজ, উত্তাপ, তার উদ্দেশ্য দৈনন্দিন ভোগ ব্যাপারের কাজ। রাত্রিকে তা করে দিনের মত শুভ্র কিন্তু সেখানে মাটির প্রদীপশিখার গভীরতা নেই। মাটির সেই দীপশিখা আমরা রেখেছি আবদ্ধ করে' আমাদের মন্দিরে, কোনও সময় তাকে স্মরণ করি, কিন্তু ব্যবহার করি না। তেমনি আমাদের হৃদয়ে রয়েছে যে স্বচ্ছ প্রেমের দীপশিখাটি, যার গাম্ভীর্য্যের মধ্যে, পবিত্রতার মধ্যে প্রস্তুত করে' দেয় হৃদয়ের পবিত্র প্রেমবৃত্তিকে, তার কথা আমরা সকল সময় এমনি ভুলে যাই যে মনে হয় সে যেন নেই। আমরা প্রদীপ চাই না, চাই আগুন; স্নিগ্ধতার আনন্দ চাই না, চাই দাহের জ্বালা। তাই আমাদের প্রেমের মধ্যে আমরা মেশাই প্রচুর পরিমাণে অশুচি দাহ্য পদার্থ, যার ফলে একদিকে ওঠে ধোঁয়া আর একদিকে ওঠে উত্তাপ। আমরা গভীরতা চাই না, ছায়া চাই না, চাই ব্যক্ততার নিরাভরণতা, চাওয়ার দুর্দ্দাম নৃত্য। তবু দুর্দ্দিনে আমাদের স্মরণ করতে হয় ঠাকুর ঘরের স্নিগ্ধ আরতির দীপ-শিখাটিকে। আরতির থালার সেই দীপশিখাটিতেই হয় যথার্থ মঙ্গলের বরণ। প্রকৃতি প্রতিদিন দিনের পিছনে পাঠান আমাদের কাছে রাত্রিকে, আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে দিনের প্রকট আলোতে যে লাবণ্যের উৎস নিরন্তর নির্ঝরিত হয়ে পড়ছে, প্লাবিত করছে আমাদের চেতনা ও বুদ্ধিকে, তার যথার্থ রহস্য হচ্ছে স্নিগ্ধ রাত্রির ছায়া-গহনতায়। আলোক-রূপসী তার উর্ব্বশীর নৃত্যে ঝলমল করে' যে রূপের মোহেতে আমাদের ডুবিয়ে দেয় তার যথার্থ রহস্য নিমগ্ন হয়ে রয়েছে অরূপের গভীরতার মধ্যে।

সুকুমার মঞ্জরীকে জিজ্ঞাসা করল—"তুমি আমাকে কেমন ভালবাস?"

মঞ্জরী একটু গম্ভীরভাবে বল্লে—"যেমন ভালবাসে নদী সাগরকে, ছায়া আলোকে। এ ভালবাসায় গতিও আছে, স্থিতিও আছে, সাহচর্য্যও আছে, বিরহও আছে।"

সুকুমার বল্লে—"আমি ত জানি ভালবাসায় বিরহ অসহ্য।"

মঞ্জরী বল্লে—"আমি ত বলি বিরহের আগুনে প্রেমের দুগ্ধরস আসে গভীর হয়ে, গাঢ় হয়ে, যেমন হয় ত হচ্ছে তোমার মনে সুজাতার প্রতি প্রেম। তুমি ছাড়া আর কারুর সম্মুখীন আমি হই নি, আর এ পর্য্যন্ত বিরহের আস্বাদও আমি পাই নি। তাই দু'এক সময় মনে হয় যে নিরন্তর পেয়েও আমি যা পেলুম না কোনও সৌভাগ্যবতী হয় ত না পেয়েও তা' পেয়েছে।"

সুকুমার বল্লে—"সুজাতার কথা বারবার তুলে তুমি আমাকে খোঁচা দাও কেন বল ত? এমন বসন্তের স্নিগ্ধ আকাশকে মেঘকলঙ্কিত করে' তোমার কি লাভ?"

মঞ্জরী বল্লে—"খোঁচা ত আমি দিই নি। যে খোঁচাটা আমি নিরন্তর খাচ্ছি কোন কোন সময় অকস্মাৎ গিয়ে সেটা তোমার গায়ে ঠেকে, আর ঈশান কোণে যদি একটু মেঘের রেখা দেখা যায়, ভরা নদীতে যারা পাল চড়িয়ে চলেছে তারা সেটা উপেক্ষা করতে পারে না। চোখ বুজে থাকলেই সত্য অসত্য হয় না। সত্য যত কঠোরই হোক্, তার সম্বন্ধে সচেতন থাকা আবশ্যক।"

সুকুমার বল্লে—"তুমি মেঘের রেখা দেখ্‌লে কোন্‌খানে? সুজাতাকে আমি একদিন ভালবাসতুম, সেও আমাকে ভালবাসত। কিন্তু সে

ভালবাসা একেবারে অন্য রকমের, কাজেই তোমার আমার ভালবাসার সঙ্গে সে ভালবাসার কোন তুলনা নেই।"

মঞ্জরী বল্লে—"কি করে' জানলে তুলনা নেই ? কি করে' জানলে আমি যেভাবে তোমাকে ভালবাসি সেইভাবেই সে তোমাকে ভালবাসে না ? আমি ধরা দিয়েছি, আমার পায়ে তুমি জিঞ্জীর দিয়ে খাঁচায় পুরেছ, কিন্তু বনের পাখীরও যে খাঁচার দিকে লোভ নেই আর তোমারও যে বনের পাখীর দিকে লোভ নেই তা তুমি কেমন করে' জানলে ?"

সুকুমার বল্লে—"তুমি কি আমার মনস্তত্ত্বের পরীক্ষা করতে চাও নাকি ? কেমন করে' জানলাম সে পরিচয় তোমাকে দিই কি করে ? জানলুম যেমন করে' দশজনে জানে। সে যদি আমাকে এইভাবে ভালবাসত তবে আকারে ইঙ্গিতে তার পরিচয় দিতে ছাড়ত না।"

মঞ্জরী বল্লে—"আকারে ইঙ্গিতে যে সে পরিচয় দেয় নি তা তুমি কি করে' বুঝলে ? তুমি কি আদিমকালের মহেঞ্জোদারোর ভাষার লিপি চেন ? সে লিপিতে লেখা রয়েছে কত কথা, যা তোমার কাছে হয় ত অর্থহীন। তেমনি হয়ত আদিম নারীহৃদয়ের ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছে সে তার ভাষা, তুমি মূঢ়, তোমার হয় ত তা বোঝবার ক্ষমতা নেই। তোমার বয়স হয়েছে সত্য, কিন্তু হয় ত নারীহৃদয়ের অভিজ্ঞতা তোমার নেই। সে যেখানে আসতে বারণ করে সেই বারণ করাই হয় ত আসতে বলা। নিষেধমুখে সে হয় ত দেয় বিধি, বিধিমুখে সে হয় ত দেয় নিষেধ। এটা ভাষার কথা, লিপির কথা। তা জানা না থাকলে সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করে' বলা যায় না।"

সুকুমারের মন হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠ্‌ল। সে ভাবলে—হয় ত মঞ্জরী যা বলছে তা সত্যও হ'তে পারে। হয়ত কানাইয়ের প্রতি

তার আছে একটু শ্রদ্ধা তার মহত্ত্ব দেখে'—ভাল সে আমাকেই বাসে। নইলে কেন সে বল্লে প্রভাকে আমার খোঁজ নিতে? অমন বিপদের সময় নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ হয়ে আমার কোথায় কি অসুবিধা হবে সেইজন্য কেন সে উঠ্‌ল ব্যাকুল হয়ে? একজনকে ভালবাসলে যে আর একজনকে শ্রদ্ধা করা যায় না এমন ত নয়। কত লোক ত রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসাবে কত শ্রদ্ধা করে, তা বলে' কি তারা তাদের প্রিয়জনকে সারা মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে না? মঞ্জরী সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে নিমেষে বুঝে নিলে তার মনের কথা। বুঝলে যে তার প্রয়োগ লক্ষ্য ভেদ করেছে। সে আবার প্রশ্ন করলে—"আচ্ছা, ধরেই নাও, যদি এখন তুমি জানতে পার যে সে তোমাকে ভালবাসে তা হ'লে কি আমাকে ভাসিয়ে দেবে, দেবে না আমাকে স্থান তোমার স্নেহের ছায়ায়?"

সুকুমার একটু থতমত খেয়ে বল্লে—"এ সব কথা তুমি কি বলছ? প্রথমতঃ, সে আমাকে ভালবাসে না। দ্বিতীয়তঃ, যদি সে ভালবাসেও তা রয়েছে আমার অবিদিত। যা আমার জ্ঞানের বাইরে তার কোনও সত্তা নেই আমার কাছে। তোমার ভালবাসা আমার প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ ভালবাসার স্রোতে আমি ছুটেছি তোমার দিকে, যেমন ছোটে ঢালু পথ দিয়ে পাহাড়িয়া ঝরণা।"

মঞ্জরী আবার বল্লে—"যা অপ্রত্যক্ষ তা মৃতও নয় অসৎও নয়। সে বসে' থাকে আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য, অপেক্ষা করতে থাকে অবসর জলধারার ও কালের জন্য। এই যে নদীতীর দেখছ আজ শুক্‌নো, খালি বালুচর আর শুক্‌নো মাটি, বর্ষাকালে দেখবে এ পূর্ণ হয়ে গেছে অগণ্য শষ্পরাজিতে। শীতের বিশুষ্কতায় তার সমস্ত পাতা ঝরে' গেছে, তার চিহ্নমাত্রও এখন দেখবার উপায় নেই, কিন্তু

তার মূল হয় ত রয়েছে নিবিড় হয়ে ভূগর্ভে। বর্ষার জলধারার প্রসেকে সে আবার সবুজ শ্যামল হয়ে উঠবে জীবন প্রবাহের উল্লাসে। তেমনি তোমার মনের মধ্যে হয় ত রয়েছে তার ভালবাসার মূল প্রোথিত হয়ে তোমার চেতনার গভীর-লোকে, সে হয় ত কোনদিন কোনও সুলগ্নে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পাবে তার শ্যামল শোভায়। তখন আমাকে নিয়ে তুমি করবে কি ?"

সুকুমার বল্লে—"তুমি বিশ্বাস করতে পার আমাকে যে তোমাকে যখন আমি বিবাহ করছি তখন তোমার প্রতি আমি কখনও অবিশ্বাসী হব না।"

মঞ্জরী বল্লে—"অবিশ্বাসী হবে না এ কথার মানে কি ? লৌকিক প্রথায় এবং আইনের চক্ষুতে এই বিশ্বাসের অর্থ দেহগত একনিষ্ঠতা, কিন্তু মন যেখানে দ্বিনিষ্ঠ হয় কিংবা মনের নিষ্ঠা যদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে' যায় তবে দেহগত একনিষ্ঠতার অর্থ কি ? বিবাহ একটা লৌকিক রচনা, তার উদ্দেশ্য পরিবার-সৃষ্টি ও পরিবার গঠন এবং সমাজের দাবী এই যে এই সৃষ্ট পরিবারের ভরণপোষণের ভার নেবে স্বামী। সে স্ত্রীকেও ভরণপোষণ করবে এবং পুত্রকন্যাদেরও সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত ভরণপোষণ করবে। সেইজন্য সমাজ চায় স্ত্রী বা পুরুষ যাতে পরস্পরকে উপায় না করে' অন্যত্র সৃষ্টি না করে কারণ তা' হ'লে সেই সৃষ্ট সন্ততি বিপন্ন হ'তে পারে, পুরুষ তার ভার বহন করতে অস্বীকার করতে পারে। তা ছাড়া পুরুষের ধন যাতে সন্তানসন্ততিক্রমে যথাসম্ভব অবিভক্ত থাকতে পারে এবং যাতে পরিবারগত ঐক্যের দ্বারা ধন সঞ্চিত করে' ধনসৃষ্টি করতে পারে এইটেই হ'ল বিবাহের সামাজিক দিক। এই জন্য সমাজকর্ত্তারা দেহগত একনিষ্ঠার প্রতি এত সতর্ক। তথাপি হিন্দু সমাজ অধিকার দিয়েছে

পুরুষকে একাধিক বিবাহ করতে এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, নারীকে দেয় নি সে অধিকার। নারীর শুচিতা সম্বন্ধে পুরুষ অধিকতর সতর্ক, যেহেতু নারীই উৎপাদিকা। সে যদি হয় ব্যভিচারিণী তবে স্বামীর ঘাড়ে এসে পড়ে আর একটা সংসার, যা বহন করতে সে দায়ী নয়। এই সামাজিক শৃঙ্খলকে শক্ত করে' বাঁধবার জন্য এর উপরে ভার চাপানো হয়েছে ধর্ম্মের ও নীতিপরায়ণতা ও চরিত্রবত্তার। কিন্তু এটা হ'ল সম্পূর্ণ অন্য কথা। ভালবাসা মাত্রই চায় একনিষ্ঠ অধিকার বিস্তার, সেইটির যেখানে অভাব ঘটে সেইখানেই ভালবাসা আনে দুঃখ এবং ব্যথা। কিন্তু হৃদয় ব্যাপারের উপর সামাজিক তাগিদ চলে না। ইউরোপে যাকে বলে morality তার গণ্ডী নিবদ্ধ হয়ে আছে কর্ম্মের ক্ষেত্রের মধ্যে, চিন্তা বা হৃদয়ের ক্ষেত্রে নয়। কাউকে বধ করলে, মিথ্যা কথা বললে, মিথ্যা আচরণ করলে সেটাকে immoral বলা হয় কিন্তু জিঘাংসা, মিথ্যা প্রবৃত্তি, মানসিক কপটতাকে immoral বলা হয় না। কাজেই, কোনও ব্যক্তি যদি দু'জন, তিনজন বা চারজনকে ভালবাসে তবে সেটা immoral হয় না। বিবাহ একটা সামাজিক ব্যাপার, সে হিসাবে এটা পড়ে সামাজিক বিধিব্যবস্থার পদ্ধতির মধ্যে। এটা moralityর ক্ষেত্রের বাহিরে, আর যদি পড়েও moralityর ক্ষেত্রের মধ্যে তথাপি সে ক্ষেত্র আবদ্ধ হয়ে রয়েছে দেহগত ক্রিয়ার মধ্যে। এই জন্য মনোগত বহুনিষ্ঠতাকে immoral বলা চলে না। কিন্তু প্রেম করে হৃদয়ের বিচার, সেখানে একটি হৃদয় করে আর একটি হৃদয়ের উপর সর্ব্বস্ব অধিকারের দাবী, সেটি ব্যাহত হ'লে আসে দারুণ দুঃখ বিপর্য্যয়; কিন্তু তথাপি কারুকে দোষী করা কঠিন হয়ে ওঠে morality বা সামাজিক নিয়ম অনুসারে।"

সুকুমার বল্লে—"কিন্তু ইউরোপে ত bigamy একটা criminal offence।"

মঞ্জরী বল্লে—"তার কারণ ক্রিয়া দ্বারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হয়েছে সেখানে। সে দেশের বিবাহে ও আমাদের দেশের রেজেষ্ট্রীকৃত বিবাহে পুরুষ ও নারী উভয়েই প্রতিজ্ঞা করে যে উভয়ে উভয়ের নিকট থাকবে একনিষ্ঠ যতদিন না পরস্পরের কারও একনিষ্ঠতা ক্রিয়ার দ্বারা ভঙ্গ হয়। সে জন্য সেখানে একদিকে আছে বিবাহবিচ্ছেদ এবং অপরদিকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলে চুক্তি ভঙ্গের জন্য আছে দণ্ড।"

সুকুমার বল্লে--"তবে ত আমরা রেজেষ্ট্রী করে'ও বিবাহ করতে পারি।"

মঞ্জরী বল্লে—"তোমার ঘটে দেখছি একটুও বুদ্ধি নেই। আমি ত এ কথা সন্দেহ করছি না একবারও যে আমাকে বিবাহ করলে তুমি বিবাহ করতে পার আর কাউকেও কিংবা তোমার দেহগত একনিষ্ঠতা ভঙ্গ হতে পারে। আমি যে কথা বলছি সে এই যে তোমার মন যদি আর কারুর দিকে টানে তবে সে আমি সইতে পারব না।"

সুকুমার আবার বল্লে—"আচ্ছা, তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে আমার মন আর কারুর দিকে টানবে, তা হ'লেও তোমার দিকের টান যে কমবে এ কথা ত বলা যায় না।

True love in this differs from gold and clay
That to divide is not to take away
Love is like understanding that grows bright
Gazing on many truths.
—Narrow the heart that loves, the brain that
contemplates

The life that wears, the spirit that creates
One object and one form and builds thereby
A sepulchre for eternity."

মঞ্জরী বল্লে—"এ কি রকম ভালবাসা তা আমি বুঝি না। হয় ত যুক্তি বিচার করলে এর বিরুদ্ধে তর্ক করা কঠিন হয়ে উঠ্‌তে পারে কিন্তু সাধারণতঃ যে প্রেমের আমাদের অভিজ্ঞতা আছে তাতে মন চায় একনিষ্ঠতা, মন চায় অধিকার বিস্তার, চায় এই কথা বলতে—তুমি একান্তই আমার। অন্যত্র হয় ত প্রেম বিস্তৃত হতে পারে, কিন্তু সেই বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই অধিকার যায় শিথিল হয়ে। এই অধিকার বোধ থেকে নির্ম্মুক্ত হয় যদি কোনও ভালবাসা তবে সেখানে হয় ত কেউ শুধু ভালবেসেই হয় সুখী। সে চায় না তার অধিকার বিস্তার করতে এবং সেখানে অধিকার বিস্তার করতে চায় না বলেই অধিকারচ্যুতির কোনও ভয় থাকে না। তুমি কি সুখী থাকবে আমি যদি তোমার সঙ্গে বিবাহিত হয়ে আর কাউকে ভালবাসি অথচ দেহগত ভাবে আমি থাকি একনিষ্ঠ ?"

সুকুমার বল্লে—"দেহগত নিষ্ঠার মূল্য ত তুমি দিয়েছ কমিয়ে। সেটার আর আলোচনা করে' লাভ কি ?"

মঞ্জরী বল্লে—"সে ত ঠিকই। মনই যেখানে পেলুম না সম্পূর্ণ আমার করে' সেখানে দেহটা নিয়ে আঁকড়ে থেকে ত কোন লাভ নেই। আমার বাড়ীতে হয়েছে একটা আম গাছ। একটা পাকা আম পড়েছে মাটিতে—কেউ তা' কুড়িয়ে খেলে তাতে হয় ত আমি আপত্তি না করতে পারি কিন্তু কেউ যদি তার একটি ডালের উপরেও দখলী স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় আমি তার প্রতিবাদ করি সমস্ত সত্তা দিয়ে।"

সুকুমার আবার বল্লে—"কিন্তু কোথাও কেউ দখলী স্বত্ব স্থাপন করবে না এবং নিজেকে কারুর দখলীস্বত্বের মধ্যে ছেড়ে দেবে না, এরকমভাবের প্রেম যদি বহুধা ব্যাপ্ত হয় ত তাতে ক্ষতি কি? মা কি তাঁর পাঁচটি ছেলেকে ভাল বাসেন না? তুমি কি তোমার পাঁচটি বন্ধুকে ভালবাস না?"

মঞ্জরী বল্লে—"সে রকম ভালবাসা ততক্ষণই অবিরোধে চলতে পারে যতক্ষণ একে অপরের উপর দখলীস্বত্ব স্থাপন করতে না চায়। দখলীস্বত্ব স্থাপন করতে এলেই বাধে বিরোধ। তুমি ত আমাকে সোজা কথার জবাব দিতে পারলে না যে আমি যদি আর একজনকে ভালবাসি তুমি সেটা সহ্য করতে পার কি না।"

সুকুমার বল্লে—"পারি, যদি জানি যে আর একজনকে দিতে গেলে আমার ভাগ কম পড়ে' যাবে না।"

মঞ্জরী আবার বল্লে—"এ আশঙ্কা ত আমাদেরও থাকে তোমাদের সম্বন্ধে।"

সুকুমার বল্লে—"এ সম্বন্ধে হয় ত মেয়ে ও পুরুষের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। কুলক্রমাগত অভ্যাসে ও প্রাকৃতিক নিয়মে মেয়ে চায় তার ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে কারুর অধিকারভুক্ত করে' তার উপর নির্ভর করতে, সে সর্ব্বদাই আশ্রয়প্রার্থিনী, আশ্রয়দাতা নয়। যে আশ্রয়প্রার্থিনী সে স্বাভাবিকভাবেই তার ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয়ের পরিবর্ত্তন করে। একটা গাছে পাঁচটা পাখী বসে' থাকতে পারে নির্ব্বিরোধে, কিন্তু একটা পাখী পাঁচটা গাছে বসতে পারে না।"

মঞ্জরী বল্লে—"যদি কেউ পারে?"

সুকুমার বল্লে—"যে নারী স্বভাবকে অতিক্রম করেছে তার কথা আলোচনার বিষয় নয়। কিন্তু তুমি কেন একথা মনে কর যে ভাল-

বাসার ধর্ম্মই এই যে সে করবে আপন অধিকার বিস্তার তার ভালবাসার পাত্রের উপর, মুক্তি না দিয়ে করবে গ্রাস ?”

মঞ্জরী বল্লে—“তা ত আমি বলি নি। আমি বলেছি এ কথা যে, যে ভালবাসার আমার অভিজ্ঞতা আছে এবং আরও দশ জনের অভিজ্ঞতা আছে তাব প্রধান ধর্ম্মই এই অধিকার বিস্তার। দার্শনিক ও কবিরা করুন গিয়ে বিচার নিরুপাধি প্রেম সম্ভব কি না ; সে বিচাবে আমার কোন লোভ নেই কারণ তা আমার অভিজ্ঞতার বাইরে, অনুভবের বাইরে।”

সুকুমার বল্লে—“কেন মিথ্যা আমরা বসে এ তর্ক করছি ? আমার মনই বা কেন অন্যত্র টানবে ? আমার মনই বা কেন হবে দ্বিনিষ্ঠ ?”

মঞ্জরী বল্লে—“তুমি Scienceএর উপর অনেক মাথা খাটিয়েছ, সাহিত্য ইতিহাসও তুমি অনেক পড়েছ, কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিকটা তুমি তেমন আলোচনা কর নি। মনের রহস্য সম্বন্ধে যদি চিন্তা করে’ দেখ তবে বুঝতে পারবে যে চেতনার রঙ্গমঞ্চে যারা নানা ভূমিকায় প্রবেশ করে’ আমাদের অভিনয় দেখায় তাদের কে কখন ভিতরে চলে যাবে আর কে কখন বাইরে এসে তার স্থান দখল করবে তা বলা যায় না। সাজঘরেরও পিছনে বহু অভিনেতা করেছে ভিড়, তারা আসতে চাইছে চেতনার রঙ্গমঞ্চে। রঙ্গমঞ্চের দ্বারী যখন সজাগ থাকে, ততক্ষণ সে যাকে তাকে ঢুকতে দেয় না রঙ্গমঞ্চে, সে ব্যবহার করে তার শাসনদণ্ড। কিন্তু তবু সে যখন পড়ে একটু এলিয়ে নিদ্রিত হয়ে, বাইরের রঙ্গমঞ্চ যখন হয় বন্ধ, তখনও বহু অভিনেতা বিকৃতরূপে এবং অপ্রস্তুতরূপে লাগিয়ে দেয় হয় ত তাদের তাণ্ডবনৃত্য সাজঘরের মধ্যে। তাই স্বপ্নের মধ্যে আমরা নানা নিরর্থক চিত্র দেখি। যাদের নিরুদ্ধ করে রেখেছিলুম সাজঘরের পিছনে জোর করে তারা তাদের জিঞ্জীর ভেঙ্গে

সাজঘরের মধ্যে এসে এমন হুল্লোড় বাধিয়ে দেয় যে তার ফলে রঙ্গমঞ্চ পর্য্যন্ত ওঠে কেঁপে। কোন অনীপ্সিত অভিনেতাকে তুমি হয় ত জোর করে পাঠিয়ে দিতে পার পিছনে কিংবা সে আপনিও চলে যেতে পারে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের পিছনে, সাজঘরে বা সাজঘরেরও পিছনে কি যে ব্যাপার চলেছে তা রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা বা প্রহরী কেউ জানতে পারে না বা তাদের টেলিফোন করেও কেউ সে কথা জানায় না। সেখানকার আইনকামুন, নিয়মপদ্ধতি তাদের অজানা। সেখানে যারা জোর করে' আটক হয়েছে তারা কে কখন বলবান হয়ে দখল করে' বসবে সাজ-ঘর ও রঙ্গমঞ্চ, আহত করে' দেবে প্রহরীকে, তা কেউ বলতে পারে না। যে মূল প্রোথিত হয়ে রয়েছে মাটির মধ্যে সে কোন্ ঋতুতে কি ভাবে উঠবে উদ্ভিন্ন হয়ে তা বলা যায় না। আবার অনেক সব্জী এমন আছে যার মূলই যথেষ্ট, সে অজ্ঞাতভাবে মাটির তলে থেকেই সেই মাটির উপরকার সব ফসল দেয় নষ্ট করে'। আমাকে নিয়ে যে ফসল তুমি তুলতে চাও তোমার নূতন বাগানখানায়, তার সমস্ত ফসল যদি অসম্ভব করে' দেয় তার মাটির নীচের মূল, তখন কি করে' তুমি পাবে তার হাত থেকে রক্ষা ?"

সুকুমার বল্লে—"আমার ইচ্ছার বাইরে, আমার শক্তির নাগালের বাইরে যদি জোর করে' কিছু আমার মনের মধ্যে আসে তা হ'লে সে সম্বন্ধে আমি কি করতে পারি ? শুধু যার মূল ছিল তার সম্বন্ধেই যে ভয় তা ত নয়, যদি কোনও নূতন জিনিষ এসে মূল বিস্তার করে তবে অমন না-জানা ভবিষ্যতের কথা আমি কি করে' বলতে পারি ?"

মঞ্জরী বল্লে—"সে ত ঠিকই। দুর্ভাবনার ত শেষ নেই। কিন্তু সকল দুর্ভাবনা নিয়ে ভাবনা করলে কোনও কাজই করা চলে না। তবে কোনও পাত্রে জল ভরতে গেলে দেখা চাই অন্ততঃ তখন কোনও

ছিদ্র আছে কি না। আমি দেব ভালবাসায় তোমার পাত্র পূর্ণ করে' আর সে নিঃশেষে বেরিয়ে যাবে ছিদ্র দিয়ে এবং পূর্ণ করে' তুলবে কোন বিজাতীয় মূলকে, এ ত চলে না। তবে হয় ত পাত্রটি পূর্ণ করবার সময় যেতে পারে ভগ্ন হয়ে, সে কথা নিয়ে আমি কোন বিচার করতে চাই না। আচ্ছা, তুমি ত অনেক ভালবাসার লেক্‌চার দিয়েছ। কেউ হয় ত তোমাকে ভালবাসে বলে' তুমি মনে কর, হয় ত সে বিষয়ে তোমার কোনও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু তুমি যদি নিশ্চিত প্রমাণে জানতে পার যে আর একজনের দিকে আকৃষ্ট হয়ে সে আর একদিকে ছুটেছে, তবুও কি তুমি তার দিকে ছুটতে পার? আওড়াতে পার তোমার Shelleyর কবিতা খুব বড় বড় করে'?"

সুকুমার বল্লে—"তাও কি সম্ভব?"

"কেন সম্ভব হবে না? তোমার প্রেমের দার্শনিকেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন? এমন কি ঘটে না সব ঘটনা যাকে বলা যায় প্রেমজ্বর? কাউকে ভালবাস বলে' বিশ্বাস করে' ছুটেছ তারই পিছনে। সে হয় ত ভালবাসে আর একজনকে বা নিরুপদ্রবে ঘর করছে তার স্বামীকে নিয়ে, আর তোমাকে নিয়ে একটু বাঁদর নাচাচ্ছে; তুমি তাতেই হয়ে পড়েছ অসহায়, সব কাজে হয়ে পড়েছ অসমর্থ, তারই চিন্তা ব্যাপ্ত করেছে তোমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত মনের পটভূমিকে। এ কি হয় না?"

সুকুমার বল্লে—"হয় ত হতে পারে, কিন্তু এ সুস্থ মনের পরিচয় নয়। হয় ত সে বেচারীর মনে সকল প্রমাণ সত্ত্বেও কেমন একটা অজ্ঞাত বিশ্বাস থেকে যায় যে সে কেবল তাকেই ভালবাসে, সে কোনও ছলনা করে নি তার সঙ্গে। কিন্তু আমার মনে হয় সেও যদি আর কারুর কাছ থেকে যথার্থ ভালবাসা পায় তা হ'লে সে আলেয়ার

পিছনে চলা তার থেমে যাবে। এ সমস্ত কথা আমি বলছি অবশ্য কোনও নিরুপাধি প্রেমের প্রতি লক্ষ্য না করে' কারণ সে বস্তুটাকে তুমি বিচারের মধ্যেই আনতে চাও না। কোনও জমির উপরে দখলী স্বত্ব ততক্ষণই করা যায় যতক্ষণ কোনও দিক থেকে তার বিরোধ না আসে কিংবা বিরোধেও করতে পারি আমাকে আমি স্থাপন কিংবা করতে পারি সেই জমিতে পাদচারণ। কিন্তু জার্ম্মাণীর ভূখণ্ড আমার, এ কথা একান্ত বাতুল না হ'লে কেউ দীর্ঘকাল কল্পনা করতে পারে না। যে ভালবাসা নির্ভর করে দখলী স্বত্বস্থাপনের উপর, সেই স্বত্ব-স্থাপন করা যখন হয়ে পড়ে একান্ত অসম্ভব, সেখানকার ভালবাসা হয়ে আসে আস্তে আস্তে ম্লান। কিন্তু যে ভালবাসা কোনরকম আদান-প্রতিদান পাবে না কিংবা ভালবাসার পাত্রের কাছে যে ভালবাসা ব্যক্ত করাও সম্ভব হবে না, তারও জন্য হয়ত কোথাও দরদ থাকতে পারে প্রচ্ছন্ন হয়ে নিজের আড়ালে, কিন্তু একান্ত দুষ্প্রাপ্য বস্তুর পিছনে পাগল ছাড়া আর কেউ ছুটে যেতে পারে না। পাগল যে, অন্ধ যে, মুগ্ধ যে, তার মনে একবার যে ঢোকে সে আর বেরুতে চায় না। সচল যে, জীবিত যে, তার পক্ষে আলেয়ার আলোর পিছনে ছুটে চলা সম্ভব নয়।"

মঞ্জরী বল্লে—"তবুও আলেয়ার পিছনেও লোক ছোটে।"

সুকুমার বল্লে—"ছোটে। যতক্ষণ বিশ্বাস থাকে যে সে আলোর পিছনে আছে মানুষ, সে দেখিয়ে দেবে একটা বিপথের মধ্যে পথ, কিন্তু যখন পথিক বোঝে যে ও আলো দপ্ করে' জ্বলে' ওঠে এখন এখানে তখন সেখানে, ও আলো আমাদের কোথাও নিয়ে যেতে পারে না, আর ওর পিছনেও নেই কোনও মানুষ, তখন আর কোনও সুস্থ পথিক তার পিছনে ছুটতে পারে না।"

মঞ্জরী বল্লে—"আচ্ছা, যদি নিশ্চিত প্রমাণে জানতে পার যে সুজাতার মন নিশ্চিতভাবেই অন্যদিকে প্রবাহিত হয়েছে তা হ'লেও কি তুমি তার কথা মনে মনে ভাববে ?"

এই কথা শুনে সুকুমারের মনে হ'ল কে যেন তার পিঠে একটা কশাঘাত করল। সে সাম্‌লে নিয়ে বল্লে—"সুজাতার সম্বন্ধে ভাবব না, এ কথা বলা চলে না। ছেলেবেলা থেকে তার জন্যে ভেবে এসেছি, সেই সংস্কারই তার জন্য ভাবাবে। কিন্তু তুমি যে দিক থেকে কথা বলছ সেই দিক দিয়ে আমার অগ্রসর হওয়াটাকে আমি অন্যায় ও পাপ বলে' মনে করব। আমি ত অজস্র পাচ্ছি তোমার কাছ থেকে, কেন মিথ্যে ছুটব তার পিছনে ? আমার কালি দিয়ে কেন কলঙ্কিত করব তার স্বাধীন প্রেমের পথ ? কিন্তু তুমি কি জান কাকে সে ভালবাসে ?"

মঞ্জরী বল্লে—"যদি বলি—জানি এবং সে লোকটি কানাইবাবু—বিশ্বাস করবে ?"

সুকুমার বল্লে—"তা অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে আমারও একটু একটু সন্দেহ ছিল। আমি দেখছি যে কানাইবাবুর আদর্শ প্রভাব বিস্তার করেছে তার মনের মধ্যে। নারীহৃদয়ের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করা কেবল ভালবাসার দ্বারাই ঘটতে পারে এবং সে নীচু তারে বাঁধা ভালবাসা নয়, এবং সুজাতার পক্ষে যে ভালবাসা ঘটবে তা উঁচু তারেই হবে বাঁধা। আমার মধ্যে সে মনুষ্যত্ব নেই, সে তেজস্বিতা নেই, যা আছে কানাইবাবুর মধ্যে। দু'জনে দাঁড়িয়ে ছিলাম এক জায়গায়, কিন্তু যেখানে কানাইবাবু পড়লেন ঝাঁপিয়ে সেখানে আমি ভীরুর মত এলুম পালিয়ে। সেই জন্যই হয় ত চিরদিনের বন্ধুতা থাকা সত্ত্বেও আমাকে অবলম্বন করে' সুজাতার মনের রস দানা

বাঁধতে পারে নি। কিন্তু তুমি কি কোনও প্রমাণ পেয়েছ ? সুজাতা কি তোমায় কিছু বলেছে ?"

সুকুমারের কথা শুনে মঞ্জরীর মুখ হর্ষদীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। তার মন বলে' উঠ্‌ল—মানছ ত তুমি নিজেই যে কানাইয়ের কাছে তুমি একটা ভেড়া। কিন্তু সে কানাই ত আমার। কিন্তু কি হবে কানাইকে দিয়ে ? তার লোমে ত শাল প্রস্তুত হবে না !

মঞ্জরী বল্লে—"সুজাতা আমার বন্ধু। তুমি আমার দিকেও ছুটবে আর তার দিকেও ছুটে চলবে, এ করে' করবে তার অমঙ্গল। এ যদি আমি আশঙ্কা না করতুম তবে তোমাকে এ কথা বলতুম না। যদি জানতুম তোমার মন কখনও তার দিকে পড়তে পারে, আমি কখনও টানতুম না তোমায় আমার দিকে। আমি দেখলুম তোমার অসহায় একটা এত বড় হৃদয় একটা অসম্ভবের সন্ধানে চলেছে, ব্যথা পাচ্ছ তুমি পদে পদে, তাই অনেকদিন থেকে আমার হৃদয় দ্রব হচ্ছিল তোমার দিকে। মনে পড়ে সেই বোটানিকাল গার্ডেনের কথা ? তুমি ত সেইদিনই আমার হাতখানা টেনে নিয়েছিলে বন্ধু বলে'। কিন্তু সেদিন আমি তোমায় প্রশ্রয় দিই নি, বলেছিলুম সুজাতাকে এগিয়ে দিয়ে আমি থাকব পিছনে। স্মরণ করে' দেখ আমার প্রতি ব্যবহারে আমি তাই করেছি কি না। সুজাতার হৃদয়ে আঘাত দিতে চেষ্টা করে' তোমার হৃদয় হ'ল বিদীর্ণ, সুজাতার হৃদয় টোল খেল না, সে প্রতিহত হয়ে ছুটে চল্‌ল অন্য দিকে। আমি তোমার বিদীর্ণ হৃদয় জুড়ে দিতে লাগলুম আমার স্নেহ দিয়ে, তবু আশঙ্কিত হলুম সেখানে দাগ দেখে'। ভেবে দেখ আমার সমস্ত কথা সত্য কি না। আজও যদি তুমি আমাকে বল যে তুমি আর আমায় চাও না, আমি মুক্ত করে' দেব তোমার পথ। শুধু তোমার যে

ছবিটি পড়েছে আমার হৃদয়ে তাকে উজ্জ্বল করে' রাখব সন্ধ্যারতির প্রদীপশিখা দিয়ে, সেটুকু থাকবে আমার সমস্ত জীবনের সম্পত্তি হয়ে।"

তার চোখ দু'টি হয়ে এল অশ্রুসিক্ত, এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল সুকুমারের হাতের উপরে। সুকুমার চমকে উঠে তাকালে মঞ্জরীর মুখের দিকে, একান্ত বিগলিত হয়ে টেনে নিল তার হাতখানা, কাঁধের উপর টেনে নিল তার মাথা। অত্যন্ত বিগলিত হয়ে বল্লে—"জানি মঞ্জরী, জানি, তুমি নইলে আমি বাঁচতুম না।"

কিছুক্ষণ রইল দু'জনে স্তব্ধ। দক্ষিণের বাতাস মৃদুমন্দ দোলা দিয়ে যেতে লাগল মঞ্জরীর সযত্নবিন্যস্ত চূর্ণকুন্তলে, তার মণিপ্রোদ্ভাসিত কর্ণাভরণ পশ্চিম সূর্য্যের আলোতে ঝক্‌মক্ করে' লাগল দুলতে। কোনও দেবলোকের দূত যদি সেখানে উপস্থিত থাকত সে প্রত্যক্ষ করতে পারত বিশ্বমোহিনী মায়া আজ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করেছে মঞ্জরীর মধ্যে আর সে মায়া সুকুমারকে আশ্রয় করে' করেছে তাকে আচ্ছন্ন। আজ সে বিক্ষেপ সৃষ্টি করবে সুকুমারের সমস্ত চিত্তের উপর, বিপর্য্যয় ঘটাবে তার জীবনে। মঞ্জরী ধীরে ধীরে তার pig leatherএর vanity case থেকে বের করলে একখানি চিঠি। অনেকদিন পূর্ব্বে কানাই মঞ্জরীকে লিখেছিল একখানা চিঠি। এ রকম অনেক চিঠিই সে লিখত। কতকগুলোতে থাকত গভীর প্রণয়োচ্ছ্বাস, আকুল আর্ত্তি। সেগুলো সব জমা করে' রেখেছিল মঞ্জরী তার একটি পেঁটরার মধ্যে। যে-সমস্ত চিঠিতে কানাইয়ের প্রেম উগ্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তার একটিও মঞ্জরী আনে নি, সে বেছে বেছে এনেছিল এমন একখানি চিঠি যাতে নাম সম্বোধন ছিল না, তারিখ ছিল না। চিঠিখানি খুবই ফিকে রঙের, কিছুমাত্র উগ্রতা ছিল না তার মধ্যে, কিন্তু যেটুকু ইঙ্গিত ছিল তার মধ্যে তাতে একথা বেশ স্পষ্ট প্রকাশ হয়েছিল যে

সে কারুর কাছে প্রণয় নিবেদন করছে এবং যার কাছে করেছে তার কাছে পেয়েছে প্রচুর উৎসাহ ও প্রশ্রয়। চিঠিখানা যদি একটু মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করে' দেখত তা হ'লে সুকুমার দেখতে পেত যে চিঠিখানির কালি এসেছে ম্লান হয়ে, কাগজখানি জীর্ণ। কিন্তু আজ সুকুমারের দৃষ্টি আচ্ছন্ন আর মঞ্জরী তার নিজের হাতে ধরেছিল চিঠিখানা এবং সুকুমারের চিঠিখানা পড়া শেষ হওয়ামাত্র সে চিঠিখানা নিয়ে টুকরো টুকরো করে' ছিঁড়ে বল পাকিয়ে ফেলে দিলে রেলিংএর বাইরে ভাগীরথীর গর্ভে। সুকুমার ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—"এ চিঠি তুমি পেলে কোথায় ?"

মঞ্জরী বল্লে—"পুলিশ খানাতল্লাসী করতে যখন আসে আমি তখন সেখানে ছিলাম। পাছে পুলিশের লোকেরা কানাইয়ের চিঠিগুলি পেয়ে সেগুলি নিয়ে তার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে সেই ভয়ে সকলের অলক্ষ্যে সে আমার হাতে এক তাড়া চিঠি দিয়ে দেয়। তারই মধ্য থেকে একখানা চিঠি কোনক্রমে রয়ে গিয়েছিল আমার এই ব্যাগেব মধ্যে। নইলে তার চিঠি আমি দেখতুমও না, পড়তুমও না। তার আর সমস্ত চিঠি আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।"

ষ্টীমার গিয়ে পৌঁছাল রাজগঞ্জের ঘাটে। সুকুমার ও মঞ্জরী উভয়েই ঈষৎ বিষণ্ণভাবে ঘাটে নেমে এল। ঘাটে নেমে কিছুক্ষণ তারা বসল ঘাটের উপরে। ষ্টীমার দিল ছেড়ে। মঞ্জরী বল্লে—"তুমিও ভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে গেছ দেখছি, ষ্টীমার যে ছেড়ে দিল, এখন যাবে কি করে' ?"

সুকুমার বল্লে—"ও আমি ইচ্ছা করে'ই ছেড়ে দিয়েছি। রাজগঞ্জে ভাল ভাল পানসী পাওয়া যায়, একখানা পানসী ভাড়া করে' কলকাতায়

ফিরে যাওয়া যাবে। কোটালের জোয়ার আর একটু পরেই আরম্ভ হবে, কলকাতায় যেতে বেশী সময় লাগবে না।"

মঞ্জরীর মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল—যেন অকালের বিকচ কদম্ব। প্রাচীনকাল থেকে মায়াবিনীরা ভেসে আসে মায়াপুরীর ভেলায়, মানুষের হাড়ে খেলে তারা যাদু। আজ এই তরুণীর মনে এই তরীতে ভাসান দিল তার কল্পনার মায়ামন্ত্রগুলি। কিছুক্ষণ পরে মঞ্জরী বল্লে— "তুমি এত ভাবাবিষ্ট হ'লে কেন? তোমার বাঁধা নোঙর ছিঁড়ল নাকি?"

সুকুমার বল্লে—"নোঙর যে কোথায় বেঁধেছিলুম তা ত মনে করতে পারি না, কিন্তু হয় ত বা কোথাও মনের অজান্তে দু'একটা রশিরশা তীরতরুতে আট্‌কে ছিল। সেগুলো ছিঁড়ে দিয়ে মুক্ত হ'ল আজ আমার চিত্ত।"

মঞ্জরী বল্লে—"মুক্তি কে পেল না পেল সে কথা নির্ভর করে না মানুষের নিজের মুক্তিবোধেব উপর, সে কথা নির্ভর করে বাস্তব সত্যের উপব। আজ যেখানে মুক্ত মনে নিজেকে করে' দিয়েছ রওনা, ভাসিয়েছ পাল, ভেবেছ তীরের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে ছিন্ন, হঠাৎ হয় ত দেখবে দাঁড় আর চলে না, নৌকা ঠেকেছে চড়ায়।"

সুকুমার বল্লে—"তুমি কি বলতে চাইছ?"

মঞ্জরী বল্লে—"তোমাকে আমি ভালবাসি। ভালবাসা চায় না গ্রাস করতে, সে চায় মঙ্গল বিতরণ করতে। আমি চাই না আজ তোমার এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের অবসর নিয়ে সপ্তপদী গমনের সঙ্গে তোমার চিরদিনের গমন আবদ্ধ করতে আমার পদক্ষেপের সঙ্গে। আমি চাই না যে তোমার মধ্যে আজ যে নিস্তেজতা এসেছে, যে শৈথিল্য এসেছে,

যে আলস্য বিহ্বলতা এসেছে, কেবল এদেরই মাত্র সাক্ষী করে' কঙ্কন-সূত্রখানি গেঁথে দেব তোমার হাতের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই তুমি বলেছ, যে ভালবাসা দখলী স্বত্ব বিস্তার করে সে ভালবাসা গ্রাস করে, মুক্তি দেয় না। কিন্তু এ বিষয়ে তোমার একটা ভুল হয়েছে। যখন কেউ দখলী স্বত্ব বিস্তার করে' কাউকে গ্রাস করে' ফেলে অজগরের মত তখন তোমার এ কথা সত্য বটে, কিন্তু ভালবাসার এমন একটা স্তর আসে যখন একজনকে অপরের উপর দখলী স্বত্ব বিস্তার করতে হয় না, একজন আপন আনন্দে দখলী স্বত্ব তুলে দেয় অন্যজনের হাতে। নেওয়ার আর দেওয়ার কোনও ভেদ থাকে না সেখানে। একটি মৃণালতন্তু প্রস্তুত হয় হৃদয় থেকে হৃদয়ে, সেখানে থাকে না অগ্রপশ্চাৎ, থাকেনা সেখানে অধিকারী আর অধিকৃতের ভেদ, দু'টি হৃদয় পরিণত হয় একটি হৃদয়ে। হিন্দু বিবাহের মধ্যে বলে—'যদস্তু হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।' এ 'অস্তু'টাকে সামনে নিয়ে হয় বিবাহ, তাই 'অস্তু'টা থাকে ভবিষ্যতের গর্ভে, সে ভবিষ্যতের আশীর্ব্বাদ সফল হবে কিনা তা জানেন বিশ্বকর্ম্মা তাঁর চিত্তে। কিন্তু আমি চাই তোমাতে আমাতে বিবাহ হবে সেদিন যেদিন দেখব যে 'অস্তু'টা পরিণত হয়েছে 'অস্তি'তে। আমি চাই তোমার পূর্ব্বের কর্ম্মময়, দীপ্তিময়, চেতনার বীর্য্যময় স্বরূপ তুমি ফিরে পাও। তুমি যাও তোমার নবীন কর্ম্মক্ষেত্রে, অর্জ্জন কর তোমার নবীন গৌরব। বিরহ এসে ইতিমধ্যে দগ্ধ করুক আমাদের হৃদয়, যা কিছু কঠিন আছে আমাদের মধ্যে তা উত্তাপে যাক্ দ্রব হয়ে, যা কিছু খাদ আছে, মলিনতা আছে, ভেসে যাক্, উড়ে যাক্ তা তপ্ত প্রবাহে। তারপরে এই দ্রবীভূত কাঞ্চনপিণ্ডের মধ্যে বইবে একটি স্রোত, যে স্রোতে উভয়ের হৃদয় অভিন্ন হয়ে উঠবে একটি নূতন সত্তার মধ্যে।"

সুকুমার বল্লে—"এ কি গুরু তপস্যার ভার তুমি চাপাতে চাও আমার উপর ? এ যে আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে উঠবে।"

মঞ্জরী বল্লে—"আমাকেও ত হতে হবে তপস্বিনী, 'গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি-মধ্যস্থা বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয়া।' তেমন মহার্ঘ প্রেম আর তেমনই মহাপুরুষ পতি পেতে হলে ত তা' রূপের আগুনে বা আকর্ষণের প্রবাহে পাওয়া যায় না। তপস্যার দ্বারা যে রূপ লাভ করা যায় সেই রূপই হয় অবন্ধ্য রূপ, তাই যোগীশ্বর করেছিলেন তপস্যা। আর পার্ব্বতী যখন রূপের দ্বারা তাঁকে বিলুব্ধ করতে গিয়েছিলেন তখনই এল মদনদাহের অভিশাপ, তাই পার্ব্বতী করলেন দারুণ তপস্যা, ফলে দগ্ধ মন্মথ হলেন পুনরুজ্জীবিত। আজকের এই পবিত্র দিনকে সাক্ষী করে' কাল থেকে আমরা করব মদনদাহের ব্যবস্থা। আমি তোমার সহকর্ম্মিণী, সহযোগিনী হয়ে পাঠিয়ে দেব তোমায় নূতন কর্ম্মের দীক্ষায়। তুমি যাবে ইউরোপে, সেখান থেকে আনবে নূতন খ্যাতি, নূতন যশ। তোমার প্রতি আমার যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস হবে তোমার রক্ষা-কবচ। অগণিত ইউরোপীয় সুন্দরীদের মধ্যে বিচরণ করে'ও অক্ষত কিশলয়ের ন্যায়, অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায় তুমি ফিরিয়ে আনবে তোমার অনঘ, অনর্ঘ চিত্ত, সেই পুষ্প দিয়ে করবে আমায় আশীর্ব্বাদ। আমিও প্রস্তুত হব তোমার জন্য। আমার কণ্ঠকে করব মার্জ্জিত সঙ্গীতবিদ্যার দ্বারা, যেন সেই কণ্ঠ চিরদিন করতে পারে তোমার বিজয়গৌরবের স্তুতিগান।"

সুকুমার বিস্ময়প্রদীপ্ত চক্ষুতে কোলের কাছে টেনে আনল্ মঞ্জরীকে, তার চোখের দিকে রইল চেয়ে। তার দু'টি চক্ষু দিয়ে ঝরতে লাগল যে দুগ্ধধারা, আকাশের জ্যোৎস্নাধারার ন্যায় সেই ধারা স্নান করিয়ে দিল মঞ্জরীকে। তার হৃদয়ের পাপাভিসন্ধি যেন তীব্র বেদনাতে সাড়া

দিয়ে উঠল শিহরণের সঙ্গে এই পবিত্রতার সংস্পর্শে। ঠিক হ'ল, সেই গ্রীষ্মেই সুকুমার রওনা হবে ইউরোপে, অর্জ্জন করে' আনবে উচ্চ উপাধি আর ব্যারিষ্টারীর মানপত্র, আর মঞ্জরী শিক্ষা করবে সঙ্গীতবিদ্যা লক্ষ্ণৌয়ে থেকে।

পানসীতে ভাসান দিয়ে চল্‌ল দু'জনে। চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। তার সন্নিকটে রয়েছে হস্তা নক্ষত্র, আর একটু দূরে রয়েছে উজ্জ্বল চিত্রা। প্লাবিনী জ্যোৎস্নায় সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল হয়ে উঠেছে পুলকিত। গঙ্গার প্রবাহ ছুটে চলেছে তরলিত মুক্তার স্রোতে। সমস্ত তটভূমিতে অস্পষ্ট আলোতে সৃষ্টি করেছে আনন্দের মরীচিকা। নীড়ের পাখীরা সুপ্ত হয়েছে। দূরে গ্রামের ঘরে ঘরে জ্বলেছে মাটির গৃহদীপ। স্তব্ধ হয়েছে সমস্ত গগন, যেন পান করছে চন্দ্রলোকের সুধাসমুদ্র। সূর্য্যের আলোতে সৃষ্টি করে দেখা, রাত্রির অন্ধকার আনে অদেখা, চাঁদের আলোতে আনে দেখা-অদেখা, ব্যক্ত করে সে আপনাকে ধরা-অধরার মধ্যে, যে রহস্যের মধ্যে নিরন্তর খেলা করছে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের হৃদয়মিথুন। এই ধরা-অধরার লীলার মধ্যে একটি হৃদয় প্রবেশ করে আর একটি হৃদয়ের মধ্যে। ছুঁই ছুঁই করে, পারে না তাকে ছুঁতে, ধরি ধরি করে, পারে না তাকে ধরতে। এরই মধ্য দিয়ে আসে মায়াবিনীর মায়া, কুহকিনীর কুহক, পাপিষ্ঠার পাপ, পাপিষ্ঠের লোভ। এরই মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় সুজনের প্রীতি, এরই মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে নলিনীদলের ন্যায় পবিত্র প্রেমের মিলন-জ্যোতি। এরই মধ্যে আসে বিচ্ছেদ, এরই মধ্যে আসে মিলন, বিচ্ছেদে মিলনে একাত্ম হয়ে জেগে ওঠে একটি নবীন সঙ্গীতধারা, বিশ্বের প্রতি স্পন্দনের মধ্যে যাকে পারা যায় অনুভব করতে। জ্যোৎস্নালোকে প্রতিবিম্বিত রশ্মিধারা ছন্দে ছন্দে নেচে চলেছে

ভাগীরথীর উর্ম্মিধারায়, সেই স্রোতে জোয়ারের টানে ভেসে চলেছে দু'টি মিথুনহৃদয় আপন আপন কল্পিতলোকের মধ্যে। তার মধ্যে আজ যে মিলন দিয়েছে একাত্মভাবে আপনাকে ধরা সে যে কোন্ অ-ধরার মধ্যে বিলুপ্ত হবে তাই যেন চিন্তা করে' নিমেষে নিমেষে ভেসে উঠছিল আকাশের উদ্‌ভ্রান্ত চন্দ্রমা, রশ্মিধারায় তার ইঙ্গিত চলছিল দূরবর্ত্তী চিত্রা নক্ষত্রের সঙ্গে। বিধাতার হাস্য কি সুন্দর, কি মধুর! আবার কি কঠোর, কি ভীষণ!

দশম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ কলিকাতার ব্যানার্জিবংশ সুপ্রসিদ্ধ। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় থেকেই এই পরিবারের ভাগ্য খুলতে আরম্ভ হয়। তদানীন্তন ব্যানার্জি পরিবারের কর্ত্তা কেনারাম বাবু জাহাজে ষ্টিভেডোরের কাজ করতেন এবং এই উপলক্ষ্যে নানা জাতীয় বণিকসাহেবের সহিত পরিচয়ে ব্যবসা সুরু করে' দেন। তারপর নানা প্রকার আমদানি রপ্তানিতে ও ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের কল্যাণে এই পরিবারের কর্ত্তারা বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। পরিবারে কোনও অনাচার ছিল না এবং বহুপরিবার না থাকাতে চঞ্চলা লক্ষ্মী এখানেই পেতেছিলেন তাঁর স্বর্ণকমলের কায়েমী আসন। সেকালের যে সমস্ত বাবুরা সাহেবদের সহিত কর্ম্ম করতেন তাঁদের ইংরেজী জ্ঞান প্রায়ই তিব্বতী ধরণের হ'ত। তিব্বতীরা প্রায়শঃই অনুবাদ করতে গেলে কথার কথার অনুবাদ করে' থাকে; যেমন, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে'র অনুবাদ তিব্বতী মতে হবে God Moon Knowledge Ocean। কেউ হয় ত সাহেবকে জানাবেন যে জাহাজখানা একাশী হয়ে অর্থাৎ কাৎ হয়ে পড়েছে, তিনি অতি সাহসের

সহিত সাহেবকে বল্লেন—Sir, sir, the ship is 81। শোনা যায়, একবার বারাণসী ঘোষের ভাড়াটে বাড়ীতে অনেকগুলি সাহেব বাস করত কিন্তু তারা ভাড়ার টাকা সহজে দিতে চাইত না। বারাণসী ঘোষ নিজে অতি ধনী ব্যক্তি ছিলেন এবং ভাড়ার টাকা ক'টা না পেলেও তাঁর কোন ক্ষতি ছিল না। অথচ ভাড়া করে' ভাড়ার টাকা দেবে না এ কোন ফ্যাসাদ! তিনি নিজে তাগিদ দিতে গেলেন। বল্লেন—give ত give, not give ত Baranashi Ghosh's plantain. সেকালে এই রকম ইংরেজীতে যে কাজ চলত তার শতাংশের একাংশও বর্ত্তমান এম্-এ, পি-এইচ্-ডি-দের দ্বারা চলে না। ব্যানার্জি বংশের বাবুরা ইংরেজীশিক্ষার বহুল প্রবর্ত্তনের পরেও তাঁদের পূর্ব্বের ইংরেজী কায়দা ছাড়লেন না। সেকালের সাহেবেরা বাঙালী-দের বেশী ইংরেজী জানা পছন্দ করতেন না, পরন্তু যাদের Pigeon English নিয়ে উপহাস করতেন হৃদয়ে থাকতেন তাদের প্রতি সদয়। এই ব্যানার্জি বংশে অধ্যাপক অবিনাশ বাবুর জন্ম হয়। বাল্যাবস্থায় তাঁর শরীর কিছু অপটু ছিল, কিন্তু নিয়মিত ব্যায়ামাদি ও সংযমের ফলে অবিনাশবাবু নীরোগ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোপানপরম্পরা সকলের অগ্রণী হয়ে উত্তীর্ণ হলেন। সরস্বতী কমলবন পরিত্যাগ করে' আসন গ্রহণ করলেন তাঁর হৃদয়ে ও কণ্ঠে। তাঁর পিতা সতীনাথ বাবু মেধাবী পুত্রের বিদ্যালিপ্সা দেখে' তাকে বল্লেন—কুলক্রমে টাকা ত এ বংশে ঢের জমেছে, ব্যাঙ্কের খাতায় লক্ষ্মীর পাদচারণ নৃত্যে পরিণত হয়েছে; এখন তুমি বরং সুখে লেখাপড়াই কর। লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীকেও ব্যানার্জি পরিবারে বাঁধতে পারবেন এই ছিল তাঁর মনের দুরাশা। একমাত্র পুত্র বলে' পিতা সতীনাথ ছিলেন একান্ত পুত্রগতপ্রাণ। অবিনাশবাবুর মাতা অবিনাশবাবুকে

অল্পবয়সী রেখে মারা যান। বাড়ীতে লোকজন, দাসদাসীর অভাব ছিল না, তথাপি শৈশবে সতীনাথবাবু যতটা পারতেন নিজেই পুত্রের দেখাশুনা করতেন। এক শয্যায় তাঁকে শোওয়াতেন এবং ভোরবেলা নানা প্রাচীন স্তোত্র তাঁর সহিত পাঠ করতেন। তাঁকে অতি প্রত্যূষে ব্যায়াম করাতেন ও গাড়ীতে করে' তাঁকে নিয়ে বড়গঙ্গায় স্নান করিয়ে আনতেন। বাড়ীতে ছিল কুলক্রমাগত রাধামাধবের মন্দির, পিতা-পুত্র এসে তারপর রাধামাধবের পূজারতি দেখতেন। এইভাবে সতীনাথবাবু তাঁর পুত্রের হৃদয়ের মধ্যে কুলক্রমাগত এমন একটা ধর্ম্মসংস্কারের ছাপ গভীরভাবে অঙ্কিত করে' দিয়েছিলেন যে পরবর্ত্তী কালের শিক্ষায় তা একটা নূতন অর্থ নিয়ে অভিব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কদাচ মুছে যায় নি।

অনেক পরিবারে শিক্ষিত পিতামাতা আপন আপন নিঃসংস্কার বা স্বল্পসংস্কার বা অতিমার্জ্জিত-সংস্কার ধর্ম্মমত অনুসারে পারিবারিক জীবন গঠন করে' থাকেন। তার একটা বিঘ্ন এইখানে যে বাল্যজীবন অনেকটা বন্য জীবন সদৃশ। সেই জীবনে পূজাঅর্চ্চার যা কিছু বহিরঙ্গভাবে শোভন ও সুন্দর তাই মনকে আকর্ষণ করে' থাকে। সেই আকর্ষণের মধ্য দিয়ে মানুষ মূঢ়ভাবে পবিত্রতার একটা স্পর্শ পেয়ে থাকে। জ্ঞানের দ্বারা ও সাধনার দ্বারা যথার্থ অন্তরঙ্গ পবিত্রতার স্পর্শ ও পরিচয় পেলে ও তার অর্থ বুঝতে পারলে হয় ত বহিরঙ্গ পবিত্রতার মূল্য অনেক কমে' যেতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ তা না ঘটে ততক্ষণ বলপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার বাহ্যিক পবিত্রতা দৈনন্দিন জীবনে অস্বীকার করলে যে ইতিহাসের দ্বারা মানুষ প্রথম বাহ্যিক পবিত্রতা ও নানাপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান বা ritual এর মধ্য দিয়ে অন্তরঙ্গ পবিত্রতা-কে ও উজ্জ্বল জ্ঞানের নৈষ্কর্ম্যকে পেরেছে আবিষ্কার করতে, সে

ইতিহাসকে যায় ভুলে, সমাজে ঘটে দারুণ বিভ্রম। এই বিভ্রমের ফলে বৌদ্ধদের পরিবারে ঘটেছিল দারুণ তান্ত্রিকতার দুর্নীতি এবং খৃষ্টপুত্র-দের মধ্যে ঘটছে অখৃষ্টীয়তা, উচ্চশিক্ষিত হিন্দু ও ব্রাহ্ম পরিবারে প্রকাশ পাচ্ছে নিরীশ্বরতা।

অবিনাশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে Physics ও Chemistry অধ্যয়ন করেছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি যে শুধু ঐ দুই শাস্ত্রেরই অধ্যয়ন চালাতে লাগলেন তা নয়, সরস্বতীর রাজহংসের পায়ের সহিত তিনি আপনাকে বেঁধে দিয়ে উড্ডীন হ'তে চাইলেন বিদ্যার মানসলোকে, শিখতে লাগলেন ইউরোপীয় নানা ভাষা এবং মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন সংস্কৃত। ইউরোপের নানা স্থান থেকে প্রতি সপ্তাহে আসতে লাগল ঝাঁকা ঝাঁকা বই আর অবিনাশবাবু সেই গ্রন্থসমুদ্রের মধ্যে ডুব দিলেন, ডুবুরীর মত অন্বেষণ করে' সংগ্রহ করতে লাগলেন গভীর সমুদ্রের তলস্থিত মণিমুক্তারাজি। অবিনাশবাবু ছিলেন দীর্ঘকায়, উন্নতনাসিক, আয়তচক্ষু; তাঁর কর্ণযুগল ছিল অতি বিস্তৃত এবং রং ছিল উজ্জ্বল শ্যাম; চক্ষুর দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ, বুদ্ধির দীপ্তি ছিল সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রখর, অনুভবের সমৃদ্ধি ছিল জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ; সর্ব্বোপরি পরিশ্রম করবার শক্তি ছিল অসাধারণ, দেহে মনে কোথাও ছিল না তাঁর ক্লান্তি। তাঁর ভিতরে চলত একটা ইঞ্জিনের আগুন, তার উত্তাপে তাঁর বুদ্ধি থাকত সর্ব্বদা জাগ্রত, সর্ব্বদা চলনশীল। অনেক প্রতিভাসম্পন্ন লোকই তরুণ বয়সে আপনাদের মধ্যে একটা উৎসাহের আগুন অনুভব করে' থাকেন। বয়লারের জলের মত এই উৎসাহের আগুনে তাঁদের মন টগ্‌বগ্‌ করে' ফুটতে থাকে, কিন্তু কাজের চাকাগুলো হয় ত চায় না চলতে, নয় ত এপথে ওপথে বিপথে চলতে গিয়ে কোন সময় গেঁথে যায় কাদার মধ্যে, কোন

সময় পড়ে গিয়ে খানায়, নির্দ্দিষ্ট বাঁধা পথের সন্ধান জানতে জীবনের অনেকখানি সময় যায় বৃথা কেটে। কিন্তু অবিনাশবাবুর বেলা ভিতরের আগুনের সঙ্গে কাজের চাকাগুলো লাগল সায় দিয়ে ঘুরতে এবং তারা ছুটতে লাগ্‌ল বাঁধা লাইনের উপরে। তাই তাঁর পথ হ'ল নির্দ্দিষ্ট এবং গতিবেগ হ'ল ক্রমশঃ দ্রুত থেকে দ্রুততর। অনেক লোক আছে যাদের প্রচুর বুদ্ধিপ্রাখর্য্য আছে অথচ তারা জানে না যে তাদের মনের ভারকেন্দ্রটি কোথায়। তাই চলতে গিয়ে বারবার হয় তাদের স্খলন পতন। তাদের মনকে তারা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে না, তাই বাইরের উত্তেজনা অনুসারে নিয়মিত হ'তে চায় তাদের গতি। ক্ষণে ক্ষণে হয় তারা দিগ্‌ভ্রষ্ট। কলুর বলদ ঘানির চারিদিকে দিবারাত্র ঘুরে'ও ঘানিখানার বাইরে যেতে পারে না, তেমনি অনেকে ঘুরপাক খেতে থাকে নিজের চারিদিকে, কি করবে তা তারা নিজেরা জানে না এবং পথও খুঁজে পায় না, তাই কিছু পরিশ্রম করে' পড়ে হতাশ হয়ে।

বুদ্ধির প্রাখর্য্যে ও মেধাবিতার গুণে অনেকে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত লাফিয়ে পার হ'তে থাকে তখন বাইরের লোক অনেকসময় অনুমান করে যে এ ঘোড়া যেন কতই ছুটবে। কিন্তু পরীক্ষার hurdle-race শেষ হবার পর সে ঘোড়া ধীরপদবিক্ষেপে ফিরে আসে তার আস্তাবলে, কারণ হয় ঐটুকু ছুটতেই তারা পড়ে নিস্তেজ হয়ে নয় ত পথ জানে না বলে' আশ্রয় নেয় চিরবিশ্রামের। পরীক্ষা বিজয়ের মধুর ফলটি খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে সারা জীবন বসে' খেতে থাকে, অন্য ফলান্বেষণ করে না। কেবল পাখা চালাতে জানলেই কোন পাখী মানস সরোবরে গিয়ে পৌঁছতে পারে না, থাকা চাই তার পাখার বল, যে বল কখনও ক্লান্ত

হবে না। নিরন্তর চলবে তার পাখার ছন্দ। তার প্রতি ছন্দে পাগল হয়ে ছুটবে তার শক্তি, দিনরাত্রি নিরন্তর চললেও তার প্রয়োজন হবে না কোন বিশ্রামের। যে হংসের থাকে তেমনি পাখার জোর তারাই উড়ে' যায় মানস সরোবরে, অন্য হংসেরা ডানা খুঁটে' খুঁটে' আপন সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করে, পুকুরে কাটে সাঁতার এবং বাড়ীতে এসে ডিম পাড়ে ও তা দেয়। একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী বলেছিলেন যে অনেক শিক্ষার্থীরই ছবি আঁকবার সাধারণ দক্ষতা আছে, হয় ত বা প্রতিভাও আছে, কিন্তু সে'ই হয় যথার্থ শিল্পী যে অতি সামান্য অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ প্রকাশ করবার জন্য আনন্দে করতে পারে অসীম পরিশ্রম। জ্ঞানসাগরের তীর্থযাত্রীর পক্ষে তাই আবশ্যক হয় প্রখর বুদ্ধি ও মেধা, অসীম ধৈর্য্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা। সে'ই এই মানসিক পরিশ্রম করতে পারে যার দেহে থাকে অফুরন্ত বীর্য্য আর যার পরিশ্রমের প্রেরণা আসে একটা অসীম আনন্দের উৎস থেকে। কেবল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ পারে না কখনও অসীম পরিশ্রম করতে। নিজের চলবার ছন্দে যে আনন্দ পায় না সে চলতে চলতে পড়ে ক্লান্ত হয়ে। সমস্ত জীবনের মূলে রয়েছে আনন্দ। আনন্দ থেকেই করতে পারি আমরা সৃষ্টি। প্রতি চলায় আমাদের ঘটে ক্ষয়, সেই ক্ষয় যদি পূর্ণ না করে মনের আনন্দ তবে মানুষ কখনও পারে না অসীম পথ চলতে। গতির সঙ্গে যখন আসে আনন্দ, আনন্দের সঙ্গে যখন ফোটে গতি, তখনই মানুষ ছুটতে পারে দুরারোহের আরোহণে।

জীবনীশক্তির যে স্বচ্ছন্দতায় মানুষ চলতে পারে তাকেই বলা যায় চরিত্র। 'চর্'-ধাতুর অর্থ 'চলা', আর 'চরিত্র' অর্থ 'যা' দিয়ে চলা যায়'। মানুষ চলে তার চিত্তের সহজ আনন্দের স্বচ্ছন্দতায়। যখনই কোনও বাইরের বস্তুকে অপেক্ষা করে' কিংবা অন্য কোনও বস্তুর

আকর্ষণে এই চলনধর্ম্মের ঘটে বিচ্ছেদ তখন তাকেই বলা যায় চরিত্র-পাত বা চরিত্রপতন। চিত্তের স্বচ্ছন্দগতিতে চলেছে চলা আর তাকে পূর্ণ করে' রেখেছে চলনের আনন্দ। মানসযাত্রী হংস দেখায় তার এই চরিত্র তার সাবলীল, সহজ, অক্লান্ত চলনের বেগের মধ্যে। যদি এই চল্‌তি পথের হংসযাত্রী কোনও বিম্বফলে আকৃষ্ট হয়ে তার চলনধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে বাঁধতে চায় সেখানে তার বাসা কিংবা বিলুব্ধ হয় তার প্রলোভনে, তখনই হয় তার চলনধর্ম্মের বিচ্ছেদ, তখনই হয় সে চরিত্রহীন। স্বচ্ছন্দ চলনই জগতের সত্য রূপ, তাই সত্যের সঙ্গে বাঁধা আছে চরিত্র। যখন মানুষ তার এই স্বচ্ছন্দ আত্মস্ফূর্ত্ত আনন্দের অভিব্যক্তির বাইরে খুঁজতে যায় তার সুখ আর তাতে ভ্রষ্ট করে তাকে তার চলন থেকে, তখনই সে হয় চরিত্রচ্যুত। চলার স্রোতের মধ্যে আসতে পারে ক্ষণিক ভুলভ্রান্তি, ক্ষণিক লোভমোহ, কিন্তু তা ভেসে যায় চলার স্রোতে, যেমন বন্যার জোয়ারে ভেসে যায় কত অপবিত্র মলিনতা, কত পঙ্করাশি। তাতে স্রোতের হয় না কোনও ক্ষতি। সে চলে তার দুর্দ্দাম বেগে এবং তার ফলে সে আবহন করে' আনতে পারে তার চরম পরিণতি। কেবলমাত্র মন্দের আকর্ষণ থেকে নিবৃত্ত হওয়াকে চরিত্রবত্তা বলা চলে না, সেটা কেবলমাত্র একটা negative ধর্ম্ম। যেখানে চলন নেই সেখানে চরিত্রও নেই। যে নিরন্তর চলছে, আকস্মিক লোভমোহের আকর্ষণে তার অন্তরে যে রয়েছে চলনের সম্পদ তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। সে নিরন্তর ব্যবহার করছে আপন বীর্য্যকে, ফুলে ফুলে উঠছে তাতে তার হৃদয়ের অফুরন্ত আনন্দ, তা সার্থক করছে তার গতিবেগকে। এই চরিত্রবত্তাই হচ্ছে জ্ঞানযাত্রীর প্রধান সম্পদ। চরিত্রকে ইংরেজী-তে বলে character। এই character হ'ল সেই সম্পদ যে

সম্পদের দ্বারা মানুষ নিরন্তর ব্যক্ত করতে পারে আপনার গতিবেগ দূর থেকে দূরতর লোকে, ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধতর লোকে। এই চলন-ধর্ম্ম শুধু দেহের পরিস্পন্দ নয়, এ প্রধানতঃই হচ্ছে মনের পরিস্পন্দ, চেতনার পরিস্পন্দ, ভাবের পরিস্পন্দ। বুদ্ধি, অনুভব এবং ভাবানু-প্রবেশের মধ্য দিয়ে চিত্ত যখন নিরন্তর আবিষ্কার করতে থাকে আপন গতিস্বভাব আপন চলনধর্ম্মের মধ্য দিয়ে, তখনই তাকে বলা যায় যথার্থ চরিত্রবান। সমগ্রপুরুষীয় অভিব্যক্তির মধ্যে যখন মানুষ নিরন্তর সাক্ষাৎ করতে থাকে আপন চলনধর্ম্ম তখনই সে অগ্রসর হ'তে থাকে আপন গন্তব্য পথের দিকে। চরিত্রবত্তা দেশহিতৈষণা নয়, সাধুতা নয়, সত্যবাদিতা নয়, ব্রহ্মচর্য্য নয়, অস্তেয় নয়, অপরিগ্রহ নয়, কিন্তু এই সমস্তের সারভূত যে চলনধর্ম্ম, যে আত্মবিকাশধর্ম্ম, আত্মপ্রকাশধর্ম্ম, তাকেই বলা যায় চরিত্রবত্তা। এ চরিত্রবত্তা মানুষের সমগ্রপুরুষীয় বা personalityর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। মানুষের মধ্যে একদিকে আছে পশুধর্ম্ম, একদিকে আছে মনোধর্ম্ম, আর একদিকে আছে তার অধ্যাত্মধর্ম্ম। মনোধর্ম্মের দ্বারা আমরা পেয়েছি জীবনযাত্রার নূতন অস্ত্র, পেয়েছি জ্ঞানসম্পদ, আর অধ্যাত্মধর্ম্মের দ্বারা আমরা পশুস্বভাবকে পারি অতিক্রম করতে। মানুষের মধ্যে তাই নিরন্তর চলেছে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সামঞ্জস্য না ঘটাতে পারলে চরিত্রধর্ম্ম হয় ব্যর্থ, চলন হয় পঙ্গু। আমাদের মধ্যে যে পশু-প্রবৃত্তি আছে তার খোরাক না যোগালে দেহ যায় ভেঙ্গে, দেহে উৎপন্ন হয় ব্যাধি, চলন হয় ব্যাহত। মানুষের মধ্যে আছে যে মনোধর্ম্ম তা দ্বারা আমরা পাই জ্ঞানলোকের সম্পদ, এ লোকের মধ্যে যে গতি সে গতি অনন্ত অক্ষয়। তাই আমাদের গতির স্ফুরণ যদি অসীমার দিকে নিয়ে যেতে হয় তবে সেটাকে সম্পন্ন করতে হয় বুদ্ধির বায়ুলোকে। পশুধর্ম্মের

মধ্যে আমাদের যে প্রবৃত্তি থাকে সে প্রবৃত্তি সহজেই হয় নিবৃত্ত। পশুধর্ম্মের মধ্যে থাকে প্রতিস্পৰ্দ্ধিতা আপন প্রবৃত্তি-সাফল্যের জন্য। এই পশুধর্ম্ম যখন প্রতিবিম্বিত হয় মনের মধ্যে তখন তা দেখা দেয় মান, ঈর্ষ্যা, দম্ভ, খ্যাতি, যশ, শক্তিসঞ্চয় প্রভৃতির প্রবৃত্তির মধ্যে। এই প্রবৃত্তিগুলির পরিপূরণ করার কোনও সীমা নেই। পশুধর্ম্ম মনোধর্ম্মে প্রতিবিম্বিত হয়ে পায় একটা অসীমতা। কিন্তু এই অসীমতা নিরন্তর থাকে দ্বন্দ্বসঙ্কুল হয়ে, তাই জীবনের কোনও স্তরে এদের উপকারিতা থাকলেও নিরুপাধি চরম গতির তুলনায় এরা বাধাসম্পন্ন। এ গতি সে গতি নয় যে গতি ঘটে দূরচারী বিহঙ্গের আকাশের মধ্যে। তবু এদের একটা সহচারিতা বা সহযোগিতা নিরন্তর সহায়ক হয় মানুষের আদর্শের দিকে যে গতি, অধ্যাত্মলোকের দিকে যে গতি, সেই গতির পরিপূর্ণতার জন্য। পাখী ওড়ে আকাশে, মানুষও বিচরণ করে অধ্যাত্মলোকে, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে পাখী তার ডানা দিয়ে পিছনে ঠেলে' দেয় বাতাসের স্রোতকে, তবেই হয় তার যথার্থ গতি ঊর্দ্ধলোকে এবং মানসলোকে। তেমনি আমাদের বুদ্ধির সম্পদকে এবং বুদ্ধির মধ্যে রয়েছে যে সমস্ত দ্বন্দ্বের বাধা সেগুলিকে নিরন্তর ঠেলে' দিতে হবে আমাদের গতির বেগের দ্বারা, তবেই সম্পন্ন হ'তে পারবে আমাদের মহাকাশে বাধাহীন গতি। দেহের প্রবৃত্তিকে তার প্রয়োজনের অধিক প্রাধান্য দিলে যেমন গতি হয় ক্ষুণ্ণ, তেমনি বুদ্ধির সম্পদকে যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাধান্য দিই তবে তা ক্ষুণ্ণ করে আমাদের অধ্যাত্ম-লোকের গতি। বুদ্ধির সম্পদকে যখন ব্যবহার করতে পারি আদর্শলোকের আকর্ষণে, তখনই আমাদের গতিবেগ হয় বর্দ্ধিত এবং গতি হয় অব্যাহত। পাখী যখন আকাশে বাতাসের ঘূর্ণীর মধ্যে পড়ে' নিজের তাল রাখতে চেষ্টা করে তখন তার সমস্ত সামর্থ্য ব্যয়িত হয়

তার এই তাল রাখার সামঞ্জস্যটুকু বজায় রাখার জন্য, তার সম্মুখের গতি হয় ব্যাহত। সম্মুখের আদর্শ যখন তাকে প্রবলভাবে টানে তখনই সে ছুটতে থাকে মানস সরোবরের দিকে, নইলে সে হয় ত আকাশে ওড়ে বটে কিন্তু সে ওড়া ওড়ার জন্য নয়, সে ওড়া ভূমিস্থ আহারের লোভে। সে ওড়া ক্ষণিক ওড়ার আনন্দের লোভে, তাই সে ওড়া নিরন্তর নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ভূমিলোকের সঙ্গে। তা তাকে মুক্ত করে' দেয় না অবাধ সঞ্চারের দিকে, তাই যখন মানুষ করে কেবল জ্ঞানের বিলাস, জ্ঞানকে করে যখন সে তার পার্থিব ভোগ সাধনের উপায়, তখন সে জ্ঞান দিতে পারে না তাকে বিমল আনন্দ, যে আনন্দ নির্ব্বাধ পক্ষীকে অনন্ত আকাশের মধ্যে মানস সরোবরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এইখানেই ঘটে চরিত্রের দ্বন্দ্বের সমাধান, চরিত্রের রহস্যের উদ্ঘাটন।

অবিনাশবাবুর ছিল এই ধরণের একটা চরিত্রবত্তা। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা তাঁকে বেঁধে রাখত না একটা গণ্ডীর মধ্যে, ছেড়ে দিত মুক্তির একটা প্রশস্ত গণ্ডী থেকে আর একটা প্রশস্ততর গণ্ডীর মধ্যে। মানুষের চরিত্রের মধ্যে যে জাতীয় সামঞ্জস্যের কথা উপরে বলা হয়েছে যথার্থভাবে কল্পনার দ্বারা প্ল্যান এঁটে কেউ সেভাবে চলতে পারে না। সেটা হ'ল চরিত্রের একটা উপাদান। কাক ওড়ে, দোয়েল ওড়ে, ফিঙ্গে ওড়ে, বক ওড়ে, চিল ওড়ে, শকুনি ওড়ে, পায়রা ওড়ে, চক্রবাক ওড়ে, বকেরা উড়ে যায় সারি বেঁধে। চেয়ে দেখলে দেখা যাবে যে যদিও সকলে ডানা মেলে' ওড়ে তথাপি তাদের প্রত্যেকের ওড়ার ভঙ্গী একেবারে পৃথক। ছোট যাদের ডানা, অল্প একটু বাতাস তারা কাটতে পারে তাদের ডানা দিয়ে, তাই বারবার দিতে হয় তাদের ডানার দোলা। চিল, শকুনি প্রভৃতি বড়

বড় পাখীরা ডানার প্রত্যেকটি ঝাপটে অনেকখানি বাতাস কাটতে পারে, তাই দু' চারটে ডানার ঝাপট দেওয়ার পর ডানা স্তব্ধ করে' সেই গতিতে সামনের দিকে ঠেলে' দিতে পারে তার শরীরটাকে। কিন্তু এই বড়ছোটর পার্থক্য ছেড়ে দিলেও প্রত্যেকটি পাখীর ওড়ার ভঙ্গী একেবারে স্বতন্ত্র রকমের। সেই ভঙ্গী পাখী আয়ত্ত করে নি অভ্যাসের দ্বারা, কিন্তু সেই ভঙ্গী তার স্বাভাবিক গতিপ্রক্রিয়ার অন্তর্লীন সম্পত্তি। মানুষেরও চলবার পদ্ধতির মধ্যে একটা কাঠামো আছে, সে কাঠামো তার জন্মগত, তার ধাতুগত, তার প্রকৃতিগত। সেটাকে সে তৈরী করে না, সেটাকে সে নিয়ে আসে তার জীবনের সঙ্গে। নিজের চেষ্টায় যেটুকু পরিবর্ত্তন সে ঘটায় সেটুকুরও বীজ থাকে সেই কাঠামোর মধ্যে। এই কাঠামোর বিভিন্নতাতেই প্রকাশ পায় দু'জনের চরিত্রের স্বভাবগত পার্থক্য। পরিণত বয়সে হয় ত গভীর আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা নিজের স্বভাবকে কেউ পারে আবিষ্কার করতে, কিন্তু তার আবিষ্কার করার বহু পূর্ব্বে থেকে তার স্বভাব তুলেছে তাকে গড়ে'। সাধনার দ্বারা এই চরিত্রকে দেওয়া যায় দার্ঢ্য কিন্তু এর অনেকখানি থাকে প্রত্যেকের মধ্যে আপন স্বভাবে সিদ্ধ হয়ে। নিজের কাঠামোর কতটুকু পরিবর্ত্তন করা যায় তা বলা কঠিন, কিন্তু যতটুকুই হোক না কেন, তার সীমা আছে, যেমন সীমা আছে পায়রা ও দোয়েলের ওড়ার ভঙ্গীতে। হাজার চেষ্টা করলেও পায়রাকে ওড়ানো যাবে না দোয়েলের ভঙ্গীতে, দোয়েলকেও ওড়ানো যাবে না পায়রার মত।

অবিনাশবাবুর চরিত্রগত বিশিষ্টতা তাঁকে যে একটা বিশিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তা কোনও দূরদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তির দৃষ্টি এড়াত না। পঠদ্দশা থেকেই অবিনাশবাবুর দেখা যেত নানা রকমের ঝোঁক। পাশ করে' যখন বেরুলেন সরস্বতীর বরমাল্য গলায় দিয়ে,

পড়তে লাগলেন যখন রাশি রাশি দেশীবিদেশী বই, তখন এ-সমস্ত ঝোঁক কমবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, বরং অনেকদিন পর্য্যন্ত চলল এগুলো বেড়েই। অবিনাশবাবুর কোনও বন্ধু ছিল না, কোনও সহাধ্যায়ীর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, তাস পিটিয়ে বা বৃথাট্যাতে তিনি কখনও সময় কাটাতেন না। এদিকে ছিলেন তিনি ভারী কুণো, কারও বাড়ীতেই তিনি প্রায় যেতেন না। একে ধনী, তায় বিদ্বান, কাজেই তাঁর ব্যবহারকে লোকে অস্বাভাবিক দম্ভ বলেই মনে করত।

বিকেলবেলা হয়ত বেরুলেন তিনি একটা ঝুলি কাঁধে জঙ্গলের দিকে, সেখানে গিয়ে তুলতে লাগলেন নানা রকম গাছের পাতা ফুল। পাহাড়ে যাওয়ার অবসর হ'লে হয় ত কুড়িয়ে আনতেন নানা জাতীয় moss, fern, সংগ্রহ করতেন নানা রকম fungus। সেগুলোকে বাড়ীতে এনে ব্লটিংএর পাতার মধ্যে রেখে করতেন বিশুষ্ক। ছোট একটা microscope ছিল তাঁর, কোনও দিন বা তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে কেটে কেটে Botanyর বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে পাতলা ডাল ফুল এই সমস্তের নানা অবয়ব করতেন তিনি বিশ্লেষণ। বাস্তায় যখন চলতেন তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্ব্বদা সজাগ থাকত বনস্পতি ও লতাবিতান-গুলির উপরে। কোন্ গাছের কি নাম, কোন্ সময়ে বা ফুল হয়, ফল হয়, কোথায় কি কাজে লাগে, কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে ছিল তাঁর আশ্চর্য্য বিচক্ষণতা, অথচ দেখা যায় যে অনেক বয়স পর্য্যন্ত অনেকে অনেক সাধারণ গাছ ও লতার নামটি অবধি জানে না। তেমনি পরিচয় ছিল তাঁর পক্ষীকুলের সঙ্গে। বাড়ীতে অনেকখানি জায়গা জাল দিয়ে ঘিরে অনেক পাখী তিনি পুষতেন, তাদের অভ্যাস, স্বভাব করতেন তিনি অধ্যয়ন। পক্ষীদের স্বভাব সম্বন্ধে, মৌমাছিদের স্বভাব সম্বন্ধে, পিপীলিকাদের স্বভাব সম্বন্ধে

বিবিধ গ্রন্থ করেছিলেন তিনি পাঠ, কিন্তু পাঠ করে' তিনি কখনও খুসী থাকতেন না, যা পড়তেন, চাইতেন তা অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে। বইয়ের মধ্য দিয়ে যা আমাদের কাছে আসে তা আসে কঠিন পাথরের মত হয়ে, তা জমা করলে হয় ভার, সে ভারে ছিন্ন হয় মনের থলি, ব্যথা করে তা ধারণ করে' রাখতে; কিন্তু অনুভবের সঙ্গে মেলাতে গেলেই সে সমস্ত শক্ত নুড়ি তরল হয়ে যায়, পরিপাক পেয়ে যায় যেন শরীরের রক্তের মধ্যে, মনের মধ্যে যেন প্রবেশ করে নাড়ীধাতুরূপে। যে প্রকৃতির মধ্যে আমরা বাস করি তার ফুল ফল, লতা বনস্পতি, জন্তু পাখী, এরা আমাদের একান্ত স্বাভাবিক বন্ধু, স্বাভাবিক জ্ঞাতি, এদের সঙ্গে হয়ে আছি আমরা আবদ্ধ। বই পড়ে' যারা উড়ো জ্ঞান আনতে চায় অথচ চারিপাশের বস্তুর প্রতি যাদের কোনও দরদ নেই, তাদের মধ্যে স্বাভাবিক জ্ঞানের, স্বাভাবিক রতির প্রকাশ কোথায়?

অবিনাশবাবু হয় ত গভীর রাত্রে তাঁর ঘরের ছাদের উপর বসে' আকাশের নক্ষত্র অবলোকন করতেন। দিনের বেলা হয় ত ঋতুতে ঋতুতে আমাদের মাথার উপরে আকাশের তারালোকের যে নব নব আবির্ভাব ঘটে তার সঙ্গে তিনি আপন পরিচয় ঘটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর ছাদে একটা টেলিস্কোপ নিয়ত খাটানো থাকত, যখন চোখ দিয়ে পরিচয় না বুঝতে পারতেন তখন এই টেলিস্কোপ দিয়ে সমস্ত আকাশমণ্ডলীর সঙ্গে তিনি পরিচিত হতেন। এম্-এ পরীক্ষা পাশ করবার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন মেডিক্যাল কলেজের Anatomy ও Physiologyর ক্লাশে। সেখানে গিয়ে গভীর উৎসাহের সঙ্গে নিজেব হাতে কাটাছেঁড়া করে' তিনি দেখতেন প্রাণিলোকের জৈব প্রক্রিয়া, তৎপর হয়ে পর্য্যবেক্ষণ করতেন

একটি প্রাণীর অবয়বসংস্থানের সহিত দেহের যান্ত্রিক ক্রিয়ার কি পরিবর্ত্তন। এমনি করে' স্বগত ও তুলনামূলকভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে' তিনি আয়ত্ত করেছিলেন প্রাণবিদ্যা, বনস্পতিলোকের সঙ্গে জীব-লোকের কোথায় সাদৃশ্য, কোথায় বৈসাদৃশ্য, আদি এককোষী জীব থেকে কেমন করে' উৎপন্ন হয়েছে বহুকোষী জীব, কেমন করে' নানা প্রকারের জৈবপ্রক্রিয়া চলেছে শরীরের মধ্যে। এগুলির মধ্যে যখন তিনি ডুবে যেতেন তখন তাঁর বাহ্যবোধ রহিত হয়ে যেত। বাল্য-কালেই তাঁর মা মারা যান, কাজেই তিনি গড়ে' উঠেছিলেন অনেকটা নিজের মধ্যে নিজে। তাঁর পিতা থাকতেন ব্যস্ত অর্থ উপার্জ্জনে।

অনেকসময় তিনি বেরিয়ে পড়তেন দেশভ্রমণে, তীর্থযাত্রায়। হয়ত চলে' গেলেন উড়িষ্যায়। ময়ূরভঞ্জে গিয়ে প্রাচীন কীর্ত্তি লাগলেন পর্য্যবেক্ষণ করতে। সঙ্গে থাকত ক্যামেরা, নিখুঁতভাবে ছবি তুলতেন নানা মূর্ত্তির, মন্দিরের। সমস্ত মন্দিরের ভিতরটা এঁকে নিতেন drawing করে' কাগজের উপরে। এমনি করে' ভারতের যে-সমস্ত স্থানে আমাদের শিল্পের কীর্ত্তি ছড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে নানা শিলালিপি, নানা প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ, প্রত্যেক স্থানে তিনি তথ্য সংগ্রহ করতেন খুঁটিনাটি করে'। পঠিত বিষয়ের সহিত মেলাতেন আবিষ্কৃত তথ্য এবং সকল সময়েই নিজের মত ব্যক্ত করে' লিপিবদ্ধ করে' রাখতেন গ্রন্থাকারে।

পাখী যেমন ওড়ে তার দুটি ডানার ছন্দে, মানুষের মনও তেমনি ওড়ে দুটি ডানার ছন্দে। একটি ডানায় করে আহরণ আর একটি ডানায় করে প্রকাশ। যেখানে আহরণ হয় পুঞ্জীভূত তা পথ পায় না নিরর্গলভাবে প্রকাশ পেতে। সেখানে সে আহরণ হয়ে যায় লোষ্ট্রবৎ কঠিন, তা প্রবেশ করতে পারে না জীবনধর্ম্মের মধ্যে।

জীবনে তাকে বহন করা যায় না, সে হয় দুর্ব্বহ্। যে আহরণকে আমরা আত্মীয় করে' নিয়ে আমাদের জীবনলীলার সঙ্গে সঙ্গত করে' প্রকাশ করতে পারি সেই আহরণই আমাদের চিত্তভূমির মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চিত্তভূমির জীবনকে করতে পারে রসসিক্ত। সেই আহরণের মধ্যে আছে যে পুষ্টি সে পুষ্টি বিকীর্ণ হয়ে পড়তে পারে আমাদের চিত্তলোকের মধ্যে এবং করে' তুলতে পারে তাকে বলিষ্ঠ ও পুষ্ট। যে আহরণ থাকে এক কোণায় পড়ে', সমগ্র চিত্ত-সঞ্চয়ের মধ্যে যা প্রবাহে পারে না স্রোতের মত ছুটে' চলতে, সে আহরণ আমাদের চিত্তলোককে সঞ্জীবিত করতে পারে না। রক্তস্রোত যদি থাকত হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে, মুহূর্ত্তে দেহ যেত অসাড় হয়ে। আমাদের রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে আমাদের আহৃত খাদ্যের পুষ্টি সঞ্চারিত হচ্ছে আমাদের শরীরের মধ্যে, তাই শরীরের প্রত্যেকটি জীবকোষ হয় পুষ্ট। তেমনি প্রত্যেকটি আহৃত জ্ঞান যখন চিত্তের জ্ঞানস্রোতের মধ্যে আপন স্রোতকে মিলিত করতে পারে তখনই সেই জ্ঞানধারার দ্বারা সঞ্জীবিত ও পুষ্ট হ'তে পারে আমাদের চেতনালোক। আত্মপ্রকাশের চেষ্টা না থাকলে চেতনার মধ্যে এ প্রবাহলীলা সম্পন্ন হয় না, জ্ঞান থাকে অসম্পূর্ণ।

অবিনাশবাবুর মধ্যে জ্ঞানের এই দু'টি দিকই ছিল সমান জাগ্রত। তিনি লিখতেন বিস্তর কিন্তু প্রকাশ করতেন অতি কম। এ সম্বন্ধে কি কারণে যেন তাঁর একটা স্বাভাবিক লজ্জা ছিল, ছিল একটা স্বাভাবিক বিনয়। সর্ব্বদা সঙ্কুচিত বোধ করতেন নিজের মতকে চালু করে' দিতে বিশ্বের দরবারে। তাঁর সকল সময়েই মনে হ'ত যে সম্পূর্ণভাবে যাচাই না করে' নিজের মত বাইরের জগতে প্রকাশ করবার একটা গভীর দায়িত্ব আছে। তাঁর সেইজন্য মনে হ'ত যে

আরও যাচাই করে' যখন একেবারে নিঃশঙ্ক এবং নিঃসংশয় হবেন তখনই করবেন তা প্রকাশ।

কিন্তু তাঁর রুচি নিবদ্ধ ছিল না বহির্লোকের জড়বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানে। সব চেয়ে বেশী অনুরাগ ছিল তাঁর মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নে আর মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে মানুষের মনের লীলা তিনি প্রত্যক্ষ করতে চাইতেন কাব্যে, দর্শনে, ইতিহাসে, আখ্যানে, কাহিনীতে, সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে। নানা ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার, তাই বিভিন্ন ভাষায় জগতের যে সমস্ত নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হ'ত তার দ্বার থাকত না তাঁর কাছে রুদ্ধ। তাঁর অসাধারণ মেধা, প্রখর বুদ্ধি প্রযুক্ত বহু বিষয়ে যদিও তিনি করে' তুলেছিলেন তাঁর জ্ঞানকে ব্যাপ্ত, তবু সে জ্ঞান ছিল না তাঁর পল্লবগ্রাহী, কারণ শুধু সংবাদ আহরণের জন্য তিনি তথ্য আহরণ করতেন না। যে কোন শাস্ত্রের তথ্যই আমরা আহরণ করতে যাই না কেন, তার মর্ম্ম পর্য্যন্ত উদ্ঘাটন করতে না পারলে আমরা কিছুতেই সেই শাস্ত্রের জ্ঞানকে অনুভবের মধ্যে সঞ্চারিত করে' তা আমাদের মর্ম্মগত করতে পারি না। ভালবাসা ওঠে তার কাষ্ঠায় যখন তা পরিণত হয় শ্রদ্ধাতে, কারণ তখনই ইন্দ্রিয়ের সুখবোধ, মনের সুখবোধ পৌছতে পারে আদর্শের ঘাঁটিতে, পেতে পারে তার পবিত্রতা। তেমনি জ্ঞান যখন দ্রবীভূত হ'তে পারে অনুভবের মধ্যে তখনই সেই জ্ঞান হ'তে পারে আমাদের চেতনার জীবনগত ধর্ম্ম। দুধের মধ্যে আমরা যে রস পাই সে স্বাদ থাকে প্রধানতঃ দুধের creamএর মধ্যে। cream হ'তে হ'লে দুধের অনেকটা অংশ যায় বর্জ্জিত হয়ে, সে অংশ যে দেহের উপকারক নয় তা নয়, কিন্তু স্বাদ হিসেবে যা হৃদ্য সেটা থাকে creamএর মধ্যে। ভাত খেয়ে আমরা আমাদের দেহ পুষ্ট করে' থাকি। সমস্ত জীবজগৎ এই শ্বেতসার

জাতীয় আহার গ্রহণ করে' থাকে, কিন্তু শরীরে তাকে গ্রহণ করবার পূর্ব্বে তাকে পরিণত করে' নিতে হয় শর্করাতে, মধুর রসে। জ্ঞানের মধ্যে থাকে যা প্রকট হয়ে, ব্যক্ত ও বিস্পষ্ট হয়ে তার সাংস্থানিক রূপ নিয়ে, অনুভবের মধ্যে তাই প্রকাশ পায় একটা মধুর রসাস্বাদের মধ্যে। সেইখানেই জ্ঞান পরিণত হয় ভাবের মধ্যে এবং এই ভাব থেকেই চিত্ত পায় তার পুষ্টি।

এমনি করে' চলছিল অবিনাশবাবুর জীবন। তিনি কাজ নিয়েছিলেন একটা কলেজের অধ্যক্ষের। পিতা তাঁকে বিবাহ দিলেন এক ধনী ব্যারিষ্টারের কন্যার সহিত। অবিনাশবাবু বড় হয়ে উঠেছিলেন পড়ার বাতাসে। দেবতাদের কোথাও ভুলচুক হয় না এ কথা সর্ব্বত্র ঠিক হ'লেও একেবারে যে সর্ব্বত্র ঠিক নয় সে কথা অবিনাশবাবুর অন্তর্য্যামী জানতেন। পৃথিবীর নানা নরনারী নিয়ে পঞ্চশর বোধ হয় এত ব্যস্ত ছিলেন যে এই লোকটি সম্বন্ধে তাঁর কর্ত্তব্য তিনি গিয়েছিলেন ভুলে। অবিনাশবাবু আর সমস্ত বিষয়েই ছিলেন অতিমাত্রায় সজাগ, কেবল অনবধান ছিলেন এই পঞ্চশর সম্বন্ধে। জীবনে স্ত্রী সন্নিকর্ষের কোন অভাব তিনি বোঝেন নি এবং সেই একটি নিরীহ জীবের সন্নিকর্ষে জীবনব্যাপী যে কি অনর্থপাত ও বিপ্লব ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে অবিনাশবাবুর বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিল না। পুরুষ ছাড়া নারী কিছুই নয়, সে শূন্য মাত্র, কিন্তু সেই শূন্যটি যতই পুরুষকে বাঁয়ে ঠেলে' ডাইনে এসে দাঁড়ায় ততগুণ যে তার অনর্থশক্তি বাড়তে পারে, গণিতের এই অধ্যায় সম্বন্ধে এখনও কোনও গাণিতিক কাজ করে' দেখান নি। অবিনাশবাবু ছিলেন পিতার একমাত্র পুত্র এবং তাঁর পিতা ছিলেন বংশরক্ষায় বিশ্বাসী প্রাচীন হিন্দু। বিবাহ করতে রাজী না হ'লে পিতাপুত্রে হ'ত একান্ত বিচ্ছেদ। আর বিবাহ করতে কেন যে

আপত্তি করবেন তা অবিনাশবাবু কখনও গুছিয়ে বলতে পারতেন না, কারণ বিপদের সম্পূর্ণ প্রকৃতিটা তাঁর কিছুমাত্র জানা ছিল না। অথচ পিতাকে সুখী করবার জন্য অবিনাশবাবু যে কোন স্বার্থ-ত্যাগ করতে পারতেন, পিতার চোখের একবিন্দু জল অবিনাশবাবুর বক্ষ শেলের ন্যায় বিদ্ধ করত।

অবিনাশবাবুর জীবনে এল একটা তুমুল বিপর্যয়। অবিনাশবাবু এতাবৎকাল থাকতেন সম্পূর্ণরূপে চাকরদের আয়ত্ত ও ইয়ত্তার মধ্যে। কি খেলেন, কোথায় শুলেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র তাঁর লক্ষ্য ছিল না। টাকা পয়সা প্রায়ই থাকত বালিশের নীচে, অকারণে কখন যে টাকার থলি লঘু হয়ে যেত তা তাঁর খেয়াল থাকত না। জিনিষপত্র গোছালো থাকত কি অগোছালো থাকত তার প্রতি তাঁর কোনও দৃষ্টি ছিল না। সহকারী ছিল দু'তিনজন, তারাও তাদের কাজ করত কিনা সে বিষয়ে তিনি তদারক করতে পারতেন না। শুধু প্রয়োজনের সময় যদি একটা বই না পাওয়া গেল তখন হঠাৎ উঠতেন একেবারে রেগে। পরিচ্ছদের তাঁর কোনও নিয়ম ছিল না। চুল যখন এক বিঘতকে অতিক্রম করত তখন তাঁর খেয়াল হ'ত যে নাপিত ডাকান প্রয়োজন। এমনি করে' বাহ্যিক সমস্ত ব্যাপারে তিনি ছিলেন একান্ত শিথিল। এমন সময়ে তাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন তরুণী রূপসী। এই বিবাহ ব্যাপারটা তাঁর জীবনে কি বিপর্যয় ঘটাতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁর কোন খেয়াল ছিল না, তাই তিনি একবারও একথা মনে করেন নি যে বিবাহের পূর্ব্বে একবার পরখ করে' নেওয়া দরকার যে কি রকম মেয়ে তাঁর সঙ্গিনী হ'তে পারে। তিনি মনে মনে জানতেন যে তিনি দূরপথের যাত্রী, সে পথে তাঁর বন্ধু বা বান্ধবী কেউ নেই। তাই স্ত্রী যে হবেন জীবনসঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী,

এমন একটা দুরাশা তিনি কথনও পোষণ করেন নি। হ'তে পারেন তিনি গৃহকর্ত্রী এবং বন্দোবস্ত করতে পারেন সংসারের। সেটা মন্দ কি! চাকরগুলো হয়ে উঠেছে একান্ত হতচ্ছাড়া, তাদের দিয়ে আর কাজকর্ম্ম চলছে না। একটি নিতান্ত অবলাজাতীয়কে আশ্রয় দিলে তাঁর যে কোনও উপদ্রব ঘটতে পারে একথা তাঁর মনে একবারও খেয়াল হয় নি। বিয়ে হওয়ার এক বৎসর পরে তাঁর পিতা পরলোক গমন করলেন, রেখে গেলেন ছেলেকে অতুল ধনের অধিকারী করে'। ব্যাঙ্কের নগদ টাকায়, শেয়ারে, বাড়ীতে, জমিজমায় ঝক্‌মক্‌-করা লক্ষ্মীর আসনখানি রেখে গেলেন ছেলের কাছে, অথচ ছেলেকে করে' গেলেন পূজারী সরস্বতীর। অবিনাশবাবুর স্ত্রী প্রতিভা লরেটোয়-পড়া একেবারে হালফ্যাসানের মেয়ে, সে বাড়াতে এসেই মন দিলে বাড়ী সংস্কারে। মোটা মোটা চেকে আসতে লাগল নূতন নূতন আসবাবপত্র, সমস্ত গৃহদ্বার হল সুসজ্জিত, বড় বড় বুদ্ধমূর্ত্তির স্থান হল সোপানপংক্তির নিম্নে, নানারকম Classic styleএর নগ্ন মূর্ত্তি বাগানের নানাস্থানে হল স্থাপিত। তপোবন হয়ে উঠল উপবন। বাড়ীতে নিত্য অভ্যাগতদের নিমন্ত্রণ, হাসি, নাচ গান, চলতে লাগল অফুরন্ত বিলাসের স্রোত।

অবিনাশবাবুর এতে তেমন আপত্তি ছিল না। টাকা আছে যথেষ্ট, এ রকম সাধারণ ক্ষয়ে তা সঙ্কুচিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বিপদ বাধল আর এক দিক দিয়ে। বিলাস ও উৎসব জমাবার জন্য একা প্রতিভা যথেষ্ট নয়, তার পাশে থাকা চাই তার স্বামী। তার স্বামীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে হয়ে পড়েছে বিস্তৃত। এ হেন পণ্ডিত স্বামী একটি মূল্যবান সাজসজ্জার অন্তর্গত। কিন্তু অবিনাশ-বাবু যে অবস্থায় থাকেন সে অবস্থায় তাঁকে লোকের সামনে বের করা

যায় না। তাঁর খোঁচা খোঁচা দাড়ি, অযত্নবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশ, বড় বড় নখ, অপরিচ্ছন্ন বেশভূষা, এ নিয়ে তাঁকে লোকসমাজে বের করা চলে না। প্রতিভা তাই প্রথম পড়ল স্বামীর উপর কায়িক আক্রমণে। সে বেচারা নিতান্ত অনভ্যস্ত এ জীবনে। একদিন চুল কাটলে, একদিন দাড়ি কামালে, একদিন নখ কাটলে হবার কথা নয়। একদিন পরিচ্ছন্ন বেশ করলেই চলবে না, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে একটা সাজ-সজ্জার চাকচিক্যের মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রা চালাবার দুঃসহ ক্লেশে অবিনাশবাবু হয়ে পড়লেন বিপর্য্যস্ত। জীবনে তিনি লোকসঙ্গ বড় করেন নি। তারপর পার্টির মধ্যে যাতায়াত নিমন্ত্রণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে' যে সমস্ত নিতান্ত ছেলেমানুষী আলোচনা চলে, হাস্যরসিকতা ও পরিহাসকুশলতা চলে, তা তাঁর জীবনকে দুর্ব্বহ করে' তুলল। স্বামীর জীবনযাত্রার প্রতি প্রতিভার তিলমাত্র সহানুভূতি ছিল না। স্বামীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, তার পাউডার-বিন্যস্ত মুখের ঔজ্জ্বল্য, তার গৌরব বাড়িয়ে তুলুক, এ বিষয়ে তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু জীবন-যাত্রার যে কল্পনা নিয়ে সে এই ধনীসংসারে ঢুকেছিল তা তিলমাত্র বদ্‌লাতে সে রাজী হল না। কি একনিষ্ঠা ও তপস্যার দ্বারা গভীর জ্ঞান জন্মাতে পারে সে সম্বন্ধে তার বোধ ছিল না। তাই সে তার স্বামীর ব্যবহারে সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ হয়ে থাকত এবং বাক্যবাণে ও শ্লেষে তাঁকে নিরন্তর জর্জ্জরিত করে' রাখত। অবিনাশবাবুর মধ্যে যে তপস্বী বাস করত সে ক্ষুণ্ণ হয়ে বিদ্রোহ করতে চাইত, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে ভদ্র ও বিনীত নিরীহ মানুষটি ছিল সে কোনও প্রতিবাদ করতে সাহস পেত না। দু'একসময়ে ক্রোধ হলেও তিনি নিজেকে দমন করতেন, ভাবতেন—রাগ করলেই ঝঞ্ঝাট আরও বাড়বে, যা করবার করুক গে, আমাকে একটু স্বস্তি দিলেই হয়। কিন্তু এমন অবস্থাতে স্বস্তি পাওয়া

যে সহজ নয় তা নিরীহ অবিনাশবাবুর বুদ্ধিতে কুলোলো না। তিনি এতাবৎকাল সমস্ত চরিত্রই অধ্যয়ন করেছিলেন, কেবল স্ত্রীচরিত্রের রহস্যই ছিল তাঁর অবিজ্ঞাত। আজ এই রহস্যের মধ্যে পড়ে' অবিনাশবাবু উঠলেন হাঁপিয়ে। অবিনাশবাবুর উপরে এই জুলুম শুধু যে বাইরের দিক থেকেই আরম্ভ হ'ল তা নয়, এটা আরও প্রবল বেগে চল্‌ল উভয়ের দাম্পত্য সম্বন্ধ নিয়ে। প্রতিভা একদিন রাগ করে' বল্লে—"তুমি একটা বইয়ের কীট মাত্র। তোমার মধ্যে আছে কি? এর চেয়ে একটা মাতাল স্বামী হ'লেও বুঝতুম যে তবু সে কিছু একটা করছে।" সে তার স্বামীকে বলত—"তুমি যদি আমাকে ভালই না বাসবে তবে আমায় বিয়ে করলে কেন, আমার জীবনটা কেন করলে নষ্ট?" অবিনাশবাবু মনে করলেন—কথা ত মিথ্যে বলে নি; বিয়ে করলুম কেন? বেচারা ভালবাসা কাকে বলে তা এ যাবৎ জানে নি। প্রতিভার ব্যাখ্যা অনুসারে ভালবাসা বলতে যা যা বোঝায় সে সমস্ত ভেবে আতঙ্কে তাঁর মন শিউরে উঠ্‌ল। বিয়ে করবার সময়ে এ সব কথা তাঁর মনেই হয় নি। তিনি ভেবেছিলেন—আমি থাক্‌ব আমার কাজ নিয়ে, স্ত্রী থাকবেন তাঁর কাজ নিয়ে, দ্বন্দ্ব বিরোধের সম্ভাবনা কোথায়? লোকে বলে এক হাতে তালি বাজে না, কিন্তু তার মানে এ নয় যে দুটো হাতই একসঙ্গে নেচে নেচে তালি দেয়। প্রতিভা অনেকসময় আগুন হয়ে উঠত এবং হাতের কাছে যা পেত তাই দিয়ে অবিনাশবাবুকে প্রহার করতে ছাড়ত না। তার ঈর্ষ্যার প্রধান কারণই ছিল লাইব্রেরীর বইগুলি। সে বলত যে ওগুলো যদি অচেতন না হয়ে সচেতন একটা মানুষ হ'ত তবে তা সহ্য করা যেত, এমন অনেক বড় মানুষের ঘরে দেখা যায়। কিন্তু এই নির্জ্জীব জিনিষগুলোর উপর অবিনাশবাবুর এই যে অতিরিক্ত

আসক্তি, এটা সে সহ্য করতে পারত না। সে এক এক দিন রেগে পেট্রোলের টিন নিয়ে ছুট্‌ত লাইব্রেরীর দিকে, যদি অগ্নিসাৎ করা যায় বইগুলো। এ কাজে অবশ্য সে সমর্থ হয় নি, কিন্তু অবিনাশ-বাবুর আশঙ্কা গেল না। তিনি একটা প্রকাণ্ড দেয়াল তুলে লাই-ব্রেরীকে পৃথক করে' নিলেন।

প্রতিভা যখন দেখলে যে ক্রোধে কোন ফল হ'ল না তখন সে এল নরম হয়ে। ক্ষণে অক্ষণে সে গিয়ে উপস্থিত হ'ত লাইব্রেরীতে, তাঁকে নিয়ে যেত বেড়াতে। কোন সময় বা ধরে' নিয়ে যেত সিনেমায় কিংবা থিয়েটারে, কোন সময় বা বসত রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চ্চা করবার জন্য অবিনাশবাবুর সঙ্গে। যখনই তাঁর কাছে কিছু জানবার জন্য উপস্থিত হ'ত প্রতিভা, তখনই অবিনাশবাবুর মধ্যে অন্তরসুপ্ত অধ্যাপক উঠত জাগ্রত হয়ে, তিনি অতি যত্ন করে' বোঝাবার চেষ্টা করতেন সাহিত্যের দুর্জ্ঞেয় সমস্ত রহস্য। তাঁর অধ্যাপকের মন বিচরণ করত একটা মূঢ় স্বপ্নের আকাশে, সঙ্কল্প করত কেমন করে' তাকে কি ভাবে গড়ে' তুলে বিদুষী করে' তুলবেন। এই অবসরে স্থূলভকোপা প্রতিভা পেত নূতন নূতন প্রশ্রয়, ভুলে যেতেন তিনি তাঁর লাঞ্ছনার কথা, তাঁর আঘাতের কথা। হারিয়ে ফেল্লেন তিনি আপনাকে ধীরে ধীরে প্রতিভার মায়াজালের মধ্যে। প্রতিভা আন্‌ল গাঢ় করে' চারিপাশের আকাশ লালসা ও আবেশের গভীর স্নিগ্ধতায়, যেমন গাঢ় করে' দেয় বর্ষণমুখর শ্রাবণসন্ধ্যা সুদূরবিসারী সপ্তপর্ণীর গন্ধে।

প্রতিভা বল্লে—এস আমরা দু'জনে সঙ্গীতের আলোচনা করি। ডাক পড়ল প্রতিভার কলেজের সহাধ্যায়ী গোলাপ মৈত্রের। গোলাপ ছিল অতি সুদর্শন, প্রিয়ভাষী বা চাটুভাষী, সুকুমার, কোমল, নর্ম্মপ্রিয় ও বিদগ্ধ। দীর্ঘকাল সঙ্গীত আলোচনার ফলে সে এ বিষয়ে অর্জ্জন

করেছিল একটা অসাধারণ নৈপুণ্য। কণ্ঠ ছিল তার অতি সুমিষ্ট। সেই কণ্ঠকে সে সাবলীল ভঙ্গীতে নিয়ে যেত নক্ষত্রলোকে, আবার অবরোহক্রমে নামিয়ে নিয়ে আসত কাণের দ্বারের ঈষৎ গুঞ্জনের মধ্যে। অবিনাশবাবুর কণ্ঠ ছিল না, তিনি জানতেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্বরপ্রণালীর বিশ্লেষণ। সঙ্গীত শাস্ত্রেরও পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর যথেষ্ট ছিল। গোলাপের মধ্যে যখন তিনি দেখলেন কেমন ললিত ভঙ্গীতে বাগ্‌দেবী করেন সুরের মধ্যে মূর্ত্তিপরিগ্রহ, তখন তিনি পাগল হয়ে গেলেন সুরচর্চ্চায়। প্রতিভা চায় বিলাসের সহিত এক আধটি পোষাকী গান অভ্যাস করা, অবিনাশবাবু চান তার তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করা, কাজেই উভয়ের একত্রে সঙ্গীত চর্চ্চাব মধ্যে এল বিরোধ। এদিকে অবহেলিত, অবজ্ঞাত শাস্ত্ররাশির মধ্য থেকে যে অভিমানের ক্রন্দন নিঃশব্দে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ত গভীর রাত্রিতে বন্ধু অবিনাশের জন্য, সে ক্রন্দনে অবিনাশ বাবুর নিদ্রা যেত ভেঙ্গে। এই সমস্ত শাস্ত্র ফেলে' তিনি যে বিলাসের মোহে, জড়িত হয়ে পড়ছেন, এ বোধ তাঁকে বারংবার ধিক্কার দিতে লাগল। অসম্ভব হ'ল অবিনাশ বাবুর পক্ষে এই জীবন চালানো। তিনি প্রতিভাকে বল্লেন—"তুমি একটু ভাল করে' লেগে যাও সঙ্গীতচর্চ্চায় গোলাপের সঙ্গে!" গোলাপ হ'ল বাড়ীর নিত্য অতিথি, সকালে সন্ধ্যায় রাত্রিতে। অবিনাশ বাবু ফিরে গেলেন লাইব্রেরীতে।

গোলাপকে নিয়ে নিরন্তর সঙ্গীত চর্চ্চা করার মধ্যে প্রতিভার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে অবিনাশ বাবুর মনের মধ্যে ঈর্ষ্যা জাগানো। গোলাপকে নিয়ে ঈর্ষ্যা জাগলেই অবিনাশ বাবু তাঁর পুঁথিপত্র ছেড়ে প্রতিভার পিছনে লেগে যাবেন তার হৃদয় জয় করতে এই ছিল তার ধারণা। প্রতিভার এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াতে সে গেল

একেবারে ক্ষেপে। অবিনাশ বাবু নিলেন একান্তভাবে লাইব্রেরীতে আশ্রয়। নানা রকমে প্রতিভা দিতে লাগল তাঁকে কষ্ট। সময়ে অসময়ে নানা ছুতায় বর্ষণ করত অশ্রাব্য গালিগালাজ, প্রচার করতে আরম্ভ করল তাঁর নানা কুৎসা এবং একদিন যখন প্রভাতে তিনি একান্ত অসহায়ভাবে নিদ্রোত্থিত, তখন করলে তাঁকে বেদম প্রহার। তিনি দেখলেন যে এ ভাবে থাকলে তাঁর জীবন নিরাপদ নয়, তখন তিনি 'সলিসিটর'এর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে' স্ত্রীকে স্বতন্ত্র মাসোহারার ব্যবস্থা করে' নিয়ে নিজে অন্যত্র থাকবার বন্দোবস্ত কবলেন। এই হ'ল অবিনাশবাবুর পারিবারিক জীবনের অবসান।

কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি ছিলেন ছেলেদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। নিজের পড়াশুনা থেকে বাঁচিয়ে যতটুকু সময় তিনি পেতেন, তার সমস্তটুকু তিনি ব্যয় করতেন ছেলেদের পিছনে। এমনি করে' ছেলেদের সঙ্গে গড়ে উঠছিল তাঁর একটা গাঢ় গ্রন্থি। একবার একটা কলেজে ছেলেদের উপর হয় পুলিশের অত্যাচার। তাদের সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে তাঁর কলেজের ছেলেরাও করলে ধর্ম্মঘট। অবিনাশ বাবু কলেজে গিয়ে দেখেন একটিও ছেলে নেই। তিনি পরদিন দিলেন বিজ্ঞাপন যে যে সব ছেলেরা তাঁর সঙ্গে কথা না বলে', পরামর্শ না করে' নিজেদের খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে ধর্ম্মঘট করেছে, তাদের তিনি শাসন করবেন। ছেলেরা ডাকলে একটা বিরাট সভা, করলে তাঁর মনোভাবের বিরুদ্ধে একটা কঠিন প্রতিবাদ। কাগজে কাগজে বেরুল ক্রুর মন্তব্য। অবিনাশ বাবু দিলেন সাজার হুকুম রদ করে'। কিছুদিন বাদে ছেলেদের এক সভা ডেকে তিনি তাদের বল্লেন যে দীর্ঘকাল ধরে' তিনি তাদের সঙ্গে যে বন্ধুতা দেখিয়েছেন, যে পুত্রবৎ ব্যবহার করেছেন, সে ব্যবহারের মর্য্যাদা করেছে তারা ধ্বংস।

অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য নয় ছেলেদের সঙ্গে বল পরীক্ষা করা। অধ্যক্ষ ও ছাত্রের সম্পর্ক এই যে অধ্যক্ষের শাসন নেবে তারা মালার ন্যায় বরণ করে', তখনই হ'তে পারে শাসনের ফল। যেখানে শাসন করলে তার ওঠে প্রতিবাদ সেখানে শাসন নিষ্ফল। অতএব তিনি আর ঐ কলেজের অধ্যক্ষ থাকতে প্রস্তুত নন। প্রত্যেকটি ছেলে অনুতপ্ত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে করলে ক্ষমা ভিক্ষা। তিনি তাদের ক্ষমা করলেন এবং দিলেন তাদের প্রাচীন বন্ধুত্বের স্থান, কিন্তু অধ্যক্ষপদ পরিত্যাগের পত্র তিনি আর প্রত্যাহার করলেন না। সেই কলেজেই তিনি রইলেন অধ্যাপক হয়ে। নূতন অধ্যক্ষ তাঁর উপর ছিলেন ঈর্ষ্যান্বিত; তিনি চাইতেন এমন ব্যবস্থা করতে যাতে অবিনাশবাবু সময় না পান আপন গবেষণার জন্য। দু'জনে বাধ্‌ল ভীষণ দ্বন্দ্ব। এমন সময় কোনও একটা রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে ছেলেদের ঘটল অধ্যক্ষের সঙ্গে দারুণ বিরোধ। ফলে একদিন অবস্থাটা এতদূর গড়াল যে অধ্যক্ষের হ'ল প্রাণসংশয়। অবিনাশ বাবু এক মুহূর্ত্তও ভাবলেন না অধ্যক্ষের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত বিরোধের কথা। ছেলেদের উপর তাঁর যে প্রভাব ছিল তা ব্যবহার করে' তিনি অধ্যক্ষকে অসম্মান ও প্রাণহানি থেকে বাঁচালেন। ফলে অধ্যক্ষ রইলেন চিরদিন তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে। তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে রওনা হলেন ইউরোপে। ইউরোপে গিয়ে অবিনাশ বাবু পড়লেন একটা নূতন হাওয়ার মধ্যে, সমুদ্রের হাওয়ার মত সে হাওয়া নির্ম্মল ও ওজস্কর। তিনি প্রধানভাবে আরম্ভ করলেন রাসায়নিক গবেষণা এবং সঙ্গে সঙ্গে খবর রাখতে লাগলেন আধুনিকতম জড়বিজ্ঞানের। বছরের পর বছর তাঁর কাটতে লাগল সেখানে, একান্তচিত্তে তিনি চালাতে লাগলেন তাঁর গবেষণা। ইউরোপে গিয়ে তিনি দেখলেন যে ইউরোপের সমস্ত বিদ্যা এদেশের

জলবায়ুতে যায় মলিন ও নিৰ্জ্জীব হয়ে। সমস্ত সমাজ-জীবনের সঙ্গে বিদ্যার রয়েছে একটা অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ, একটা নাড়ীগত যোগ। সে জিনিষটা সহজে ধরা পড়তে চায় না। সে দেশের পণ্ডিতেরা বিদ্যালোচনা করেন আপন আপন স্বতন্ত্র চেতনার স্ফূর্ত্তিতে। তাঁদের বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা তেমন তাঁদের ঈর্ষ্যা করেন না যেমন করেন সহযোগিতা। সকলেরই উদ্দেশ্য বিদ্যার বৃদ্ধি, নিজের বৃদ্ধি তেমন নয়। নিজেকে করেন তাঁরা গৌণ, বিদ্যাকে দেন তাঁরা প্রধান স্থান। একটা বাগানে যেন দশজন মালী খাটছে। প্রত্যেক মালীরই কাজ যেন সে যা জানে তাই দিয়ে অপর মালীকে সাহায্য করা। বাগান উঠবে গড়ে', গাছেরা উঠবে বেড়ে, হবে ফুল ও ফল—এই হচ্ছে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের দেশেও যখন সুদিন ছিল সেদিন এমনিই নিঃস্বার্থভাবে লোকে আয়ত্ত করত সেকালের বিদ্যা। শাস্ত্রে বলেছে —'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেতব্যঃ', সকল ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য বিনা কারণে নিঃস্বার্থভাবে ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করা। অবিনাশ বাবু যে এতদিন নিঃস্বার্থভাবে অধ্যয়ন করে' এসেছেন সেখানে তিনি কোনও দৃষ্টান্ত পান নি, সহযাত্রী পান নি। এখানে এসে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝলেন, মূর্ত্তভাবে চোখের সামনে দেখলেন অধ্যাপকের কি কাজ। শুধু যে অধ্যাপকদের মধ্যে পেলেন সহযোগিতা তা নয়, দেখলেন বহু ছাত্র অধ্যাপকের সঙ্গে সহযোগিতা করে' হাত ধরাধরি করে' সরস্বতীর মহামূর্ত্তিকে ক্রমশঃ উচ্চ হ'তে উচ্চতর ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। দেখে' তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হ'ল। এতদিন তিনি যা কল্পনালোকে দেখতেন, আজ তা প্রত্যক্ষ করে' তাঁর চেতনা মুক্তিলাভ করল জড়তা থেকে। তিনি সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার নানা বিদ্যার পীঠস্থানে গিয়ে গিয়ে বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন বড় বড় অধ্যাপকের সঙ্গে

স্থাপন করলেন সৌহার্দ্দ্য ও কাজ করতে লাগলেন তাঁদের সহযোগিতায়। আট দশ বৎসর এমনি করে' কাটিয়ে তিনি ফিরে এলেন দেশে, নিয়ে এলেন অসীম আশা, অতুলনীয় উৎসাহ এবং কর্ম্মের বিপুল কল্পনা। তাঁর পুরাতন কর্ম্মগৃহ হ'ল এখন তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অচল।

কলকাতার উপকণ্ঠে একটা বিরাট ভূখণ্ড নিয়ে তিনি সুরু করে' দিলেন তাঁর নবীন কর্ম্মগৃহ নির্ম্মাণ। বিরাট হ'ল তাব পরিধি, বিপুল হ'ল তাব আয়তন। ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে আসতে লাগল নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। তাঁর সঞ্চিত অর্থ ক্রমশঃ হ'তে লাগল নিঃশেষ। তাঁর পিতৃবন্ধুরা দেখে' ভীত হ'লেন। কেউ কেউ এসে তাঁকে বল্লেন—'এ সব তুমি কি করছ? ব্যানার্জিবংশের চির-সঞ্চিত ধন তুমি কোন্ গহ্বরে ঢালছ?' তিনি স্মিতহাস্যে বলতেন—'সরস্বতীর গহ্বরে। লক্ষ্মীর স্বর্ণকমলের একটি একটি পাপড়ি খসিয়ে আমি দিচ্ছি সরস্বতীর শ্রীচরণে, পেতে চাই তাঁর প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ।' বন্ধুরা বল্লেন—'অল্পে স্বল্পে কি চলত না?' তিনি তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে আজকালকার বৈজ্ঞানিক জগতে নূতনতম যন্ত্রপাতি না হ'লে কোনও গবেষণা করা যায় না। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—'এ গবেষণায় তোমার ফল কি?' তিনি বল্লেন—'ফল ত খুঁজি নি। এ হবে নিষ্ফল, এ করবে সত্যকে আবিষ্কার। এ হচ্ছে সরস্বতীর নিষ্কারণ উপাসনা। তবু এই আবিষ্কারের ফলকে যারা প্রযোগ করতে পারবে তারা হয় ত করতে পারবে দেশের মহাকল্যাণ। আমার ভাগ্যে তা জুটবে কি না জানি না, কিন্তু এই যন্ত্রগৃহের কার্য্য যদি আমাকে অতিক্রম করে' চলে তবে এর দ্বারা দেশের ও দশের অশেষ কল্যাণ সম্পন্ন হ'তে পারে।'

সকলে হতবুদ্ধি হয়ে এই পণ্ডিতমূর্খের সম্বন্ধে নানা আলোচনা

করতে লাগল। কেউ করলে নিন্দা, কেউ করলে প্রশংসা, কিন্তু অবিনাশবাবু সে সম্বন্ধে রইলেন একেবারে নির্ব্বাক। তিনি একমনে কাজ করে' চল্লেন তাঁর মহান্ উদ্দেশ্যের সাধনা নিয়ে। যন্ত্রগৃহের সঙ্গে স্থাপিত হ'ল একটা কারখানা গৃহ। সেখানে নিযুক্ত হ'ল দক্ষ যান্ত্রিকেরা। তারা দেবে প্রয়োজনমত নূতন নূতন যন্ত্র তৈয়ারী করে'। যন্ত্রগৃহে স্থাপিত হ'ল নানা বিভাগ, প্রত্যেক বিভাগে হ'ল দক্ষ বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত। তারা সব নিযুক্ত হ'ল খণ্ড খণ্ড বিষয়ের পরীক্ষার জন্য, আর সেই সমস্ত পরীক্ষালব্ধ সত্য একত্র করে' তিনি চালাতে লাগলেন আপনার কাজ। যন্ত্রগৃহের চারিদিকে স্থাপিত হ'ল এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকের আবাস-কুটির। তাঁর নিজের শয়ন ও বিশ্রাম প্রভৃতির কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হ'ল সেই যন্ত্রগৃহেরই মধ্যে। এমনি করে' মহাসমারোহে রইলেন তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিকের কাজ নিয়ে। বাইরের সংসার হ'ল তাঁর কাছে একান্ত নিরুদ্ধ। বয়স চল্‌ল বেড়ে, যৌবন হ'ল অতিক্রান্ত, প্রৌঢ়দশা অতিক্রম করে' তিনি উপনীত হলেন প্রায় পঞ্চষষ্টির উপান্তে। দেহে ধরতে আরম্ভ করল ভাঙ্গন, কিন্তু মনের বীর্য্য রইল তাঁর অক্ষুণ্ণ। এখন তিনি অনুভব করতে লাগলেন তাঁর পরে এই বিরাট ল্যাবরেটরীর কি দশা হবে, কে নেবে এর নেতৃত্ব, কে নেবে এর প্রধান গবেষণার কাজ।

কানাই ছিল রাসায়নিক। একদিন সে খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে এল এই ল্যাবরেটরী দেখ্‌তে। স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হয়ে গেল সে এর সব আয়োজন দেখে'। সমস্ত দেখে' শুনে' সে দেখা করতে গেল অবিনাশ বাবুর সঙ্গে। ভূমিষ্ঠ হয়ে সে তাঁর পায়ের ধূলো নিল। অবিনাশবাবু হেসে বল্লেন—"তোমাদের এখনও দেখছি পুরোণো সংস্কার যায় নি, অথচ তোমরা নবীন কালের লোক।"

কানাই যতই বিনীত আর নম্র হোক না কেন, সে ছিল একান্ত তার্কিক প্রকৃতির ; একজন যুযুৎসু,যেন নিরন্তর কুস্তির প্যাঁচ লড়বার জন্মে ওৎ পেতে বসে' থাকত তার মনের মধ্যে, সুবিধা পেলেই সে আসত রঙ্গমঞ্চে নেমে। কানাই বল্লে—"এটা হ'ল ভক্তিজ্ঞাপনের ভাষা।"

অবিনাশবাবু বল্লেন—"ভক্তির অর্থ হচ্ছে পূজ্য ব্যক্তিতে অনুরাগ। তা আমি তোমার পূজ্যই বা হলুম কেমন করে' আর হঠাৎ তোমার আমার প্রতি অনুরাগই বা জন্মাল কেমন করে' এবং তা জ্ঞাপন করবারই বা তোমার কি প্রয়োজন হ'ল।"

কানাই বল্লে—"আপনি জ্ঞানের সাধক মনীষী, তাই আমার পূজ্য।"

অবিনাশবাবু বল্লেন—"পূজা তুমি কর কাকে ? মানুষকে না বিদ্যাকে ?"

কানাই বল্লে—"বিদ্যাকে।"

অধ্যাপক বল্লেন—"তবে মানুষকে কেন পূজা কর ? আমাকে কেন প্রণাম করলে ?"

কানাই বল্লে—"আপনি বিদ্যার সাধক বলে'।"

অধ্যাপক বল্লেন—"বিদ্যার সাধক বলতে তুমি কি বোঝ ?"

কানাই বল্লে—"বিদ্যার যিনি করেন সাধন।"

অধ্যাপক আবার বল্লেন—"বিদ্যা ত রয়েছে সিদ্ধ হয়েই, তিনি আবিষ্কৃত হন নানা সাধনের দ্বারা মানুষের চিত্তে।"

কানাই আবার বল্লে—"মানুষই ত করে তাঁকে আবিষ্কার।"

অধ্যাপক বল্লেন—"কোনও কাজের আমি কর্ত্তা বল্লে এই জিনিষই বোঝায় যে আমারই ক্রিয়ার দ্বারা যা ছিল না সেটা উঠল ঘটে'। আমার ক্রিয়ার দ্বারা আমি মাটিতে গড়ে' তুলি পুতুল। পুতুল ত

ছিল না কোথাও পুতুলভাবে যদি না আমার ক্রিয়ার দ্বারা তৈরী করতুম। কিন্তু যে সমস্ত জাগতিক্ সম্বন্ধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন বলে' তোমরা বল সে সমস্ত সম্বন্ধ ত নিত্যসিদ্ধ হয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক ত কোনও কাজ দিয়ে তা তৈরী করে' তোলেন না।"

কানাই পড়ল অথই জলে। সে বল্লে—"তবে তিনি কি করেন?"

অধ্যাপক বল্লেন—"পৃথিবী ছিল রাত্রির অন্ধকারে আবৃত হয়ে। ভোরবেলা সূর্য্য উঠ্‌ল আকাশে, প্রকাশ হ'ল পৃথিবীর রূপরাজি। আমার চোখ ছিল খোলা, আমি দেখলুম তা চোখ দিয়ে। আমি ত চোখ দিয়ে রূপরাজি তৈরী করি নি। সে রূপরাজি আমার চিত্তে প্রকাশ হওয়ার জন্য আমার কোন যত্নের অপেক্ষা রাখে নি।"

কানাই বল্লে—"তাও ত বটে। তবে কি হয়?"

অধ্যাপক বল্লেন—"কতগুলি সাধন একত্র সমবেত হ'লে, যা ছিল বাইরে তার প্রকাশ হয় চেতনার মধ্যে। চেতনা সেই প্রকাশের কর্ত্তা নয়, সেই প্রকাশের ভূমি। Canvas-এর উপর ছবি আঁকে চিত্রী, সেই canvas-এর উপর প্রকাশ হয় অসীম লাবণ্য নিয়ে চিত্রীর চিত্র। Canvas ত চিত্রী নয়, সে হ'ল চিত্রপট। তেমনি বৈজ্ঞানিকের চিত্ত হচ্ছে সেই ভূমি যেখানে প্রকাশ পায় জগতের কতগুলি ধর্ম্ম বা কতগুলি সম্বন্ধ, যার সে কর্ত্তাও নয়, স্রষ্টাও নয়।"

কানাই বল্লে—"মেনে নিলুম যে আপনিও হয়েছেন একটি সাধন। সেই হিসেবেই আপনাকে প্রণাম করি।"

অধ্যাপক বল্লেন—"তা হ'লে যাও ল্যাবরেটরীর মধ্যে, প্রত্যেকটি যন্ত্রের কাছে একবার করে' মাথা ঠুকে' এস। পার ত ফুলের অর্ঘ্য দাও, সিঁদুর পরিয়ে দাও।"

"কিন্তু আপনি যে জীবিত।"

অধ্যাপক আবার বল্লেন—"যখন সাধ্যেরই কর পূজা, তখন সাধন হিসেবে জীবিত কি জড়, এদিক দিয়ে সাধনের মূল্য কি ?"

কানাই বল্লে—"মূল্য কি কিছুই নেই ?"

অধ্যাপক বল্লেন—"মূল্য আছে কি নেই সে সম্বন্ধে আমি ত কিছু বলি নি। আমি জিজ্ঞাসা করছি তোমাকে—তুমি কি মূল্য দেখতে পাচ্ছ ?"

কানাই বল্লে—"আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না।"

অধ্যাপক বল্লেন—"যাক্, তা হ'লে বোঝা গেল যে তুমি না বুঝেই আমাকে প্রণাম করেচ, অতএব সে প্রণাম আমার গ্রহণ না করাই উচিত। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে বৈজ্ঞানিক জীবিত। সেই হিসাবে তিনি করেন নানা কল্পনা, মনের মধ্যে ওঠে নানা সম্ভাবনা, নানাপ্রকার যুক্তিপ্রবাহের চলে স্বচ্ছন্দ চালনা। বাহ্য জড়লোকে যেমন আছে জডধর্ম্মী যন্ত্র, অন্তর্লোকে তেমনি আছে নানারূপ চিত্তের স্পন্দন। সেগুলি নির্ভর করে চিত্তের প্রাচীন ইতিহাসের উপর। তেমনি যন্ত্রলোকেও যন্ত্রের রয়েছে নানা ইতিহাস। অন্য লোকেরা যে সমস্ত কাজ করে' গেছেন সেই ইতিহাস একদিকে জড়িত হয়ে রয়েছে যন্ত্রের সঙ্গে আর একদিকে জড়িত হয়ে রয়েছে বৈজ্ঞানিকের চিত্তের সঙ্গে। এই ইতিহাসটি হচ্ছে অতীতের ইতিহাস। এইটিকে অবলম্বন করে' বর্ত্তমানে এসে পৌঁছেছে যে নিত্য নবোদ্ভাবিত যন্ত্র, সেই যন্ত্র ও নবোন্মেষশালী মানুষের চিত্ত, এদের পরস্পর সন্নিপাতে উদ্ভাসিত হয় একটা নূতন সত্য বা সম্বন্ধ। তার ফলে গড়ে' ওঠে একটা নূতন ইতিহাস।"

কানাই বল্লে—"আপনি এগুলিকে কি ইতিহাস বলবেন ?"

অধ্যাপক বল্লেন—"ইতিহাস ছাড়া তুমি কি বল্‌তে চাও ?"

কানাই বল্লে—"ইতিহাস ত রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের হয়।"

অধ্যাপক হেসে বল্লেন—"কেন, ধর্ম্মের ইতিহাস হয় না? সাহিত্যের, দর্শনের ইতিহাস হয় না?"

কানাই বল্লে—"তা ত হয়। তবে 'ইতিহাস' কথার মানে কি?"

অধ্যাপক বল্লেন—"ইতিহাসই হচ্ছে জগতের তত্ত্ব। আর সমস্তই হচ্ছে এই ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা ঐতিহাসিক উপাদান মাত্র। জগতের প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে রয়েছে তার দীর্ঘ ইতিহাস, অর্থাৎ কেমন করে' দূর অতীত থেকে আরম্ভ করে' নানা ঘটনার স্রোতে সেই ঘটনাটিকে করেছে অভিব্যক্ত। ঘটনায় ঘটনায় চলে দ্বন্দ্ব ও মিলন, তার ফলে প্রত্যেকটি ঘটনাকে লক্ষ্য করে' অভিব্যক্ত হয় তার একটি ঐতিহাসিক প্রকাশ। এমনি করে' গড়ে' উঠছে নব নব পর্য্যায়ের ইতিহাস এবং তার পরিচয় আমরা পাই জড়ে, প্রাণধর্ম্মে ও মানুষের চিত্তে। এই ত্রিবিধ ঘটনার সঙ্ঘাতে আবার গড়ে' ওঠে একটা নূতন-জাতীয় ইতিহাস, তা প্রকাশ পায় আবার তেমনি জড়ে, জীবে আর মানুষের চিত্তে। সমগ্র জগৎ হচ্ছে এই ক্ষণপরিবর্ত্তী ইতিহাস-ধারার ক্ষণপ্রকাশ বা ক্ষণবিকাশ।"

অধ্যাপক এই সঙ্গে আবার প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা, এ কথার আলোচনা থাক্। তুমি বলেছ যে বিদ্যার প্রতি তোমার যে অনুরাগ আছে সে অনুরাগ তুমি প্রকাশ করেছ আমাকে প্রণাম করে'। তুমি কি শাস্ত্র পড়েছ?"

এইবারে কানাই অত্যন্ত বিনীতভাবে বল্লে—"আজ্ঞে, আমি একটু রসায়ন পড়েছি এবং সেই বিষয়ে এম্-এস্-সি পাশ করেছি।"

অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন—"তোমার কি রসায়নের প্রতি অনুরাগ আছে?"

কানাই বল্লে—"তা একটু একটু আছে বৈ কি।"

অধ্যাপক বল্লেন—"অর্থাৎ, তোমার অনেক বিষয়ে অনুরাগ আছে, তার মধ্যে রসায়ন একটি?"

কানাই যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল। বল্লে—"হ্যাঁ।"

অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার প্রত্যেক অনুরাগই কি এই রকম প্রণাম করে' প্রকাশ কর, না অন্য উপায়েও প্রকাশ কর?"

কানাই পালাতে পারলে বাঁচে। সে যেন লাগল ঘামতে। অধ্যাপক আবার হেসে বল্লেন—"বল না, তোমার কি বলবার আছে। আগে খোঁজ নাও তোমার কি কি বিষয়ে অনুরাগ আছে এবং তার মধ্যে কোন্‌টি প্রধান। অনুরাগ আমাদের নানা বিষয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারা না পারা নির্ভর করে বাহ্য কারণপরম্পরার উপর। আত্মপ্রকাশ, আত্মাভিব্যক্তি আমাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। নিজেকে অন্বেষণ করে', তোমার চারিদিকের আবেষ্টনীকে অন্বেষণ করে' বেশ করে' পরীক্ষা করে' দেখ তোমার অনুরাগের কোন্ দিকটি বাহ্য কারণকলাপের সাহায্যে তুমি পার স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে, কোন্‌খানে কতখানি অপেক্ষা করতে হয় বাহ্য কারণকলাপের, কোন্‌খানে কতখানি অনুকূলতা পাওয়া যাবে বাহ্য উপকরণের এবং কোন্‌খানে বাহ্য উপকরণের প্রয়োজন হবে সব চেয়ে কম। যেখানে বাহ্য উপকরণের সহায়তা লাগবে সব চেয়ে বেশী, সেখানে নির্ভর করতে হবে বাহ্য উপকরণের উপর। সে উপকরণের উপর আমাদের হাত নেই, কাজেই সেখানে আত্মপ্রকাশ হবে পদে পদে ব্যাহত, জীবনে হবে বহু ব্যর্থতার সৃষ্টি। এইজন্য তোমাকে প্রথম করতে হবে আত্মাবিষ্কার, তোমাকে দেখতে হবে কোন্ অনুরাগটি বেরিয়ে আস্‌ছে তোমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে, যে

অনুরাগকে পূর্ণ না করলে তোমার জীবন হবে অপূর্ণ। অনেকসময় একটা অনুরাগ প্রকাশ পায় নানা আবরণের মধ্য দিয়ে, তাকে দেখায় নানারকম যদিও তা বস্তুতঃ এক। যে অনুরাগের আক্রন্দন উঠছে তোমার গভীর থেকে তাকে কর তুমি আবিষ্কার, আর চেষ্টা কর তুমি তাকে প্রকাশ করতে, প্রণামের দ্বারা নয়, সমস্ত জীবনের কার্য্যের দ্বারা। তোমার সঙ্গে কথা কয়ে আমি খুসী হয়েছি। তোমার যখন ইচ্ছে তখন এসো, আমার যদি তখন অবসর থাকে, তোমার সঙ্গে আলাপ করে' খুসী হব।"

কানাই আবার ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলে। প্রণাম করে' বেরিয়ে এল। তার মাথাটা যেন লাগল ঘুরতে। সামান্য কথার মধ্যে এত রহস্য থাকতে পারে সে সম্বন্ধে সে এতদিন এতটুকুও সচেতন হয় নি।

এর পর অনেকদিন গিয়েছে সে অধ্যাপকের কাছে এবং অনেক বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। অনেক বিষয়ে তার মত গেছে বদ্‌লে এবং সে হয়ে উঠেছে অধ্যাপকের মুগ্ধ ভক্ত। এমন সময় সে পড়ল ধরা কোতোয়ালের হাতে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সুকুমার চলে' গেছে বিলেতে। মঞ্জরী গেছে লক্ষ্ণৌয়ে। সেখানে সে একটা বাড়ী ভাড়া করে' আছে, সঙ্গে আছেন তার বৃদ্ধা পিসীমা। সুকুমার ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যবস্থা করে' গেছে, সেখান থেকে মাসে মাসে আসে তার ৬০০৲ টাকা। বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন ওস্তাদ রাখতে অনেক খরচ, অত খরচ মঞ্জরীর একলা চালানো সম্ভব নয়। আর

সেই যে মঞ্জরী একবার কথার ছলে বলেছিল সে গানবাজনা শিখবে, সেইটিই জেদ করে' ধরল স্থকুমার। মঞ্জরী অনেক করে' বলেছিল যে এতে অনেক টাকা খরচ, সে বি-টি পড়বে, 'টিচার' হবে, ইত্যাদি। কিন্তু এই সব দুর্ব্বল প্রতিবাদ স্থকুমারই সবলে আপনা থেকে দূর করেছিল, না মঞ্জরীর প্রতিবাদের ভঙ্গীতেই স্থকুমার উত্তেজিত হয়ে তার প্রস্তাব দৃঢ় করেছিল তা মনস্তত্ত্ববিদেরাই বলতে পারেন। অবশ্য স্থকুমারেরও এ বিষয়ে রুচি ছিল। যে দখলী স্বত্ব সে মনে মনে বিস্তার করত মঞ্জরীর উপর, তার জন্য টাকা খরচ করে' সে সেটা নিজের কাছে চাইত প্রমাণ করতে; গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করেছিল সে এইরকমভাবে মঞ্জরীকে সাহায্য করতে এবং তাকে সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিনী করে' তুলতে। কোথাও কোন সম্বন্ধের বলে কেউ আশ্রয় পেতে যেমন আনন্দ বোধ করে, তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ বোধ করে কোনও সমর্থ ব্যক্তি কাউকে আশ্রয় দিতে। স্থকুমারের জীবনে আর এ পর্য্যন্ত পূরো সাবালক হওয়া ঘটে' ওঠে নি। আজ সে তার ধনের মালিক, চলেছে সে বিলেতে এবং ভরণ-পোষণ করছে তার বাগ্‌দত্তা পত্নীকে। সে আজ তাতে অনুভব করল পূর্ণ পুরুষত্বের মহিমা।

মঞ্জরীর কণ্ঠে ছিল মিষ্ট স্বর, তার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ এবং স্থর সম্বন্ধে তার কাণ ছিল খুব সজাগ। ভাল ভাল ওস্তাদ যখন লাগল তাকে শেখাতে, তার প্রতিভা স্পষ্ট হয়ে উঠল এই সঙ্গীতবিদ্যার মধ্যে। গানের একটা মোহিনী শক্তি আছে। যে গান করতে পারে, সমস্ত বড় উৎসবেই পড়ে তার ডাক। সঙ্গে সঙ্গে সে যদি স্থন্দরী, বিদুষী ও বিদগ্ধা হয় তবে অল্প দিনের মধ্যেই সে পারে সকলের মন কেড়ে নিতে। লক্ষ্ণৌয়ে সেজন্য মঞ্জরী দেবী হয়ে উঠলেন dominant figure of society। অনেকেই তার সঙ্গে চাইত মিশতে, তার বাড়ীতে এসে

চাইত তার সঙ্গে আলাপ করতে। কিন্তু মঞ্জরী বড় কাউকে আমল দিত না। এ বিষয়ে তার রুচি ছিল অত্যন্ত মার্জ্জিত। সে ছিল selective, সে কেবল কৃপাদৃষ্টিতে দেখেছিল অজয়কে। অজয় লক্ষ্ণৌয়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে সব চেয়ে বড ধনী। তার মামা তার জন্য সমস্ত সম্পত্তি রেখে কাশীবাসী হয়েছেন। তালুকদারের যত বাঁধা ঘর, সব তার হাতে। লক্ষ্মীর অকস্মাৎ আগমনে অজয়ের ব্যারিষ্টারিতে পসারও খুব খুলেছে। তা ছাড়া সে একজন স্বাদেশিক 'পলিটিসিয়ান্', কারণ অর্থের বলে সমস্ত বিষয়েই ভোটগুলি ছিল তার করায়ত্ত। আজকালকার যুগে ভোটই হচ্ছে সর্ব্বগুণের প্রমাণ। অমুকে বড় স্বাদেশিক কি না, নাও ভোট, অমুকে বড় কবি কি না, নাও ভোট, অমুকে বড় দার্শনিক কি না, নাও ভোট—সর্ব্বং ভোটময়ং জগৎ।

মঞ্জরীর সঙ্গে অজয়ের ঘনিষ্ঠতা চল্‌ল বেড়ে। লোকে একটু কৌতুকের কাণাকাণি করত বটে, কিন্তু বেশী কিছু বলবার ছিল না, কারণ উভয়েই অবিবাহিত। মঞ্জরীর পূর্ব্ব পরিচয় কেউ জানত না এবং সে যে কি সূত্রে এমন বিলাসবাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য লক্ষ্ণৌয়ে বাস করছে সে কথাও কারুর জানা ছিল না। ঘটনাটার রহস্য ভেদ করবার জন্য সকলেরই মন কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে গুঞ্জরণ করে' ফিরত। মঞ্জরী নিজে ছিল এ বিষয়ে খুব চাপা। পিসীমাকেও সে শিখিয়ে দিয়েছিল দু'চারটি মামুলী রকমের গল্প। আর তা ছাড়া সেই অহিফেনপরায়ণা বৃদ্ধার নিকট থেকে কারও কিছু খবর বের করা সহজ ছিল না এবং তিনি নিজেও ছিলেন ঢিলে রকমের লোক, সকল খবর তিনি জানতেনও না। মঞ্জরী মেয়েতে মেয়ে, পুরুষে পুরুষ, সেইজন্য তিনি সকল বিষয়ে তার শাসন মেনে চলতেন। এমনি করে' অজয় আর মঞ্জরীতে মিলে সৃষ্টি করে' চলল একটা নূতন পর্ব্ব,

নূতন অভিনয়। অজয় মঞ্জরীকে দিলে একখানা ভাল মোটর কিনে, প্রকাশ হল যে মঞ্জরীই কিনেছে গাড়ী। তারই নামে হ'ল মোটর কেনা, তারই নামে হ'ল রেজিষ্ট্রী। মঞ্জরী ইচ্ছা করলে যে কোনও দিনই অজয়কে বিয়ে করতে পারত, কিন্তু সে অপেক্ষা করতে লাগল সুকুমার কেমন উৎরায় দেখবার জন্য। অজয়কে সে সুকুমারের কথা কিছুই বলে নি। অজয়ের চোখে মঞ্জরী 'অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়-মলূনং কররুহৈঃ'।

বিলেতে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রভার সঙ্গে সুকুমারের অনেকবার দেখা হয়েছে। প্রভাকে সুকুমারের ভাল লেগেছে এবং সুকুমার সে খুব ভাল মেয়ে বলে' তার বন্ধুত্বকে আশীর্ব্বাদের মত গ্রহণ করেছে। সে মঞ্জরীকেও বলেছে যে প্রভার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে। কিন্তু প্রভা সম্বন্ধে মঞ্জরীর বিন্দুমাত্রও উৎকণ্ঠা ছিল না। তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে প্রভার এমন কোনও শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই যে সে সুকুমারকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে। তার চোখে সে কেবল একটা ক্যাব্‌লা রকমের মেয়ে।

কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে স্থান হয়েছিল কানাইয়ের। কিছু দিনের মধ্যেই তার চরিত্রের গুণে কয়েদী, ওয়ার্ডার, জেলর প্রভৃতি সকলেই তার বন্ধু হয়ে উঠেছিল। তার স্বভাবই ছিল এই যে সে কোনও অবস্থাতেই ক্লেশ অনুভব করত না। শরীর সম্বন্ধে সে ছিল একরকম নিস্পৃহ। তার দেহ তাকে কোনরকম কষ্ট দেয় নি, সেও দেহের জন্য কোন রকম উদ্বেগ বোধ করে নি। তার স্বভাবে আকৃষ্ট হয়ে অবসর সময়ে কয়েদীরা এসে বসত তার কাছে। সে তাদের বাড়ীঘর, ছেলেমেয়ে প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করত, নানারকম গল্প আলোচনা করত, নানা কাহিনী বিবৃত করত, আর সেই সব গল্প

কাহিনী, আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত দরদীভাবে তাদের শিক্ষা দিতে চাইত ও তাদের হৃদয়কে কোমল করে' আনতে চেষ্টা করত যা মঙ্গল, যা শ্রেয় সেইদিকে। এমনি করে' চলতে লাগল একদিকে তার শিক্ষাদান এবং তার অভিজ্ঞতাও বাড়তে লাগল দেশের সেই বিরাট জনসাধারণের বিষয়ে যাদের সম্বন্ধে আমাদের ইংরেজী-শিক্ষিতরা প্রায় কিছুই খবর রাখেন না। আমাদেব ইংরেজীশিক্ষিতদের কাছে দেশ বল্লে যারা কল্পনার মধ্যে আবির্ভূত হয় তারা মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টিমেয় লোকেরই শিক্ষাদীক্ষা, ধারণা বিশ্বাস, আদর্শ, চলাফেরা, রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু অভিজ্ঞতা, আর পর্ব্বত-প্রমাণ বিরাট জনরাশি সম্বন্ধে আমাদের না আছে কোনও জ্ঞান, না আছে কোনও দরদ। তাদের আচারব্যবহার, রীতিনীতি, আয়ব্যয়, পরস্পরের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের কিছুই জানা নেই। এদের সঙ্গে আলাপ করে' এবং পূর্ব্বে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তাতে সে ক্রমে উপলব্ধি করতে লাগল যে এত বড জনসমুদ্রকে ঈষন্মাত্রও বিচলিত করতে হ'লে দরকার হয় একটা প্রবল ঝটিকার। বর্ষের পর বর্ষ ধরে' এই ঝটিকার আন্দোলনে যদি কিছু সাড়া ওঠে এই নিঃসাড় জনসাধারণেব মধ্যে। সে অনুভব করতে পারল দু'একজন লোকের ক্ষীণ কণ্ঠের চেষ্টায় যে শব্দতরঙ্গ তোলা যাবে বা দু'একজনের চেষ্টায় যে কর্ম্মস্রোত বওয়ানো যেতে পারে, সে তরঙ্গ, সে স্রোত এ মহামরুভূমিতে পড়বামাত্র বিশুষ্ক হয়ে যাবে। তথাপি সে আশ্চর্য্য বোধ করল কেমন করে' এই বিপুল জনসাধারণের মধ্যে মহাপুরুষদের বাণী প্রবেশ করেছে এবং এই মরুভূমির মধ্যে যে স্নিগ্ধতা ও শ্যামলতা আছে, যে দরদ আছে, অনেক পাপ, অনেক অনাচার সত্ত্বেও যে সাধুতা আছে, তার বিন্দুমাত্রও থাকত না যদি সে

সমস্ত মহাপুরুষদের বাণী ফল্গুধারার ন্যায় তাদের অন্তরে প্রবাহিত না হ'ত। আমাদের চোখের সামনে যে পাপ, যে ধ্বংস, যে অনাচার আমরা দেখতে পাই, তারই যদি হ'ত প্রাধান্য, তাই যদি হয়ে উঠত সর্ব্বগ্রাসী, তবে আজও ভারতবর্ষ যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় কখনই থাকতে পারত না।

জেলের মধ্যে কানাই খুব পড়বার অবসর পেত। আনিয়েছিল সে নানা দেশের অনেক ইতিহাসের গ্রন্থ। এখানে সে বন্ধুভাবে পেলে জেলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌কে। ভদ্রলোক বিলেতফেরৎ ডাক্তার, অমায়িক, মিষ্টভাষী এবং বহু বিষয়ে তাঁর জানবার ইচ্ছা ছিল এবং জানতেনও তিনি অনেক বিষয়। তাঁর সঙ্গে অনেকসময় কানাইয়ের হ'ত নিয়মিত আলাপ। ভদ্রলোক একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার এই কারাগৃহে আসবার কারণ শুনেছি এই যে মেয়েদের শোভাযাত্রায় একটি মেয়ে অগ্রণী হয়ে আসে; তার সঙ্গে বাধে পুলিশের সঙ্ঘর্ষ; আপনি মেয়েটির পক্ষ হয়ে পুলিশকে করেন বেদম প্রহার; আটটিকে করেন ধরাশায়ী। তা সেই মেয়েটি কি আপনার কোন আত্মীয়া ছিলেন?"

কানাই বল্লে—"কিছুমাত্র না।"

"তবে কি আপনার সঙ্গে তার পরিচয়ও ছিল না?"

কানাই বল্লে—"পরিচয় হয়েছিল সামান্যমাত্র একটা চায়ের পার্টিতে, কিন্তু সেই পরিচয়ের জন্যই যে আমি লাফিয়ে পড়েছিলুম তা নয়। যে কোনও স্ত্রীলোকের উপর, যে কোনও অসহায়ের উপর, যে কোনও দুর্ব্বলের উপর বলবানের অত্যাচার দেখলেই আমার সমস্ত শরীরের রক্ত আগুন হয়ে ওঠে, আমি সমর্থ কি অসমর্থ তার কোনও চিন্তা করবার অবসরও আমার থাকে না। সম্মুখে সাপ দেখলে যেমন মানুষ প্রাণভয়ে

দেয় লাফ, তেমনি এ রকম অত্যাচার চোখের সামনে দেখলে আমার শরীরটা সেখানে আপনি পড়ে গিয়ে লাফিয়ে।"

ডাক্তার হেসে বল্লেন—"হঠাৎ আপনার pituitary glandএর কাজ আরম্ভ হয়ে যায়, না? Adrenalin secretion হয় রক্তের মধ্যে, ব্লাড্-প্রেসার যায় বেড়ে, আর করতে পারেন এমন সব অসম্ভব কাজ যা সাধারণ লোক পারে না?"

কানাই বল্লে—"হয় ত হবেও বা ঐরকম একটা কিছু। আমাদের শারীর প্রকৃতির মধ্যে এমন সব ব্যবস্থা আছে যা আকস্মিক কাজের জন্য দেয় আকস্মিক বল। প্রকৃতি প্রাণিপুঞ্জকে রক্ষা করবার জন্য রেখে দিয়েছেন শরীরের মধ্যে একটা আকস্মিক বলের রিজার্ভ্। নিমেষমধ্যে সেটা হয় কার্য্যকরী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মানুষ যদিও বুদ্ধিজীবী তথাপি তাদের বুদ্ধির মধ্যে আপৎকালের জন্য কোনও নূতন রিজার্ভ্ বল দেখতে পাওয়া যায় না। আমাদের বুদ্ধি যায় বিপৎকালে মূঢ় হয়ে।"

ডাক্তার বল্লেন—"এ কথাটা আপনার মানি না, কারণ বিপৎকালে নূতন পন্থা বাৎলে দেবে এইখানেই হচ্ছে বুদ্ধিতে আর instinctএ তফাৎ।"

কানাই বল্লে—"মানলুম, Biologyর দিক থেকে আপনি যা বলছেন তা ঠিক, কিন্তু আমাদের যে এতবড় আপৎকাল উপস্থিত হয়েছে এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমাদের চেতনালোকে ত কোনও নূতন উন্মেষ আসছে না।"

ডাক্তার বল্লেন—"আসছে না তা বলেন কি করে'? ধরুন, চল্লিশ বৎসর আগে যখন কংগ্রেসের প্রথম সভা বসল তখনই এল একটা নূতন মন্ত্র যে বাহুবল যেখানে নেই সেখানে বাগ্‌বলের দ্বারা এই প্রভুতন্ত্র

রাজ্যের মূল পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে তুলতে হবে। আর এই চল্লিশ বৎসর ধরে' যে বাক্‌স্রোত চলেছে তাতে দেশময় একটা প্লাবন এনে দিয়েছে। কতশত লোক নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে' নিরন্তর কত যন্ত্রণা, কত অত্যাচার, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করেছে।"

কানাই বল্লে—"তা কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে বটে, কিন্তু বিশাল জনসমুদ্র কেবল যে নিরক্ষর তা নয়, তারা একান্ত দুর্ব্বল। কিসে তাদের স্বার্থ, কেমন করে করবে তাদের স্বার্থরক্ষা, সে সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না। অন্য দেশ হ'লে এ রকম তুমূল আন্দোলনের ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে বিদ্রোহ উৎপন্ন হ'ত এখানে তার কিছুমাত্র নেই। এ যেন একেবারে টিকের আগুন, অনেক ফোঁয়ালে একটু জ্বলে, তারপর যায় ছাইয়ে ঢাকা হয়ে আপনি নিবে।"

ডাক্তাব বল্লেন—"সে কথা ঠিক। কিন্তু কেন এমন হয় বলুন ত?"

কানাই বল্লে—"অধ্যাপক ব্যানার্জির সঙ্গে একবার আমার একটা আলোচনা হয়েছিল এ বিষয়ে। লোকটি যেমন বিদ্বান্ তেমনি বহুদর্শী ও বিচক্ষণ। বসে' গেছেন অগস্ত্যের মত, লেগে গেছেন জ্ঞানের মহাসমুদ্র পান করতে। অমন অদ্ভুত জীর্ণ করবার শক্তি কারও দেখা যায় না। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে সমস্ত ঘটনার কারণ হচ্ছে ইতিহাস।"

ডাক্তার বল্লেন—"সমস্ত জিনিষেব কারণ ইতিহাস, এ কথার মানে কি?"

কানাই বল্লে—"তিনি বলেন যে যা কিছু সম্বন্ধে আমরা ভাবতে পারি সেগুলি সমস্তই নিরন্তর চলছে, যেন স্রোতের জল। এই চলার মধ্য থেকে অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে' আমরা যখন কোন কিছুকে আমাদের চিন্তা ও মনোযোগের বিষয়ীভূত

করি, তখন সেটা আমাদের চোখে একটা অচল বস্তুর মত দেখায়। কিন্তু যে কোনও পদার্থেরই বর্ত্তমান অবস্থাটাকে বিচ্ছিন্ন করে' আনি আমরা আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের মধ্যে, তার পিছনে রয়েছে অনাদি ক্রিয়ার স্রোত। এই অনাদি অতীত-কালের স্রোতে একটা বিন্দুতে প্রকাশ হচ্ছে আমাদের বর্ত্তমানকাল। কাজেই, বর্ত্তমানকালে যাকে আমরা পাচ্ছি সেটা উৎপন্ন হয়েছে অনাদিকালের ক্রিয়াপরম্পরার ফলে। আবার এই বর্ত্তমানকালে যাকে পাচ্ছি সে চলেছে সীমাহীন অনাগতের উদ্দেশে। কাজেই, প্রত্যেক পদার্থই ত্রিবিক্রম। ত্রিবিক্রমের একটি পা পাতালে, একটি পা পৃথিবীতে, আর একটি পা স্বর্গলোকে। বিষ্ণু অর্থ 'ব্যাপক'। যা ব্যাপক তাই ত্রিবিক্রম অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে ব্যাপ্ত করে' রয়েছে। অতীতে রয়েছে তার অতীতের ইতিহাস, যার ফল পাওয়া যাচ্ছে বর্ত্তমানে। বর্ত্তমান বিন্দুকে অতিক্রম করে' অতীতের ইতিহাস চলেছে অনাগতের দিকে, সেই অনাগতের রূপই হচ্ছে বর্ত্তমানের উদ্দেশ্য। আমরা যখনই কোনও জিনিষ বুঝতে চাই তখনই তিনটি কথা আমাদের মনে হয়—কারণ, কার্য্য ও তার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক পদার্থই ত্রিলোকী। তা ব্যাপ্ত করে' রয়েছে এই তিন লোক—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। বর্ত্তমান হচ্ছে অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনলগ্ন।"

ডাক্তারবাবু বল্লেন—"কথাটা ভাল বুঝলুম না।"

কানাই বল্লে—"ধরুন, এই রয়েছে একটা নুড়ি। এটা একটা পার্থিব জিনিষ। এর উপাদান তখনও ছিল বর্ত্তমান যখন পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল সূর্য্যের বাষ্পের মধ্যে। সেই উপাদান বেরিয়ে এল সেই মহাবাষ্পরাশি থেকে যার থেকে উৎপন্ন হয়েছে এই পৃথিবী। সেই বাষ্পরাশি চলেছিল নিরন্তর নানা পরিবর্ত্তনে, যে পরিবর্ত্তনের ফলে

পৃথিবী বর্ত্তমানকালের পৃথিবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নুড়িটিও অনাদিকাল থেকে বহু ক্রিয়া-পরম্পরার মধ্য দিয়ে আপন সত্তাকে কোনও না কোনওভাবে স্বতন্ত্র করে' রেখেছে। এই নুড়িটিকে যথার্থ বুঝতে গেলে আমরা দেখ্‌তে পাই যে এই প্রাকৃতিক নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে তার যে ইতিহাস তাকে নুড়ি করে' তৈরী করেছে তা ছিল তারই মধ্যে লুক্কায়িত হয়ে। আবার এইখানেই নুড়ির শেষ নয়, এ চলেছে এর অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে। এই অতীত অনাগতের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ছাড়া এই নুড়িটিকেও সম্পূর্ণভাবে বোঝবার উপায় নেই। এই নুড়ির মধ্যকার প্রত্যেকটি পরমাণু কিরূপে পরস্পর গ্রথিত হয়ে রয়েছে তার সমস্ত কারণ ও উদ্দেশ্য বিধৃত হয়ে রয়েছে তার অতীত ইতিহাসে ও তার অনাগত ইতিহাসে। বর্ত্তমান হচ্ছে অতীতের ফল ও অতীত ও বর্ত্তমানের বলোৎপন্ন ভবিষ্যৎ হচ্ছে তার উদ্দেশ্য।"

ডাক্তারবাবু বল্লেন—"তারপর?"

"এমনি করে' একদিকে চলেছে প্রত্যেক জড়খণ্ডের সঙ্গে অপর জড়খণ্ডের মিলন, বিচ্ছেদ ও পরিবর্ত্তনের ইতিহাস। আবার এই জড়ের থেকে একটি শাখা প্রাণপ্রবাহ উৎপন্ন করে' একটি নূতন ইতিহাস-পর্য্যায়ের সৃষ্টি করেছে এবং সেই প্রাণপ্রবাহের মধ্যে একটা নূতন ইতিহাসের বীজ দেখা যায় প্রাণিলোকের instinctএর মধ্যে। সেই ইতিহাসটা একটা নূতন পর্য্যায় পেয়েছে উচ্চশ্রেণীর প্রাণিপর্য্যায়ের মধ্যে ও নরলোকের মধ্যে। এই তিন শ্রেণীর ইতিহাসের মধ্যে পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব ও পরিবর্ত্তনের ফলে প্রত্যেকেরই ইতিহাসের হচ্ছে নূতন নূতন পরিবর্ত্তন।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—"মনুষ্যলোকে এই ইতিহাসের ধারা কি রকম?"

কানাই বল্লে—"নানা কারণে মানুষের ইতিহাসের চলেছে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন। সে কারণগুলি সমস্ত বিবৃত করা সম্ভবও নয়, তার প্রয়োজনও নেই। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এই বোঝা যায় যে চতুষ্পার্শ্বস্থ পৃথিবীর জলবায়ু, প্রাণী, লতাগুল্ম, নদীসাগরভূধর প্রভৃতিতে মানুষকে দেয় একটা প্রাকৃতিক আবেষ্টন। তার মধ্যে খুঁজতে হয় তাকে আহার, করতে হয় তাকে জীবনধারণ, অন্বেষণ করতে হয় আহারের উপায় (economic means), করতে হয় শ্রমবিভাগ, বণ্টন-বিভাগ। তার পিছনে থাকে মানুষের প্রতি মানুষের একটা স্বজাতীয়তাবোধ, জাতিগত ও বংশগত বিশেষত্ব এবং যেখানে এক স্থানে বিভিন্ন জাতীয় লোকের সমাবেশ হয় সেখানে ঘটে দুই জাতির ইতিহাসে ইতিহাসে দ্বন্দ্ব এবং করতে হয় সেই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম। যখন ক্রমশঃ মন উঠতে থাকে গড়ে' তখন ধর্ম্ম, নীতি, রাষ্ট্র প্রভৃতির নূতন নূতন চিত্তগত কারণ উপস্থিত হয়ে ঘটাতে থাকে ইতিহাসের পরিবর্ত্তন। মানুষের অন্তবস্থ বিভিন্ন প্রবৃত্তির তাড়না ও নানা জাতীয় ইতিহাস-পরম্পরার পরস্পর দ্বন্দ্বে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত চলতে থাকে এক একটা জাতির ইতিহাস এবং সেই জাতির সঙ্গে অপর জাতির দ্বন্দ্বে ঘটতে থাকে উভয় জাতির পরিবর্ত্তন। এমনি করে' সমুদ্রের ঢেউয়ের মত বিভিন্ন ধারায় চলেছে বিভিন্ন মনুষ্যজাতির ইতিহাস, তাদের পরস্পরের সঙ্গমে ও দ্বন্দ্বে তাদের পরস্পরের ইতিহাসের হচ্ছে পরিবর্ত্তন। এই ইতিহাসের ফলে যে জাতি এসে যেখানে দাঁড়িয়েছে বা যেদিকে সে ছুটেছে সহসা তার কোনও পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। মানুষের ব্যক্তিগত বা যৌথ চেষ্টা এই ইতিহাস পরিবর্ত্তনের একটা কারণ হ'তে পারে এবং এক একজন মহাপুরুষের চেষ্টা এই ইতিহাসের গতিকে খানিকটা পরিমাণে দিতে পারে ফিরিয়ে, কিন্তু প্রত্যেক জাতির ব্যক্তিগত

ইতিহাস এবং অন্যান্য জাতির সঙ্গে তার ইতিহাসের দ্বন্দ্ব—এইটিই হচ্ছে তার ইতিহাস পরিবর্ত্তনের প্রধান শক্তি। এই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোন কাজ করা অসম্ভব।"

ডাক্তার বল্লেন—"দেশের ইতিহাস আমাদের কোন্‌খানে এনে ফেলেছে ?"

কানাই বল্লে—"আর্য্যেরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁদের মধ্যে ছিল একটা প্রবল স্বজাতীয়তার বোধ। এই স্বজাতীয়তার বোধকে দৃঢ় করেছিল তাঁদের কুলক্রমাগত কাব্যগাথা এবং তাঁদের আচার ও ধর্ম্মপ্রণালী। এই কাব্যগাথা হচ্ছে বেদ। এই দুটির প্রতি প্রবল ভক্তি নিয়ে তাঁরা পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁদের বিরোধী অসুর ও দ্রাবিড়জাতি এবং অন্যান্য অনার্য্য জাতির সঙ্গে প্রবৃত্ত হলেন দ্বন্দ্বে। এই দ্বন্দ্বের ফলে তাঁরা এই সমস্ত জাতিগুলির কতগুলির মধ্যে আপনাদের আচার ও ধর্ম্মপ্রণালী দৃঢ় করে' স্থাপিত করেছিলেন এবং এদের কতগুলিকে অসামর্থ্য প্রযুক্ত এই সমস্ত বিদ্যার অধিকার দেন নি, কিন্তু তাদের গ্রহণ করেছিলেন নিজেদের সমাজে সেবক হিসাবে, কারুশিল্পী হিসেবে। এমনি করে' তাঁরা আর্য্যগোষ্ঠীর মধ্যে এই সমস্ত জাতিগুলিকে কোনও না কোনও ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এমনি করে' চলতে লাগল তাঁদের ইতিহাস, যা প্রকাশ করতে লাগল আপন জাতিগত ব্যক্তিত্ব। দ্রাবিড়জাতিদের অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্রতা ছিল, সেইজন্য তাঁরা আর্য্যদের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেই অনেক নূতন জিনিষও উৎপাদন করেছিলেন ধর্ম্ম, স্থাপত্য, কাব্য ও সঙ্গীত প্রভৃতিতে। জাতি সংমিশ্রণের এইটিই হচ্ছে চরম সার্থকতা।"

ডাক্তার বল্লেন—"সেইভাবেই চল্‌ল না কেন ভারতের ইতিহাস ?"

কানাই বল্লে—"এর পরেই এল পারসিকেরা। তারা উত্তর-পশ্চিম

ভারতের কিয়দংশ করলে দখল এবং ভারতবর্ষকে যুক্ত করলে তাদের বিরাট সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিশরদেশ পর্য্যন্ত। ভারতবর্ষ বহুবিশ্রুতি লাভ করল পশ্চিমদেশ পর্য্যন্ত। কিন্তু পারসিকেরা ভারতবর্ষে বিশেষ কোন দাগ রেখে যেতে পারে নি। তারপরে এল যবনেরা। শুধু যে সিকন্দর-শা একবার ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন তা নয়, অনেক যবন রাজা ভারতবর্ষের মধ্যে রাজ্যস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এই বাহ্যিক জয়ে ভারতবর্ষ দমল না। তারপরে এল শক এবং হূণজাতি, রাজ্য স্থাপন করলে তারা ভারতবর্ষে, কিন্তু গ্রহণ করলে তারা হিন্দু সভ্যতা এবং হিন্দুধর্ম্ম। সংঘর্ষ লাগল চীনাদের এবং তিব্বতীদের সঙ্গে। ভারতবর্ষ তাদের জয় করলে তাদের মধ্যে আপনার ধর্ম্ম প্রচার করে'। যে ধর্ম্মবলে ভারতবর্ষ ইতিপূর্ব্বে অন্য সকল জাতির হৃদয় জয় করেছিল এবং এনেছিল তাদের আপন সভ্যতার আওতার মধ্যে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াল একটা প্রবল ধর্ম্ম যখন মুসলমানেরা প্রবেশ করল ভারতবর্ষে। যতই আক্রমণ হ'ল ভারতবর্ষের ধর্ম্মের প্রতি বাহ্যিক-ভাবে, ততই ভারতীয়েরা মন দিয়ে অস্বীকার করলে প্রবলভাবে এই মোস্‌লেম্ ধর্ম্ম ও মোসলেম্ সভ্যতা, বাঁধলে আপনাদের নিবিড় করে' যাতে উভয় জাতির মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় আব সংমিশ্রণ না হ'তে পারে। ফলে যে উদার সংমিশ্রণ-নীতিতে ভারতবর্ষ অন্য সমস্ত জাতিকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করেছিল সেই নীতি প্রযুক্ত হ'তে পারল না মুসলমানদের সম্বন্ধে। মুসলমানেরা রইল ভারতীয় সভ্যতার বাইরে, তাদের ধর্ম্ম ও নীতি রইল পৃথক হয়ে। তথাপি কালক্রমে এই সংমিশ্রণের গতি আরম্ভ হয়েছিল এবং উভয় ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতি বহু সাধুদের প্রযত্নে। হয়ত বা তা এককালে সফল হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু

এমন সময়ে এল ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী। এদের মধ্যে পরস্পর লাগল লড়াই। ইংরেজ রইল কায়েমী হয়ে এবং আস্তে আস্তে গ্রাস করলে সমস্ত ভারতবর্ষ।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—"ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় আমরা এমন দেবে গেলাম কেন ?"

কানাই বল্লে—"এতদিন ভারতবর্ষ যে সব জাতির সম্মুখীন হয়েছিল তাদের কারও হয় ত ছিল না কোনও ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য, কারুর বা ছিল প্রবল ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। তাই ভারতবর্ষ ধর্ম্ম ও নীতির মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে আপনার হৃদয় বিস্তৃত করতে পেরেছিল বা বিস্তৃত করবার জন্য উদ্যোগী হ'তে পেরেছিল। কিন্তু ইংরেজের যদিও একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম ছিল, তথাপি ধর্ম্মটা ছিল তার গৌণ। সে এসেছিল তার নূতন বিদ্যা নিয়ে—তার জড়বিদ্যা, সমাজবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিদ্যা। সে তার ধর্ম্মকে গৌণ করে' সেই বিদ্যাকেই করে' তুলেছিল প্রধান। সেই বিদ্যাই তাকে দিয়েছিল শক্তি, দিয়েছিল বল। সেই বল প্রকাশ পেয়েছিল তাদের যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এবং গড়ে' তুলেছিল তাদের বুদ্ধি ও নীতির কাঠামো। এর সামনে এসে ভারতীয় সভ্যতা, যা আপনাকে চাইছিল প্রকাশ করতে ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে, তা দাঁড়াল থম্‌কে, খেতে লাগ্‌ল ঘূর্ণী, ঠিক করতে পারলে না যাবে কোন্ দিকে। সে অবহেলা করল আপন ধর্ম্মকে কিন্তু আয়ত্ত করতে পারল না পাশ্চাত্য দেশের বল।"

ডাক্তার বল্লেন—"তবে যে আপনি আপনার আত্মপ্রকাশের প্রধান মন্ত্র বলে' মনে করেছিলেন ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মবুদ্ধিকে ও আদর্শকে ইউরোপীয় নীতির বিরুদ্ধে দাঁড় করানোকে এবং সে জন্য সহ্য করেছিলেন অনেক ক্ষয়ক্ষতি !"

কানাই বল্লে—"এখন দেখছি সেইটিই হয়েছিল আমার ভুল।"

ডাক্তার বল্লেন—"কেন, আপনি কি মানেন না যে ভারতবর্ষীয় ও পাশ্চাত্যদের মধ্যে একটা আদর্শের দ্বন্দ্ব আছে, সেইটে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্বের প্রতীক, তাই প্রকাশ পাচ্ছে নানা পরিচ্ছদে ও পট-ভূমিতে?"

কানাই বল্লে—"না, তা অস্বীকার করি না।"

ডাক্তার বল্লেন—"তবে?"

কানাই বল্লে—"বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে এই যে ইউরোপীয়েরা যা আবিষ্কার করছে সে বিদ্যাটা ত মিথ্যা নয়, অথচ সে বিদ্যাটা আমরা আয়ত্ত করি নি। যখনই এক জাতি অপর জাতির উপর জয়ী হয়েছে সে জয় ঘটেছে বিদ্যার বলে। বিদ্যা দুই রকম—একটা জড়বিদ্যা, যার ফলে আসে বল; আর একটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিদ্যা, যার ফল পাওয়া যায় ধর্ম্ম, নীতি ও চরিত্রে। নীতি ও চরিত্র যখন প্রধান হয়ে ওঠে তখন তা পরিণত হয় ধর্ম্মে। যখন কোন জাতি অপর জাতিকে জয় করেছে বাহ্য বলের দ্বারা, জড়বলের দ্বারা, তখন তা ঘটেছে জড়বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত এবং এই জড় বিদ্যার পিছনে নিযুক্ত থাকত চরিত্রের দৃঢ়তা। আর যখনই কোনও জাতি বাহ্যতঃ বিজিত হয়েও অপরের হৃদয় জয় করেছে বা আপন সভ্যতায় অন্যকে দীক্ষিত করেছে, তখন সেটা ঘটেছে অধ্যাত্মবলের দ্বারা, ধর্ম্ম, নীতি ও জ্ঞানের বলের দ্বারা। পাশ্চাত্য জাতিরা যে জড়বিদ্যা আয়ত্ত করেছে আমাদের সে জড়বিদ্যা নেই, তাই বাহ্যিক বলে হয়ে পড়েছি আমরা পদানত। ধর্ম্মে হারিয়েছি আমরা বিশ্বাস, নীতিতে নেই আমাদের দৃঢ়তা, জ্ঞানে হয়ে পড়েছি আমরা সঙ্কুচিত, আমাদের ধর্ম্মের স্থান নিয়েছে অর্থহীন মিথ্যা আচারে। তাই কি জড়বিদ্যা, কি অধ্যাত্ম বিদ্যা, উভয় দিক থেকেই আমরা হয়ে পড়েছি নিঃস্ব। কাজেই,

পাশ্চাত্য জাতিদের সামনে দাঁড়ানো হ’য়ে পড়েছে আমাদের পক্ষে অসম্ভব।”

ডাক্তার বল্লেন—“আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে যদি আমরা জাগিয়ে তুলি তা হ’লেও হয় ত আমরা উঠে দাঁড়াতে পারি।”

কানাই বল্লে—“তা পারবেন কি করে’? আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি যে ফেলেছে তার ইতিহাসকে হারিয়ে।”

ডাক্তার বল্লেন—“কেন?”

কানাই বল্লেন—“ইউরোপীয়েরা একটা নীতি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে, তাদের রাষ্ট্রবিদ্যা এবং সমাজবিদ্যাকে ব্যাপ্ত করেছে তাদের সেই নীতিবুদ্ধি, আর এর পিছনে দাঁড়িয়েছে তাদের জড়বল এবং তাদের অসামান্য জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা থেকে আবিষ্কৃত হচ্ছে প্রতিদিন নব নব জ্ঞান, আর সেই জ্ঞান প্রতিদিন সবল করে’ তুলছে তাদের ইতিহাসকে। তাই তাদের ইতিহাস বলিষ্ঠ ও সচেতন হয়ে উঠছে প্রতিদিন, আর আমরা সেই ইতিহাসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমাদের নীতিবর্জ্জিত ধর্ম্মের ছায়ামাত্র নিয়ে, কথার আড়ম্বর নিয়ে, প্রাচীনের দোহাই নিয়ে। আমাদের প্রাচীনও আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অপরোক্ষ হয়ে ওঠে নি তার সম্পূর্ণ ইতিহাসকে নিয়ে। আমাদের ইতিহাসকে আবিষ্কার করছে ইউরোপীয়েরা, বহিরঙ্গভাবে আমরা করছি তাই তাদের কাছে অধ্যয়ন। এই জন্যই বল্‌ছিলুম যে আমাদের ইতিহাসকে আমরা ফেলেছি হারিয়ে।”

ডাক্তার আবার বল্লেন—“কিন্তু আপনার কথা অনুসারে ত এই কথাই মনে হয় যে কোনও ইতিহাসই কখনও হারাতে পারে না। ইতিহাসই ত সত্য, তা মিথ্যা হবে কেন?”

কানাই বল্লে—“সে কথা ঠিক। কিন্তু হারানো অর্থ ত মিথ্যা

হওয়া নয়। হারানো অর্থ প্রত্যক্ষের বাহিরে যাওয়া। যা হারায় তা ত থাকে, কেবল তাকে খুঁজে পাই না ও ব্যবহার করতে পারি না।"

ডাক্তার আবার বল্লেন—"ইতিহাস প্রত্যক্ষের বাইরে যাবে তার মানে কি?"

কানাই বল্লে—"যখন কোনও পর্য্যায়ের ইতিহাস অন্য পর্য্যায়ের ইতিহাসের সঙ্গে দ্বন্দ্বে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে কিংবা বিলুপ্ত হয়ে যায় আর একটা ইতিহাসের শরীরের মধ্যে, তখনই তাকে বলে হারিয়ে যাওয়া।"

ডাক্তার বল্লেন—"লুপ্ত হওয়া মানে ত ধ্বংস হওয়া। আপনি ত তা হলে প্রকারান্তরে ইতিহাস ধ্বংস হ'তে পারে তাই স্বীকার করছেন।"

কানাই আবার বল্লে—" 'লুপ্ত হওয়া' শব্দের অর্থটা আপনি বিস্মৃত হয়েছেন। ভগবান পাণিনি বলেছেন 'অদর্শনং লোপঃ', অর্থাৎ, যা দৃষ্টিপথের বাইরে গেছে তাকেই আমরা বলি—লুপ্ত হয়েছে। লুপ্ত হওয়া মানেই তাকে আর দেখা যায় না।"

ডাক্তার আবার বল্লেন—"আমাদের দেশের ধর্ম্মের এই আদর্শ লুপ্ত হয়েছে বলায় আপনি কি বুঝছেন?"

কানাই বল্লে—"আমি বুঝেছি এই যে আমাদের সেই ধর্ম্মের আদর্শ নিমগ্ন হয়ে গেছে আমাদের অন্তরের গভীরের মধ্যে, তা প্রবিষ্ট হয়েছে আমাদের ধাতুর মধ্যে, কিন্তু তা ব্যক্ত মনের সামনে এসে তেজস্বী ও বীর্য্যবান হয়ে উঠতে পারছে না, তা দেখাতে পারছে না সফল হয়ে প্রতিবিম্বিত করে' আপনাকে আমাদের কার্য্যের মধ্যে।"

ডাক্তার বল্লেন—"তার কারণ?"

কানাই বল্লে—"তার কারণ এই যে ইতিপূর্ব্বে যে সকল জাতি

আমাদের দেশে এসে বলবিক্রমের দ্বারা আমাদের পরাজিত করেছিল তাদের সেই বলের মধ্যে আমরা এমন কিছু অনুভব করি নি যার দ্বারা তার মধ্যে যে কোনও নিত্যতা বা অমৃতত্ব বা অক্ষয়তা আছে তা অনুভব করতে পারতুম। সে বল ছিল contingent, অর্থাৎ, এখন যে বল প্রকাশ পাচ্ছে, পর মুহূর্ত্তে সে বল প্রকাশ পেতে না পারে। কিন্তু ইউরোপীয়েরা যে বল নিয়ে আমাদের সামনে এল তার মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বিদ্যার গাম্ভীর্য্য, বিদ্যার অক্ষয়ত্ব। সে বল একটা সাময়িক বল নয়, একটা আপেক্ষিক প্রকাশ নয়, সে বল উদ্ভূত হচ্ছে জড়ের রহস্য থেকে। সে রহস্য অমর, সে বিদ্যা। তাই সে হয়েছে কার্য্যকরী। সে বিদ্যা শুধু যে জড়ের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করেছে তা নয়, সে বিদ্যা ব্যাপ্ত করেছে ইউরোপীয়দের চরিত্র, তাদের রাষ্ট্র, তাদের সমাজ।"

ডাক্তার আবার বল্লেন—"আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিই বা প্রদীপ্ত হয়ে বিদ্যার তুল্য বলশালী হয় না কেন?"

কানাই বল্লে—"মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে আমাদের ধর্ম্মকে আমরা সঙ্কুচিত করে' ফেলেছিলাম শুধু পরস্পরকে কেমন করে' পৃথক করে' রাখব সেই জন্য। ধর্ম্মের যথার্থ স্থান নিয়েছিল আচার। ধর্ম্ম অর্থ 'যা ধারণ করে'। নব নব অবস্থার মধ্যে ধারণ করবার রূপ হবে পরিবর্ত্তিত। এই জন্য ধর্ম্মের মধ্যে থাকা চাই জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা আপনাকে প্রকাশ করবে বিদ্যার মধ্য দিয়ে, তবে সে ধর্ম্ম হবে ওজস্বী। কোন্ সময়ে কি উপায়ে আমরা ধারণ করতে পারি আমাদের, সেটা বলে' দিতে পারে বিদ্যা। এই জিজ্ঞাসা যখন বিলুপ্ত হ'ল এবং বিচারের স্রোতকে আচার দিলে বন্ধ করে' তখন একদিকে দাঁড়াল আচারের জটিল বন্ধন এবং আদর্শের উচ্চ অধ্যাত্ম কামনা

প্রকাশ পেল ধর্ম্মে একান্ত পরাপেক্ষিতায়, প্রভুবাদে। ভগবানকে করে' তুললাম আমরা বাদশাহের প্রতীক। মনে করতে লাগলুম যে স্তবস্তুতিতে খুসী হয়ে শরণাগতকে বাদশাহ যেমন আপনার সমীপস্থ করেন তেমনি আমাদের ভক্তিতে ও প্রীতিতে খুসী হয়ে ভগবানও আমাদের তাঁর সমীপস্থ করবেন। ভক্তির প্রবল বন্যায় বিচার গেল রুদ্ধ হয়ে, জিজ্ঞাসা হ'ল স্তব্ধ, ধর্ম্ম হারাল তার বল রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মধ্যে।"

ডাক্তার বল্লেন—"আপনি কি বলেন তবে ভক্তি নিষ্ফল ?"

কানাই বল্লে—"তা আমি কখনও বলি না। কিন্তু প্রত্যেক জিনিষই সবল দুর্ব্বল হয় তার পারিপার্শ্বিক ইতিহাসে। ভক্তি যখন থাকে যুক্ত হয়ে জ্ঞানের সঙ্গে, বিচারের সঙ্গে, রাখে আপনাকে অবিযুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রধর্ম্মের সঙ্গে, তখন ভক্তিরসের আস্বাদনে মানুষের হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে বিপুল আনন্দে। কিন্তু কোনও একজন মানুষ যখন আর সকলের থেকে আপনাকে বিযুক্ত করে' কেবল আপনার মনঃকল্পিত ভগবানের সঙ্গে আপন সান্নিধ্য ঘনিয়ে তুলতে চায় তখন সে ছিঁড়ে ফেলে তার সমস্ত সম্বন্ধ সর্ব্বলোকের সঙ্গে, সর্ব্বসমাজের সঙ্গে, সমদর্শিতা পরিণত হয় অদর্শিতায়। সে ভগবানের সাক্ষাৎ পেতে চায় আপন গহন অন্ধকারের মধ্যে, ব্যর্থ করে সে আপনার মধ্যে ভগবানের নিয়মকে, তাঁর শৃঙ্খলাকে, ভুলে যায় যে সর্ব্বযোগিতার মধ্য দিয়ে ভগবান ব্যাপ্ত করতে চান প্রত্যেক মানুষের আপন রূপ। এরূপ ধর্ম্ম সমাজকে করতে পারে না দৃঢ়, মানুষকে করতে পারে না একত্র, সর্ব্বহৃদয়কে বাঁধতে পারে না একটি ঐক্যসূত্রে। সকলেই হয়ে উঠতে চায় পৃথক পৃথকভাবে ভগবানের স্তাবক এবং পেতে চায় তাঁর আশীর্ব্বাদ পৃথক পৃথকভাবে তাঁর হাত থেকে। তাই ধর্ম্ম হারিয়ে ফেলে তার সমাজ-

বিধান শক্তি, ভিক্ষা স্থান নেয় পৌরুষের, বীর্য্য স্থান নেয় শরণাগতিতে, মানুষ হারিয়ে ফেলে তার ব্যক্তিত্ব। মুসলমানদের সময়ে বাদশাহী একেশ্বরবাদের যে রাষ্ট্রতন্ত্র ছিল সেই রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেল আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মের ওজস্বিতা ও দৃঢ়তা। আজ এই দুর্ব্বল ধর্ম্মকে আশ্রয় করে' আমাদের প্রবৃত্তি চলেছে একদিকে ইংরেজ রাজাদের কাছে নানা ছলে ভিক্ষা করায় এবং আর একদিকে পূজা, মানৎ, পশুবলি প্রভৃতির দ্বারা দেবতার তুষ্টি সাধনে কিংবা শান্তিস্বস্ত্যয়নের দ্বারা আকাশেব অচেতন গ্রহবর্গকে আমাদের অনুকূল করায়।"

ডাক্তার বল্লেন—"আমাদেব এই ধর্ম্মকে কি আর সন্ধুক্ষিত করা যায় না? আর যদি আমরা আমাদের ধর্ম্মকে এমান করে' হারিয়েই ফেলে থাকি তবে ইউরোপীয় আদর্শের সঙ্গে মন সায় দিতে চায় না কেন?"

কানাই বল্লে—"আপনাকে ত আমি বলেছি যে আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মেব ইতিহাসটি ধ্বংস হয় নি, সে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে আমাদের অবচেতনার মধ্যে। সেই অবচেতনার স্পন্দনে আমরা ইউরোপীয় আদর্শ সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে চাইলেও গ্রহণ করতে পারি না। হৃদয়ের মধ্যে জাগে বিদ্রোহ এবং তাদের আদর্শের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাদের আদর্শ তাদের জীবনে এনে দেয় যে সামঞ্জস্য, তাদের আদর্শ গ্রহণ করে' সে সামঞ্জস্যে তুলতে পারি না মণ্ডিত করে' আমাদের চরিত্রকে। ইংরেজের মধ্যে যে আছে nationalism তা বাস্তব করে' তুলেছে তাদের জীবনকে, অনুপ্রাণিত করেছে ধর্ম্মের শক্তি। আমাদের ধার-করা nationalism এমন প্রীতিতে পরিণত হয় নি যা স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে উঠতে পারে দেশের ও দশের মঙ্গলকামনায় ও দেশের ও দশের জন্য স্বার্থত্যাগে। তা পরিণত হয়েছে বাগাড়ম্বরে,

চটক-লাগানো demonstrationএ এবং ইংরেজের নিকট ভিক্ষার ছলনার বিচিত্রতায়।”

ডাক্তার বল্লেন—“তবে এ ধর্ম্মকে জাগিয়ে তোলার উপায় কি?”

কানাই বল্লে—“বিচার, বিদ্যা ও চরিত্র। ইউরোপ যে বিদ্যাকে আরাধনা করে’ সিদ্ধ হয়েছে সেই বিদ্যাকে আমাদেরও আরাধনা করতে হবে প্রত্যক্ষদৃষ্ট উপায়ে, তার দ্বারা বাড়াতে হবে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, সহজ করে’ এনে দিতে হবে জীবনযাত্রা। যে দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী খাদ্যের অভাবে প্রাণত্যাগ করছে বা প্রাণের ছায়ামাত্র ধারণ করে’ আছে সে দেশ ত মৃতপ্রায়। প্রাকৃতিক বল সংগ্রহ না করলে, ইউরোপীয়দের ন্যায় প্রাকৃতিক বলে বলীয়ান্ না হ’লে, সেই সঙ্গে না আনতে পারলে চরিত্রের দৃঢ়তা, আমরা ধর্ম্মজাগরণের প্রথম স্তরেও উঠতে পারব না। কল্পিত একটা স্বাধীনতার অভিমানে জীবনধারণ করা হবে অসম্ভব, তাই আমাদের মজ্জাগত করে’ তুলতে হবে প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট শাস্ত্রের চর্চ্চা, বিজ্ঞানের চর্চ্চা, প্রকৃতির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে তার রহস্য, আর ব্যবহার করতে হবে তাকে দেশের মঙ্গলের জন্য।”

ডাক্তার বল্লেন—“কিন্তু বিদেশী শাসন যে দেবে পদে পদে বাধা।”

কানাই বল্লে—“বাধা ত দেবেই, কিন্তু বাধায় বাধায় ঠেকে’ ঠিক্‌রে’ উঠবে আমাদের আগুন, যদি কোথাও কিছুমাত্র তার অবশেষ থাকে।”

ডাক্তার আবার বল্লেন—“আগে স্বাধীনতা অর্জ্জন করে’ তার পরে সে চেষ্টায় হাত দিলে কি হয় না?”

কানাই বল্লে—“কিন্তু স্বাধীনতা হবে কি করে’? যে স্বাধীনতা আমরা ভিক্ষার দ্বারা লাভ করব সে স্বাধীনতা ত হবে নিঃসার ছায়া। অভিভাবকেরা থাকবেন পিছনে, দাবীটা থাকবে তাঁদের পূরাদস্তুর

অথচ দায়িত্ব থাকবে আমাদের। ফলে অবস্থা হবে শোচনীয়তর। সে স্বাধীনতা হবে একটা দিল্লীর লাড্ডু, যে খায় সেও পস্তায়, যে না খায় সেও পস্তায়। অভিভাবকেরা যদি পড়েন দুর্ব্বল হয়ে, আর একদল অভিভাবক এসে নেবেন তাঁদের স্থান। যতদিন না আমাদের বিদ্যা ও বলকে, আমাদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে, আমাদের চরিত্র ও তেজস্বিতাকে, আমাদের কর্ম্মঠতা ও কর্ম্মকুশলতাকে আমরা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে পারব ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের থাকবে একান্তভাবে পরাপেক্ষিতা। এই পরাপেক্ষিতাই পরাধীনতা।"

ডাক্তার বল্লেন—"এমন স্বাধীনতা লাভ করা ত বহুদিনের চেষ্টাসাপেক্ষ।"

কানাই হেসে বল্লে—"আপনি কি দশস্কন্ধ রাবণ হ'তে চান না কি যে বিশটা হাত দিয়ে ধরে' হিমালয় পাহাড়টাকে তুলবেন উঁচু করে? হাজার বৎসর ধরে' যে ইতিহাস গড়ে' উঠেছে তার গতি ফেরানো কালসাপেক্ষ, একদিনের কাজ নয়। আমাদের কোনও নেতা ত বলেছিলেন যে সকলে মিলে 'নন্-কো-অপারেশন্' করলে সাতদিনের মধ্যে ভারতবর্ষ পাবে স্বাধীনতা। আমিও বলতে পারি, একটি সূঁচের পুচ্ছছিদ্র দিয়ে যদি একটি হাতী প্রবেশ করিয়ে দিতে পার তবে আমি এক দণ্ডে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে' দিতে পারি। এ সব কথার কোনও মানে হয় না।"

ডাক্তার আবার বল্লেন—"তবে কি আপনি মনে করেন যে স্বল্প-কালের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'তে পারবে না?"

কানাই বল্লে—"যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করতে হ'লে দীর্ঘদিনের সাধনা চাই। তবে স্বাধীনতা যদি হয় নামমাত্র পররাষ্ট্রের অধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়া, তবে তা হয় ত অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যেও ঘটতে পারে।"

ডাক্তার বল্লেন—"কি রকম ?"

কানাই বল্লে—"এ চলেছে একটা যুগসন্ধি, একটা ইতিহাস-সন্ধির কাল। বহু জাতির ইতিহাস চলেছে পরস্পরের সঙ্গে সঙ্ঘাতে ও দ্বন্দ্বে। এই দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘাতের ফলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নিতে পারে একটা বিশেষ স্থান। সেটা হয় ত আমাদের পক্ষে এমন অনুকূল হ'তে পারে যে আমরা শুধু যে পররাষ্ট্রের অনধীন হব তা নয়, হয় ত অন্য রাষ্ট্র থেকে আমরা অনেক আনুকূল্য পেতে পারি। তা সেটা নির্ভর করবে আমাদের উপর নয়। বিভিন্ন জাতির ইতিহাসপরম্পরার যদি এই স্বার্থ হয় যে ভারতবর্ষ হবে পররাষ্ট্রের অনধীন এবং তাকে অনধীন রাখাই হবে জগতের ইতিহাসের কাম্য, তবে জগতের ইতিহাসের প্রসাদে ও আশীর্ব্বাদে আসতে পারে আমাদের তথাকথিত স্বাধীনতা। তথাপি এই স্বাধীনতাকে সার্থক করে তুলতে হ'লে লাগবে দীর্ঘযুগের সাধনা।"

ডাক্তার আবার বল্লেন—"তা হ'লে আমাদের কর্ত্তব্য কি ?"

কানাই বল্লে—"কার কি কর্ত্তব্য তা আমি নির্দ্দেশ করে' দিতে পারি না, সেটা অনেকখানি নির্ভব করে যার যার প্রবৃত্তি ও প্রেরণার উপরে।"

ডাক্তার বল্লেন—"আপনার পক্ষে আপনি কি কর্ত্তব্য বলে' মনে করেন ?"

কানাই বল্লে—"আমার কিছুদিনের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে, যে পথে আমি চলেছিলুম তাতে রয়েছে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা। সে বাধা ঠেলতেই যাবে আমার জীবন, কোনও কাজে সফল হওয়া ঘটবে না আমার জীবনে।"

ডাক্তার বল্লেন—"তবে আপনি কি করবেন ভেবেছেন ?"

কানাই বল্লে—"আমার মত দুর্ব্বল ও অল্পসাহসী লোক যা পারে।"

ডাক্তার বল্লেন—"তার মানে ?"

কানাই—"তার মানে এই যে এই বিশাল সমস্যার মধ্য থেকে কিছু সামান্য অংশ নিয়ে সেইখানে দেব আমার জীবনব্যাপী সাধনা। মনে করেছি রসায়নের কোনও একটা বিষয় নিয়ে জীবনে ফলবান করে তোলবার চেষ্টা করব আমার যত্নকে। দেখব যদি কোনও না কোনও রকমে কোনও রহস্য উদ্‌ঘাটন করে' আমাদের দেশের খাদ্য-সমস্যা বা কোনও একটা প্রযোজনের মীমাংসা করা যায় বিজ্ঞানের সাহায্যে।"

"অতটুকুতেই থাকবেন আপনি খুসী হয়ে ?"

কানাই বল্লে—"আমার শক্তি কম, আমি একটা মহাপুরুষ নই। আমার পক্ষে অধিক আশা করা হবে একান্ত নিষ্ফলতার কারণ। জানেন ত, কথায় বলে—অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ?"

ডাক্তার বল্লেন—"আপনি যে সব কথা বল্লেন তা খুবই মূল্যবান্। অনেকেরই এ বিষয়ে অনুধাবন করে' দেখা উচিত। তা আপনি মাসিক কাগজে এ বিষয়ে লেখেন না কেন ?"

কানাই বল্লে—"জেলের মধ্যে থেকে বাইরের কাগজে লেখা দেব কি করে' ?"

ডাক্তার বল্লেন—"ওঃ, সে ত আমার হাতে। আর এ সব লেখা প্রকাশ হওয়ায় ত কোনও দোষ নেই।"

কানাই বল্লে—"বেশ ত, লেখা যাবে। কিন্তু ফল ত আমি বেশী কিছু দেখি না।"

এমন সময়ে cellএ যাবার ঘণ্টা পড়ল। দু'জনের কথা বন্ধ হ'ল।

কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে একদিন প্রভা এল কানাইয়ের

সঙ্গে দেখা করতে। ডাক্তার ব্যবস্থা করে' দিয়েছিলেন। আড়ি পাতার কোনও লোক ছিল না। কানাই প্রভাকে দেখে' চম্‌কে উঠে বল্লে—"আপনি এসেছেন এত কষ্ট করে' !"

প্রভা বল্লে—"এ আর কষ্টটা কি আপনি দেখলেন? আপনি নারীজাতির সম্মান রাখবার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে সমস্ত নারীজাতি থাকবে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।"

কানাই অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বল্লে—"এ আর আমি কি করেছি! যে কেউ সেখানে থাকৃত সে'ই এ রকম করৃত।"

প্রভা বল্লে—"হঁ্যাঃ, করত! ছিল ত সেখানে পাঁচ শ' লোকের ভিড়, কই একটি লোকও ত কড়ে আঙ্গুল নাড়লে না।"

কানাই হেসে বল্লে—"হয় ত অনেকেরই মনে সাড়া দিয়েছিল, করবার অবসর পায় নি'। আমি যে বিদ্যুদ্বেগে পড়লুম তড়াক করে' লাফিয়ে। আর ঠিক কাছাকাছি কেউ ছিলও না, তাই কাজটা করবার সৌভাগ্য জুট্‌ল আমারই। দেখুন, বরাতে যা থাকে তা মারা যায় না।"—বলে'ই হো হো করে' হেসে উঠ্‌ল।

প্রভা বল্লে—"বেশ, বরাতে যেখানে নিয়ে এসেছে সেখানে আছেন কেমন?"

কানাই বল্লে—"বেশ খোস্‌মেজাজে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে আছি, নির্ভাবনা নির্দ্বন্দ্ব। পরের পয়সায় দু'বেলা বসে' বসে' জুটছে আহার, সেটা বড় কম লাভ নয়।"—বলে'ই আবার হেসে উঠ্‌ল।

প্রভা বল্লে—"আপনার ভাবনা করবার কেউ নেই বুঝি?"

কানাই বল্লে—"কে আবার থাকবে? বাপ-মা গিয়েছেন মরে'। একটা বোন ছিল, তার বিয়ে হয়েছে বহু দূরদেশে সিঙ্গাপুরে।

সেখানে খবরাখবরও যায় না, ছ' মাসে ন' মাসে এক-আধখানা চিঠি পাই বা লিখি।"

প্রভা জিজ্ঞাসা করলে—"মা-বাপ ভাইবোন ছাড়া আর কেউ কি ভাববার থাকে না? নেই কি আপনার কেউ বন্ধু বা বান্ধবী?"

কানাই বল্লে—"বন্ধু আমার তেমন কেউ নেই, আর যারা আছে তারা আমারই মত লক্ষ্মীছাড়া।"

প্রভা একটু হেসে বল্লে—"আর বান্ধবী?"

কানাই বল্লে—"বান্ধবীদের মনের রহস্য জানা অত্যন্ত কঠিন। এমন দুর্ভেদ্য বস্তু ভেদ করবার প্রতি আমার কোনও লোভ নেই।"

প্রভা বল্লে—"আপনারা বুঝি খুব সুভেদ্য?"

কানাই বল্লে—"আমরা কি তা জানি না, তবে আমি যে অত্যন্ত সুখভেদ্য সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। আমার কোনও ভিতর বাহির নেই।"—বলে' আবার হাস্‌লে।

কানাইয়ের মন যে অত্যন্ত সরল তা প্রভা আগেই বুঝেছিল। তবু সে হেসে বল্লে—"এত আত্মপ্রশংসা ভাল নয়। তা আপনি যখন এত সুখভেদ্য তখন বলুন আপনাকে কেউ ভেদ করেছে?"

কানাই হেসে বল্লে—"হয় ত করেছে। ভেবেছিল ভিতরে শাঁস আছে, তারপরে দেখলে কিছুই নেই, খোলাটা ফেলে' চলে' গিয়েছে।"

প্রভা বল্লে—"চলে' গিয়েছে কি কোথাও অপেক্ষা করে' বসে' আছে কখন খোলার মধ্যে শাঁস জমে' উঠবে তারই প্রত্যাশায়, তা কে বলতে পারে? অসময়ে খোলা ভাঙ্‌লে অনেক সময় অনুতাপ করতে হয় সে কথা আপনি নিশ্চয় জানেন। পুরাণে তার অনেক কাহিনী আছে।"

কানাই বল্লে—"হবে। তা আমি কি করে' জান্‌ব?"

প্রভা বল্লে—"তা আপনি জেল থেকে বেরিয়ে কি করবেন ?"

কানাই বল্লে—"কি করব তা এখনও কিছু ঠিক করি নি। হয় ত আবার কেঁচে পড়ুয়া বনে' যাব।"

প্রভা বল্লে—"পড়ুয়া বনবেন কার কাছে ?"

কানাই বল্লে—"হয় ত প্রফেসর ব্যানার্জির কাছে।"

প্রভা বল্লে—"এত পাশটাশ করে' আবার পড়ুয়া বনা কি ? তা হ'লে ত বিলেত যেতে হয়।"

কানাই বল্লে—"কেন, বিলেত না গেলে এদেশে বসে' আর পড়া যায় না ?"

প্রভা বল্লে—"এদেশের পড়া ত আপনি শেষই করেছেন। আর ভিতরের খোলাটার দিকে দৃষ্টি করেছেন ত ? সেখানে কিছু জমে' উঠেছে কি ? কেউ হয় ত আপনার অপেক্ষা করে' আছে।"

কানাই বল্লে—"আমাব খোলায় কিছু জমলেও তাতে প্রদীপ জ্বেলে যে মাটির ঘরের কাজ চালাতে পারব এ রকম ত মনে হয় না।"

প্রভা জিজ্ঞাসা করলে—"আপনার কথা শুনে মনে হয় আপনি কাউকে ভালবেসেছেন। তা হ'লে ঘর-সংসার করবেন না কেন ?"

কানাই বল্লে—"ঘরসংসার করতে হ'লে কেবল তৈলাক্ত জিনিষে হয় না, শক্ত চক্‌চকে জ্বল্‌জ্বলে জিনিষেরও দরকার হয়।"

"তা আপনি পুরুষমানুষ, রোজগার করবেন, ঘরসংসার করবেন, এই ত সকলে চায়।"

কানাই বল্লে—"সেই রোজগার জিনিষটি যদি আমার দ্বারা সম্ভব না হয় ?"

প্রভা বল্লে—"তা না করলে আপনাকে বিয়ে করবে কে ?"

কানাই বল্লে—"তাই ত বল্‌ছি, আমার বিয়ে হবে না। বিয়ে

করবে না অথচ আমায় জীবন ভরে' ভালবাসবে এমন একটি মানসীকে আমি পাই কোথায় ?''

"রোজগার আপনি করবেন না কেন ?''

কানাই বল্লে—"যেহেতু আমার রোজগারে মন নেই। আমি চাই পড়তে, কিছু আবিষ্কার করতে।''

প্রভা আবার বল্লে—"এমন যদি কাউকে পান যিনি আপনার সঙ্গে সঙ্গিনী হয়ে লেখাপড়ার কাজে ব্রতী হবেন, তা হ'লে আপনি কি করেন ?''

কানাই বল্লে—"কিন্তু আগে যিনি মনে প্রবেশ করে' বসে' রয়েছেন তাঁকে তাড়াই কি করে' ?"

প্রভা বল্লে—"তিনি যদি দীর্ঘকাল আপনার জন্য অপেক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে আপনিই সরে' পড়েন ?''

কানাই বল্লে—"তা হ'লে আমার দুটো ভাঙা খোলাই বা জোড়ায় কে ? তা হয় ত অপেক্ষা করে' থাকতে পারে, যেখানকার ভাঙ্গা সেখানকার আঠা ছাড়া না জুড়তে পারে।"

প্রভা বল্লে—"তা হ'লে ত আপনাকে নিয়ে মুস্কিল কম নয় !''

কানাই বল্লে—"মুস্কিলের ভয় করি না। যে কাজের পিছনে জীবনপাত করব বলে' ঠিক করেছি তার প্রতি প্রেম আমার এত কম নয় যে অন্য আর একটা প্রেমের অভাব হ'লে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।''

প্রভা বল্লে—"এমনি করে' শুকনোভাবে কি আপনার কাজ করতে ভাল লাগবে ?''

কানাই বল্লে—"হৃদয় ত আমার শুকনো থাকবে না।''

প্রভা বল্লে—"ভিজে কাঠ পোড়াতে গেলে পুড়তে পুড়তেও তার

গা দিয়ে রস বের হয়। এই যে না-পাওয়ার দাহ, এতে আপনার কাজের বিঘ্ন হবে না ?"

কানাই বল্লে—"হবে না বলেই ত মনে করি। জীবনের এক-দিকের আগুন হয় ত আবার আর একদিকের আগুনকে জ্বালাতে সাহায্য করবে।"

প্রভা বল্লে—"এত দগ্ধাদগ্ধির দরকার কি ? ঠাণ্ডা হয়ে ঘরে ফিবে যান এবং সংসারী হন।"

কানাই বল্লে—"দগ্ধ হওয়ার প্রয়োজন বাইরের নয়, সে আমার ভিতরের। সে চায় যেন ধূপকাঠির মত দগ্ধ হয়ে অন্ততঃ একটুও গন্ধ বিস্তার করতে পারে। দাহ ত অনেক কারণেই ঘটতে পারে। আমার হৃদয় যদি থাকে পচা, তাতে যদি থাকে দুর্গন্ধ, তবে তা দগ্ধ হ'লে দুর্গন্ধই বেরোবে। সেইজন্য আমি চাই আমার ব্রতের শুচিতা, হৃদয়ের শুচিতা, আমার উদ্দেশ্যের শুচিতা।"

প্রভা বল্লে—"আপনার এসব বড় বড় কথা আমি বুঝিও না, আর আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতেও পারি না।"

এমন সময় একজন কর্ম্মচারী এসে বল্লে—"আপনার সময় উত্তীর্ণ হয়েছে।" প্রভা কানাইকে প্রণাম করে' বেরিয়ে গেল।

কানাইয়ের একবার ইচ্ছা হয়েছিল যে সুজাতা সম্বন্ধে অন্ততঃ দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করে। আর একটু কৌতূহল ছিল সে বিষয়ে। হয় ত বা সে কৌতূহলের পিছনে একটু উৎকণ্ঠা বা ঔৎসুক্যও ছিল। কিন্তু এই সুজাতাকে নিয়ে অনেকে তাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছে। আজ প্রভাও এসেই পাড়লে ভালবাসার কথা, বিবাহের কথা। আর তার কথায় সে কোনও দিকে একটু রন্ধ্র দিল না যাতে সুজাতার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে সে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে

পারে। মনটা তার মাঝে মাঝে কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ত সুজাতার সম্বন্ধে কিছু খবর জানবার জন্য, কারণ সেই যে চায়ের টেবিলে দেখা আর তার পলিটিক্যাল্ আন্দোলনে যোগদান ও মেয়েদের বাহিনী নিয়ে শোভাযাত্রা করা, এর অতিরিক্ত সুজাতা সম্বন্ধে সে কিছুই জানত না।

মঞ্জরীর কথাও তার অনেক সময় মনে পড়ত। সে বিস্মিত হয়ে গেল কেন মঞ্জরী তার আর কোন খোঁজ করলে না। সেদিন ইডেন গার্ডেনে আলাপ আলোচনার পরেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল মফঃস্বলে, তার ঠিকানা ছিল অনির্দ্দিষ্ট। তথাপি সে এর মধ্যে দু'একবার কলকাতায় এসেছিল এবং মঞ্জরীর খোঁজ নিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একদিনও সে মঞ্জরীর দেখা পায় নি। চিঠিও দু'একটা লিখেছিল সে মঞ্জরীর ঠিকানায়, কিন্তু কোন উত্তর পায় নি। সে ভাবতে লাগল যে এত বড় একটা ব্যাপার হয়ে গেল আর মঞ্জরী তার কোনই খোঁজ নিলে না—এটা কি রকম! এক একবার মনে করতে লাগল যে মঞ্জরী হয় ত তার সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে নি, আর সে যে প্রেসিডেন্সী জেলে আছে তাও বোধ হয় মঞ্জরী জানে না; মেয়েদের পক্ষে পুলিশের আড্ডায় গিয়ে খবরাখবর করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তার নিজের চরিত্রের যে দিকটা সেদিন হঠাৎ প্রকাশ পেয়েছিল মঞ্জরীর কাছে সে দিকটা তার কাছেও একটা নূতন আবিষ্কার।

প্রত্যেক জিনিষেরই একটা ঋতুকাল আছে। এই ঋতুকালে হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় কোরক, হয়ে ওঠে তা বিকশিত এবং ফলে পরিণত। এই ঋতুকাল আসবার পূর্ব্বে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে প্রাণের মধ্যে এই কোরকগুলি। সমস্ত বৎসর ধরে' একটি আমগাছকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। তাকে খণ্ড খণ্ড করে' বিদীর্ণ করতে পারি, তার পত্ররস বা শাখারস নিয়ে চালাতে পারি রাসায়নিক ক্রিয়া; কিন্তু

কিছুতেই এ কথা আমরা আবিষ্কার করতে পারি না যে তার পল্লবের মধ্য থেকে পল্লব ছাড়া আর কিছু উদ্ভিন্ন হয়ে উঠতে পারে। হঠাৎ দেখা যায় যে পল্লবের মধ্য থেকে কি একটা কোমল পদার্থ বেরিয়ে এল। ক্রমশঃ যখন সেই কোমল পদার্থটি স্ফুট হয়ে উঠতে থাকে তখন আমরা তাকে চিনি যে তা আম্রমুকুল। সে আম্রমুকুল ক্রমশঃ হয়ে ওঠে বিকশিত। তখনও আমরা জানি না তার ফলের কথা। তার পরে আসে ছোট একটি ফল। সেটি বাড়তে বাড়তে হয় বড়, রস তার তীব্র অম্ল। হঠাৎ সে একদিন পাক ধরে' গাছ থেকে যায় পড়ে', আস্বাদ করে' দেখি যে সে সুমিষ্ট। গাছের যে ইতিহাস প্রকাশ পাচ্ছিল পল্লবসৃষ্টিতে এবং শাখাবৃদ্ধিতে, সে ইতিহাস ব্যক্ত করে' আনে একটা নূতন ইতিহাসের ধারা—মুকুল, কুসুম ও ফলের পর্য্যায়ে। তেমনি দেখা যায় মানুষের দেহের যৌবনে, তেমনি ঘটে মানুষের চিত্তে। যে চিত্ত ছিল সুখাসক্ত, দৈহিক কামনায় যা হয়ে উঠেছিল মাতাল, হঠাৎ হয় ত ব্যক্তিবিশেষের চিত্তের মধ্য থেকে উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে তার অবচেতনায় কোনও একটা নূতন উচ্চাভিলাষ, ব্যক্ত হয়ে প্রকাশ পায় কোনও একটা আদর্শের অনুপ্রেরণা, আর সেইটাই হয় তার জীবনের প্রধানতম বস্তু এবং তা পূর্ণ করে' তোলে তার জীবনকে। কেবল যে ছোটখাট জীবনের মধ্যে এ দেখা যায় তা নয়, অনেক বড় বড় জীবনেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। নানাবিধ সুখে ঘিরে রেখেছিল শাক্যমুনিকে। হঠাৎ একদিন দেখা দিল তাঁর মধ্যে একটা প্রেরণা যে তিনি পৃথিবীর প্রাণিবর্গকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেবেন, সর্ব্ব সত্ত্বের কল্যাণ করবেন। একটির পর আর একটি বিবাহ করে' দর্পিত অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত চালাচ্ছিলেন টোলের পাঠ, হঠাৎ একদিন এল তাঁর মধ্যে হরিভক্তির বন্যা।

কানাই ছিল মঞ্জরীর প্রেমে মশগুল্ হয়ে। কিছু অধ্যাপকের প্রভাবে, কিছু অন্য প্রভাবে, দেশের নূতন হাওয়ার গুণে তার মধ্যে জেগে উঠ্ল নূতন চিন্তাধারা, নূতন প্রেরণা। সেই প্রেরণায় যখন কানাইয়ের হৃদয়ের আগুন জ্বলে' উঠেছিল এমনি একটি দিনে সে তার নূতন পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল মঞ্জরীর কাছে। এই নূতন পরিচয়ের মধ্যে মঞ্জরী তার পুরাতন কানাইকে চিনতে পারে নি। এই নূতন পরিচয়ের খামখেয়ালী বন্যতায় ও ভাবভঙ্গীর উগ্রতায় মঞ্জরীর মন বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল কানাইয়ের প্রতি। তাকে নিয়ে সে কি করবে এ বিষয়ে তার যতটুকু সন্দেহ ছিল সেটুকু ছিন্ন হয়ে গেল সেদিনকার কানাইকে দেখে'। তার মনে আর এ বিষয়ে দ্বিধা রইল না যে কানাইকে ভর করে' জীবনযাত্রা চালানো অসম্ভব, তাই সে কানাইয়ের চিন্তা দিলে একেবারে ছেড়ে। কিন্তু কানাই তার এই নূতন পরিচয়ের মধ্যেও মঞ্জরীকে ভোলে নি। সেখানে তার একটা আকর্ষণ ছিলই, কিন্তু তার নূতন আকর্ষণটা আচ্ছন্ন করে' দিয়েছিল মঞ্জরীর প্রতি আকর্ষণকে। দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল তার চিত্ত এই আশায় যে এই নূতন জীবনযাত্রার পথে এগিয়েও মঞ্জরীকে কোনরকমে পাশে পাওয়া যায় কি না। কল্পনার ছবিতে সে ভাবতে লাগল একটি দূর স্বপ্নের চিত্র যে সে চলেছে তার দুরারোহ পথের যাত্রায় আর মঞ্জরী তার পাশে দাঁড়িয়ে আঁচল্ দিয়ে তার ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছে, কানাইয়ের গৌরবে তার মুখ হয়ে উঠেছে গর্ব্বে উদ্ভাসিত।

কলকাতার সহরতলীর নিকটে একটা 'ডিটেনশান্ ক্যাম্প'এ ছিল সুজাতা। ক্ষণে অক্ষণে কানাইয়ের বীর্য্যদীপ্ত মুখখানি ভেসে উঠ্ত তার মনে। হয় ত বা স্বপ্নে সে দেখত যে সে কোনও অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে আর একটি তেজস্বী মূর্ত্তি দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ নিয়ে এগিয়ে

এসেছে তার দিকে, স্নেহের সহিত তার হাত ধরে' নিয়ে চলেছে, গভীর অরণ্যের অন্ধকার থেকে সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত মহা রাজপথের দিকে। কানাইয়ের কথা সে কাউকে কিছু বলত না। কানাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে যখন সে সচেতন হয়ে উঠ্‌ত তখন তার কপোল দু'টি যে অরুণাভ হয়ে উঠ্‌ত তা তার সামনে কেউ থাকলে নিশ্চয়ই দেখতে পেত। কানাই তাকে অত বড় হাঙ্গামা থেকে বাঁচিয়েছে এ অবস্থায় কানাইয়ের কথা কাউকে বলতে বা কানাইয়ের প্রশংসা করতে তার কোনও লজ্জার কারণ ছিল না, তথাপি কানাইয়ের কথা কিছু বলতে গেলেই তার জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হয়ে যেত, হঠাৎ কে এসে যেন ভিতর থেকে তার কণ্ঠরোধ করত। প্রভাকে সে অত্যন্ত চাপা কৌশলে কানাইয়ের খবর জানবার জন্য পাঠিয়েছিল। প্রভা তা কিছু বুঝতে পারে নি। মঞ্জরী হ'লে তা তার চোখ এড়াত না। কানাইয়ের কাছ থেকে এসে প্রভা তার সঙ্গে যে সব কথা হয়েছিল তা নানারকম অলঙ্কৃত করে' প্রকাশ করলে। সুজাতা সে সব কথার উপর কোনও কথা বলে নি, সে কেবল অনুভব করেছিল যেন বিনা কারণে ঈশানকোণের কোনও একখানা মেঘ ব্যাপ্ত করে ফেল্‌ল শরৎকালের স্বচ্ছ আকাশকে। কেন যে তার মন অকস্মাৎ এ রকম ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌ল তা সে নিজেই বুঝতে পারলে না।

সে আপন মনের মধ্যে চিন্তা করতে লাগল যে সে জেল থেকে বেরিয়ে কি করবে, কে দেবে তাকে পথ দেখিয়ে। একবার ভাবলে সে সুকুমারের কথা, কিন্তু তার মন কোনও সাড়া দিলে না। তার মনে হ'ল সুকুমার খুব ভাল, খুব চরিত্রবান্, কিন্তু তার মনের ধাতুর সঙ্গে তার কোনও মিল নেই, সে তার সঙ্গে একত্র থাকলেও থাকবে বিচ্ছিন্ন হয়ে, যেমন থাকে তেল জলের উপরে; কিছুতেই সে পারবে

না অনুপ্রবিষ্ট হ'তে তার মধ্যে। তেলে জলে মিশিয়ে খুব ঝাঁকিয়ে 'ইমাল্‌শান্‌' করলেও তার প্রত্যেকটি বিন্দু অপর বিন্দু থেকে থাকবে আলাদা হয়ে, বিচ্ছিন্ন হয়ে। সংসারের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যদি দু'জনে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে' কোনও বিপরীত প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নামে, তথাপি সেই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েও একে অপরের সঙ্গে মিশ্রিত হ'তে পারবে না। মনে হ'ল তার কানাইয়ের কথা। হৃদয়ের মধ্যের কোন্‌ জায়গা থেকে যেন একটা তীর এসে তাকে বিদ্ধ করল। মনে হ'ল বেরিয়ে এসে কানাইয়ের কোনও সংস্রবে সে থাকবে না, কানাইকে চলবে সে সর্ব্বপ্রযত্নে এড়িয়ে। আবার নিজের অনিচ্ছায় মন ফিরে গেল কানাইয়ের কাছে। চুম্বকের আকর্ষণে লোহাটি যেমন গিয়ে লাগে চুম্বকের গায়ে তেমনি তার চেতনাটি গিয়ে লাগ্‌ল কানাইয়ের ছবির সঙ্গে, রইল সেখানে সংলগ্ন হয়ে কিছুকাল। আবার যেই সে সচেতন হয়ে উঠ্‌ল তখনই সে মনে করলে —কি অবুঝ আমার মন! কানাইবাবু সম্বন্ধে আমার ভাববার এত দরকার কি? তিনি থাকবেন তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সিংহের মত তাঁর গতি, আমি কেন একটা ফেউয়ের মত তাঁর পিছনে পিছনে ফিরব? আনলে সে জোর করে' তার মনকে কানাইয়ের কাছ থেকে ফিরিয়ে, আবার মন গিয়ে লাগ্‌ল কানাইয়ের সঙ্গে। পেণ্ডুলামের মত দোল খেয়ে ফিরতে লাগ্‌ল তার সমস্ত চেতনা।

সুজাতা আবার ভাবতে লাগ্‌ল, ভবিষ্যৎ জীবনটা নিয়ে সে কি করবে, কোথায় লাগাবে একে কাজে। ভাবতে ভাবতে সে ঠিক করলে যে সে যাবে অধ্যাপক ব্যানার্জির কাছে, তাঁর কাছ থেকে নেবে উপদেশ। সে বিন্দুমাত্রও অনুভব করতে পারলে না যে অধ্যাপক ব্যানার্জির নিকট উপদেশ নেওয়ার এই যে সঙ্কল্প, তার সঙ্গে

কানাইয়ের সেখানে উপস্থিতির ও কাজের কল্পনার একটুমাত্রও যোগ আছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কানাই এল অধ্যাপকের কাছে। অধ্যাপক তাকে কুশল প্রশ্ন করে' জিজ্ঞাসা করলেন এর পর সে কি করতে চায়। সে বল্লে সে রসায়ন সম্বন্ধে কোনও কার্য্যকরী গবেষণা করতে চায়। অধ্যাপক স্নিগ্ধভাবে তার মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"জীবনে কি কোনও গভীর দুঃখ পেয়েছ বাবা, যা নাড়া দিয়েছে তোমার অন্তরপুরুষকে?"

কানাই বল্লে—"এ কথা আপনি কেন জিজ্ঞাসা করছেন?"

অধ্যাপক বল্লেন—"তোমার আচরণটা অনেকটা সেই রকমই দেখছি। একবার তুমি যোগ দিলে স্বাদেশিকতায়, ঝাঁপিয়ে পড়লে পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ে, খাটলে জেল। এখন আবার এসে উপস্থিত হয়েছ রসায়নের গবেষণা করবার জন্য। এ থেকে দুটো সিদ্ধান্ত হয়। একটা হচ্ছে এই যে তুমি অত্যন্ত impulsive, যখন যা মনে আসে সেই কাজে লেগে যাও, কিছুদিন পরে ছেড়ে দাও সেই কাজটা। আর একটা সিদ্ধান্ত এই হ'তে পারে যে জীবনে এমন কোনও দুঃখ পেয়েছ যে জীবনের আর কোনও মূল্য নেই তোমার কাছে, জীবনটাকে নিয়ে তুমি যা খুসি করতে চাও। অনেক সময়ে অনেক ঔপন্যাসিক তাদের নায়কের এই রকম হতাশা বর্ণনা করতে গিয়ে হয় ত তাকে microscope বেচে' South Africaতে পাঠিয়ে দেন।"—বলে'ই তিনি উঠলেন হেসে।

কানাই বিনীতভাবে বল্লে—"এ ছাড়া কি আর কিছু হ'তে পারে না ?"

অধ্যাপক বল্লেন—"হয় ত হ'তে পারে। এমন হয় ত হ'তে পারে যে তোমার হৃদয়ের মধ্যে ছিল একটা প্রচ্ছন্ন আগুন, সে যখন তার আপন ঋতুতে হ'ল প্রকাশ তখন তুমি আপনিই পারলে না তাকে চিনতে। সে এল তার আত্মপ্রকাশের ব্যগ্রতা নিয়ে, কিন্তু সে তার পথ জানত না। ঝরণা যখন ঝরে' পড়ে মাটিতে, সে থাকে নানা পথে এঁকেবেঁকে চলতে। কোনও সময়ে খানায় পড়ে' হয়ে যায় আবদ্ধ; আরও যখন জল এসে জমে তখন সেই চাপে সে বের হয়ে পড়ে। তখনও সে ঘূর্ণি খেয়ে ফিরতে থাকে পথে বিপথে, অবশেষে হয় ত সেই ঘূর্ণির চক্রে সে এসে পড়ে ঠিক পথে নদীর বুকে। তেমনি হয় ত তোমার বুকের প্রচ্ছন্ন আবেগ আপনাকে নিষ্ফলভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছিল স্বাদেশিকতার ঘূর্ণির মধ্যে। জেলে গিয়ে পেয়েছিলে আত্মচিন্তার অবকাশ, বুঝতে পেরেছ তোমার ভুল, তাই আজ নিতে চাও এমন একটি পথ যে পথে সফল করতে পারবে তোমার আত্ম-প্রকাশের কামনা।"

অধ্যাপক আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি জীবনে কোনদিন স্নেহের প্রভাবে আস নি ? যে পথে তুমি আসতে চাও সে পথ কঠিন এবং বন্ধুর। কোনও বাইরের স্নেহ-পদার্থে সিক্ত যদি থাকে তোমার চিত্ত তা হ'লে তুমি আঁকড়ে ধরতে পারবে না কোনও কঠিন কর্ত্তব্যকে, পিছ্‌লে যাবে তুমি তোমার পথ থেকে এবং হয় ত গিয়ে পড়বে সেই স্নেহ-সরণির মধ্যে। আমি চাই না যে একটার পর আর একটা কাজ নিয়ে তুমি জীবনকে করবে বিপর্য্যস্ত। পরিণামে দেখবে জীবনটা জুড়ে খালি দ্বন্দ্বই করে' গেলে, ফল কিছুই পেলে না।"

কানাই বল্লে—"কোথাও কোনও স্নেহ পাই নি এ কথা বলতে পারি না, তবে তারই ব্যর্থতায় যে এ পথে এসেছি তা নয়, বরং এইটেই জেগে উঠেছে বলে' সেইটেতে এনেছে ব্যর্থতা, অগ্নির দাহে যেমন উড়ে যায় স্নেহের প্রলেপ।"

অধ্যাপক আবার বল্লেন—"কিন্তু স্নেহের প্রলেপ ত একদিনের প্রলেপ নয়। তার নির্ঝর আসে ভিতর থেকে এবং সেই স্নেহই পারে একদিন জ্বলে' উঠতে।"

কানাই বল্লে—"মানুষের মনকে মানুষ চিরন্তন করে' বুঝতে পারে না কারণ সে একান্তভাবে নিশ্চল স্থায়ী পদার্থ নয়। আপনারই কথায় বলতে গেলে বল্‌ব সে নিরন্তর গড়ে' তুলছে তার আপন ইতিহাস। তাই নিশ্চিত করে' বলা কঠিন যে এই ব্রতকে আমি সমস্ত জীবন দিয়ে পূর্ণ করে' তুলতে পারব কি না। কিন্তু এখন যতটা বুঝছি তাতে আমার মনের মধ্যে দৃঢ়তার অভাব দেখতে পাচ্ছি না।"

অধ্যাপক বল্লেন—"এটা যদি নিশ্চিত বুঝে থাক তা হ'লে আমার কিছু বলবার নেই; যদি থেকেও থাকে তোমার জীবনে কোনও স্নেহের ইতিহাস তবু সে ইতিহাসও ঢেলে দিতে পারে তার শক্তি যদি এই শিখাটি জ্বলে তোমার হৃদয়ে দীপ্ত হয়ে। যেমন নানাদিকের নানা স্নেহের স্রোত অনেক সময় পূর্ণ করে' জ্বালিয়ে দিতে পারে একটি প্রেমের বর্ত্তি, তেমনি একটি প্রেমের শিখাও তার ইতিহাসকে নিমগ্ন করে' দিতে পারে আর একটি বৃহৎ শিখান্তরের মধ্যে, তা সে শিখা বিদ্যারই হোক্ বা সর্ব্বমানবের প্রতি প্রেমেরই হোক্। প্রেমের শক্তি ছাড়া বিদ্যার শিখা জ্বলে না। প্রেম দেয় হৃদয়ের মধ্যে বেগ। শুষ্ক বিচার জ্বালিয়ে তুলতে পারে না আগুন, তার পিছনে চাই স্নেহপদার্থ। তা হ'লে তুমি লেগে যাও তোমার কাজে। আর একটা কথা আমি

জিজ্ঞাসা করতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে আমার এখানে অনেক গবেষকদের আমি কিছু কিছু দিয়ে থাকি, তারা আমার গবেষণার উপকরণ সংগ্রহ করে। তুমি কি সেইভাবে কাজ করতে চাও?"

কানাই বল্লে—"না, আমার সামান্য যা কিছু আছে তাতে কিছুদিন আমার গ্রাসাচ্ছাদন চলে' যেতে পারে। আমি আপনার নির্দ্দেশ অনুসারে কোনও একটা গবেষণার কাজে লাগতে চাই। সেটাকে আমি আমার মনের মত সফল করতে চাই আমার নিজের দায়িত্বে।"

অধ্যাপক খুসী হয়ে বল্লেন—"তা হ'লে ত খুব ভালই হয়।"

তাঁর মন প্রসন্ন হয়ে উঠল এই সঙ্কল্পে যে ভবিষ্যতে যদি এই ছেলেটি তাঁর গবেষণাগারের সম্পূর্ণ ভার নিতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে একে গড়ে' তুলবেন এই আশায় তাঁর মন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কানাই লেগে গেল তার গবেষণার কাজে। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তার মনে হ'ত সুজাতার কথা, কিন্তু তার খবর জানবার কোন উপায় নেই। প্রভার সঙ্গেও তার অনেকদিন দেখা হয় নি। মঞ্জরীর খবর নিতে গিয়ে সে তার খবর কিছু জানতে পারে নি। সে যে কোথায় গিয়েছে তা কেউ বলতে পারে না।

অধ্যাপক অবিনাশ বাবু যে সমস্ত গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন সেই গবেষণার প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হ'ল ক্রমশঃ ক্রমশঃ ল্যাবরেটরী বাড়ানো এবং নূতন যন্ত্র আনা। লক্ষ্মীর ঝুলিতে এতদিন যা জমা হয়েছিল সে থলির ছিদ্র ক্রমশঃই লাগল বাড়তে আর স্রোতের ধারায় বয়ে যেতে লাগল অর্থ। যা শেয়ার টেয়ার ছিল সে সমস্ত বিক্রী হয়ে গেল। পত্নীকে যে এককালীন টাকা দিয়েছিলেন সেও বড় কম নয়। তাঁর থাকতি মেটাতে আরও অনেক অর্থ সেদিকে ব্যয় করতে হয়েছিল। কলকাতায় বাড়ীগুলির কতগুলি করলেন বিক্রী, কতগুলি

পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। তিনি সুজাতাকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কেন এসেছ, মা, আমার কাছে ?"

সুজাতা বল্লে—"আপনি আমাকে চেনেন না, তবু আপনার নাম শুনে সাহস করে' এলুম আপনার কাছে। আমার একটু পরিচয় আগে আপনার কাছে দেওয়া আবশ্যক।"—এই বলে' সে আপনার ছোট জীবনের প্রধান কথাগুলি তাঁকে সংক্ষেপে জানাল। তারপর বল্লে—"আমার জীবনে প্রধান উপদ্রবটাই হচ্ছে আমার হৃদয়ের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা। সাধারণ দশজনে যেমন লেখাপড়া করে সে রকম আমিও করেছি এবং বরাবরই পরীক্ষার যাচাইয়ে প্রথম স্থান পেয়েছি কিন্তু আমার মধ্যে নিরন্তর একটা আকুল আকৃতি জন্মাচ্ছে—ততঃ কিম্, ততঃ কিম্। যেটুকু জীবন আমি অতিক্রম করেছি সেটুকুতে যা কিছু লাভ করেছি সমস্তই মনে হচ্ছে অর্থহীন।"

অধ্যাপক বল্লেন—"তুমি দেখছি প্রাচীন মৈত্রেয়ীর মত ব্যাকুল হয়ে উঠেছ। মৈত্রেয়ী বলেছিলেন—তেনাহং কিং কুর্য্যাম্ যেনাহ নামৃতা স্যাম্, তা দিয়ে আমি কি করব যা দিয়ে আমি অমৃতত্ব লাভ না করতে পারব ?"

সুজাতা বল্লে—"এ কথাটা আমিও শুনেছি কিন্তু এর অর্থ বুঝি নি। এর মানে কি ?"

অধ্যাপক বল্লেন—"তাকেই বলি আমরা মৃত যা অন্যের সঙ্গে হারিয়ে ফেলে তার অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ, যেটা পাওয়া যায় সচলতার মধ্যে। যখন আমরা জীবিত থাকি তখন আমাদের দেহের সমস্ত যন্ত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে একযোগে কাজ করে। প্রত্যেকে পায় তার সার্থকতা, তার আপন উদ্দেশ্যের সফলতা অপরের ক্রিয়ার মধ্যে। ফুসফুসের মধ্য দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে' যদি তার ভিতরের অক্সিজেন দিয়ে রক্তকে

পরিষ্কার না করত ও রক্তকে একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মে পরিণত না করত তবে হৃদয়ের কাজ হ'ত অচল ; হৃদয়ের কাজ যদি রীতিমত না চলত তবে প্লীহা যকৃৎ বুক্কের (kidney) কাজ চলতে পারত না। তেমনি আমরা এ কথাও বলতে পারি যে এক বুক্কই যদি তার কাজ করতে অসমর্থ হ'ত তবে অন্য কারুরই কাজ চলতে পারত না। এরা পরস্পর একটি উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য চলেছে, সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে জীবনকে তার সামঞ্জস্যে, তার গতিতে, তার বিশিষ্ট প্রক্রিয়া ও ধর্ম্মের মধ্যে পূর্ণ করে' তোলা, তাকে অব্যাহত করে' তোলা। এই একটি উদ্দেশ্য সকলে সাধন করছে বলে' এরা একযোগিত্বে আপনাদের প্রকাশ করে জীবন-ধর্ম্মের মধ্যে। সেই জন্য জীবনের মধ্যে এরা প্রত্যেকেই জীবিত। যখন এরা বিচ্যুত হয় এদের এই পরস্পরযোগিত্ব থেকে এবং জীবন সম্বন্ধে একযোগিত্ব থেকে, তখনই এরা বিচ্যুত হয় এদের জীবিত স্বভাব থেকে এবং ব্যাহত ও অসম্ভব করে জীবনকে। তখন এদের বলা যায় মৃত। তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও রয়েছে নানা রকমের চাওয়া এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে আছে একটা সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যটা নির্ভর করছে কোনও একটা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের এক-যোগিত্বে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে আমাদের এই প্রবৃত্তিগুলির একযোগিত্ব কোথায়, বা তারা সকলে মিলে কি উদ্দেশ্য সফল করতে চায় তার যখন কোনও আভাস বা ছায়ামাত্র আমরা পাই না, তখন আমাদের প্রত্যেকটা কাজই মনে হয় নিরর্থক ; মনে হয় কোনও প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়ে যে কাজটা সম্পাদন করল সেটা হয়ে গেল সেইখানে শেষ। তার সঙ্গে অন্যকে করতে পারি না আমরা যোগ, ঘনিষ্ঠভাবে সম্পূর্ণ করে' দেখতে পারি না আমাদের চেতনার জীবনকে ; তাই আমাদের প্রত্যেকটা কাজ আমাদের মনে হয় অসংবদ্ধ

ও অশ্লিষ্ট। তখন প্রত্যেকটা কাজই আমাদের কাছে হয়ে ওঠে নিরর্থক। তাই মনে হয় প্রত্যেকটি কাজই যেন করছে আমাদের বঞ্চনা। তারা মৃত, জীবনের একযোগিত্বে তাদের প্রকাশ নেই।"

সুজাতা আবার জিজ্ঞাসা করলে—"কই, এমন ত মনে হয় না যে সকলেই নিজেদের জীবনকে এমন অর্থহীন করে এবং নিজের আগুনে নিজে দগ্ধপ্রায় হয়ে ওঠে, দেখতে পায় নিজেদের নিরর্থকতা নিজেদের সমস্ত কাজের মধ্যে। বরং অধিকাংশ লোককেই ত দেখতে পাওয়া যায় যে তারা নিজ নিজ কাজে বেশ সুখীই আছে। কোনও ব্যবসায়ী জীবন ভরে' ধনসঞ্চয় করছে এবং তাতেই আপনার জীবনকে কৃতার্থ মনে করছে। কারুর আবার খ্যাতির উপর লোভ, সে খ্যাতিই সঞ্চয় করে' চলেছে। কেউ বা আপন পরিবার গোষ্ঠী পালন করে' সুখে জীবনপাত করছে। হৃদয়ের কোনও আর্ত্তিই ত তারা অনুভব করে না।"

অধ্যাপক বল্লেন—"তুমি যা বলেছ তা ঠিক। কিন্তু তুমি যদি চেয়ে দেখ নিম্নতর জীবদের প্রতি এবং তার সঙ্গে তুলনা কর একটা উচ্চতর জীবের, তা হ'লেই পার্থক্য বুঝতে পারবে। একটা আম গাছও জীব, কিন্তু তার একটা ডাল কেটে সেই কাটাস্থানে যদি সেই গাছের উপযোগী খাদ্যপদার্থ সংযোগ করে' দাও দেখবে কিছুদিন পরে সেখানে শিকড় গজিয়েছে। তারপর তাকে মাটিতে পুঁতে রাখ, সে দিব্যি একটি আম গাছ হয়ে উঠবে। এমন কি, এমন পাতাও অনেক আছে যার একটা টুক্‌রো ছিঁড়ে' মাটিতে ফেলে' দিলে সেই পাতা থেকে একটা নূতন গাছ গজিয়ে উঠবে। কিন্তু একটা ছাগলের ঠ্যাং কেটে তাকে খুব আমপাতা কলাপাতা দিয়ে বেঁধে রাখলে সেই ঠ্যাং থেকে আর একটা ছাগল হবে না। তা হ'লেই দেখ, জীবপর্য্যায়ের মধ্যে একটা

প্রচণ্ড বৈষম্য আছে। কোনও কোনও উচ্চস্তরের জীবের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব এত প্রবল যে অন্য অঙ্গের সন্নিধি ব্যতিরিক্ত কোনও অঙ্গই তার কাজ করতে পারে না। আবার নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে তারা সন্নিধিতেও কাজ করে, অসন্নিধিতেও কাজ করে। 'স্পঞ্জ' একটা প্রাণী, তা বহু জীবকোষের সমবায়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এক টুকরো 'স্পঞ্জকে' আগুনে শুকিয়ে গুঁড়ো করে' কাপড়ে ছেঁকে একেবারে ফাঁকিচূর্ণ করে'ও যদি সেখানে লবণাক্ত জল দেওয়া যায় তবে প্রত্যেকটা কণা থেকে এক একটি নূতন 'স্পঞ্জ' তৈরী হয়। এই সমস্ত নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে তাদের প্রত্যেকটি জীবকোষের স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবার এবং সার্থকতা লাভ করবার ক্ষমতা আছে।"

সুজাতা জিজ্ঞাসা করলে—"এ কথার সঙ্গে আমার প্রশ্নের কি সম্বন্ধ বুঝতে পারলুম না।"

অধ্যাপক বল্লেন—"সেই কথাই আমি বলতে যাচ্ছি। মানুষের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে একটি অন্তর্লোক। সেই অন্তর্লোকের জীবনের মধ্যে একদিকে রয়েছে জৈব প্রবৃত্তি, একদিকে রয়েছে বুদ্ধি-প্রবৃত্তি বা মনোপ্রবৃত্তি, আর অপর দিকে রয়েছে অধ্যাত্ম-প্রবৃত্তি। এই তিনটির অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে গঠিত হয়েছে আমাদের অন্তর্লোক। কিন্তু সকলের মধ্যে এই তিনটির অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হয় নি, তাই এদের তিনটিকে নিয়ে যে একটি একযোগিতা হতে পারে এবং তিনটির সামঞ্জস্যে যে অন্তর্লোকের যথার্থ উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে সে বোধও জাগ্রত হয় নি। মনোলোক ও অধ্যাত্মলোকের সন্নিধি সত্ত্বেও অনেকের জীবনে শুধু জৈব প্রবৃত্তিগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে তাদের একটা যৌথ স্বার্থসিদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন থাকে এবং সেইভাবেই গড়ে'

তোলে তাদের জীবন। তারা মূঢ় বা অর্দ্ধমূঢ় থাকে তাদের অন্য দুই লোকের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে। কাজেই সেই দুই লোকের প্রবৃত্তি থেকে এমন কোনও বাধার সৃষ্টি হতে পারে না যাতে তাদের জৈব প্রবৃত্তি-নিচয়কে অর্থহীন করে' তুলতে পারে। তারা সচেতন থাকে তাদের পশুধর্ম্মী পুরুষ সম্বন্ধে। কিন্তু যে সমস্ত লোকের মধ্যে তিনটি লোকেরই প্রবৃত্তি সজাগ হয়ে ওঠে তারা যে পর্য্যন্ত না এই তিনটি লোকের প্রবৃত্তিকে একটি অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধসম্পন্ন সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে না আনতে পারে সে পর্য্যন্ত প্রতি লোকের পৃথক পৃথক প্রবৃত্তিকে তারা অর্থহীন মনে করে। যে জীবনে তিনটিরই দাবী প্রবল হয়ে উঠেছে সেই জীবনে যে কোনও একটি বা দু'টির দাবী মেটাতে পারলে সে জীবন হবে বাধাগ্রস্ত, সম্পূর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন ও মৃত।"

সুজাতা বল্লে—"জীবজগতের প্রারম্ভ থেকে যে পরিণতি বা ক্রম-বিকাশে উদ্ভিদ্‌লোক ও জান্তবলোক ক্রমধারায় উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধতর সোপানে মনুষ্য পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত হয়েছে, মনুষ্যে এসেই ত তা শেষ হয় নি।"

অধ্যাপক বল্লেন—"বাইরের আকৃতি প্রকৃতিতে ও সাধারণ জৈব ধর্ম্মের দিক দিয়ে দেখতে গেলে মানুষের চেয়ে বিশিষ্টতর প্রাণী সৃষ্টি হয় নি এবং হবে বলে'ও মনে করা যায় না। মানুষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়েছে তাদের প্রধান পরিবর্ত্তনই হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বা ভিতরের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন। এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা যান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের প্রধান উদ্দেশ্য বা গতিই হচ্ছে জৈব কার্য্য ও জীবনযুদ্ধে অন্য প্রাণীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে আত্মরক্ষা। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন অনেক বিষয়ে যেমন জৈব কর্ম্মের উপযোগী তেমনি অনেক বিষয়ে মনুষ্যেতর প্রাণীর জৈব যুদ্ধের দ্বন্দ্বে যে সমস্ত সুবিধা আছে, যে সমস্ত নখদন্তাদি

স্বাভাবিক অস্ত্র আছে, মানুষের তা নেই। তার পরিবর্ত্তে মনুষ্যলোকে দেখা দিয়েছে মার্জ্জিত বুদ্ধি এবং কোন না কোন প্রকারের অধ্যাত্ম প্রেরণা। মনুষ্যেতর জীবের সহিত দ্বন্দ্বে মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করবার জন্য তার আর অন্য কোনও যান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নেই। মনুষ্যের দ্বন্দ্ব এখন প্রধানতঃ হবে সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে এবং জাতিতে জাতিতে। এই দ্বন্দ্বে মানুষ যেমন একদিকে হবে আত্মঘাতী তেমনি আর একদিকে সে মুক্ত হবে এই আত্মহননের চেষ্টা থেকে এবং ভবিষ্যতে পূর্ণ করবে মনুষ্যের চরম উদ্দেশ্য—সর্ব্বমঙ্গলের সাধনা। তারই দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে এইখানে যে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এই বুদ্ধি ও অধ্যাত্মপ্রেরণা বিভিন্ন রকমের। এইখানেই পাওয়া যাচ্ছে এক মানুষের কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় মানুষ। তাকেই আমি উচ্চতর মানুষ বলব যার মধ্যে বুদ্ধি ও অধ্যাত্মপ্রেরণা অধিকতর জাগ্রত হয়েছে।"

সুজাতা বল্লে—"এই সামঞ্জস্য বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

অধ্যাপক বল্লেন—"এস আমরা ফিরে যাই আমাদের প্রাণিলোকের দৃষ্টান্তে। একটি সূক্ষ্মতম এমিবার মধ্যে কোনও অবয়বের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। তার জীবনের সমস্ত কাজ সিদ্ধ হয় তাদের সমগ্র দেহ দিয়ে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ উচ্চতর প্রাণীতে দেখা যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভাগ। প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা যন্ত্রের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যের ভার দেওয়া থাকে। ফুসফুস্ করে ফুসফুসের কাজ, হৃদয় করে হৃদয়ের কাজ, শিরা ধমনী নাড়ী যকৃত প্লীহা সকলেই আপন আপন কাজ স্বতন্ত্রভাবে করে, অথচ প্রত্যেকের কাজের মধ্যে থাকে একটা পরাপেক্ষা এবং প্রত্যেকে নিজের কাজের দ্বারা সফল করে অন্যের কাজ।

এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভাগের শ্রেষ্ঠ পরিণতিতে হয় মানুষ। মানুষের জৈব প্রক্রিয়ার মধ্যে কতগুলি কাজ চলে ঠিক ইতরপ্রাণীদের জৈব প্রক্রিয়ার মত। মানুষের দেহযন্ত্রের মধ্যে জীবনধারণের জন্য যে প্রক্রিয়াগুলি চলে সেগুলির উপর মানুষের বুদ্ধির বা ইচ্ছার কোনরকম হাত নেই। আমরা যে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলি, আমাদের হৃদয় যে ধুক্‌ধুক্ করে' সমস্ত দেহকে আপ্লাবিত করে' রক্তস্রোতে, আমাদের প্লীহা, বুক, পাকাশয় যে তাদের কাজ করে যায়, সেজন্য তারা একটুমাত্রও অপেক্ষা রাখে না আমাদের বিবেচনাশক্তির বা ইচ্ছার। আমি বলতে পারি না—হে আমার পাকাশয়, আজ অনেক মাংস পোলাও খেয়েছি, সে জন্য আজ তুমি ভাল করে' তাকে জীর্ণ কর। আমার হৃদয়কে আমি বলতে পারি না—আজকে রবিবার, তুমি একটু বিশ্রাম কর। গভীর দুঃখে আমার জৈবক্রিয়াকে আমি বলতে পারি না—হে জৈবক্রিয়া, তুমি আজ বিশ্রাম কর, আমি মৃত্যুতে প্রবেশ করি। আমাদের এই দেহের ভিতরকার জৈবক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ পশুবৎ, সম্পূর্ণ অস্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ পরাধীন কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক বলে' একটা স্বতন্ত্র জিনিষ আছে যা পূর্ণ হয়ে আছে কোটি কোটি তন্তুজালে। তার ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন। কিন্তু সেই নাড়ীতন্তু-জালের সাহায্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে আমাদের বুদ্ধি ও আমাদের জৈব প্রবৃত্তি যখন দেহরক্ষার অনুকূলে বহির্মুখে আপনাকে চালিত করতে চায় তখন তা বুদ্ধিলোকে প্রতিভাত হয় ইচ্ছা, তৃষ্ণা কি আকাঙ্ক্ষাতে। তাই বুদ্ধিলোকে ঘটতে পারে বুদ্ধির ও ইচ্ছার মধ্যে দ্বন্দ্ব। এইখানে আমরা যদি ইচ্ছাকে বুদ্ধির দ্বারা চালিত করে' সংযন্ত্রিত করি তবেই ঘটে বুদ্ধি ও ইচ্ছার সামঞ্জস্য এবং তাতেই অধিক পরিমাণে সম্ভাবনা ঘটে সেই ইচ্ছার পরিপূরণের সাফল্য। আবার তেমনি মানুষের মধ্যে

আছে একটা অধ্যাত্ম আদর্শ। সেই আদর্শ অনুসারে যদি আমরা আমাদের বুদ্ধিকে চালিত করি এবং ইচ্ছাকে যদি চালিত করি সেই বুদ্ধির অনুকূলে, তবেই ঘটে আমাদের অন্তর্লোকে ত্রিবিধ বৃত্তির সামঞ্জস্য।"

"এই 'অধ্যাত্ম' বলতে আপনি কি বোঝেন ?"

অধ্যাপক বল্লেন—"অধ্যাত্মের প্রকাশ নানা রকম হতে পারে তবে অত্যন্ত স্থূলভাবে বলতে গেলে আমাকে বলতেই হয় যে এটা একটা জীবস্বভাববিরোধী ধর্ম্ম।"

সুজাতা আবার জিজ্ঞাসা করলে—"তার স্বরূপ কি, আর অর্থই বা কি ?"

অধ্যাপক বল্লেন—"কেবলমাত্র যা জীব, কেবলমাত্র যা প্রাণী, সে চায় অন্য প্রাণিনিরপেক্ষভাবে সে-ই কেবল বাঁচবে, তারই কেবল সুখ হবে, অন্যের যাই হোক না কেন। এই স্বভাবের প্রেরণায় প্রাকৃতিক দ্বন্দ্বে জীব-পরম্পরার মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে পরিণত হয়েছে জীবের সর্ব্বোত্তম বিকাশ মানুষে।"

সুজাতা আবার প্রশ্ন করলে—"তবে মানুষের মধ্যে এই অধ্যাত্ম-ধর্ম্মের সার্থকতা কি ?"

অধ্যাপক বল্লেন—"মানুষ তার বুদ্ধির বলে সমস্ত প্রাণিলোকের উপর আপনাকে প্রভু করেছে। মানুষের বিপদ এখন হচ্ছে মানুষের কাছে। মানুষে মানুষে লড়াই করে' সর্ব্বক্ষয় হ'লে আর কোনও উন্নততর জীবের উদ্ভবের সম্ভাবনা নেই। তাই মানুষের মধ্যে প্রয়োজন হচ্ছে একটা নূতন রকম জীবনের। একটি জীবনের মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন অবিরোধে কাজ করবে তেমনি মানুষের পক্ষে প্রয়োজন হয়েছে যে তাদের প্রত্যেকের কার্য্য অন্য সকলের অবিরোধে

সম্পন্ন হবে। আমিই শুধু বেঁচে থাকব এই যে আত্মাশীর্ব্বাদ, যোগশাস্ত্রে একে বলেছে 'অভিনিবেশ'। এই অভিনিবেশই হ'ল মনুষ্য-জীবনের সব চেয়ে বড় অভিনিবেশ, সব চেয়ে বড় অবিদ্যা।"

সুজাতা আবার জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি যে বল্লেন যে আমাদের অধ্যাত্মবোধ প্রকাশ পায় নিজের জীবনকে অপরের চেয়ে বড় না দেখাতে, এটা ত হ'ল একটা 'না' এর দিক। এর 'হ্যাঁ' এর দিকটা কি?"

অধ্যাপক বল্লেন—"এর 'হ্যাঁ' এর দিক নানাভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে প্রকাশ পেতে পারে। প্রকাশ হতে পারে সকলের প্রতি সমত্ব বুদ্ধিতে, সকলের প্রতি মঙ্গলের প্রেরণায়, তত্ত্বদর্শনের প্রেরণায়, প্রেমে নানাবিধ জগদনুষ্ঠানকর প্রতিষ্ঠানে, সত্যে, সারল্যে। এ সমস্ত গহন বিচারে আর এখন প্রয়োজন নেই।"

সুজাতা আবার জিজ্ঞাসা করলে—"আমার সমস্যাটা আপনার কি রকম মনে হয়?"

অধ্যাপক বল্লেন—"তোমাকে ত এখনও ভাল করে' দেখি নি মা। এমন সম্ভব হ'তে পারে যে তোমার বুদ্ধির প্রেরণা একটা অধ্যাত্ম-প্রেরণাকে আশ্রয় করতে চায় কিন্তু কোন্ পরিচয়ের প্রেরণাটি তার অনুকূল হবে তা বুদ্ধি আয়ত্ত করতে পারছে না। তাই দেশ-হিতৈষণার নিঃস্বার্থতা তোমাকে পেয়ে বসেছিল, তুমি তারই মধ্যে পড়েছিলে ঝাঁপিয়ে। বাইরের বাধা ও বিক্ষোভের মধ্যে পড়ে' তোমার বুদ্ধি হয়েছে বিভ্রান্ত, সে আর সে পথে চলতে সাহস করছে না। তাই তুমি হয়ে পড়েছ সঙ্কুচিত। কোন্ পথে যাবে তার ঠিকানা নেই কিন্তু ভিতরে রয়েছে ছোটবার তাগিদ্।"

সুজাতা আবার জিজ্ঞাসা করলে—"যারা বিভ্রান্ত হয় তারা কি সকলে এই রকমভাবে হয়?"

অধ্যাপক বল্লেন—"তা বলতে পারি না। কেউ হয় ত জীবনে একটা গভীর আঘাত পেয়েছে, তার কাছে তার জীবনের আর কোনও মূল্য থাকে না। সে চায় তার জীবনটা নিয়ে কিছু একটা করতে, কি কববে তা জানে না। কারও জীবনে হয় ত হয়েছে একটা বড় প্রেম ব্যর্থ, বড় আকাজ্ক্ষা হয়েছে বিদীর্ণ—তার সেই আকাজ্ক্ষা হয় ত অন্য পরিচয়ে আপনাকে প্রকাশ করে' সার্থক হ'তে চায়।"

সুজাতা আবার বল্লে—"আমি আপনার কাছে আমার জীবনটি নিয়ে এসেছি নিবেদন করে' দিতে, আমার এই জীবনকে যে কি ভাবে কাজে লাগাতে পারব, আমার হৃদয়ের চাওয়া কিসে পূর্ণ হয়ে উঠবে, তা আপনিই সব চেয়ে ভাল বুঝবেন। আপনি আমাকে আশ্রয় দিন আপনার চরণের প্রান্তে, গড়ে' তুলুন আমার জীবনকে নূতন রূপ দিয়ে। এক পিণ্ড মৃত্তিকার মত আমি পড়ে' আছি অসার্থকতার দৈন্যে, আপনি আপনার ধ্যানে প্রত্যক্ষ করুন আমার মধ্যে কোন্ মূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ লাভ করতে চাইছে; তাকেই আপনি ফুটিয়ে তুলুন, দিন আমাকে আমার অমরত্ব।"

অধ্যাপক আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমাব কি কেউ আছে অভিভাবক?"

সুজাতা বল্লে—"কেউ নেই আমার, আপনিই হোন্ আমার অভিভাবক।"

অধ্যাপক তাকে বল্লেন—"বেশ, তুমি এসে থাক আমার সংলগ্ন ছাত্রনিবাসে। সেখানে তুমি থাকতে পারবে একলা স্বতন্ত্রভাবে নিরুপদ্রবে, তোমার কোন কিছুর অভাব হবে না, বিঘ্ন হবে না। তুমি যখন Physicsএর M. A. তখন তোমায় দেব গণিত এবং Physics বিষয়ের একটা গবেষণায় লিপ্ত করে'। আর তুমি থাকবে

সর্ব্বদা আমার সহকর্ম্মিণী হয়ে, যাতে আমি সর্ব্বদা পারি তোমাকে সাহায্য করতে, তোমার আত্মার কল্যাণের দিকে রাখতে পারি সর্ব্বদা আমার স্নেহদৃষ্টি।"

সুজাতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তার বিক্ষুব্ধ হৃদয় খুঁজছিল একটা আশ্রয়।

একটি মূল protonএর চারিদিকে electron-জাতীয় শক্তি-পদার্থের ন্যূনাধিক পরিমাণে সন্নিবেশ বশতঃ Oxygen, Nitrogen প্রভৃতি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। যে সমস্ত electron-সমষ্টির রচনাতে একটি মৌলিক পদার্থের রচনা ঘটে সেই electron-সমষ্টি থেকে যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কতকগুলি electronকে বহিষ্কৃত করে' দেওয়া হয় তবে একটি উচ্চজাতীয় মৌলিক পদার্থ থেকে একটি নিম্নজাতীয় মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হতে পারে। এই বিষয়ে আধুনিক কালে অনেক গবেষণা হয়েছে ও তার সিদ্ধিও ঘটেছে। কিন্তু কোনও নিম্নজাতীয় মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মধ্যে অধিকতর electron-জাতীয় পদার্থ সন্নিবিষ্ট করে' উচ্চজাতীয় মৌলিক পদার্থে পরিণত করবার চেষ্টা এখনও সফল হয় নি। বর্ত্তমানে যে ধারাতে এই বিষয়ের গবেষণা সফল হয়ে চলেছে তাতে সোণা থেকে হয় ত লোহা উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু আরোহমার্গে লোহা থেকে সোণা করবার কোনও চেষ্টা বিশেষ করে' আরব্ধ হয় নি। এই বিষয়ে ব্রতী হয়েছিলেন অধ্যাপক ব্যানার্জি। তাঁর এই কার্য্যে সহকর্ম্মিণীরূপে তিনি নিযুক্ত করলেন সুজাতাকে। কাজের নবীনতায় সুজাতার উৎসাহ বেড়ে চল্‌ল এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে সে পরিশ্রমে লিপ্ত হ'ল। এই একটা কাজের আদর্শ নিয়ে যখন সে লেগে গেল পরীক্ষার পর পরীক্ষায়, নানারকম নূতন ব্যাপারে ও পরীক্ষার ফলে যখন আসতে

লাগল নূতন নূতন উত্তেজনা, তখন অধ্যাপক ব্যানার্জির নির্দ্দেশ অনুসারে পাগল হয়ে খাটতে লাগল সুজাতা। আসল উদ্দেশ্যের সাফল্য দূরে থাকলেও প্রত্যেকটি গবেষণা আনতে লাগল নূতন নূতন আবিষ্কার। সে আবিষ্কারের উত্তেজনায় সুজাতার মন পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল কর্ম্মের উৎসাহে। এই কর্ম্মের মধ্যে পড়ে' সুজাতা যেন বদ্ধ কারাগারের মধ্য থেকে মুক্তি পেল দিবাকরোদ্ভাসিত মহাপ্রান্তরের মধ্যে। দিঙ্‌মূঢ়তায় রেখেছিল তাকে আচ্ছন্ন করে'। আজ সে পথ পেল নূতন কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে, সে বুঝতে পারল অধ্যাপকের উপদেশের সারবত্তা।

যে সমস্ত তরুণ-তরুণীর হৃদয় থাকে অতিরিক্ত উৎসাহে পূর্ণ হয়ে, তাদের সে উৎসাহের বাষ্প নিরন্তর চাপ দিতে থাকে তাদের সমস্ত চিত্তভূমির উপরে। সেই চাপের ফলে তাদের মন চায় ছুটে যেতে কর্ম্মের প্রবাহের মধ্যে, ব্যক্ত করতে চায় সেই উৎসাহের আবেগ কর্ম্মের সাফল্যের মধ্যে, অথচ হয় ত তারা পায় না কোন কর্ম্মের উপায়। চারিদিকের পথ রুদ্ধ, যেন দামোদরের বন্যার জল আটকে রেখেছে বাঁধ দিয়ে। অন্তরপ্রবৃত্তির নিষ্ফল তাড়নায় সমস্ত হৃদয় ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয় অথচ সে ক্ষোভের তারা কোনও কারণ নির্ণয় করতে পারে না। ফলে কোনও কাজে তারা পায় না শান্তি। একটা অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় দুঃখ ব্যাপ্ত করে তাদের সমস্ত হৃদয়, একটা আক্রন্দন উঠতে থাকে হৃদয়ের গহ্বর থেকে, পূর্ণ করে' তোলে তার আর্ত্তিতে, তার ব্যথার নিপীড়নে সমস্ত চেতনালোকের আকাশ, অথচ কোনও বাহ্যিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সাংসারিক ভাবের বাহ্য দৃষ্টিতে হয় ত তার কোনই অভাব নেই, কোনই দুঃখের কারণ নেই, তথাপি যেন হৃন্মর্ম্মের মধ্যে অনুভব করে সে একটা ক্ষত,

অনুভব করে যেন সেই ক্ষতের মধ্যে একটা প্রোথিত শঙ্কু নিরন্তর আলোড়িত হয়ে তার জীবনকে করে' তুলেছে আর্ত্তিময়।

অনেকে হয় ত বলবেন যে এটা একটা যৌন আবেগের তাড়না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় করে' বলা কঠিন। এটা যৌবনের তাড়না, জীবনের আবেগের তাড়না, জীবনপ্রবাহের প্রাচুর্য্যের বেদনা। জীবনপ্রবাহ যখন স্বচ্ছল হয়ে ওঠে, বান ডেকে ওঠে যখন জীবনে, সে বান থাকতে চায় না বদ্ধ হয়ে নৈষ্কর্ম্ম্যের নিষ্ফলতার মধ্যে। একটা 'কচি বাঁশ যখন অঙ্কুরাবস্থায় থাকে তখন তার মধ্যে যে জীবনের শক্তি থাকে সে শক্তি সেই বংশপ্ররোহকে ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধে প্রেরিত করে। সে তার শিখা লগ্ন করতে চায় আকাশে, তার বিজয়পত্রিকা মেলে' ধরতে চায় বায়ুমণ্ডলের মধ্যে। সেই বংশাঙ্কুরকে যদি একটা হাঁড়ি দিয়ে দিতে চাও আটকে, বন্ধ করে' দিতে চাও তার ঊর্দ্ধগতি, সে তথাপি চাইবে বাড়তে। কুঁকড়ে' কুঁকড়ে' কুণ্ডলীকৃত হয়ে হাঁড়ির গহ্বরকে পূর্ণ করবে এবং সেইখানেই লাঞ্ছিত হবে তার গতির সমস্ত উদ্যম। উন্নত আকাশের সূর্য্যালোককে সে স্পর্শ করতে পারবে না, দৈন্যের জীর্ণতায় তার অবরুদ্ধ জীবন লয় পাবে হাঁড়ির মধ্যে। সে বংশাঙ্কুরের যদি চেতনা থাকত তবে সে অনুভব করতে পারত এই একান্ত সঙ্কোচের যাতনা।

হৃদয়ের ঘূর্ণী থেকে মুক্তিলাভ করে' আনন্দের উৎসাহে কর্ম্মস্রোতের মধ্যে গা ঢেলে দিল সুজাতা। তার সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন অধ্যাপক ব্যানার্জি। জরা এসে করেছে তখন তাঁর দেহকে আক্রমণ, কাশশীর্ষের ন্যায় ধবল হয়েছে তাঁর কেশ, গ্রন্থি হয়েছে শিথিল, পেশীগুলি হয়ে এসেছে লোল। তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই দেহের দিকে, দৃষ্টি নেই ব্যক্তিগত শয়নভোজনের ক্লেশের দিকে, দৃষ্টি নেই তাঁর

বেশের দিকে। পাগল হ'য়ে চলেছেন তিনি কাজের দিকে। জ্যোতিষ্মান্ সেই মুখের দিকে চেয়ে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে আপ্লুত হ'ত সুজাতার মন, তার নারীহৃদয়ের উৎস থেকে জননীর স্তন্যের ন্যায় ক্ষরিত হ'তে লাগল স্নেহধারা, অনুরাগধারা এই বৃদ্ধ অধ্যাপকের উপর। সে একদিকে করতে লাগল তার পরীক্ষার কার্য্য, অপরদিকে সে আপনাকে ব্যাপৃত করল অধ্যাপক ব্যানার্জির সেবায়। ভৃত্য ছিল অনেক, কিন্তু আমাদের দেশের ভৃত্যেরা কাজ করবার সময় প্রায়ই মগজ বস্তুটার ব্যবহার করে না, দীর্ঘদিন ধরে' কাজ করলেও কখন কোন্‌টা প্রয়োজন, কোনটা হ'লে প্রভুর সুবিধা হবে, কোন্‌টায় অসুবিধা, এ বিষয়ে তারা কখনও তাদের বুদ্ধিকে চালায় না। এর মধ্যে খুব যারা ভাল হয় তারা বড় জোর রুটিন্-মাফিক কাজ চালিয়ে যেতে পারে; তাও তারা চালায় না যদি না সে সম্বন্ধে তাদের সজাগ করে' দেওয়া হয়। সেই জন্য যারা একান্তভাবে ভৃত্যোপজীবী এবং কোন্ বিষয়ে কি করতে হবে সে বিষয়ে যারা ভৃত্যদের উপদেশ দিতে এবং উপদেশ মত তারা কাজ করল কি না তা দেখে' নিতে অক্ষম, তাঁদের বেঁচে যাওয়ার একটিমাত্র উপায় হচ্ছে কোন্ বিষয়ে কিসের অভাব হ'ল সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র বোধ না থাকা কিংবা অভাববোধ হ'লেও তা গ্রাহ্য না করা। সময়ে অসময়ে দু'একটা হুমকি দেওয়াতে মেজাজ খারাপ করা ছাড়া আর কোনও ফল হয় না। গৃহিণীরা যখন নেন চাকরের উপর কর্ত্তৃত্ব, তখনও যে সকল সময়ে সুফলই হয় তা বলা যায় না; কিন্তু তখন যে অসুবিধা ঘটে তার আর কোনও প্রতিক্রিয়া নেই, তার প্রতিক্রিয়া পুরুষের তরফ থেকে যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু ঘটে তবে সে পুরুষের লাঞ্ছনার শেষ থাকে না। গৃহিণীদের সহিত যুদ্ধে নেপোলিয়নের মত বীরেরও জয়লাভ করার আশা নেই।

গৃহিণীরা থাকেন নানা কর্ম্মে ব্যস্ত—গল্পগুজব, প্রসাধন, সন্তানদের মারণ তাড়ন, উপন্যাস-পাঠ ইত্যাদি। তা ছাড়া সংসারের প্রবল দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়ে তারা কি প্রকার বিব্রত হয়ে আছেন এ কথা নানা প্রকারে ধ্বনিত করে' এবং তার গৌরব উপভোগ করে' অন্য বিষয়ে ভাববার তাঁদের বড় সময় থাকে না। কর্ত্তার কি কি আবশ্যক হতে পারে, কি কি বিষয়ে তিনি সুবিধা অসুবিধা অনুভব করেন, কি হ'লে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকতে পারেন, এ সব বিষয়ে বিবেচনা করে' ব্যবস্থা করতে হ'লে তাঁব পক্ষেও প্রয়োজন হয় কল্পনাশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির ব্যবহার করা। তাতে লাগে মগজের পরিশ্রম। স্বভাব ও অভ্যাসের গুণে তাঁদের অনেকেই শরীর ও মগজ এ উভয় বস্তুকে ব্যবহার কবতে নারাজ। এই জন্য যদিও ভৃত্যের উপর প্রভুত্ব দেখাবার জন্য সময়ে অসময়ে গলগর্জ্জন ও তর্জ্জন উভয় বস্তুরই সদ্ব্যবহার হয়, তথাপি কর্ত্তা বেচারীর তাতে কোনও বিশেষ উপকার হয় বলে' মনে হয় না। পরন্তু, ভৃত্যের তত্ত্বাবধানে থাকলে যদি বা কখনও সুবিধা অসুবিধার কথা জানানো যায়, গৃহিণীর তত্ত্বাবধানে থাকলে সে বিষয়ে একান্ত মৌন হয়ে না থাকলে জীবনযাত্রা হয় দুঃসম্পাদ্যেয়। কিন্তু সুজাতা গৃহিণীও নয়, ভৃত্যও নয়; সে কাজ করছিল অধ্যাপকের প্রতি দরদে ও ভক্তিতে। ভৃত্যের হাতে কোন কাজ দিয়ে সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারত না। সে নিজের হাতে অধ্যাপকের সমস্ত কাজ না করে' ছাড়ত না। সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করত তাঁর মনের চরিত্র, কি তাঁর ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না; এবং তাঁর অভাববোধের আগেই তা' পূরণ করে' তাঁর জীবনে একটা নূতন অভ্যাস ও অধ্যায় আনবার চেষ্টায় উঠে পড়ে' লেগে গেল। এ জন্য অধ্যাপক অনেক সময় তাকে মৃদুভাবে ভৎর্সনা করতেন, কিন্তু

সে কথা সে কাণে তুলত না। নারীর অন্তরে যে একটি সেবাপরায়ণা দেবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন সেই দেবী চাইতেন তাঁর পূজা। এই অধ্যাপকের সেবা দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠত তার মাতৃহৃদয়ের সেবাবৃত্তি।

কিছুদিন যেতে না যেতে সুজাতার দৃষ্টি পড়ল অধ্যাপকের আয়-ব্যয়ের দিকে। সে দেখল যে অধ্যাপকের খরচের অন্ত নেই। কিন্তু তাঁর আয় কোথা থেকে হয় তা তার কিছুই জানা ছিল না। একদিন সে ভয়ে ভয়ে কথা পাড়ল অধ্যাপকের কাছে। অধ্যাপক ফেলে' দিলেন তার কাছে তাঁর স্বল্লাবশিষ্ট আয়ের তালিকা। ব্যয়ের সঙ্গে খতিয়ে সুজাতা দেখলে যে অধ্যাপক দাঁড়িয়ে আছেন একটা পাহাড়ের পিচ্ছিল শিখরে, কোন্ দিন যে তিনি গড়িয়ে পড়বেন অর্থহীনতার বিপুল গহ্বরে সে সম্বন্ধে তিনি একটুও সচেতন নন্। পরীক্ষার পর পরীক্ষা, গবেষণার পর গবেষণা, ধ্যান ও চিন্তা—এই নিয়ে ছিলেন তিনি মগ্ন হয়ে, অর্থকৃচ্ছ্রতার কথা মনে হ'লেও অপ্রীতিকর বলে' সেটা চাইতেন তিনি চাপা দিতে। সুজাতা যখন তাঁকে তাঁর অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তখন তিনি শুধু বল্লেন—"তাই ত, কি করা যায়?"

সুজাতা লেগে গেল দীর্ঘদিনের সমস্ত হিসাবপত্র, সমস্ত কাগজপত্র দেখতে। অনেক পরিশ্রমের পর সে আবিষ্কার করল যে শুধু যে নিরর্থক অনেক ব্যয় হচ্ছে তা নয়, অনেকে অধ্যাপককে দু'হাতে ঠকিয়েছে এবং অনেক অর্থ আছে ঠগদের কবলে যাওয়ার পূর্ব্বদশায়। সে আরও দেখলে যে এ সমস্ত বিষয় নিয়ে অধ্যাপককে বিরক্ত করলে কোনও লাভ নেই। তিনি অনেক বিষয়ে অনেককে নানা উপায় বলে' দিতে পারেন, কিন্তু নিজের বিষয়ে তিনি একেবারে নিরাশ্রয় ও নিঃসহায়, শিশুর চেয়েও যেন অসহায়।

সুজাতা পড়ল চিন্তিত হয়ে। সে উপস্থিত হ'ল গিয়ে কানাইয়ের

কাছে। কানাই যেখানে কাজ করে তা সে জানে। অনেকদিন সে দেখেছে কানাইকে অবিশ্রান্ত সাধনায় নিমগ্ন, তপস্বীর ন্যায় একাগ্র-চিত্তে আপন সাধনার সাফল্যের জন্য নিরন্তর চলেছে তার হোমাগ্নিকে প্রোজ্জ্বলিত করে'। দু' একবার দেখা হয়েছে তার সঙ্গে এবং মৌখিক শিষ্টাচারও ঘটেছে, কিন্তু তবু কানাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা তার চিত্তের একটা অংশ পূর্ণ করে' রেখেছিল। একে ত অধ্যাপকের সঙ্গে যে কাজে সে লিপ্ত ছিল এবং অধ্যাপকের যে কাজ সে আনন্দে মাথা পেতে নিয়েছিল তা করবার পর তার অবসরই ঘটত অতি অল্প। কানাইও সর্ব্বদা রয়েছে কাজে নিমগ্ন হয়ে। উভয়ের অবসর প্রায়ই কখনও এক সময়ে ঘটত না। যদি বা কখনও প্রভাতে বা সন্ধ্যায় পাদচারণের সময় পরস্পর দেখা হ'ত তথাপি ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্ত্তার কোনও সুযোগ ছিল না। সে লক্ষ্য করেছে যে কানাই তার প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় সশ্রদ্ধ। অনেক সময় এ'ও লক্ষ্য করেছে যে কানাই যেন তার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হবার জন্য অভিলাষী, অথচ দেখেছে যে কানাই আপনাকে গেছে চেপে, কথার স্রোতের পথে হঠাৎ দিয়েছে একটা আল চাপিয়ে। তার মুখে দেখেছে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন অথচ সে থমকে গিয়েছে তার সামনে, সরসভাবে চায় নি কথা জমাতে, নিবিড় করে' দিতে চায় নি তার সঙ্গ। প্রভার মুখে কানাইয়ের কথা সে যা শুনেছিল তাতে সেও আপনাকে দিতে পারে নি খোলাখুলি করে' তার কাছে, কিন্তু প্রতিক্ষণে সে অনুভব করেছে যে এতদিন পর্য্যন্ত সে যে রকম খোলাখুলিভাবে সকল পুরুষের সঙ্গেই মিশতে পারত, যেমন করে' মিশতে পারে অধ্যাপকের সঙ্গে, ঠিক তেমন করে' সে পারছে না মিশতে কানাইয়ের সঙ্গে। কোথায় যেন একটা সঙ্কোচের বাধা পথ আগ্‌লে রয়েছে, তাকে এড়িয়ে যেতে ইচ্ছা হ'লেও সে এড়াতে পারে

না, মিশতে ইচ্ছা হ'লেও মিশতে পারে না; অথচ অনেক গভীর রাত্রে সে হঠাৎ উঠেছে ঘুম ভেঙ্গে, ভেসে উঠেছে কানাইয়ের মুখ অকারণে, হৃদয় টেনেছে তার দিকে, যেমন চুম্বক টানে লোহাকে।

ভালবাসার রহস্য অতি দুর্জ্ঞেয়। কেন যে কোনও জিনিষ আমাদের ভাল লাগে, তা নির্ণয় করে' বলা কঠিন। খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে রুচির বৈষম্য সুপ্রসিদ্ধ। কোনও কোনও মতের চিকিৎসকেরা মনে করেন যে রুচির বিচিত্রতার দ্বারা মানুষের দৈহিক জীবনের ধাতুগত বিচিত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সমস্ত চিকিৎসকেরা রোগনির্ণয় বা ঔষধ নির্ণয়ের জন্য এই রুচিগত বিচিত্রতার পরিচয় নিয়ে থাকেন। খাদ্যাদি সম্বন্ধে রুচিগত বিচিত্রতার কারণ যদি অনুসন্ধান করতে হয় জীবনপ্রবাহের ধাতুগত প্রকৃতিতে, তা হ'লে বোধ হয় কোনও লোককে কেন আমাদের ভাল লাগে তারও কারণ খুঁজতে হয় আমাদের মনের কাঠামোর বিচিত্রতার মধ্যে। কেউ যখন আমাদের কোনও উপকার করে তখন আমরা তাকে ভালবাসি। এ ভালবাসাটা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে আমাদের সাধারণ জৈব ধর্ম্মের উপর, জৈব প্রবৃত্তির উপর। আমাদের জৈব প্রবৃত্তি আমাদের সেই দিকেই টেনে নিয়ে যায় যেদিকে আমাদের জীবনের অনুকূলতা ঘটতে পারে। এইজন্য যারা আমাদের উপকার করে তাদের আমরা ভালবাসি এবং তাদের উপকার করা আমাদের একটা সামাজিক কর্ত্তব্য। এই শ্রেণীর ভালবাসার সঙ্গে রয়েছে একটা আদানপ্রদানের ভাব। অনেক সময়ে অনেকে কার জন্যে কতটা ত্যাগ করতে পারে বা কাকে কতটা দিতে পারে তার দ্বারা ভালবাসার পরিমাপ করে' থাকেন, আবার যারা কিছু ভাল না করে', কিছু উপকার না করে'ও আমাদের প্রশংসা করেন তাঁরাও তাঁদের চাটুবাক্যের দ্বারা আমাদের মন হরণ করে' থাকেন।

জীবনের পথে চলতে চলতে সর্ব্বদাই আমাদের সন্দেহ আসে যে আমরা ঠিক পথে চলছি কিনা, সমাজ আমাদের কাজের অনুমোদন করছে কি না। যখন কারও কাছে আমাদের কাজের বা চরিত্রের প্রশংসা শুনি তখন আমাদেব অবচেতনার মধ্যে তাকে সমাজের প্রতীক মনে করে' আমাদের কাজ যে সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যে চলেছে এই বোধ লাভ করে দৃঢ়তা, ফলে আমাদের সেই লোকটির কথা ভাল লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকেও ভাল লাগে। কিন্তু আর এক রকমের ভালবাসা আছে যা অত্যন্ত নিগূঢ় কারণে উৎপন্ন হয় এবং যা একান্ত অকারণ বা যার কারণ অতি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে আমাদের চিত্তস্বভাবেব মধ্যে। গাছপালা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, এই সমস্ত নানা সুন্দর জিনিষ আমরা ভালবাসি। যার সুন্দর বলে' বিশেষ পরিচয় দেওয়ার নেই, শুধু দীর্ঘ পরিচয় বশতঃ সংস্কারের মধ্যে যা দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে, এমন অনেক জিনিষ আমরা ভালবাসি, যার কোনও কারণ বলতে পারি না। আমার গ্রামের অপরিচ্ছন্ন ঘর, অপরিচ্ছন্ন পথঘাট, ডোবা পুকুর, সমস্তগুলিই যেমন আমাদের মনের উপর একটা স্নেহের কুহেলিকা বিস্তার করে, তাদের ছবি যখন মনে ভেসে ওঠে তখন মনে হয় আনন্দ। তেমনি মধ্যে মধ্যে এমন অনেক লোকের সামনে আমরা আসি স্বল্পমাত্র পরিচয়ে যারা আমাদের হৃদয়কে আনন্দের ছায়ায় উদ্ভাসিত করে। ক্রমশঃ পরিচয়ের সঙ্গে যখন তাদের মধ্যে উদারতা বা মহত্ত্ব, বুদ্ধি-প্রাখর্য্য বা ত্যাগশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ আমরা দেখি, তখন নিষ্কারণে করে তারা আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ। কিছু না করে'ও তারা আমাদের মনের উপর সুখ বর্ষণ করে, দুঃখের পীড়া করে হরণ। একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ করে তারা আমাদের মন, আমরা তার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

মানুষের মনে যে যৌবনধর্ম্মী আকর্ষণ আছে তা কারুর মধ্যে প্রকাশ পায় নিছক দেহের দিক থেকে, নিছক সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ দৈহিক প্রবৃত্তি থেকে। কিন্তু কারুর কারুর মন থাকে উঁচু তারে বাঁধা। উঁচু দিক থেকে আকর্ষণ না এলে নীচু দিক থেকে তার কোনও সাড়া আসে না। আবার উঁচু দিক থেকে একবার সাড়া এলে, শ্রদ্ধায় চিত্ত বিনম্র হ'লে, নীচুদিকের আকর্ষণটাও সেখানে গিয়ে জমা হয় এবং পার্থিব প্রবৃত্তির শক্তির দ্বারা অপার্থিব প্রেরণাকে নূতন রসে সঞ্জীবিত করে' তোলে। এই সব স্থলে শ্রদ্ধার সঙ্গে কামনা যুক্ত হয়ে যে প্রেম গড়ে' তোলে সে প্রেম স্বাদে ও আকর্ষণে অধিকার করে জীবনের কেন্দ্রস্থল। কামনার উপভোগের কোনও অবসর না ঘটলেও, কামনার ছায়ায় মসৃণ ও কোমল হয় শ্রদ্ধা। হয়ত বা সেখানে কামনা আপন রূপকে পরিত্যাগ করে' শ্রদ্ধার রূপের মধ্যে আপনাকে দেয় বিলীন করে', শ্রদ্ধা হয়ে ওঠে রসাল গভীর অনুরাগে। রাগ তার আপন উপরঞ্জকতার ছোপে রাঙিয়ে দেয় তার শ্রদ্ধাকে, ব্যক্ত করে আপনাকে প্রেমের স্বাদের মধ্যে। সেই মাধুর্য্যের অনুভবে চিত্ত হয় রসধারায় স্নাত।

সুজাতা যখন দেখেছিল কানাইকে প্রথম, তার বুদ্ধি ও বল তাকে করেছিল বিস্মিত, তার মনের নির্ভীকতা তার চিত্তের মধ্যে একটা সাড়া তুলেছিল। তারপরে সে যখন শুনলে যে আপনভোলা হয়ে কানাই দেশের উপকারের কাজে গেলে গিয়েছে, সেই শ্রদ্ধা তখন ক্রমশঃ ঘনীভূত হ'তে লাগল। যখন সুজাতার জন্য কানাই পুলিশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে জেলে গেল তখন সেই শ্রদ্ধা তার হৃদয়কে পূর্ণ করে' তুল্‌ল। হৃদয়ের কোন্ অজ্ঞাত লোক থেকে আর একটি অজ্ঞাত রসধারা সেই শ্রদ্ধার পরিপূর্ণ পাত্রটিকে মাধুর্য্যরসে পূর্ণ করে' তুল্‌ল। প্রভার

কাছে সে শুনেছিল যে কানাই আর কাউকে ভালবাসে, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক্, তাকে নিয়ে বিবাহিত জীবনের ঘরকন্না করতে৹ তার মন নারাজ—সে মুক্ত বিহঙ্গম। হৃদয়ের আর একটি প্রান্ত থেকে যে আর একটি রসধারা স্বচ্ছন্দভাবে প্রবাহিত হয়ে শ্রদ্ধাকে তার মধুময় করে' তুলছিল সে ধারার গতি যেন একটা বাধায় হ'ল প্রতিহত। কানাইয়ের দৃষ্টান্তে সুজাতা লেগে গেল অধ্যাপকের সঙ্গে কাজ করতে, অথচ এ সমস্ত যে তার মনের জ্ঞাতসারে ঘটেছে তা বলা যায় না। অস্ফুটভাবে অবচেতনার প্রেরণে মানুষ একটা কাজ থেকে আর একটা কাজে লিপ্ত হয়, ঠিক কারণের হদিস্ পায় না।

আজ অধ্যাপকের কাছে এসে সে কানাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্র কাজ করছে। প্রথম প্রথম যখন দেখা হয়েছে, সে তার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে তার উদ্ধারকর্ত্তার প্রতি, কিন্তু কানাই তা গায়ে মাখে নি। সে এমন ভাব দেখিয়েছে যেন সে কিছুই করে' নি, সে যেন সে কাজ যে-কোনও লোকের জন্যই করত। এর পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাড়াবাড়ি আর চলে না। ব্যক্তিগতভাবে অনুরাগের ক্ষেত্র গেছে সঙ্কুচিত হয়ে কিন্তু শ্রদ্ধার পরিমাণ গেছে বেড়ে। যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসে বলে' ব্যক্তিগতভাবে সেই প্রেমাস্পদের জন্য কোনও লাঞ্ছনা বা ত্যাগ স্বীকার করে সে মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু যে কেবলমাত্র দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার দেখে', নারীর প্রতি পুরুষের অসম্মান দেখে' সেজন্য ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে পারে, সে কত মহৎ! যখন সুজাতা অনুভব করল যে কানাইয়ের মধ্যে সে এমন কোনও পরিচয় পাচ্ছে না যে সে ব্যক্তিগতভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট, তখন তার সঙ্কোচ এল ক্ষীণ হয়ে। আজ যখন সে অধ্যাপকের কাজ নিয়ে কানাইয়ের নিকট উপস্থিত হ'ল তখন সে যেন ফিরে

পেল তার পুরাণো স্বচ্ছন্দতা ও মুক্ততা, যে পরিচয়ে সে সকল সময়ে বেড়িয়েছে এবং মিশেছে সে সকল সময়ে সুকুমারের সঙ্গে। তবু একথা বলা চলে না যে অন্তরের অন্তরালে যে একবার জেগেছিল, আজ অর্দ্ধসুপ্তপ্রায় হ'লেও সেটি গেছে বিনষ্ট হয়ে। যা একবার জাগ্রত হয় তা সহজে বিনষ্ট হয় না, সে থাকে আধঘুমন্তভাবে যেন কিছুর অপেক্ষায়, যেন একটু নাড়া পেলেই উঠতে পারে জেগে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কানাইয়ের সঙ্গে মঞ্জরীর দেখা হয়েছিল তার জীবনের প্রথম যৌবনে। সে সাড়া দিয়েছিল তার বিমূঢ় চেতনাকে, জাগ্রত করেছিল তার মধ্যের তরুণ পুরুষকে। কিন্তু যে প্রেমকে অবলম্বন করে' অন্তশ্চেতনার সমস্ত শুভ প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, যে প্রেম তার নির্ঝরিণীর ধারা দিয়ে ধৌত ও উন্মুক্ত করে' দিতে পারে পুরুষের অন্তর্লোকের সমস্ত বীর্য্য ও মহত্বের দ্বার, পবিত্র করে' দিতে পারে হৃদয়-মন্দিরের অঙ্গন ভূমি, রসসিক্ত করে' তুলতে পারে জীবন-তরুর মূল থেকে পত্র পর্য্যন্ত, সজাগ করে' দিতে পারে সমস্ত মানুষটিকে, মঞ্জরীর প্রেমে সে নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। মঞ্জরীর সংস্পর্শে এসে কানাইয়ের হৃদয়ের তারুণ্যের দিকটি সচ্ছল হয়ে উঠে ছিল, কিন্তু সে প্রেমে সে এমন কিছু পায় নি যা তার বহুমুখী প্রবৃত্তির মধ্যে এনে দিতে পারত একটি আশ্রয়, সামনে এনে দিতে পারত একটি ভেলা, যে ভেলাকে আশ্রয় করে' সে ভাসান দিতে পারত জীবন-সমুদ্রের জোয়ারে—যত দূরে যেখানেই সে যাক্ না কেন, সে ভেলা থাকত তার চির-আশ্রয় হয়ে। সেইজন্য যখন নানা দিকের

তাগিদ্ প্রকাশ পেতে লাগল কানাইয়ের জীবনে, সে হতাশ হয়ে দেখল সে সমস্ত তাগিদের সঙ্গে মঞ্জরীগত তার জীবনের কোনও যোগ নেই। মঞ্জরীর সঙ্গে তার যা ঘটেছে সে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস —সে রয়েছে একটি দ্বীপেব মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে। সেই ছোট দ্বীপটির মধ্যে গেলে কানাইয়ের হয় ত ছিল বিশ্রাম, ছিল আনন্দ, ছিল একটা তারুণ্যের কল্লোল, কিন্তু তাকে টেনে আনা সম্ভব হত না জীবনের অন্য প্রান্তে। সে ইতিহাস যেন বাঁধা রয়েছে জীবনেব এক ঘাটে, আর এক ঘাটে পাওয়া যাবে না তার দেখা। তাই যখন এল কানাইয়ের জীবনে বন্যা, ভেসে গেল সে সেই স্রোতে, মঞ্জরীর প্রেম রইল এক পাশে পড়ে'। সে প্রেম তাকে পারে নি এগিয়ে দিতে, পারল না আটকাতে, তা হয় নি তার ভার, হয় নি তার বাহন। জীবনের এক প্রান্তে কিছু দিনের ছেলেখেলার মত সে রইল হৃদয়ের একটি কোণকে মঞ্জুছায়ায় মসৃণ করে'। তাই মঞ্জরী যখন প্রকারান্তরে করলে কানাইকে প্রত্যাখ্যান, তা কঠিন হয়ে বাজে নি তার হৃদয়ে। যে জীবনে সে ছুটে চলেছিল তার আপন সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে, তা আপনিই করেছিল মঞ্জরীকে প্রত্যাখ্যান। মঞ্জরী যেন নিজে তার প্রত্যাখ্যানে নিয়ে এল তারই প্রতিধ্বনি। তার পরে ঢেউয়ের পরে আস্তে লাগল ঢেউ, কানাই পড়ল বিচ্ছিন্ন হয়ে। মঞ্জরীর কাছ থেকে সে পায় নি এমন কিছু যা মহা দুর্দ্দিনেও অক্ষয় সুধার বাটি ধর্‌বে তার মুখের কাছে। তবু জীবনের যে স্বপ্নকুঞ্জ সে রচনা করেছিল তার স্বপ্নটুকু সে গেল না বিস্মৃত হয়ে, ম্লান দীপ শিখার ন্যায় সে জল্‌তে লাগল জীবনের এক কোণে। ঘনিয়েছিল যখন নানা কুজ্ঝটিকা, বর্ষণমুখর রাত্রি যখন এনেছিল গর্জ্জনের তাণ্ডব, মধ্যাহ্নের তপ্ত দিবস যখন আকাশকে অন্ধকার করেছিল তার ধূলিপুঞ্জে, তখনও

ক্ষণে ক্ষণে তার মনে পড়ত সেই দীপশিখাটির কথা, তরুণের কল্প-কুঞ্জের কথা। আদিকাল থেকে মহাকবিরা যত প্রেমের বন্দনা গান করে' এসেছেন, কাব্যকুঞ্জ থেকে নিঃসৃত হয়েছে যত ময়ূরের কেকা-ধ্বনি, কোকিলের কুহুরব, তারা সেই সুদূরের দীপশিখাটির উপরে বর্ষণ করত তাদের সুরধারা, থেকে থেকে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠত তার দীপ্তি, মন পূর্ণ হ'ত তার ক্ষণিক উন্মাদনায়। বিধাতা তার ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন সাগরগামী মহাস্রোতের মধ্যে। যে ঘাটের দীপে একদিন সম্পন্ন হয়েছিল এই ভেলার বরণ তার কথা স্মরণ করা চলে, কিন্তু সেখানে ফিরে যাওয়া চলে না। ঘাটের মাটির দীপ জ্বলছে তার নিভৃত কোণে, আকাশের নক্ষত্রমালা থেকে বর্ষণ হচ্ছে বিচিত্র আলোকধারা তার উপর। তরঙ্গিত বাতাসের মধ্য দিয়ে কতই না বিচিত্র রূপে সে দেখা দিচ্ছে মনের কাছে, ক্ষণে ক্ষণে টান্‌ছে মনের নাড়ীর বন্ধনকে, কিন্তু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তাকে বিদায় সম্ভাষণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। কিন্তু দুরাশার শেষ নেই। অনেক সময় সে মনে করত, হয় ত সেই পুরাতন দীপটি কোনও না কোনও অলৌকিক উপায়ে, কোনও অনির্দ্দিষ্ট দৈবাচরণে অজ্ঞাত পথে ফিরে আসবে তারই বুকের কাছে, ভেলায় আর দীপে হবে ঠেকাঠেকি, দীপটি উঠে বস্‌বে ভেলার উপরে। তারপর সেই দীপটিকে বক্ষে করে' ভেলার হবে জয়যাত্রা সাগরের দিকে। সাগরের যাত্রী ভেলা, দীপের খাতিরে ঘাটে বাঁধা থাকা তার অসম্ভব। এইখানেই ত আসে জীবনে দৈবের পরিহাস।

সুজাতাকে সে এর পূর্ব্বে দেখেছিল দুইবার। ইতিমধ্যে অধ্যাপকের আশ্রয়ে সুজাতার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, কিন্তু সে কখনও এ কথা মনে করতে পারে নি যে তার প্রতি সুজাতার কোনও আকর্ষণ

ঘটেছে বা ঘটতে পারে। স্ত্রী চরিত্র সম্বন্ধে সে ছিল সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মেয়েরা যে কখন হাঁ বলতে না বলে বা না বলতে হাঁ বলে সে সম্বন্ধে তার কিছুই ছিল না জানা। সুজাতার যতটুকু ইতিহাস তার জানা ছিল তাতে তার প্রতি উদ্রিক্ত হয়েছিল তার একটা গভীর শ্রদ্ধা। তার মনে হয়েছিল যে সে সেই শ্রেণীর মেয়ে যে দিতে পারে সঙ্গ কিন্তু হ'তে পারে না সঙ্গিনী। দেখাশুনায় যতটুকু কথাবার্ত্তা হয়েছে তাতে তার মনে হয়েছে যে *এটি একটি* ধ্রুবতারা, এ আবর্ত্তন করবে না কারও পিছুতে কিন্তু পৃথিবী নিরন্তর আবর্ত্তন করছে এর চারিপাশে। এ এক মুষ্টি পাবার মত নয় যা আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে যায় পালিয়ে, কিন্তু এ হাত-ভরা রৌদ্রের মত থাকে হাতে—পাওয়া যায় কিন্তু ধরা যায় না। তার চোখে ছিল একটা উজ্জ্বল শান্তি, বুদ্ধির ছিল আনন্দ, কিন্তু তাকে আত্মীয় করে' পুঁটলিতে বাঁধবার যেন কোনও উপায় নেই। কোনও বিলাসভ্রমের চপলতায় সে আপনাকে করত না প্রতিবিম্বিত, চাটুবাক্যের জাল পেতে পারা যেত না তাকে ধরতে। রৌদ্রের মত সে আস্‌ত দূর লোক থেকে ধেয়ে, ব্যাপ্ত হয়ে পড়ত শস্যশ্যামল ধরাতলের উপরে, কিন্তু কখনও যেন বিস্মৃত হ'ত না যে তার যথার্থ স্থান সবিতৃমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী বিন্দুতে। পৃথিবীর হয়েও সে পৃথিবীর নয়। তার প্রতি কানাইয়ের মনে যে শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত হ'ত তাকে হয় ত বা পূজারই ছায়া বলা যেতে পারত। সুজাতা যেমন মনে করত যে কানাই তার সঙ্গে বেশী করে' মিশতে চায় না, কানাইও তেমনি মনে করত যে সুজাতাই বুঝি তাকে আমল দিতে চায় না। এমন একটা সময় আছে যখন হয় ত মেয়েরা ঝরে' পড়তে পারে শিউলি বা বকুল ফুলের মত, কিন্তু তার পূর্ব্বে হয় ত এমনও একটা সময় থাকে যখন দুরারোহ ডালে আরোহণ করে' তাকে

পেড়ে আনতে হয় চাঁপাফুলের মত; কিন্তু চাঁপাগাছের তলে দাঁড়িয়ে চাঁপার বর্ণলহরীর প্রতি পূজাময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে চাঁপাফুল ঝরে' পড়বে না মাটিতে। কানাইয়ের প্রধান মুস্কিল হ'ল এই যে সে নুয়েও কুড়িয়ে নিতে পারে না, উঠেও পাড়তে পারে না। মঞ্জরী তাকে অসহায় পেয়ে নিজেই নিয়েছিল কুড়িয়ে।

কানাই ও সুজাতার পরস্পর ঘনিষ্ঠ হওয়ার আর একটা বাধা ছিল কানাই ও মঞ্জরীর ইতিহাস। সুজাতার দিকে যখন তার মন টান্‌ত তখন সে সাহস করে' উৎসাহের সঙ্গে এগুতে ভয় পেত। সে মনে করত, তার বর্ত্তমান জীবনের গতি সত্ত্বেও মঞ্জরী যদি তাকে দাবী করে' বসে তা হ'লে সে দাবী সে এড়াবে কি করে'। ভালবাসা যখন আসে ক্ষীণ হয়ে, ছায়ার মত যখন আসে ম্লান হয়ে, কর্ত্তব্যবোধের দাবী তখনও থাকে টানা দেওয়া দড়ির মত শক্ত হয়ে। কানাই ছিল সেই প্রকৃতির লোক যে সকল সময়েই জান্‌ত কর্ত্তব্যকে সহজ করে' তুলে নিতে। কর্ত্তব্যের সঙ্গে প্রীতির দ্বন্দ্বকে কখনই সে প্রবল হয়ে উঠতে দিত না, এখানে সে রেহাই পেত এই দ্বন্দ্ব থেকে তার স্বাভাবিক কর্ম্মোন্মুখতায়। কর্ত্তব্য চিনে নিতে তার দেরী হ'ত না, আর কর্ত্তব্যের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তেও তার বিন্দুমাত্র দেরী হ'ত না। কর্ত্তব্য ও প্রীতির দ্বন্দ্ব ততক্ষণই থাকে প্রবল, যতক্ষণ প্রীতির আকর্ষণে কর্ত্তব্যকে আমরা রাখি ঠেলে'। কিন্তু অনেক মন আছে যাকে টেনে দাবিয়ে রাখা যায় না, সে স্প্রিং-এর মত ওঠে তড়াক করে' লাফিয়ে। প্রীতির আকর্ষণ বা বিপদের ভয় যদি কখনও কানাইকে চেপে রাখতে চাইত, সে দ্বিগুণ বেগে লাফিয়ে পড়ত তার কর্ত্তব্যের দিকে। উভয়ের দ্বন্দ্ব ঘট্‌তে যে সময়টুকু লাগে, কানাইয়ের মনের ধাতই ছিল এই রকম যে সে সময়টুকু তার কাছে পাওয়া যেত না। তাই

দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে আস্‌বার অবকাশ পেত না, দ্বন্দ্বে তার এক প্রান্তকে টানতে না টানতেই তার ভারকেন্দ্র তাকে সোজা খাড়া করে' দিত কর্ত্তব্যের দিকে। এইজন্য মঞ্জরীর সম্বন্ধে স্নেহের তন্ত্রী যদিও ধীরে ধীরে আসছিল শ্লথ হয়ে এবং যদিও ধীরে ধীরে সে অনুভব করছিল যে তার জীবন-যাত্রার প্রণালী ও আদর্শের সঙ্গে মঞ্জরীর জীবনযাত্রার প্রণালী ও আদর্শের কোনও মিল নেই, তথাপি একদিন সে মঞ্জরীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছিল যাতে সে মনে করার অবসর পেয়েছিল যে এমন একটা সম্বন্ধ পরস্পরের মধ্যে ঘটে' উঠবে যাতে তারা চিরজীবন দেবে পরস্পরকে সঙ্গ। সেই কথাটা স্মরণ করে'ই তার চিত্ত দৃঢ় হয়ে উঠেছিল মঞ্জরী সম্বন্ধে তার কর্ত্তব্য পালন করবার জন্য। সে অনেক সন্ধান করেছিল মঞ্জরীর, তার মনে হয়েছিল যে এ সম্বন্ধে শেষ কথা সেদিন হ'তে পারে নি, তাই তার মন স্তব্ধ হয়েছিল। যতই এগিয়ে যেতে লাগল সে আপন কাজের স্রোতে এবং যতই মঞ্জরীর সামান্য সংবাদটুকুও হয়ে উঠ্‌ল একান্ত দুর্লভ ততই মঞ্জরীর ছায়া আস্‌তে লাগ্‌ল একান্ত ম্লান হয়ে। কিন্তু সে কাজের মানুষ, সে এগুতে লাগ্‌ল তার পথে। শুধু কারণে অকারণে মাঝে মাঝে মনে হ'তে লাগল তার সুজাতার কথা—কি অসাধারণ এই মেয়েটি অথচ মঞ্জরীর চেয়ে কত বিভিন্ন প্রকৃতির। যতই তার মন সেই দিকে টানতে চাইত ততই সে চাইত তার মুখে কাঁটা লাগাম দিতে। একদিকে যতক্ষণ কর্ত্তব্য স্থির হয় নি তখন পাছে মন অন্যদিকে ছুটে গিয়ে একটা বিপত্তি বাধায় সে জন্য সে সর্ব্বদা থাকৃত সজাগ ও সচেতন।

এই রকম যখন চল্‌ছিল একটা দোটানা তার মনের গভীর প্রদেশের মধ্য দিয়ে, তখন একদিন সহাস্যে গিয়ে উঠ্‌ল তার বস্‌বার ঘরে সুজাতা। বল্‌লে—"আপনার সমাধি ভঙ্গ করতে এলুম, কিন্তু আমার প্রয়োজনে নয়।"

কানাই বল্‌লে—"সমাধি হ'লে ত আপনি ভঙ্গ করবেন। চঞ্চল মনকে সে এক জায়গায় বেঁধে রাখা যে কত কঠিন তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। বিশেষতঃ এক সময়ে করেছিলুম প্রচুর দেহচর্চ্চা। তাই শরীরটা চায় নিরন্তর বাইরে ছুটতে, মোটা কাজ মোটা দু'খানা হাত দিয়ে করতে। রাসায়নিক গবেষণায় দেহকে করতে হয় একান্ত সংযত, একটু নড়াচড়া করলে যন্ত্রপাতি যাবে উল্‌টে। দৃষ্টিকে সর্ব্বদা রাখতে হয় যন্ত্রপাতির উপর নিবদ্ধ। এ কাজে সিদ্ধিলাভ করা আমার মত লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। তবুও এসেছি যখন, লেগে থাকৃতেই হবে এ কাজে, আশা করি ক্রমশঃ অভ্যাস দৃঢ় হয়ে আস্‌বে। তা আপনি ত আসেন না কখনো গল্প করতে।"

সুজাতা বল্‌লে—"আজ এসেছি আপনার দু'খানা হাত আর দু'খানা পা'কে অবসর দিতে আর তাদের মুক্তি দিতে এই Laboratoryর যন্ত্রকারাগার থেকে। এই জন্যই ত আপনি উস্‌খুস্ করছিলেন, না? আপনার ভাগ্য থাকে ত পুলিশের সঙ্গে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামার সুযোগ ঘট্‌তে পারে।"

কানাই হেসে বল্‌লে—"আপনি অল্প দিনেই আমাকে চিনেছেন কিন্তু ঠিক, ঐটিরই ত একটা সুযোগ খুঁজ্‌ছিলাম. তা কার সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামা করব বলুন। একদিকে ত আছেন আপনি আর অধ্যাপক ব্যানার্জ্জি। আপনাদের কে আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পারেন?"

সুজাতা হেসে বল্‌লে—"পাঞ্জা আমরা কেউ লড়তে পারি না। সে বিষয়ে যত কৃতিত্ব তা আপনাকে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। কিন্তু তা নয়, আপনাকে একবার বেরুতে হবে মফঃস্বলে।"

কানাই বল্‌লে—"কেন বলুন দেখি?"

সুজাতা বল্‌লে—"অধ্যাপক মহাশয়ের জমিজমা ছড়িয়ে আছে

নানা স্থানে। বেশীর ভাগ তার মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে, বিশেষতঃ বাখরগঞ্জ জেলায়। সেখানকার যে সব নায়েবরা আছেন তাঁরা খাজনাপত্র ত কিছু পাঠানই না বরং অনেক জায়গায় বাকী খাজনার দায়ে অনেক বড় বড় জমিদারী শীঘ্রই বোধ হয় নিলাম হয়ে যাবে। গুরুদেব ত নিজে কিছুই দেখেন না আর দেখারও তাঁর বোধ হয় সাধ্য নেই।"

কানাই বল্‌লে—"হিসেবপত্র ত আমি কিছুই বুঝি না। আমাকে কোথাও কিছু করে' আস্‌তে বল্‌লে করে' আস্‌তে পারি।"

সুজাতা বল্‌লে—"সমস্ত হিসেবপত্র আমি তৈরী করে' রেখেছি। সেগুলো দেখলেই আপনি সব বুঝতে পারবেন। এই দেখুন না।"

কানাই কিছুক্ষণ হিসেবপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করে' বল্‌লে—"দেখুন এ সমস্ত ত কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। অঙ্কের figure দেখলেই আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়। সেই জন্যেই ত অতি কষ্টে Physicsএর হাত থেকে B. Scতে রেহাই পেয়ে ঢুকেছি রসায়নে। এখানে নানা রকম রঙ্‌চঙে জিনিষ দেখি, জ্বালাই পোড়াই। অঙ্কের হাঙ্গামা অনেক কম।"

সুজাতা বল্‌লে—"তবে কি হবে।"

কানাই বল্‌লে—"ব্যাপারটা কি আমায় সংক্ষেপে বলুন তো।"

সুজাতা বল্‌লে—"ব্যাপারটা এই যে, বাখরগঞ্জের সদর এলাকার মধ্যেই অনেকগুলো বড় বড় মহাল একজন নায়েবের হাতে রয়েছে। সে নায়েব অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ লোক। সে খাজনাপত্র কিছু দেয়নি এবং মহালগুলোরও বাকী খাজনা না দিয়ে নিজের নামে খরিদ করে' নেবে এই বন্দোবস্তে আছে।"

কানাই বল্‌লে—"এ ত তা হলে মস্ত মামলা মোকর্দ্দমার ব্যাপার। মামলা মোকর্দ্দমা ত আমি কিছুই বুঝি না।"

সুজাতা বল্‌লে—"তবে কি হবে।"

কানাই বল্‌লে—"একটা কাজ করা যেতে পারে। বরিশালে Magistrate আছে Kempis সাহেব, যে আমাকে দিয়েছিল জেলে। লোকটা নিজে জোয়ান এবং Irishman। আমি পুলিশের আটটাকে শুইয়ে ফেলেছিলুম দেখে সে মনে মনে ভারী খুসী হয়েছিল। হয়ত লোকটার কাছে গেলে সুরাহা হতে পারে। কিন্তু এসব কাগজপত্র বোঝানো ত আমার দ্বারা হবে না।"

সুজাতা বল্‌লে—"তবে কাগজপত্র কে বোঝাবে।"

কানাই একটু মৃদু হাস্যে সুজাতার দিকে চেয়ে বল্‌লে—"কেন? যিনি করেছেন তিনিই।"

সুজাতা বল্‌লে—"তার মানে?"

কানাই বল্‌লে—"মানে ত অতি সুস্পষ্ট। আমি দেখছি যে বহু বৎসরের দাখিলা পত্র ও হিসাবের খাতা তন্ন তন্ন করে' দেখে' আপনি এ হিসাব তৈরী করেছেন। একান্ত অসম্ভব হ'ত অধ্যাপক ব্যানার্জ্জির পক্ষে এ হিসাব তৈরী করা এবং হয়ত তিনি এ হিসাব দেখে এখনও কিছু বুঝতে পারবেন না।"

সুজাতা বল্‌লে—"তাঁর কথা তুল্‌ছেন কেন? তিনি কি যেতে পারবেন নাকি হিসাব বোঝাতে বরিশালে?"

কানাই বল্‌লে—"তাইত বল্‌ছি, তিনজন লোক রয়েছি আমরা। অধ্যাপক ব্যানার্জ্জি পারেন না একাজ করতে। যেহেতু বহু গাণিতিক গবেষণা রয়েছে এর মধ্যে এবং যেহেতু আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটি এতাদৃশ গোলক ধাঁধার মধ্যে যেতে একান্ত অসমর্থ, সেই জন্য আমার পক্ষে এটা অসম্ভব। অতএব একমাত্র তৃতীয় ব্যক্তিই এটা করতে পারেন।"

সুজাতা যেন একটু ভীত হয়ে বল্‌লে—"বলেন কি? আমি যাব বরিশালে?"

কানাই বল্‌লে—"এর মধ্যে আবার বলাবলি কি? আপনি ত পায় হেঁটেও যাচ্ছেন না, সাঁতার কেটেও যাচ্ছেন না, আর পথে যদি গুণ্ডা পুলিশের উপদ্রব হয় ত আটজন পর্য্যন্ত আমি শুধু হাতেই পারব। এবার না হয় একখানা লাঠি নিয়ে যাব, তা হলে ষোলজন পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এর মধ্যে আর ভয়টা কোনখানে।"

কানাই এমন সহজ ও সরলভাবে কথাগুলো বল্‌ল যে সুজাতার আর কোনও সংকোচের অবসর রইল না। সে একটু চুপ করে' থেকে বল্‌লে—"সে ত ভারী মুশকিলের কথা হ'ল দেখছি। চলুন যাই গুরুদেবের কাছে।"

কানাই বল্‌লে—"চলুন।"

উভয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ল অধ্যাপক ব্যানাৰ্জ্জির নিকটে। দেখলে তিনি বসে আছেন তাঁর টেবিলের কাছে, একটা জীর্ণ জামা তাঁর গায়ে, পরিধানের বস্ত্র অপরিচ্ছন্ন। তিনি কি একটা অঙ্ক কষছিলেন। দু'জনে গিয়ে তাঁর ঘরে উপস্থিত হ'তেই তিনি চম্‌কে উঠে বল্‌লেন—"কি হে, কি খবর, তোমরা সব ভাল ত?"

সুজাতা একটু স্নেহার্দ্র কৃত্রিম রোষের সহিত অধ্যাপককে বল্‌লে—"হ্যাঁ, সব ভাল। আর আপনাকে যে আমি পই পই করে' বলে' গেলুম যে আপনার স্নানের জল, গামছা, সাবান সব রেখে গেলুম, আপনি একটু পরিষ্কার হয়ে কাপড় ছাড়ুন। তারপর কেটে গেল দেড় ঘণ্টা, আপনি সেইভাবেই বসে আছেন।"

অধ্যাপক হো-হো করে' হেসে বল্‌লেন—"কাপড়, কাপড় ছাড়ব কেন?"

সুজাতা বল্‌লে—"হ্যাঁ, ছাড়বেন। গ্রীষ্মের দিনে বিকেল বেলা একটু স্নান করে' পরিষ্কার হয়ে কাপড় জামা ছাড়লে দেখবেন কত ভাল লাগে।"

অধ্যাপক বল্‌লেন—"হ্যাঁ, তা ত বটে। কিন্তু এখন উঠি কি করে' বল দেখি। অঙ্কটা যে কিছুতেই মিল্‌ছে না। তুমি একবার দেখ দেখি কোথায় ভুল করলুম।"

সুজাতা বল্‌লে—"আচ্ছা, সে আমি দেখব এখন, কিন্তু আপনি যদি স্নান করে' কাপড় জামা ছেড়ে আস্‌তেন তবে দেখতেন এক নিমেষেই অঙ্কটা মিলে যেত।"

অধ্যাপক আবার অন্যমনস্ক, তাঁর দৃষ্টি ঐ অঙ্কটির দিকে, বল্‌লেন,—"কোথায় যেন কোন্ sign ভুল করেছি।"

সুজাতা আর বাক্যব্যয় না করে' বল্‌লে—"Sign হচ্ছে এখন আপনার স্নানের ঘরের দিকে," বলে' এক রকম জোর করে' ধরে' হাস্‌তে হাস্‌তে শিশুর মত নিয়ে গেল স্নানের ঘরে। ফিরে এসে বল্‌লে—"দেখুন কত বড়লোক অথচ কি শিশুর মত সরল, অথচ আপনার বল্‌তে কেউ নেই। কেউ নেই যে ওঁকে একটু যত্ন করে।"

কানাই বল্‌লে—"তবু ওঁর ভাগ্য জোর যে আপনার মত মা পেয়েছেন। আপনি যে স্নেহে ওঁকে লালন পালন করছেন তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।"

সুজাতা বল্‌লে—"আমি কি পারি ওঁর ভার সামলাতে। ওঁকে নিয়ে আমার লেখাপড়া গেছে চুকে। সব সময়েই মনে হয় কোথায় কি অনিয়ম ঘটবে, অসুখ করবে। যতদিন ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে পারা যায় ততদিনই আমাদের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল। কত বড় একটা

গৌরব উনি সমগ্র দেশের। এর চাইতে বড় যে আমি কিছু করতে পারতুম তা ত আমি মনে করি না।”

কানাই চেয়ে রইল শ্রদ্ধাপুলকিত দৃষ্টিতে সুজাতার স্নেহ গৌরব-দীপ্ত মুখের দিকে, মনে হ’ল যেন জগন্মাতা পার্ব্বতী বসে আছেন তাঁর স্নেহবিহ্বল দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবীকে দুগ্ধধারায় অভিষিক্ত করে’।

সুজাতা বল্‌লে—“ওঁকে নিয়ে আমি নাবার খাবার সময় পাই না কিন্তু। শুধু কি তাই? ওঁরই ঘরের পাশে আমার ঘর। কোন কোন দিন দেখি যে গভীর রাত্রিতে শুক্লা একাদশীর চন্দ্র যখন প্রায় অস্তোন্মুখ বা যখন সপ্তর্ষি ঢলে’ পড়েছে পশ্চিম আকাশের দিকে, তখন দেখি কি বিড় বিড় করে’ বকছেন আর পায়চারী করছেন বারান্দায়, ভয় পেয়ে যাই বুঝি বা গেলেন পাগল হয়ে। ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসি বারান্দায়। আদর করে’ কাছে বসিয়ে মাথায় দিই হাত বুলিয়ে। জিজ্ঞাসা করি, ‘কি হয়েছে আপনার বলুন ত।’ কোনও কথা নেই, দুই চোখ দিয়ে দেখেছি ঝর ঝর করে জল পড়তে, অনেক বোঝাবার পর একদিন বল্লেন, ‘সমস্ত জীবন দিয়ে গড়ে তুলেছি এই বিদ্যামন্দির, কে একে রক্ষা করবে, কে একে গড়ে তুল্‌বে বাড়িয়ে।’ আমি বলেছিলুম—‘কেন, ব্যবস্থা করে’ ভাল ভাবে trusteeদের হাতে দিয়ে যান না।’

‘তিনি হেসে বল্লেন, “ক্ষেপেছ, trusteeরা চালাবে এই বিদ্যা-মন্দিরকে। তারা বছরে দু’বার করে’ আস্‌বে, মিটিং করবে, চলে’ যাবে, মাইনে-করা Auditor দিয়ে আয় ব্যয় করাবে পরীক্ষা, হয়ে গেল তাদের কাজ। স্নেহ ছাড়া, মমতা ছাড়া, দরদ ছাড়া না গড়ে Library, না গড়ে বিদ্যামন্দির, সরস্বতীর ধন সারস্বত প্রেম ছাড়া রাখা যায় না। যদি কেউ থাকৃত এমন যে আমাকে ভালবাসে, সে

হয় ত রাখতে পারত, বাঁচাতে পারত আমার এই ভালবাসার ধন তার ভালবাসা দিয়ে, প্রেম দিয়ে। জীবনের রক্ত দিয়ে, হৃদয়ের পূজা দিয়ে যে ধন গড়ে তুলেছি, সমস্ত জীবনের পরিশ্রম দিয়ে, ঐকান্তিক কামনা দিয়ে আমার তারা পশ্চিমে ডুবতে আর বড় দেরী নেই।"

আমি বল্লুম—"এ কথা কেন আপনি বলছেন, আপনি এখনও ঢের দিন বাঁচবেন। আপনাকে কেন্দ্র করে'ই ত আমরা বেঁচে আছি।" বিশাখা নক্ষত্রের মত দুটি জ্বল্‌জ্বলে তারা যেন চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। আমি তাঁকে বল্লুম—"আমার কোন যোগ্যতা নেই, গবেষণায় আমার কোন দক্ষতা নেই। তবে একথা আপনাকে বল্‌তে পারি যে যে স্নেহপূর্ণ করেছেন আপনি আমার হৃদয়কে, তার প্রত্যেকটি বিন্দু ক্ষরিত হবে আপনার এই স্মৃতিরক্ষার কাজে। আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে আমি লেগে থাক্‌ব আপনার এই বিদ্যামন্দির রক্ষার কাজে, জীবনে এর চেয়ে বড় আমার কোনও কাজ নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।"

বৃদ্ধ তখন উত্তেজিত ভাবে আমার দুখানি হাত ধরলেন চেপে, আমার কাঁধের উপর রাখলেন তার পুণ্যধবলিত শীর্ষ, আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। প্রভাতের আলোতে ধ্রুব নক্ষত্রের জ্যোতি তখন এসেছে ম্লান হয়ে।"

কানাই নিস্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল সুজাতার মুখের দিকে, মনে হ'ল যেন তার দুটি চক্ষের তারা আরতির দীপশিখার ন্যায় পূজার আনন্দে নৃত্য করছে মহাদেবীর সিংহাসনের সম্মুখে। ইতিমধ্যে অধ্যাপক স্নান সমাপন করে ফিরে এলেন। সুজাতা তাঁকে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বল্লে।

অধ্যাপক বলে উঠলেন—"এ সব তোমরা করবে কি করে।"

সুজাতার মুখের দিকে চেয়ে আবার বল্লেন—"এত কষ্ট পরিশ্রমের মধ্যে তোমায় কি আমি পাঠাতে পারি।"

সুজাতা বল্লে—"এ ত আমার না করে' উপায় নেই। আপনার মনে নেই আপনি কি ভাব চাপিয়েছেন আমার উপরে। এখন ত তবু কানাইবাবু সঙ্গে আছেন। ভবিষ্যতে যখন নানা হাঙ্গামায় পড়ব তখন ত কানাই বাবুকেও সঙ্গে পাব না।

কানাই একটু হেসে বল্লে—"কপালের কথা বলা যায় না, হয় ত বা পেতেও পারেন।"

সুজাতা বল্লে—"বটে !"

কানাই বল্লে—"কি করে' বলি বলুন! আপনি যে এত বড় একটা দায়িত্ব ঘাড়ে করবেন তা কি এখানে আসবার আগে জান্তেন। মানুষের জীবনে কখন কি ঘটে তা কি কখনও ঠিক করে' বলা যায়। বিশেষতঃ আমাদের মত লক্ষ্মীছাড়াদের কথা।"

সুজাতা অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—"আমার যত ভয় সে আপনাকে নিয়ে, আমি চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই এসে পড়ব। আপনি শুধু আমি যে রকম বলি সেইভাবে চলবেন। আমাকে কথা না দিলে তো আমি যেতেও সাহস পাই না।"

অধ্যাপক সুজাতার মাথায় হাত দিয়ে ঈষৎ হাস্যে বল্‌লেন—"আচ্ছা তাই হবে।"

পরদিন সুজাতাকে নিয়ে কানাই রওনা দিল বরিশালের দিকে। বৈকালে সন্ধ্যাসন্ধি দুজনে গিয়ে উঠল বরিশাল এক্সপ্রেস ষ্টীমারে খুলনাতে। ফাষ্ট ক্লাসের সামনে বারান্দায় দুখানা চেয়ার নিয়ে দুজনে বসে গেল। উদার নদীর বাতাস যেন বুলিয়ে দিলে তার স্নিগ্ধ শীতল হাত এবং জুড়িয়ে দিল তাদের তপ্ত দেহ।

হঠাৎ কানাইয়ের পেছনে দৃষ্টি পড়াতে কানাই দেখলে যে একজন অতি দীর্ঘকায় পাঞ্জাবী পুলিশ কর্ম্মচারী তাদের দুজনকে দেখিয়ে দিয়ে একজন বাঙ্গালী পুলিশ কর্ম্মচারীর সঙ্গে কি ফিস্‌ফিস্‌ করে' কথা কইছে।

কানাই সুজাতাকে বল্‌লে—"দেখুন আবার কি ঘটে, পিছনে ফেউ লেগেছে।"

একটু পরেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি এগিয়ে এল সামনের দিকে—প্রায় সাড়ে দুফুট উঁচু, হাত পায়ের হাড় যেন এক একটি লোহার ডাণ্ডা, মাথায় পাঞ্জাবী ধরণের পাগড়ী, গায়ে একটা টুইল সার্ট, পরণে খাকী হাফপ্যাণ্ট ও বুট। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সুজাতার দিকে চেয়ে বল্লে, "Good afternoon. I hope you are Sujata Debi." একটু হেসে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে' বল্লে—"Do you know where is your intimate friend Manjari Devi," বলেই খানিকটা হাস্‌তে লাগল।

কানাই অসহিষ্ণু হয়ে বল্লে ইংরাজীতে—"এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অর্থ কি?"

কর্ম্মচারী আবার খানিকটা হেসে বল্‌লে—"কিছু না, কিছু না।"

কানাই এই প্রথম জানলে যে মঞ্জরীর সঙ্গে সুজাতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। হঠাৎ পুলিশের কর্ম্মচারী মঞ্জরীর কথা জিজ্ঞাসা করায় সে একটু চিন্তিত ও ভীত হ'ল যে মঞ্জরী আবার কোনও পুলিশের ফ্যাসাদে পড়েছে না কি।

পুলিশ কর্ম্মচারী আবার কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে বল্লে—"আপনিই ত কানাইবাবু, কেমন নয়?"

কানাই বল্লে—"হ্যাঁ, আমিই কানাইবাবু। তা আমার প্রতি আপনাদের এখনও কি লোভ শেষ হয় নি।"

কর্ম্মচারীটি বল্লে—"না, না, একি কথা বলছেন। তবে সুজাতা দেবীর সঙ্গে যে দেখা হ'ল তা ভালই হ'ল, আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে ক্ষমা চাই যে তাঁর প্রতি যে উপদ্রব করা হয়েছিল সে জন্য।"

কানাই ও সুজাতা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। পুলিশের কর্ম্মচারী ক্ষমা চায়, এ ত ভূতের মুখে রাম নাম। ব্যাপার কি ?

পুলিশ কর্ম্মচারিটি তাদের মনোভাব যেন ইঙ্গিতে বুঝে বল্লে—"Excuse me. I am Dilip Singh of the Punjab Regiment. After all a Police officer is also a human being. He regrets when he commits a blunder, at least some of us do."

কানাই বল্লে—"কি রকম। ভুলই বা কি হয়েছিল আর ভুল বুঝলেনই বা কি করে'।"

কর্ম্মচারীটি বল্লে—"দেখুন, মঞ্জরী দেবী সুজাতা দেবীর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি ওঁর বিরুদ্ধে গোপনে কতগুলি অভিযোগ আমাদের কাছে করেছিলেন। সেই অভিযোগ অনুসারেই কোন প্রমাণ না পেয়েও ওঁকে আমরা আটক করেছিলাম। তারপরে অনেক দিন অনুসন্ধান করে' জানলাম যে সে অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা। মঞ্জরী দেবী কোথায় আছেন জানলে আমরা মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তারও করতে পারি।"

কানাই ও সুজাতা উভয়েই একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে কর্ম্মচারীটির মুখের দিকে চেয়ে রইল। সুজাতার মনে বরাবরই সন্দেহ ছিল যে কি কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল এবং এমন কথাও তাকে কেউ বলেছিল যে নিশ্চয়ই তার নামে কেউ কিছু

পুলিশের কাছে লাগিয়েছে, কিন্তু কে যে তার বিরুদ্ধে লাগাতে পারে এ সম্বন্ধে তার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় জাগে নি। মঞ্জরী কেন যে হঠাৎ আলগা হয়ে গেল তা সে কিছুই বুঝতে পারে নি। কিন্তু মঞ্জরী তার নামে লাগাবে এ কথা ত স্বপ্নেও ভাবা যায় না। সে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, "অসম্ভব, অসম্ভব।" কানাই যেন আরও অধিকতর উত্তেজিত হয়ে তারই কথার প্রতিধ্বনি করে' উঠল, "অসম্ভব, অসম্ভব।" তারপর খাড়া হয়ে আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়িয়ে এবং কর্ম্মচারীটির দিকে চক্ষু রক্তবর্ণ করে' বল্‌লে—"কোনও ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলবার আগে নিজে সাবধান হবেন।"

সুজাতার তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল যে এ সেই কানাই যে মেয়েদের বিরুদ্ধে একটুমাত্র অত্যাচার সহ্য করতে পারে না। ভাবলে সে এখনই যদি একটা মারামারি বাধিয়ে দেয় ত অধ্যাপকের কাজ সব মাটি হবে। কানাইয়ের ত দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নেই। নিমেষে হয় ত ঘুষিটা গিয়ে পড়বে কর্ম্মচারীটির মুখের উপর। বারুদ ধরেছে আর কি, গুলিটা ছুটলেই হয়। সুজাতা ভীত হয়ে কানাইয়ের হাতখানা ধরলে চেপে, বল্‌লে—"ধৈর্য্য ধরুন, সব মাটি করবেন দেখছি।"

পুলিশ কর্ম্মচারীটি অবিচলিত ভাবে ঈষৎ হাস্য করে' বল্লে—"মিছে অত উত্তেজিত হবেন না। আপনার মাংসপেশীর বল ব্যবহারের জন্য সংসারের সৎপাত্রের অভাব ঘটবে না, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ওটার ব্যবহার নিতান্ত অপব্যবহার হবে। আমি প্রয়োজনবশতঃ চলেছি বরিশালে, সেই জেলাতেই মঞ্জরী দেবীর আদি বাস, সদর থানার এলাকাতেই। মঞ্জরী দেবীর কাগজপত্র অবশ্য একান্ত গোপনীয়। তবু সুজাতা দেবীর প্রতি একটা ঘোরতর অন্যায় হয়ে গেছে বলে' তাঁকে সে কাগজপত্র আমি দেখাতে প্রস্তুত আছি। ভবিষ্যতে বন্ধু চয়ন সম্বন্ধে

তিনি যেন আর একটু অবহিত হন।" এই কথা বলেই উঠে গেল তার কেবিনের দিকে, একটু পরেই file হাতে করে' এল। তারপর সে file থেকে একটা কাগজ বের করে' কাগজের বৃত্তান্তটা হাতে চেপে ধরে' সইটা শুধু মুক্ত করে' ধর্‌লে সুজাতার সামনে। বল্লে—"আপনি নিশ্চয়ই মঞ্জরী দেবীর স্বাক্ষর চেনেন। দেখুন এটা তার সই কি না।"

সুজাতা ও কানাই দুজনেই সে সইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলে। মঞ্জরীর সই চিন্‌তে তাদের এক মুহূর্ত্তও দেরী হ'ল না। বিস্ময়ে তারা স্তব্ধ ও হতবাক্। তারপর কর্ম্মচারীটি হাতের আবরণটা তুলে নিলে লেখাটার উপর থেকে। তাতে সুজাতা ও কানাই সম্বন্ধে ও সুজাতার সরকারের বিরুদ্ধে নানা প্রকার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেওয়া সম্বন্ধে প্রকাশ্যে ও ইঙ্গিতে অনেক কিছু লেখা ছিল। কানাই ও সুজাতা কিছুকাল বিস্ময়ে রইল স্তব্ধ হয়ে; দ্রুত পড়তে লাগল তাদের নিঃশ্বাস। কর্ম্মচারীটি তার কাগজপত্র গুটিয়ে ফাইল বন্ধ করলে।

কানাই কর্ম্মচারীটির দিকে তাকিয়ে বল্লে—"আমায় ক্ষমা করবেন।"

কর্ম্মচারীটি মুখ গম্ভীর করে বল্‌লে—"কিছু না, কিছু না, আপনার ত চট্‌বার কারণই ছিল।"

কানাই জিজ্ঞাসা করলে—"আমাদের আপনি চিনলেন কি করে'?"

কর্ম্মচারীটি বল্‌লে—"কিছু মনে করবেন না। বড় বড় Laboratoryতে যারা নিযুক্ত থাকে তাদের উপরে আমাদের সর্ব্বদাই একটু দৃষ্টি রাখতে হয় এবং সেই সেই Laboratoryতে কি কি জিনিষ প্রস্তুত হয়, কে কোন গবেষণায় কি কাজ করেছে এ সম্বন্ধে তথ্য আমাদের জান্‌তে হয়। সুজাতা দেবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল,

আপনার বিরুদ্ধেও ছিল, তা আপনি মঞ্জরী দেবীর একরারনামা দেখেই বুঝতে পেরেছেন। আপনারা উভয়েই ছিলেন আটক সরকারের হেফাজতে। তারপর আপনারা উভয়েই বেরিয়ে এসে যোগ দিলেন একটা বড় Laboratoryর কাজে। আপনারা উভয়েই এম্, এস্ সি, দক্ষ গবেষক, বিশেষতঃ আপনি দক্ষ রাসায়নিক। এ অবস্থায় আপনারা Laboratoryতে কি করছেন এবং পরস্পর কি সঙ্কল্প করছেন এ বিষয়ে ত আমাদের একটু দৃষ্টি রাখতেই হয়"—বলে' একটু হাস্‌লে।

কানাই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"Laboratoryর মধ্যেও আপনাদের দৃষ্টি যায় ?"

কর্ম্মচারীটি হেসে বল্‌লে—"না গেলে দেখুন রাজার কাজ চলে কি করে'।"

কানাই আবার জিজ্ঞাসা করলে—"বলুন ত আমি কি কি গবেষণায় লিপ্ত আছি।"

কর্ম্মচারীটি বল্‌লে—"আপনি খুব ভাল কাজই করছেন। সে বিষয়ে আমাদের কোনও আপত্তি নেই ; বরং আমার মনে হয় আপনারা যদি চেষ্টা করেন ত সে কাজের সাফল্যের জন্য সরকারের কাছ থেকেও হয় ত সাহায্য পেতে পারেন। আপনি যা করছেন তা সফল হ'লে দেশের অশেষ মঙ্গল হবে। আপনাকে ধন্যবাদ।"

কানাই অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"বলুন ত আমি কি কাজ করছি।"

কর্ম্মচারীটি বল্‌লে—"আপনি waste vegetables এবং animal products থেকে nitrogen ও protein বের করে' সস্তায় কোনও বীর্য্যবান্ খাদ্য প্রস্তুত করা যায় কিনা এ চেষ্টায় লিপ্ত আছেন। এ ত অতি ভাল কাজ।"

কানাই বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। সুজাতা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কথা শুনছিল। জিজ্ঞাসা করল—"বলুন ত আমি কি করি।"

কর্ম্মচারীটি বল্‌লে—"আপনি কাজ করেন অন্য পথে, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ কৌতূহল নেই। আপনি রাশি রাশি অঙ্ক কষেন, তা আমরা কিছু বুঝি না, আর করেন পরমাণু নিয়ে গবেষণা। ওটা স্থূল হয়ে না দাঁড়ালে আমাদের উৎসাহের বাইরে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা যতক্ষণ পর্য্যন্ত যন্ত্রে পরিণত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও ইষ্টানিষ্ট করতে অক্ষম।"

সুজাতা আবার জিজ্ঞাসা করলে—"কি উপায়ে আপনারা এসব জানেন ?"

কর্ম্মচারীটি হেসে বল্‌লে—"সকল উপাখ্যানেরই এক জায়গায় দাঁড়ি টান্‌তে হয়। আমাদের এ বিষয়ের আলোচনা এইখানেই হোক শেষ।" বলে' সে কাগজপত্র গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বল্‌লে—"আপনাদের বিশ্রাম ভঙ্গ করলুম বলে' অত্যন্ত দুঃখিত। আর যে কোলাহল তুলে গেলুম তাতে রাত্রিতেও বিশ্রাম পান কিনা সন্দেহ। আমি আর আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না।" এই কথা বলে' পুলিশ কর্ম্মচারীটি আবার হেসে বল্‌লে—"আর যে কাজের জন্য আপনারা বরিশাল যাচ্ছেন সে কাজে আপনারা সফল হন এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি।" এই কথা বলে' দু'হাত তুলে একটি নমস্কার করে' তাদের মুখের দিকে একটি সস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' কর্ম্মচারীটি আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে গেল। দুজনে বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

চারিদিক নিস্তব্ধ। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে এসেছে। ছপ্ ছপ্ শব্দ করে' ষ্টিমারখানা চলেছে নদীর জল আলোড়ন করে'। অনতি-প্রশস্ত নদী, দু'পাশের ঝোপঝাপ সমস্ত রয়েছে গভীর কালো হয়ে।

দিনের আলোতে গাছে গাছে ঝোপে ঝোপে যে অন্তরাল থাকে তা চোখে দেখা যায়। তাই প্রত্যেকটি থাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। রাত্রির অন্ধকারে অন্তর্লীন সমস্ত অন্তরাল নিমগ্ন হয়ে যায় দৃষ্টির অভ্যন্তরে, বস্তুব মধ্যে যে বস্তুর পার্থক্য তা লক্ষ্য করবার কোনও অবসর থাকে না। যে বনস্পতির লাবণ্য দিনের বেলা তার সবুজ চিক্কণতায় চোখে এনে দেয় প্রসন্নতা, রাত্রিতে গভীর অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় সেই লাবণ্য। সমস্ত চোখের পটভূমি জুড়ে প্রকাশ পায় একটা গভীর কালো, যা অন্ধকারের মতই গহন ও দুর্ভেদ্য। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকী পোকার দল সে অন্ধকারের মধ্যে চিক্‌মিক্ করে' আরও উন্মুক্ত করে' দেয় অন্ধকারের গাম্ভীর্য্য। মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে সার্চ্চলাইটের আলো দূর বনানীর উপর পড়ে' একটা স্বপ্নময় মায়ালোকের ছবিতে প্রোজ্জ্বল করে' তুলছিল তীরের তটপ্রান্ত; আর তারই সঙ্গে তুলনায় আরও গভীর হয়ে দেখা দিচ্ছিল চারি পাশের অন্ধকারের গাঢ়তা। আমাদের দৃষ্টি যতক্ষণ নানা রূপের মধ্যে করে বিচরণ, চলচ্চিত্রের মতন বিচিত্র ছবি নেচে যায় আমাদের মনের পটভূমির উপর দিয়ে এবং সেই চলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিন্তা আন্দোলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু গভীর অন্ধকারের মধ্যে রূপ যখন যায় নিমগ্ন হয়ে, যখন একটি অখণ্ড কালোরূপ মনকে পারে না চালিত করতে তার বিচিত্রতার দ্বারা, তখন মন যায় স্তব্ধ হয়ে। অন্তরের কোন্ গহ্বরের মধ্যে মন যেন যায় তলিয়ে, স্তব্ধ ও নিঃসাড় হয়ে আসে চেতনা। কোন্ দৃষ্টিহীন, রূপহীন, দিশাহীন, ভাঙ্গন-ঘন অন্ধকারের স্রোতের মধ্য দিয়ে ভেসে চলেছে দুটি যাত্রী। হারিয়ে যেন ফেলেছে তারা মানুষের প্রতি বিশ্বাসের ধ্রুব-নক্ষত্রের দিগ্‌যন্ত্রটিকে। অখণ্ড অন্ধকারের স্রোতে পৃথিবীর লাবণ্য, পৃথিবীর আকর্ষণ, পৃথিবীর স্নেহ-মমতা, আকাঙ্ক্ষা,

আদর্শ সমস্ত যেন ডুবে গেছে একটা গাঢ় নিদ্রা-তমসার গভীর আবর্ত্তের মধ্যে। চিন্তা চাইছে না সাড়া দিতে, মন হয়ে গেছে স্তব্ধ।

সুজাতা ও কানাই বসে' আছে দু'খানা চেয়ারের উপর। মাঝে খানিকটা অন্তরাল। উভয়ে নিমগ্ন রয়েছে আপন চিন্তার মধ্যে। সে চিন্তা একমুখী হ'লেও উভয়ের জীবনের ইতিহাস রচনা করেছে উভয়ের চিন্তাধারায় একটা স্বাভাবিক অন্তরাল। তবু সে চিন্তার ছিল না কোনও ধারা। সে চিন্তা এনেছিল একটা ঘূর্ণির স্তব্ধতা। ঘূর্ণি আপনার মধ্যেই ঘোরে, কিন্তু সে এগোয় না। উভয়েরই মন যেন পড়ে' গেছে একটা ঘূর্ণিতে, হারিয়ে ফেলেছে যেন পায়ের তলার মাটি। এমন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে দু'জনে যে তারা যে পরস্পর কাছাকাছি আছে সে কথাও যেন তারা জানে না। উভয়েই একক, অসঙ্গ, উভয়েরই গতি নিরুদ্দিষ্ট কোন্ অনির্দ্দিষ্ট অভিযানে।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ভেদ হয়ে উঠল আকাশে, যেন ছিন্ন করে' দিলে অন্ধকারের অতলস্পর্শী মোহ। সুজাতা ও কানাই কারুরই এই প্রবৃত্তি ছিল না যে মঞ্জরীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। থেকে থেকে সুজাতার মনে হ'তে লাগল যে কানাই মঞ্জরীর কথায় তার চেয়ে কম অভিভূত হয় নি। মঞ্জরী যদি হ'ত কেবলমাত্র সুজাতার একজন বন্ধু, সে যদি হ'ত তার কাছে অপরিচিত বা ঈষৎ পরিচিতমাত্র, তা হ'লে মঞ্জরীর কথায় কানাই এতটা অভিভূত হ'ত না। তবে প্রভা যে বলেছিল যে কানাই কাউকে ভালবাসে, সে ভালবাসার পাত্রী কি মঞ্জরী? কিন্তু তা কেমন করে' হবে? মঞ্জরী ত ঝুঁকে পড়েছিল সুকুমারের দিকে এবং এ কথাও সে প্রভার কাছে শুনেছে যে মঞ্জরী ও সুকুমারের বিবাহ হবে এ রকম একটা গুজব বেরিয়েছিল। তবে মঞ্জরীর সঙ্গে কানাইয়ের সংঘটন হ'তে পারে কোথায়? তবে কি

মঞ্জরীর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের পূর্ব্ব থেকেই কানাইয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল? কই, সে কথা ত সে কিছু বলে নি। তবে কি সে গোড়াগুড়ি থেকেই নানা রকম চাতুরী করে' এসেছে! এত ভালোবাসা সে যে সুজাতাকে দেখিয়েছে তা কি সবই ছল! আর এত লোক থাকতে সুজাতার বিরুদ্ধেই বা সে কেন এমন একটা মিথ্যা অভিযোগ আন্‌বে! সুজাতা ত কোনও দিন তার কোনও উদ্দেশ্যে বাধা দিতে চেষ্টা করে নি। গ্রেফ্‌তার হওয়ার সময় উপস্থিত ছিল মঞ্জরী, কি করুণ সজল-নেত্রে সে বিদায় দিয়েছিল তাকে সেদিন, আবেগে চেপে ধরেছিল তার দুখানি হাত তার হাতের মধ্যে! এ সমস্তই ছল? তবে এ সংসারে বিশ্বাসের স্থান কোথায়? কোনও মানুষের উপরেই ত তাহ'লে বিশ্বাস রাখা যায় না। মানুষের উপরে যদি বিশ্বাস হারাই তবে সংসারে চলব কি করে'?

কানাই মনে মনে আলোচনা করছিল তার জীবনটা। এই মঞ্জরী তাকে একদিন আকৃষ্ট করেছিল। রূপের মোহে পড়ে' সে আপনাকে ধরা দিয়েছিল মঞ্জরীর হাতে। তার কর্ম্মের জীবন যদি তাকে মুক্ত করে' না দিত, টেনে নিয়ে না আসত প্রশস্ততর গণ্ডীর মধ্যে, তাহ'লে হয় ত সে একটা চাকরীবাকরী জুটিয়ে মঞ্জরীকে নিয়েই চেষ্টা করত সুখের নীড় বাঁধতে। কি কণ্টকশয্যা হ'ত সেই নীড়! নারীর মোহ কি ভয়ানক! বিবাহ করে' ঘর সংসার করার দিকে, কায়েমী হয়ে একটা স্থিরতা লাভের দিকে তার মন বরাবরই ছিল বিমুখ। যৌবনধর্ম্মে সে আকৃষ্ট হয়েছিল মঞ্জরীর দিকে। কোন্ ঘূর্ণিতে সে আপনাকে ফেলত হারিয়ে! সে ভাবতে লাগল তার ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার গতির কথা। তার মনে হ'ল সমস্ত পথের দ্বন্দ্ব তার গিয়েছে মিটে, শুধু একটি মাত্র পথ আছে তার কাছে মুক্ত, সেটা ধর্ম্মের

পথ।, রাজনৈতিক জীবনের যে অল্প আস্বাদ ঘটেছিল তার জীবনে, পরে সে দেখেছে যে তার প্রকৃতিতে সে পথে চলা তার অসম্ভব। একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সেখানে যত অন্যায়ের সঙ্গে করতে হয় সন্ধি, অধর্ম্মকে বরণ করে' নিতে হয় আত্মীয় বলে'। যুদ্ধ যে কেবল করতে হয় রাজশক্তির সঙ্গে তা নয়, যুদ্ধ করতে হয় রাজনৈতিক দলের নানা নেতার ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে। এই যুদ্ধে একটা দলকে অনুসরণ করে' আর সেই দলের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য নিজের বিবেক বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়ে যদি যুদ্ধ করা যায় রাজশক্তির জন্য, আর রাজশক্তির কাছে যদি বারংবার হওয়া যায় নিগৃহীত তবে পাওয়া যায় একটা দিগ্‌জোড়া বাহবা। এই রাজশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে যদি কোনদিন কোন সুফল ঘটে তবে তা ঘটবে সমগ্র ইতিহাসের গতিতে। সে ইতিহাসের মধ্যে ব্যক্তিগত দান কতটুকু তা খতিয়ে দেখা অসম্ভব। জীবন ভরে' যেতে হবে একদিকে যুদ্ধ করে', অপর দিকে অন্যায় অসত্যকে প্রশ্রয় দিয়ে। কোন সময়ে পাবে দেশের বাহবা, কোন সময়ে পাবে দেশের নিন্দা। কিন্তু সমস্ত জড়িয়ে কি ফল যে লাভ করতে পারবে সে সম্বন্ধে কোন আশা নেই। বাইরের চাটু বচনের প্রতি, যশের প্রতি, খ্যাতির প্রতি তার কোন দুর্দ্দমনীয় লোভ ছিল না। তার লোভ ছিল যে ন্যায় ও ধর্ম্মের পথে, সত্যের পথে, কর্ম্মের পথে ও সাফল্যের পথে সে আপনাকে দেবে অগ্রসর করে'। তাই তার মনে হ'ল যে কাজ সে আরম্ভ করেছে যদিও তার প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পূর্ণ ঐক্য নেই তবুও সেই পথই হচ্ছে একমাত্র পথ, যা সে অবলম্বন করতে পারে। তার জন্য একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে এই ল্যাবরেটরীকে বাঁচিয়ে রাখা এবং বাড়িয়ে তোলা।

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'ল সুজাতার কথা। বিপুল ধনের সে

অধিকারিণী, তথাপি সমস্ত ধন ভোগের মায়া ত্যাগ করে' সে নেমে এসেছে কর্ম্মের পথে, সাধনার পথে। মনে হ'ল অধ্যাপকের প্রতি তার কি বিচিত্র অনুরাগ, কি তার সেবা, কি তার যত্ন! মনে হ'ল কত স্বচ্ছন্দে, কত সহজে সে অধ্যাপকের নিকট আত্মনিবেদন করে' দিয়েছে! তাঁর ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে, তাঁর পূজা ও শ্রদ্ধার আকর্ষণে সে স্বীকার করেছিল যে তার সর্ব্বস্ব দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে এ বিদ্যা-মন্দিরটিকে। কি মহৎ তার চরিত্র, কি মহৎ তার আদর্শ! সঙ্গে সঙ্গে আবার এলো মনে মঞ্জরীব কথা। বিতৃষ্ণা ও ক্ষোভে তার সমস্ত হৃদয় গেল ভরে'। আবার তার মনে হ'ল, কেন মঞ্জরী করতে গেল এমন কাজ! কেন বন্ধুর বিরুদ্ধে আনতে গেল অভিযোগ! সুজাতার জীবনের কোন পূর্ব্ব ইতিহাস সে জানত না, এবং পরের সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তার ছিল না। মঞ্জরীকে লক্ষ্য করে' একটা ধিক্কার উঠতে লাগল তার মনে। মুহূর্ত্তে যেন তার সমস্ত নাড়ীর টান গেল শিথিল হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আবার সজীব হয়ে এল, জ্যোতির্ম্ময়ী হয়ে উঠল সুজাতার ছবিটি। নরনারীগত যৌবনের আকর্ষণ তাকে টানতে পারল না সুজাতার দিকে, তার চরিত্র যেন মহনীয় হয়ে উঠল দেবীমণ্ডপের সিংহাসনে। সে আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজেকে মনে করল যেন সে দাঁড়িয়ে আছে ভক্ত পূজারীর ন্যায় কোন দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে। ত্যাগে, সেবায়, কমনীয়তায়, বিদ্যানুরাগিতায়, পুণ্যপ্রোদ্ভাসিত হয়ে উঠল সুজাতার মুখখানি তার হৃদয়ের মধ্যে। সে তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে জ্যোৎস্নার আলোকে ঝল্‌মল্ করে' উঠেছে যেন সে মূর্ত্তি পুণ্যের জ্যোতিতে, শ্রদ্ধায় হৃদয় যেন তার নত!

সুজাতা কানাইকে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি রাত্রে কিছু খাবেন না?"

কানাই জিজ্ঞাসা করলে সুজাতাকে—"আপনি ?"

সুজাতা বল্‌লে—"আমার কোন ক্ষুধা নেই।"

কানাই বল্‌লে—"আমারও তাই।"

সুজাতা বল্‌লে—"তা কি হয় ?" এই কথা বলে'ই সুজাতা উঠ্‌ল তার আসন থেকে। কানাইয়ের ইচ্ছা যে তাকে ধরে' বসায় কিন্তু সে একটি কথাও বলতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে সুজাতা সঙ্গে যে খাবার এনেছিল তা পরিবেশন করে' আনল একটি প্লেটে, সম্মুখস্থ টেবিলে রাখলে সেই খাবার ও জল এবং কাছে এসে এমন স্নিগ্ধভাবে তাকে ভোজন করতে অনুরোধ করলে যে তার কথায় বাধা দিতে তার সামর্থ্য হ'ল না : তার যেন মনে হ'ল যে তার আজ্ঞা প্রতিপালন করা ছাড়া তার আর কিছু করণীয় নেই। নারীর স্নেহের কাছে পুরুষ স্বভাবতঃই হয়ে আসে শিশুর মত। নারীর মধ্যে রয়েছেন চিরন্তনী জননী, তিনি যখন করেন আত্মপ্রকাশ, বিশ্বের নরশক্তির তাণ্ডব যায় থেমে, মানুষ শিশুর ন্যায় পালন করে তাঁর আজ্ঞা।

আবার দু'জনে বসল পাশাপাশি। জ্যোৎস্নায় তখন প্লাবন দিয়েছে সমস্ত নদীর বক্ষের উপর। ছোট ছোট ঢেউ ঝিক্‌মিক্ করে' সর্পিল হয়ে ছুটে চলেছে কূলের দিকে। পানা ও শেওলা কোন বিল থেকে এসে ভেসে চলেছে নদীর বুক দিয়ে। কত জায়গায় ছোট ছোট খালের মধ্য দিয়ে জলের স্রোত বয়ে গিয়েছে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে কদলী-নারিকেল-কুঞ্জ-বেষ্টিত পল্লীভবনের দিকে। তটবর্ত্তী গুবাক-নারিকেলের পত্ররাজি বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। ঝরে' পড়ছে যেন তাদের পত্রগুলির মধ্য দিয়ে রূপালি জ্যোৎস্নার ধারা। জেলেরা বেরিয়েছে তাদের মাছের নৌকা নিয়ে, ঢেউয়ের সঙ্গে দোল খেয়ে ফিরছে তাদের লঘুভার নৌকাগুলো। এখানে সেখানে সার্চ্চ

লাইট পড়ে' নানাস্থানে উন্মুক্ত করছে জ্যোতির উদ্ভাস। চিরপরিচিত মাটির ধরণী যেন বাস্তব ও কল্পনার রঙীন সূত্রে পরিধান করেছে একটা নূতন পরিচ্ছদ। বাস্তব যেন মিলিত হচ্ছে কল্পনায়, কল্পনা যেন আলোক পাচ্ছে বাস্তবে।

সুজাতা বল্লে—"কি সুন্দর এই রাত্রি!"

কানাই বল্লে—"আলো ও আঁধারে মেশানো মানুষের হৃদয়খানি যেন মূর্ত্তি নিয়ে নেমে এসেছে বাইরের জগতে।"

সুজাতা বল্লে—"আঁধার ও আলো এই দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বড় সত্য বলতে পারেন।"

কানাই বল্লে—"যেখানে আমরা আমাদের খুঁজে পাই সেই আমাদের কাছে বড সত্য। আঁধারে ফেলি আমরা আমাদের হারিয়ে, আমাদের বুদ্ধির বিলুপ্ত হয় প্রেরণা, তাই আলোই আমাদের কাছে বড় সত্য।"

সুজাতা বল্লে—"কিন্তু আঁধার যখন ফেলে আপনাকে ঢেকে?"

কানাই বল্লে—"তখন এই কথাই বিশ্বাস করে' থাক্‌তে হবে যে এমন একদিন আসবেই যেদিন আঁধারেব বুক চিরে বেরিয়ে আসবে আলো।"

সুজাতা বল্লে—"কোন্‌টা নিছক কল্পনা আর কোন্‌টা সত্য তা কে নির্ণয় করতে পারে? যে কল্পনা আপনাকে সফল করে' কার্য্যের মধ্যে এনে দেয় সত্যকে আমাদের মুঠোর মধ্যে সেই কল্পনাকেই আমরা বলব সত্য।"

সুজাতা জিজ্ঞাসা করলে—"সত্য বলে' কি স্থির কিছু নেই?"

কানাই বল্লে—"এটা হ'ল একেবারে তত্ত্বশাস্ত্র বা Metaphysics-এর আলোচনা। আমার সে বিষয়ে কিছু জ্ঞান নেই, আমি বুঝি যে

মানুষ আপনাকে নিয়ে এবং বাহ্যজগৎকে নিয়ে এবং মনুষ্য-সমাজকে নিয়ে গড়ে তার আপন সত্য। সে সত্যের পরিচয় পায় সে তার আপন চাওয়ার প্রাপ্তিতে।”

সুজাতা বল্‌লে—“চাওয়ার ত কোন শেষ নেই।”

কানাই বল্‌লে—“পাওয়ারও ত কোন শেষ নেই। চাওয়া আপনাকে ব্যক্ত করে পাওয়ার মধ্যে এবং পাওয়া আপনাকে ব্যক্ত করে চাওয়ার মধ্যে।”

সুজাতা বল্‌লে—“এর মধ্যে বেশী কম নেই ?”

কানাই বল্‌লে—“বেশী কম নির্ভর করে চাওয়ার রকমের উপর। যে রকম যে চায় সে রকম না পেলে তার হাজার গুণ অন্যদিকে পেলেও তার পাওয়া হয় না। তা তার পক্ষে হয় অসত্য।”

কানাইয়ের মনে হ'ল সেই প্রথম দিন সুজাতার সঙ্গে চায়ের টেবিলের আলাপ। কত প্রশ্ন সে করেছিল সে তাকে সেদিন। আজও আবার সেই প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জন্য প্রশ্ন নয়, তর্কের খাতিরে প্রশ্ন নয়, এ জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন।

সুজাতা বল্‌লে—“নদীর জল চলেছে ছুটে সাগরের দিকে, খালের জল চলেছে ছুটে পল্লীভবনের দিকে। সেখানে সে উৎপন্ন করবে ফসল, তাকে দিয়ে চলবে পানাবগাহনের কাজ। আর নদীর জল চলেছে নিরর্থক বয়ে তার বইবার আনন্দে। আলোছায়া খেলে' যাচ্ছে তার বুকের উপর, তার গ্রাহ্য নেই। সে চলেছে সাগর-সঙ্গমের পুণ্যতীর্থে। এদের মধ্যে কার পাওয়া বেশী ? যে পাখী বাঁধে নীড় সেই কি বেশী পায়, না যে পাখী নিরন্তর ডানার ছন্দে উড়ে চলে মানস সরোবরের দিকে সেই পায় বেশী ?

কানাই বল্‌লে—"আমার জবাব ত আপনাকে দিয়েছি। যার যেমন চাওয়া তেমনি তার পাওয়া। যে বাঁধতে চায় নীড় তার নীড় বাঁধাতেই আনন্দ, সেই পাওয়াকেই সে চেনে। যে খাল বয়ে যায় গ্রামের মধ্য দিয়ে তরুণীরা স্নান করে তার ঘাটে বসে' কলসী ভাসিয়ে দিয়ে, বৃদ্ধারা করে তটে বসে' গল্প, ছেলেরা খেলে তার পারে ঘুটিং, ব্রাহ্মণ করে তার জলে স্নানাহ্নিক, তরুণেরা কাটে সাঁতার, বকুল ফুল ঝরে' পড়ে তার পারে, বৃদ্ধ বট ফেলে তার ছায়া, আমের গাছে ধরে রসাল ফল, নারিকেলের কুঞ্জ দোলায় সেখানে তার শাখা, সেই ভোগেই খালের জলের আনন্দ, কিন্তু পদ্মার জল ছোটে তার বিপুল জলরাশি নিয়ে কল কল বাহিনী হয়ে, তার ভোগ হচ্ছে সমুদ্রের দিকে ছুটে যাওয়া।"

সুজাতা আবার বল্‌লে—"কিন্তু দুটো চাওয়াই তো উঁকি দিতে পারে কারুর হৃদয় মধ্যে ?"

কানাই বল্‌লে—"সেখানেই আসতে পারে বিপদ ও বিফলতার পরিহাস।"

সুজাতা বল্‌লে—"সেখানে কর্ত্তব্য কি ?"

কানাই বল্‌লে—"তখনই তার চাওয়া হবে সার্থক যখন সে তার ছোট চাওয়াটাকে মিলিয়ে দিতে পারবে তার বড় চাওয়ার মধ্যে। জোয়ারের জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে বটে খাল, কিন্তু ভাঁটা এসে নিঃশেষ করে' দেয় তার জল বিশাল নদীর গর্ভে। এমনি করে' নিঃশেষ করে' দিতে পারে বলে'ই খাল পূর্ণ করতে পারে তার বড় চাওয়াটাকে। আমাদের ছোট ছোট সুখ, ছোট ছোট আকাঙ্খা ঝক্‌মক্ করে' ওঠে তাদের নানা রঙে, কিন্তু তারা তাদের পূর্ণতা পায় যখন তারা মিলে যায় রবির কিরণের মধ্যে। তেমনি আমাদের ছোট ছোট খালকে মিশিয়ে

দিতে হবে নদীর মহাস্রোতে, যদি মহাপ্রবাহে কল্‌কল্‌ করে' ওঠে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এই মহাস্রোতের রাগিনী।"

সুজাতা আবার বল্লে—"তবু ত ছোটর প্রতি আমাদের দরদ কম নয়।"

কানাই বল্লে—"কিন্তু মহাস্রোত না থাক্‌লে ছোট স্রোতই বা জায়গা পাবে কোথায়! মহাপ্রবাহের সঙ্গে যোগ থাক্‌লে ঢেলে ত দিতেই হবে সব জল তার মুখে।"

সুজাতা আবার জিজ্ঞাসা করলে—"আমাদের জীবনে নানা সময়ে নানা দাবী ওঠে। সেগুলির মধ্যে কি একটা সামঞ্জস্য সব সময়ই থাকে?"

কানাই বল্লে—"সব সময়েই যে থাকে এ কথা বলা যায় না। জীবনের প্রথম প্রান্তে যেটা সব চেয়ে বড় দাবী হয়ে ওঠে, জীবনের শেষ প্রান্তে হয় ত সেটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিংবা হয় ত আসে ঠিক তার উল্‌টো রকমের দাবী। খালে যখন জোয়ারের টান আসে সে জল ক্রমশঃ ছুটতে থাকে খালের বক্ষ পূর্ণ করে' ভিতরের দিকে। সমুদ্রে ওঠে প্লাবন, নদীর বুকের মধ্য দিয়ে সে পূর্ণ করে' তোলে খাল বিল। আবার এক সময়ে এই জল স্থির হয়ে যায়, দ্বিধাগ্রস্ত হয় তার পূর্ব্ব গতির দিকে। তারপর সেই খালের জল আবার ফিরে ছোটে নদীর দিকে, নিঃশেষ-প্রায় করে' দেয় নদীর বুকে, নদীর জল ছুটে চলে সাগরের দিকে তার ভাঁটার টানে।"

সুজাতা আবার প্রশ্ন করলে—"খাল বা নদীর মধ্যে ত দুটো গতিই চল্‌ছে সমান তালে এবং তাইতে সার্থক হচ্ছে তার প্রবাহ।"

কানাই বল্লে—"সর্ব্বত্রই যে সে প্রবাহ এই রকম হয় তা নয়।"

সুজাতা বল্লে—"কি রকম?"

কানাই বল্লে—"হরিদ্বার থেকে যে ভাগীরথী নেমে আস্‌ছেন তিনি ত আর ফিরে যান না। আদিমকালে ভগীরথ যখন তাঁকে শঙ্খ বাজিয়ে এনেছিলেন আজও তিনি চলেছেন তেমনি কলকলবাহিনী হয়ে একটানা স্রোতে—তাতে জোয়ার-ভাঁটা নেই।"

সুজাতা আবার জিজ্ঞাসা করলে—"এ দুটো উপমা দ্বারা আপনি কি বল্‌তে চান ?''

কানাই বল্লে—"আমি বলি এ কথা যে সকলের জীবনের প্রবাহ এক রকমে বয় না। কারুর জীবন চলে একটানা বয়ে মহাসাগরের উদ্দেশে, তার দ্বিধা নেই, বাধা নেই, বিরাম নেই। কারুর চিত্তনদী বা উভয়ত বাহিনী হয়ে ছোটে সাগরের দিকে, ছোটে গ্রামের দিকে, কোন দিকেই পারে না আপনাকে নিঃশেষ করে দিতে। কোনও স্রোত বা বাঁধা পড়ে গিয়ে পুকুরের মধ্যে, হয়ত সেখানেও কোনও প্রণালী দিয়ে যোগ থাকে বাইরের নদীর সঙ্গে, ভিতরে ভিতরে একটু অনুভব করে জোয়ার-ভাঁটা। কোনও জল বা একেবারে বাঁধা পড়ে' যায় চারটি পাড়ের মধ্যে—সেখান থেকে বের হবার তার অবকাশ থাকে না।''

সুজাতা বল্লে—"আমি ত দেখছি তাহ'লে যত দুঃখ তা কেবল খালের জলেরই, পূর্ণ হওয়াতেও তার তৃপ্তি নেই, রিক্ত হওয়াতেও তার তৃপ্তি নেই। তাকে কেবল ছুটতে হয় দোটানায়।''

কানাই বল্লে—"এই দোটানায় ছোটে বলেই থাকে তার পবিত্রতা, নইলে তার প্রবাহে জলের এত বিশালতা নেই যে নিরন্তর সাগরে ছুটে গিয়েও থাক্‌বে তার পূর্ণতা, এমন স্বাভাবিক পবিত্রতা নেই যে কিছুতে পারবে না তাকে মলিন করতে। হিমালয় থেকে যে গঙ্গা ছুটে আসে, নানা শাখা নদীকে সে দেয় আশ্রয় আপন বুকে। তাদের

গতি থাকে বিভিন্ন, কিন্তু সে সমস্ত গতিকে সে পূর্ণ করে আপন মহাযাত্রার মধ্যে। তেমনি কারুর জীবনের মহাস্রোত হয় ত বয়ে পড়ে যোগীশ্বরের মহা জটাবন্ধ থেকে, তার পবিত্রতা এত পূর্ণ, তার উচ্ছ্বাস এত গভীর যে সে কেবল যে আপন গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয় না তা নয়, সে আরও দশটি ধারাকে সঙ্গে করে' নিয়ে যায় আপন সঙ্গে। সে তাদের সহযাত্রী নয়, সে তাদের আশ্রয়। এই রকম এক একটি ধারা পৃথিবীতে এখনও আছে বলে' পৃথিবী এখনও রয়েছেন শস্যপূর্ণ ও শ্যামল।"

সুজাতা রইল নীরব হয়ে, ফেল্‌লে একটি দীর্ঘশ্বাস। হয় ত বা তার অন্তঃকরণে কোন্ গভীর প্রদেশে কি একটা পণ দৃঢ় হয়ে উঠ্‌ল, জীবনের কি একটা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হয়ত বা সে উঠ্‌ল সচেতন হয়ে।

কিছুক্ষণ রইল উভয়েই নিস্তব্ধ। পরে সুজাতা বল্লে—"আপনি একটু শোবেন না?"

কানাই একটু হেসে বল্লে—"ও কাজটা ত আপনিও সার্‌লে পারতেন। প্রভাতের আর বড় দেরী নেই, শুকতারা অনেকক্ষণ হয় দেখা দিয়েছে আকাশে। ঝালকাঠির বাঁকও দেখ্‌ছি সামনে, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা বরিশালে এসে পড়ব। যান বরং আপনি আসুন একটু গড়াগড়ি দিয়ে। আমি এখানে একটু চেয়ারে এলিয়ে পড়ি।"

সুজাতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, নিঃশব্দে উঠে গেল তার কেবিনে।

ঘণ্টাদুয়েক পরে তারা নামল বরিশালে। আশ্রয় নিল ডাক বাংলায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বেলা প্রায় ৮৷৷টা ৯টার সময় উপস্থিত হ'ল তারা Kempis সাহেবের বাংলায়। Kempis সাহেব তখন সবেমাত্র রাশীকৃত পরিজ, ডিম্ব ও আধ ডজন রুটি-টোষ্ট গলাধঃ-

করণ করে' চা পান শেষ করেছেন। ইংরেজ বা আইরিশ্‌দের প্রাত-র্ভোজনেই তাদের বৈশিষ্ট্য। ভোজনান্তে প্রসন্ন মনে একটি হাফ্‌ প্যাণ্ট ও টুইলের কামিজ পরে' যখন Kempis সাহেব বসে' আছেন তাঁর বসবার ঘরে তখন কানাই পাঠিয়ে দিলে তার কার্ড। সাহেব কার্ড দেখে কিছু বুঝ্‌তে পারলেন না। চাপরাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোন্‌ হ্যায় ?"

চাপরাসী বল্লে—"মালুম নেহি হুজুর, কভি দেখা নহি। একঠো বাবু হ্যায় আউর একঠো আউরৎ উন্‌কো সাথ্‌ হ্যায়।"

সাহেব বল্লেন—"সেলাম দেও।"

কানাই ও সুজাতা প্রবেশ কর্‌ল সাহেবের ঘরে। সুজাতাকে দেখে' সাহেব চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, কানাইয়ের দিকে একটু তীব্র দৃষ্টি করে' তারপরে হো-হো করে' হেসে উঠলেন। বল্‌লেন—"Are you not the same chemist who brought down eight of my Police officers ?"

কানাই বল্লে—"Yes,. Sir."

সাহেব বল্লেন—"Good morning. Very glad to meet you again."

সুজাতার দিকে সাহেব দৃষ্টিপাত করতেই কানাই বল্লে—"এঁর নাম সুজাতা দেবী।"

সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"ইনি কি সেই মহিলা যাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি পুলিশের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পড়েছিলে ?"

কানাই একটু হেসে বল্লে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, এখন আমরা এক বিদ্যা-মন্দিরে গবেষণা কাজে লিপ্ত আছি। ইনি বিজ্ঞানে এম্‌-এস-সিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছেন।"

সাহেব আবার হেসে বল্লেন—"By Jove, you are going to be comrades in life!" এ কথা বলে'ই স্থজাতাকে নমস্কার করলেন। স্থজাতা প্রতিনমস্কার করলে দু'খানা চেয়ারে দু'জনকে বসিয়ে নিজে বসে' বল্লেন—"তোমরা চা খেয়ে এসেছ না চা খাবে?"

কানাই বল্লে—"ধন্যবাদ, আমরা চা খেয়ে এসেছি।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—"তারপর বল ত তোমরা এখানে এসেছ কেন? কি আমি তোমাদের জন্য কর্‌তে পারি?"

কানাই তখন বিদ্যামন্দির ঘটিত সমস্ত কথা, অধ্যাপকের কথা সাহেবকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলে।

সাহেব অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করে' বল্লেন—"এ রকম ব্যাপার এদেশে আছে বলে' ত আমি জানি না। আমি আর একটু বিশদ করে' জান্‌তে চাই।"

কানাই বল্লে—"বিশদ করে' জানাতে পারবেন স্থজাতা দেবী।"

সাহেব একটু বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চাইলেন। স্থজাতা তার কাগজপত্র টেবিলের উপরে খুলে বস্‌লে। সাহেব এসে বসলেন একটা চেয়ারে টেবিলের ধারে। স্থজাতা প্রথম খুল্‌লে বিদ্যামন্দিরের প্ল্যান। কোথায় লাইব্রেরী, কোথায় Laboratory, কোথায় কি কাজ হয়, কোথায় তারা থাকে, কোথায় অধ্যাপকের বাসগৃহ, কানাইয়ের বাস-গৃহ, কি কি জাতীয় গবেষণা হচ্ছে, পাঠাগার কি রকম, কি কি বিষয়ের কত বই আছে, বর্ষে বর্ষে কোন্ কোন্ বিষয়ে কোন্ কোন্ গবেষণা সিদ্ধিলাভ করেছে, ভবিষ্যতে এই বিদ্যামন্দির বাড়াবার কি কি প্ল্যান আছে, কোন্ কোন্ যন্ত্রের অভাব আছে, সমস্ত বিষয় এমন স্থন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে' সে এনেছিল যে সাহেব অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা আয়ত্ত করে' ফেললেন। পঠদ্দশায় তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন এবং

এসব বিষয়ে তাঁর কৌতূহলও ছিল যথেষ্ট। সাহেব সমস্ত দেখে' অত্যন্ত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হ'লেন। বল্লেন—"এ সব বিষয়ে এ রকম কাজ করার লোক যে এদেশে থাকতে পারে তা আমার মনেই হয় না।"

সুজাতা স্মিতহাস্যে বল্লে—"আপনারা এদেশের কতটুকু খবর রাখেন, বিশেষতঃ জ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে ?"

সাহেব একটু লজ্জিত হয়ে বল্লেন—"তা ঠিক, তা ঠিক।"

তার পরে সুজাতা খুলে বস্‌লে আয় ব্যয়ের হিসাব এবং তারপর সাহেবকে বুঝিয়ে দিলে কি রকম কৌশল ও চক্রান্ত করে' জগবন্ধু রায় বরিশালের সমস্ত জমিদারীটা গিলে খাবার ব্যবস্থা করছে। সাহেব সমস্ত দেখে' শুনে একেবারে ক্ষেপে' উঠলেন। বল্লেন যে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান একটি লোক লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে গড়ে' তুলেছে আর তা নষ্ট করতে বসেছে এই রকম একটা হতভাগা লোক। তিনি তারপর বল্লেন—"Leave it with me. I shall make him disgorge everything even if I have to kick his bloated stomach."

কাগজপত্রগুলো রেখে দিয়ে সাহেব বল্লেন যে পরে সমস্ত ঠিক করে' কাগজপত্র সমস্ত রেজেষ্ট্রী করে' ফেরৎ পাঠাবেন। তিনি আরও বল্লেন যে এ রকম কাজে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য করা উচিত এবং যদিও এটা তাঁর এলাকার মধ্যে নয় তথাপি তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন যাতে গভর্ণমেণ্ট এ বিদ্যামন্দিরকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারেন। উভয়কে বিদায় দেওয়ার সময় সাহেব উভয়ের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন—"I hope both of you will work as comrades for the maintenance of this institution in future—that will be a great thing. Good luck."

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সুজাতা বরিশাল থেকে চলে' এসেছে। তারপর অনেকদিন কেটেছে। সুজাতা তার গবেষণার কাজে নিযুক্ত আছে বটে, কিন্তু আর একটা বড় দায়িত্ব পড়েছে তার ঘাড়ে। সে কাজটি বিদ্যামন্দিরের আভ্যন্তরিক পরিচালনা। সে কায়েমী করে' গেড়েছে তার অফিস অধ্যাপকের অফিস-ঘরের মধ্যে এবং বিদ্যামন্দিরের ভিতরকার সমস্ত কাজের ভার আপনার উপর নিয়ে অধ্যাপককে রেহাই দিয়েছে এবং তাঁকে তাঁর নিজের কাজে নিমগ্ন হওয়ার অবসর দিয়েছে। সর্ব্বদা তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে অধ্যাপকের যত্নের যাতে কোনও ত্রুটি না হয়। তাঁর পিছনে দিয়েছে স্বতন্ত্রভাবে লোক নিযুক্ত করে' এবং তাদের প্রত্যেকের কাজ সে নিজে পর্য্যবেক্ষণ করে। কি রান্না হবে, কেমন-ভাবে রান্না হবে, এ সমস্ত বিষয় সে নিজেই দেখে এবং প্রতিবার খাওয়ার সময় নিজে বসে' থেকে খাওয়ায়। বিশ্রামের যাতে কোনও বিঘ্ন না হয় এ বিষয়ে তার দৃষ্টি অতি সজাগ। তারপর অনেক সময় সে গিয়ে অধ্যাপকের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে, নানা উপদেশ গ্রহণ করে ও আপন স্নেহে তাঁর বার্দ্ধক্যের অনাদৃত পটভূমিকা উজ্জ্বল করে' দেয়। তা ছাড়া সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব সে রাখে, সমস্ত বিদ্যামন্দির যাতে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে, গ্রন্থগুলি যাতে সর্ব্বদা সুপরিষ্কৃত হয়, সে বিষয়ে তার দৃষ্টির শৈথিল্য নেই। যাঁরা বেতনভুক্ গবেষক আছেন তাঁরা কোথায় কি কাজ করছেন, কাজে কোনও অবহেলা হচ্ছে কিনা, সে সকল বিষয়েও তার যত্ন ও পরিশ্রমের অভাব নেই। তার ব্যবস্থা সুন্দর ও ব্যবহার এত কোমল যে অতি সহজেই সে সকলের হৃদয় জয় করেছে। তাকে খুসী করবার জন্য সকলেরই

যেন সর্ব্বদা একটা ঐকান্তিক আগ্রহ রয়েছে। সর্ব্বত্র সে স্বচ্ছন্দগতি, সকলের সঙ্গে সে মেশে অনায়াসে। তার নিজের উৎসাহের স্রোত সে অনুপ্রেরিত করে' দিয়েছে বিদ্যামন্দিরের তুচ্ছতম অংশ পর্য্যন্ত। হৃদয় থেকে যেমন রক্তস্রোত সর্ব্বদা অনুপ্লাবিত করতে থাকে দেহের সমস্ত অংশ, তেমনি সুজাতার প্রাণস্রোত, তার হৃদয়ের ভালবাসা সমস্ত বিদ্যামন্দিরকে অনুপ্লাবিত করে' সঞ্জীবিত করে' তুলেছিল। কানাইয়ের সঙ্গে সর্ব্বদাই তার দেখা হ'ত, অনেক আলাপ আলোচনা হ'ত, কিন্তু সে সমস্তই বিদ্যামন্দিরকে অবলম্বন করে'। উভয়ের মেশামিশিতে এখন আর কোনও বাধা নেই, কোনও আড়ষ্টতা নেই, কোনও স্ত্রীপুরুষগত সঙ্কোচ নেই। একজাতীয় দু'টি বন্ধুর মত দু'জনে পরস্পর মিশত। এই মেশার মূলকেন্দ্র ছিল অধ্যাপক এবং বিদ্যা-মন্দির। কানাই যে কেবল নিজের গবেষণা নিয়েই থাকত তা নয়, অন্য সকলের রাসায়নিক গবেষণা সে সর্ব্বদাই পরিদর্শন করত এবং তাদের সাহায্য কবত ও উপদেশ দিত। কানাই যে চিরকালই এই গবেষণা নিয়ে থাকবে এ বিষয়ে সে কারুর কাছে কোন প্রতিজ্ঞা করে নি, বা সুজাতাও তাকে সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। কিন্তু সে এমন প্রসন্নভাবে কাজ করে' চলেছিল যে সে যে কখনও এ বিদ্যা-মন্দির ছেড়ে যেতে পারে এ কথা কারও মনে কখনও উদয় হয় নি।

নানা কাজে মানুষ নানা সময়ে লাগে নানারকম প্রয়োজন বা প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং কাজ করতে করতে অনুভব করে সেই কাজের সরণির মধ্য দিয়ে তার সমস্ত প্রবৃত্তির স্রোত, তার আকাঙ্ক্ষার গতি আপন উদ্দেশ্যের দিকে প্রবাহিত হ'তে পারছে কিনা। সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায় যে তাদের সমস্ত কাজের গোড়ায় রয়েছে কতকগুলি মৌলিক প্রবৃত্তি। ইতর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে যথেষ্ট পরিমাণে

বুদ্ধিবৃত্তি না থাকলেও এই মৌলিক প্রবৃত্তিগুলি একদিকে প্রযুক্ত হয় তাদের বাইরের উদ্দেশ্যের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে সেই প্রবৃত্তিগুলি সেই উদ্দেশ্য—সিদ্ধির পথও পারে খুঁজে নিতে। আহার অন্বেষণ, বাসা বাঁধা, অন্য প্রাণীদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচানো, সন্তানদের লালনপালন করা প্রভৃতি সমস্ত কাজই ইতর প্রাণীরা সুসম্পন্ন করতে পারে তাদের প্রবৃত্তির স্বাভাবিক অনুপ্রেরণায়। ইতর প্রাণীদের মধ্যে এই প্রবৃত্তিপুঞ্জের একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে একদিকে আছে বুদ্ধি আর একদিকে আছে প্রবৃত্তি। এই বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির মধ্যে একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্য নেই। এই জন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক মানুষ কোনও প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে সে হয় ত এমন-ভাবে জীবনযাত্রা অনেক সময় সমাধা করতে পারে না যাতে তার সমস্ত প্রবৃত্তির আক্রন্দন মিটে যেতে পারে এবং সামাজিক ব্যবস্থাও সকল সময় তার পক্ষে হয় ত অনুকূল হয় না। হয় ত কারও মনে ধনার্জ্জন ও বিদ্যার্জ্জনের উভয় আকাঙ্ক্ষাই রয়েছে। সে যদি এমন সময় পাটের ব্যবসা খুলে দেয় তাতে হয় ত সে প্রচুর অর্থ পেতে পারে তবু হয় ত সে বিদ্যার অভাবে জীবনটা ব্যর্থ মনে করতে পারে। সমস্ত জীবন ভরে' থাকবে তার এই ব্যর্থতার বোধ, হৃদয়ে সে পাবে না কখনও তৃপ্তি। যতই অর্থ সে উপার্জ্জন করুক না কেন, তার মনে সে কোন আনন্দ পাবে না। তাই যখন দেখা যায় যে মানুষ কোনও কাজে লেগে প্রসন্নভাবে সেই কাজে দিয়েছে তার মন ঢেলে, কোনও অভাব বা দৈন্যের বোধ তাকে নিপীড়িত করছে না, তখন বুঝতে হবে যে সে তার কর্ম্মের মধ্যে আপন প্রবৃত্তিপুঞ্জের যথার্থ মুক্তি পেয়েছে। এই জন্যই একথা বলা যেতে পারত যে কানাই বিদ্যা-মন্দিরের মধ্যে অধ্যাপক ও সুজাতার সান্নিধ্যে খুঁজে পেয়েছিল তার

জীবনের যথার্থ পথ। অধ্যাপকের নিকট সে পেত উপদেশ ও উৎসাহ, তার আপন গবেষণার কাজের মধ্যে সে প্রবাহিত করতে পারত তার কর্ম্মশক্তির স্রোত, ব্যায়ামচর্চ্চার মধ্যে হ'ত তার দেহের অনুশীলন এবং হৃদয়ের স্নিগ্ধ অনুলেপের অভাব তার মোচন হ'ত সুজাতার সুস্নিগ্ধ বন্ধুতায়। সে বন্ধুতা তাকে সুরার ন্যায় উত্তেজিত করত না, তা তাকে এনে দিত দুগ্ধের বল। পুরুষের মধ্যে নারীসঙ্গের যে একটা ক্ষুধা আছে সে ক্ষুধার নিবৃত্তি যে কেবল স্থূল উপায়েই ঘটতে পারে তা নয়, রসান্তরে পরিণত হয়ে একটি গাঢ় স্নেহরসের মধ্যে মানুষের সেই ক্ষুধা শান্ত হয়ে যেতে পারে। দেহের উপাধি থেকে মুক্তিলাভ করলে এই গাঢ় স্নেহরসটি তার সমগ্র পবিত্রতার সঙ্গে হৃদয়কে অনুষিক্ত করে' দিতে পারে, আপ্লাবিত করে' দিতে পারে আমাদের অন্তর্ভূমির সমস্ত সম্পদ। তাই কানাই চলেছিল হৃষ্টমনে, নিবিষ্ট করেছিল আপনাকে তার কাজের প্রেরণায়। অধ্যাপক ও সুজাতাকে কেন্দ্র করে' তার যে গতির আবর্ত্ত সৃষ্ট হয়েছিল, সেখান থেকে চ্যুত হওয়ার আর যেন কোনও আশঙ্কা ছিল না।

পুত্রের ন্যায় বাৎসল্য জন্মেছিল সুজাতার অধ্যাপকের উপর। পিতার ন্যায় ভক্তি করত সে তাঁকে এবং জীবনে সব চেয়ে বেশী যাকে শ্রদ্ধা করত, সেই কানাই ছিল তার সহকর্ম্মী হয়ে। কাজেই, সুজাতার জীবনস্রোত নির্দ্বন্দ্বে ছুটে চলেছিল আপন কর্ম্মপথে, যেমন ছুটে চলে ভাগীরথীর রসধারা হিমালয়ের শৈলসানু থেকে। এ একটানা স্রোত, এর ভাঁটাও নেই, জোয়ারও নেই। পবিত্র প্রেম ও উৎসাহের উৎস থেকে এ সর্ব্বদাই হ'ত পরিপূর্ণ।

প্রভা আসত মধ্যে মধ্যে সুজাতার কাছে। প্রভার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। রঞ্জন এম্-এ পাশ করে' বেকার হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে

চাকরী। প্রভারও পরীক্ষার পড়া শেষ হয়েছে, সে এখন ভারমুক্ত বিহঙ্গম। প্রভা একদিন নিয়ে এল মঞ্জরীর খবর। অজয় নাকি মঞ্জরীর বিরুদ্ধে একটি নিষ্ফল অভিযোগ এনেছিল আদালতে যে সে তাকে বিবাহ করবে এই প্রস্তাবে ভুলিয়ে তার কাছ থেকে অনেক টাকাকড়ি আত্মসাৎ করেছে এবং অনেক জমিজমা তার নামে লিখিয়ে নিয়েছে এবং তার পরে যোগ দিয়েছে সিনেমায়। সিনেমাতেও মঞ্জরীর পসার প্রতিপত্তি দিনদিনই উঠছে বেড়ে। কথাটি কানাইয়ের কানেও উঠল, কিন্তু সেখান থেকে আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। প্রভা আরও খবর দিলে যে সুকুমার ইউরোপ থেকে ফিরে এসে ব্যারিষ্টারিতে যোগ দিয়েছে পাঞ্জাব হাইকোর্টে। প্রভার কাছে সুকুমার বিলেত থেকেও মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখত এবং প্রতি চিঠিতেই সুজাতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করত।

সুকুমার বিলেত গিয়ে প্রথমে রসায়নের গবেষণা সুরু করে' সেখানকার একটা বড় উপাধি অর্জ্জন করে, তারপর যোগ দেয় সে ব্যারিষ্টারি পড়াতে। কাজেই, যে সময় তার ফিরবার কথা ছিল তার চেয়ে তার বিলম্ব ঘটল অনেক। প্রথম প্রথম সে মঞ্জরীর চিঠি রীতিমতই পেত এবং সে চিঠিগুলো হ'ত রসভারে বিনম্র। ক্রমশঃ চিঠির সংখ্যা যেতে লাগল কমে,' তার আস্বাদও হ'তে লাগল কঠোর। সুকুমার লক্ষ্ণৌয়ে দু'একজন বন্ধুর নিকট চিঠি লিখে জানতে পারল অজয় ও মঞ্জরী বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত। সে লিখল তিরস্কার করে' মঞ্জরীকে চিঠি। পরে মঞ্জরীর চিঠিতেও আসতে লাগল প্রতি-তিরস্কার ও নানারূপ-ছলনা, এবং পরিশেষে চিঠি হ'ল বন্ধ। সুকুমার দিলে তার টাকা বন্ধ করে'। মঞ্জরী তাতে ভ্রূক্ষেপ করলে না। জাহাজে বোম্বায়ে নেমে একখানা খবরের কাগজে সুকুমার পড়লে প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী

মঞ্জরী দেবীর কথা। সে আর কলকাতায় না ফিরে সোজা চলে' গেল লাহোর। সেখানে তার একজন পিতৃবন্ধু ছিলেন খুব বড় ব্যারিষ্টার। সে তাঁরই আশ্রয় নিলে লাহোরে ব্যবসা সুরু করবার জন্য। কিন্তু ব্যবসা সে নামমাত্রই করত। অনেকদিন ধরে' মঞ্জরীর কথা চিন্তা করে' তার হৃদয়কে সে করেছিল জীর্ণ। মঞ্জরীর কাছ থেকে যে অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাত সে পেয়েছিল তাতে শুধুই যে তার বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল তা নয়, তার দেহের জীবনীশক্তিও হয়ে গিয়েছিল ম্লান। যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তারপর লজ্জায় সে আর সুজাতাকে মুখ দেখাতে সাহস পায় নি, সাহস পায় নি চিঠি লিখে তার কথা জানতে। সুজাতা সমস্ত শুনেছিল এবং সুকুমারের জন্য তার হৃদয়ও হয়েছিল পীড়িত, কিন্তু এ অবস্থায় সে যে কি করতে পারে তা সে ভেবে ঠিক করতে পারে নি।

এমন সময় একদিন প্রভা খবর নিয়ে এল যে সুকুমারের খুব অসুখ। সুজাতা ও প্রভা উভয়েই অত্যন্ত বিচলিত হ'ল। সুজাতা পড়ল মহা সমস্যায়। সুকুমারের এমন পীড়ার সময় সুজাতা গিয়ে পাশে দাঁড়াবে না, এ যেন তার পক্ষে অসম্ভব মনে হ'ল। চিরজীবন সে সুকুমারের কাছ থেকে যে স্নেহ, যে উপকার পেয়েছে, ছবির মত ভেসে যেতে লাগল সে সব তার চোখের সামনে দিয়ে। যে সুকুমার সকল সময়েই সকলকে দিয়ে এসেছে আশ্রয়, সেই সুকুমার আজ একান্ত অসহায়, রোগশয্যায়, একথা জেনে সে কি করে' থাকবে চুপ করে'? অথচ অধ্যাপককেও সকল সময়ে দেখা প্রয়োজন। তাঁর শরীর পড়েছিল ভেঙ্গে এবং সুজাতার মনে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল যে এ সময়ে দেখাশোনার অভাব ঘটলে তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। এই দোটানার মধ্যে পড়ে' তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সে পরামর্শ

করতে গেল কানাইয়ের সঙ্গে। কানাই বল্লে যে এ অবস্থায় তার যাওয়াই উচিত, সে নিজেই দেখাশোনা করবে অধ্যাপকের, সেজন্য সুজাতা যেন চিন্তা না করে। সুজাতার পরের চিন্তা হ'ল, কেমন করে' একলা সে যাবে সুকুমারের ওখানে। এখানে কানাইকে নিয়ে যাওয়া চলে না, এ বিদ্যামন্দিরের কাজ নয়। এ কাজ তার ব্যক্তিগত। তারপর সে সিদ্ধান্ত করলে যে যেমন করে' হোক্ প্রভা ও রঞ্জনকে নিয়ে সে যাবে। প্রভার কাছে কথাটা পাড়তে সে দেখলে প্রভার বিশেষ আপত্তি নেই এবং সে একথাও আবিষ্কার করল যে প্রভাও কম ব্যাকুল হয় নি সুকুমারের জন্য। সুজাতার এখন বয়স হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক অভিজ্ঞতাও অনেক বেড়েছে। পূর্ব্বে হ'লে সে এ ব্যাকুলতার কোনও কারণ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করত না, কিন্তু আজ এর মধ্যে সে যেন একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পেলে। একটু হেসে তাকে বল্লে—"চল্ তুই তবে আমার সঙ্গে। রঞ্জন ত এখন পাকাপোক্ত জোয়ান হয়েছে, পথে কোনও আপদ বিপদের আশঙ্কা থাকলে সেই আমাদের দেখতে শুনতে পারবে।"

এর পরে সে উপস্থিত হ'ল প্রস্তাবটা নিয়ে অধ্যাপকের কাছে। সুকুমারের কথা অধ্যাপক অনেক সময় শুনেছেন সুজাতার কাছে এবং তাঁর মনে মনে একটু ক্ষীণ আশাও ছিল যে হয় ত এই সুকুমারও এসে যোগ দেবে তাঁর বিদ্যামন্দিরের কাজে। আজ সুকুমারের পীড়ার কথা শুনে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করলেন। তাঁর মনে কেবল উদ্বেগ রইল, এই রোগের শুশ্রূষা করতে গিয়ে সুজাতা আবার নিজে কোনও অসুখে না পড়ে। সুজাতা তাকে বোঝালে যে প্রভা এবং সে, দু'জনে যাচ্ছে, দু'জনে ভাগাভাগি করে' কাজ করবে। দরকার হ'লে নার্সও রেখে দিতে পারবে, চিন্তার কিছু নেই।

অধ্যাপককে সে বার বার নানা বিষয়ে সাবধান করতে লাগল, কোন্ সময় কি ওষুধ খেতে হবে না হবে সব তাঁকে ঠিক করে' বুঝিয়ে দিয়ে তাঁকে দিয়ে বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে যে তিনি যেন কোনও অনিয়ম না করেন। তারপর অধ্যাপক সুজাতার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। প্রভা ও রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে সুজাতা যাত্রা করল লাহোর অভিমুখে।

লাহোরে এসে সুকুমারের বাসায় গিয়ে সুজাতা দেখলে যে সবই বে-বন্দোবস্ত এবং সুকুমার যকৃতের একটা কঠিন রোগে পীড়িত, একেবারে শয্যাশায়ী। সুজাতা গিয়ে তার পাশে বসে' মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। সুকুমারের দু'টি চোখ বেয়ে জলধারা এল নেমে। প্রভাকে ইঙ্গিত করলে সুকুমার পাশে বসতে। সুকুমারের মুখে কথা নেই, শুধু সে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। সুজাতা লক্ষ্য করলে, সে চাহনিতে প্রভার মুখখানি হয়ে উঠল রাঙা, দৃষ্টি হ'ল আনত। পূর্ব্বের দিন হ'লে সুজাতা হয় ত এ লক্ষ্যই করতে পারত না।

সুজাতা ও প্রভার পৌছবার পর সুকুমারেব রোগ গেল আরও বেড়ে। সুজাতা ও প্রভা দু'জনে লেগে গেল তার সেবায়। কিন্তু সুজাতা লক্ষ্য করল যে প্রভাই শুশ্রূষার ভার নিতে চায় বেশী করে'। সে প্রভাকে রোগীর শুশ্রূষার ভাব বেশী করে' ছেড়ে দিয়ে বাইরের অন্য সমস্ত ব্যবস্থা, ডাক্তার ডাকা, রোগের বিবরণ রাখা, পথ্যের ব্যবস্থা করা, রোগীর গৃহ সর্ব্বদা সুপরিষ্কৃত রাখা, এই সমস্ত ব্যবস্থা যাতে নির্বিঘ্নে সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় সেইদিকেই দিলে বেশী করে' তার মনোযোগ। প্রভার যে শুধু শুশ্রূষা করতে আগ্রহ ছিল তা নয়, সেবা-কার্য্যে তার দক্ষতাও ছিল যথেষ্ট। এমনি করে' চলতে লাগল যমে মানুষে দ্বন্দ্ব।

অনেক সময় ভোররাত্রে উঠে সুজাতা একা একা ছাদের উপর পাদচারণ করত, ভেসে উঠত তার মনে অধ্যাপকের ছবি, তাঁর বিদ্যা-মন্দিরের ছবি আর সেই সঙ্গে ভেসে উঠত কানাইয়ের উৎসাহদীপ্ত মুখমণ্ডল। সে গর্ব্ব অনুভব করত কানাইয়ের গবেষণায়, তার প্রত্যেকটি গবেষণার যে যথার্থ মূল্য তার চেয়ে অনেক অধিকতর মূল্যে প্রতিভাত হ'ত তা তার কাছে। সে অনেক সময় চিন্তা করে' দেখেছিল যে এক একটি গবেষণায় যে সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে কাজে ফলাও করে' দেশের ব্যবহারের যোগ্য করে' তুলতে হ'লে অনেক বড় বড় যন্ত্রপাতি দরকার এবং এই যন্ত্রপাতি না আনালে কানাইয়ের গবেষণা শুধু ঘরের জিনিষ হয়ে থাকবে, শুধু পাওয়া যাবে তাতে বাহবা। তাতে দেশের যথার্থ উপকার কিছু হবে না, অথচ দেশের উপকার ফলাও করে' করবে বলে'ই কানাই এসেছিল এই রসায়নের কাজে। তখন তার মনে পড়ল যে তার যে অগাধ ধনসম্পত্তি আছে, এতাবৎকাল তার অতি সামান্য অংশই লেগেছে তার নিজের কাজে। ঠিক তার কত টাকা আছে তা সে ভাল করে' খতিয়ে দেখে নি। সেই সমস্ত টাকার কল্পনায় একটা আঁচ এনে সে সঙ্কল্প করলে যে এখান থেকে ফিরে গিয়েই সে এই সব যন্ত্রপাতি আনাবে। সে কল্পনা করতে লাগল যে সেই সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে যখন কানাইয়ের আবিষ্কার দেশব্যাপী উপকারে লাগবে তাতে কানাই কত আনন্দ পাবে। আনন্দে হর্ষোজ্জ্বল হয়ে সে হয় ত তাকাবে তার দিকে। এই স্নেহদৃষ্টির কল্পনা তার জীবনে যেন নূতন করে জ্বালিয়ে তুল্‌লে একটি ধ্রুবনক্ষত্রের দীপশিখা।

চিঠি এল একদিন কানাইয়ের। বিদ্যামন্দিরের নানা খবর ছিল তাতে। সেদিককার সব ভাল। অধ্যাপক সম্বন্ধে ছিল—'তোমার গুরুদেবকে বাগ মানানো ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। তাঁর খাওয়া

শোওয়ার নিয়ম নেই। দিবারাত্রিই চিত্ত অপ্রসন্ন। আর একটা দুর্দ্ধর্ষ যন্ত্র নিয়ে পড়ে' আছেন তারই গবেষণায়, ভয় হয় কোন সময় হাত পা চিপ্‌সে না যায়। রাত্রে তাঁর অনিদ্রা বেড়ে গেছে, প্রায়ই শুনি তাঁর পায়চারির শব্দ।' সুজাতার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল বৃদ্ধের জন্য। তার হৃদয়ের স্নেহ যখন পাগল হয়ে উঠেছিল তার নিজেরও অজ্ঞাতে, তার হৃদয়ের রক্তস্রোত যখন বক্ষের পঞ্জরভূমিতে বারংবার আছাড় খেয়ে পড়ছিল আপনাকে ব্যক্ত করার জন্য, তখন তার নারী-হৃদয়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন এই বৃদ্ধটি। পূজায়, ভক্তিতে, বাৎসল্যে তখন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তার হৃদয়। নিরন্তর জ্ঞানের উপদেশে তিনি তার চিত্তকে করেছেন বলিষ্ঠ, কুয়াশা ও কুজ্ঝটিকার মধ্যে এনেছেন সূর্য্যের আলো, অতি বলিষ্ঠের ন্যায় হাত ধরে' নিয়ে গিয়েছেন আপনার পথে, আবার তাঁর জরাজীর্ণ দেহ দ্বারা কেড়ে নিয়েছেন ক্ষুধিত মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য। অজস্র স্নেহধারা আর ভালবাসা পেয়েছিল সেইখানে তার নির্গমের পথ। এই ভালবাসাকে কেন্দ্র করে' গড়ে' উঠেছিল সুজাতার কর্ম্মপদ্ধতি। এই বস্তুটিকে নিয়ে সে পূর্ণ করে' তুলেছিল নারীহৃদয়ের অনেক ছোটখাট আকিঞ্চন। অনেক বাৎসল্যের অভিমান চলেছে তাঁর সঙ্গে। সে হয়েছিল তাঁর বিরাট বিদ্যামন্দিরের কর্ত্রী, ঘর না বেঁধেও তার উপর পড়েছিল ঘর বাঁধার দায়িত্ব। এ সমস্ত না হ'লে কি তার হৃদয় পেতে পারত তার পরিপূর্ত্তি ? তাঁর কাছে তার জীবন দিয়েছে ধরা। তার সমস্ত ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হবে আজ এই বৃদ্ধের ভালবাসায়। আজ তার অভাবে বৃদ্ধ হয়েছেন অপ্রসন্ন, কোনও কাজে লেগে তিনি আজ সন্তোষ পাচ্ছেন না। কোনও না কোনও আশঙ্কা করে' সুজাতার মন হয়ে উঠত কণ্টকিত—কোন্ সময় কি হয় তা বলা যায় না। তাঁকে ওরকম একলা ফেলে আর ত বেশী দিন

থাকা যায় না। একবার মনে হ'ল, কানাইবাবুই ত আছেন, তিনি সব দেখবেন। আবার ভাবলে, এ তার মিথ্যা সান্ত্বনা—কানাইবাবুও যে ঐ রকমই আর একজন তপস্বী ; তিনি নিমগ্ন আছেন নিজের কাজে, তাঁর কে খবর করে ঠিক নেই। এবার ফিরে গিয়ে তাঁরও দেখাশোনার ভার তাকেই নিতে হবে। কানাই স্বীকার করে না বটে, কিন্তু সে দেখেছে যে সে যেদিন তার খাবার সময় কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কাছে বসে' গল্প করেছে, এটা ওটা এগিয়ে দিয়েছে, তার মুখ হয়ে উঠেছে প্রসন্ন। প্রত্যাশী বিড়াল সেদিন ফিরেছে উপবাসী হয়ে। তার মনে হ'ল যেন পুরুষজাতিটাই একান্ত অসহায়, নারীর কোমল হস্তের সেবা না পেলে বলিষ্ঠ এবং তপস্বী পুরুষও মনে মনে হয়ে যায় ম্লান। প্রভাতের শিশিরবিন্দু পায় বলে'ই বনস্পতি পারে অখণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপ সহ্য করতে।

আবার একখানা চিঠি এল কানাইয়ের কাছ থেকে। সেই চিঠিতে নানা কথার মধ্যে এক জায়গায় লেখা ছিল—'যে বিদ্যামন্দির তোমার জ্যোৎস্নাধারায় ছিল নিরন্তর অভিষিক্ত, আজ যেন সেখানে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনিয়েছে, আমরা যেন কেউ কাউকে পারছি না চিনতে।' সুজাতা একটু হেসে ভাবলে—ব্যাপার কি, কানাইবাবু যে কবি হয়ে উঠলেন! সে মনে মনে নিশ্চিত জানত যে চাটুবাক্যের লোক কানাই নয়। তার হৃদয়ে যেটি আসে, সহজ, সরল ও স্বচ্ছভাবে সুনির্দ্দিষ্ট বাক্যে সেটিই পায় প্রকাশ। বিলাস বা বাহুল্যের কোনও অবকাশ নেই তার হৃদয়ে। ছলনা বা কল্পনার পরিচ্ছদ বঞ্চনা করত না তার বাক্যকে। তাই কথায় কথায় ভাববিলাসের অভিভাষণ থেকে সে পেয়েছিল নিষ্কৃতি। সেই কানাই আজ লিখেছে যে তার অদর্শনে আজ বিদ্যামন্দিরে নেমেছে অমাবস্যার ছায়া। কার মনে কি ছায়া

নেমেছে তা কানাইবাবুর প্রত্যক্ষ করবার কথা নয়—তবে কি এই ছায়া কানাইবাবুর মনেই নেমেছে? কানাইবাবুর মনেও তা হ'লে কারুর অদর্শনে ছায়া পড়ে! ঈষৎ একটু অস্ফুট হাসি এল তার মুখে, যেন স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ কুঁড়ির পাপড়ির ঈষৎ প্রসারণ মাত্র। সে মনে মনে ভাবল—কানাইবাবুর মধ্যে অনেক জিনিষ দেখেছি। তাঁর অক্লান্ত তপস্যা, তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, সাহসিকতা, কর্ম্মঠতা, এমন কি বিনা অস্ত্রে দশবিশজন লোকের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে যাওয়াও দেখেছি, কিন্তু এ কি অঘটন ঘটনা যে আমি তাঁর কাছে না থাকায় তাঁর মনে একটা অন্ধকারের ছায়া পড়বে! কারুর মনে প্রবেশ করার কোনও স্বাভাবিক চেষ্টা বা উন্মুখতা সুজাতার ছিল না। তবে চেষ্টা না করলেও অনেকের মন সহজেই পড়ে ধরা। কিন্তু কানাইয়ের মন ছিল না সে জাতীয়। নিরন্তর ব্যায়ামচর্চ্চাতে তার মুখের পেশী হয়েছিল কঠিন, রং ছিল কালো। অন্তরে ক্ষণে ক্ষণে ওঠে যে ভাবতরঙ্গ তা আলোছায়ায় নেচে যেত না তার মুখে। তার দু'টি কালো চোখ কোন সময় থাকত নিষ্প্রভ, কোন সময় থাকত প্রশান্ত, কোন সময় হয়ে উঠত দীপ্ত। তার ব্যবহার ছিল সংযত, ভদ্রতা বা শিষ্টতার অতিবাহুল্য তার ছিল না। কারুর উপর কানাই যখন রাগ্‌ত, ঘুসিটা মুখের উপর পড়বার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে অনুমানই করতে পারত না যে সে রেগেছে। সুজাতার প্রতি ব্যবহারে তার যতটুকুই বন্ধুত্ব প্রকাশ পাক্ না কেন, সে এমন কোনও অবকাশ পায় নি যাতে সেই ব্যবহারকে সাধারণ বন্ধুত্বের অনুরাগের চেয়ে সে বেশী আর কিছু মনে করতে পারে। তার মন অনেক সময় খুঁজেছে কানাইয়ের চিত্তকে আবিষ্কার করবার জন্য, কিন্তু ফুলের কুঁড়ি যেমন তার সমস্ত গন্ধকে তার নিজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে চেপে রেখে দেয় তার পাপড়িগুলির

অন্তরালে, একটুও বেরিয়ে যায় না বাইরে তার পরাগের কণা, তেমনি কানাইও একটুও প্রকাশ পেতে দেয় নি তার অন্তরের সুগন্ধকে।

কানাই মনে মনে যে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয় নি সুজাতার দিকে তা নয়, কিন্তু সেই আকর্ষণকে বিন্দুমাত্র ব্যক্ত করতে সে নিজের কাছেই অত্যন্ত লজ্জাবোধ করত। কথাপ্রসঙ্গে সে একদিন সুজাতাকে বলেছিল যে জীবনে একদিন কোনও সময় ছিল যখন মঞ্জরীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সে সাধারণতঃ নিজের কথা কিছু বলত না। কিন্তু কি কারণে যেন তার মনে হয়েছিল যে এ কথাটা সুজাতার কাছে গোপন রাখা অন্যায় হবে, অথচ কেন যে তাকে এ কথা না বললে অন্যায় হবে সে কথা ভেবে সে ঠিক করতে পারে নি। এর পর থেকে যখনই সে সুজাতার দিকে তার মনের প্রীতি ও আকর্ষণ প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে তখনই কোন্ বলবান্ দৈত্য এসে যেন সবলে বাধা দিয়েছে তা ভাষায় বা ব্যবহারে প্রকাশ করতে দিতে, সে মনে মনে ছোট হয়ে গেছে সুজাতার কাছে। সে ভয় পেয়েছে যে কোনরকমে যদি সুজাতা টের পায় তার মনের এই আকর্ষণের কথা, তবে সে তাকে কত না হীন মনে করবে। হয়ত বা মনে করবে মেয়ে ধরে বেড়ানো তার ব্যবসা। এবং এই রকম কোনও কথা মনে করলে তার বিরুদ্ধে তার কিছু বলবার নেই। কোন্ প্রেমটা সত্য নয়, কোন্টা সত্য, কোন্টা শুধু মোহ বা লালসা আর কোন্টা উৎপন্ন হয় হৃদয়ের স্বচ্ছ পবিত্র উৎস থেকে, সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে কে? এ সমস্ত বিষয়ে সে নিজের কাছেই নিজে সাক্ষ্য দিতে পারে না, অপরের কাছে কি করে' দেবে?

ভালবাসা বা কামনা বলতে আমরা কি বুঝি তা আমাদের নিজেদের কাছেই খুব সুস্পষ্ট নয়। দেহের প্রতি দেহের আকর্ষণ

সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ। কিন্তু মানুষের মধ্যে যখন এই দেহের আকর্ষণ প্রকাশ পায়, তখন সে আকর্ষণের মধ্যে দেহজ ব্যবহারের কল্পনা যে সকল সময়েই অঙ্কিত থাকে তা বলা যায় না। যার পরিণতি হবে দেহজ ব্যবহারে বা মিলনে, তেমন আকর্ষণও যখন মানুষের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তখন সে নিয়ে আসে তার সঙ্গে মনের অসীমতা। সংস্কৃত সাহিত্যে এই জাতীয় কামনার বহু ছবি দেওয়া হয়েছে এবং জীবনেও এর বহু দৃষ্টান্ত মেলে। সর্ব্বত্রই এই কামনা মনকে তোলে আকুল করে', মনকে করে বিমর্দ্দন, মনকে করে মাতাল। সেই জন্য এই কামনাকে বলে 'মনোজ', 'মন্মথ', 'মদন'। পশুজগতে হয় ত যেটা প্রকাশ পায় কেবল দেহজ সন্নিধানের আকর্ষণে, মানুষের মধ্যে সেই কামনাই প্রকাশ পায় মনের উৎকট আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। অবসর পেলে এই আকাঙ্ক্ষা আপনাকে ক্ষয় করে' ফেলে দেহজ বৃত্তির মধ্যে, দেহজ সন্নিকর্ষের মধ্যে। কিন্তু পরোক্ষভাবে যতক্ষণ মনের আকিঞ্চনে, দৈন্যে ও আর্ত্তিতে, ত্যাগে বা প্রীতিতে এই কামনা আত্মপ্রকাশ করে ততক্ষণ সেই কামনার মধ্যে যে একটা দৈহিক জৈবশক্তিও কাজ করছে তা অনেক সময়ই অনুভব করা যায় না। এই কামনা হয় ত প্রকাশ পায় বারংবার প্রিয়জনের স্মরণে, তার আলোচনায়, তাকে দেখার ইচ্ছায়, তার সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছায়; কিন্তু এগুলির মধ্যে যে কোনও দেহবৃত্তি লুক্কায়িত আছে বা দেহবৃত্তির প্রেরণাতেই যে এগুলি সংঘটিত হচ্ছে, তা একান্তই তুর্নির্ণেয়। কোনও একটা অবস্থায় হয় ত প্রধান হয়ে প্রকাশ পায় একটা দেহজ কামনা, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না সেই ভাবটি স্ফুট হয়ে ওঠে, সে পর্য্যন্ত আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা তাকে আমরা দৈহিক বলে' নিশ্চয় করে' নির্দ্দেশ করতে পারি না।

সেই জন্য কানাই যখন তার অন্তরে সুজাতার জন্য একটা টান অনুভব করত তখন সে সর্ব্বপ্রযত্নে সে ব্যাকুলতাকে চাইত গোপন করতে; এমন কি, নিজের মনের মধ্যেও চাইত তাকে অস্বীকার করতে, অন্য কোন রকম একটা ব্যাখ্যা দিয়ে মনটাকে চাইত হাল্কা করে' দিতে। কিন্তু জল যেমন চেপে সঙ্কুচিত করা যায় না বরং তাকে চাপতে গেলে চাপ হয়ে ওঠে একান্ত দুঃসহ, তেমনি কানাইয়ের অন্তরের মধ্যে সুজাতার জন্য টানটা ক্রমশঃই উপচিত হয়ে উঠছিল। যতক্ষণ সুজাতাকে দেখতে পেত, তার সঙ্গে কথা কইতে পারত, তার সঙ্গে একত্র কাজ করতে পারত, ততক্ষণ সেই সব অবসরের মধ্য দিয়ে সঞ্চিত ব্যাকুলতার খানিকটা পরিতৃপ্তি ঘটতে পারত। তাই আজ সুজাতার অদর্শনে তার ব্যাকুলতা তার অন্তরকে করে' তুলেছিল ভারাক্রান্ত ও অন্ধকার-মলিন।

কানাই যেমন একদিকে ছুটে যেত কাজের মধ্যে জ্যা-নির্ম্মুক্ত শরের মত, অপরদিকে সে নিরন্তর চেষ্টা করত নিজেকে খনন করে' আবিষ্কার করতে। তার মনের প্রত্যেক পলিতে কি ভাবগুলি স্ফুট বা অস্ফুট হয়ে রয়েছে তা জানবার জন্য তার ছিল অসীম কৌতূহল। কিন্তু মনের সূক্ষ্ম বিষয়কে আবিষ্কার করা সকল সময় সহজ নয়। বাইরের সূক্ষ্ম বিষয়ের ন্যায় মনের সূক্ষ্ম বিষয়ও আবিষ্কার করতে চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা তাদের রূপ ফেলি হারিয়ে, আবিষ্কার হয় অসম্ভব। কি ভিতরে কি বাইরে, বিধাতা এঁকে দিয়েছেন একটা সীমারেখা। সেই সীমা-রেখাকে অতিক্রম করে' সূক্ষ্মতম রহস্যের রাজ্যে আমরা আমাদের আবিষ্কারকে প্রসারিত করতে পারি না।

কানাই অনেক সময় তুলনা করত প্রথম জীবনে মঞ্জরীর প্রতি তার আকর্ষণের সঙ্গে তার বর্ত্তমান জীবনে সুজাতার প্রতি আকর্ষণের।

তার স্পষ্টই মনে হ'ত যে বর্ত্তমান আকর্ষণ অনেক গভীর। তখন সে তার মনকে জিজ্ঞাসা করত—যথার্থই কি সুজাতার আকর্ষণ এত অধিক গভীর, না বর্ত্তমানকালে অনুভূত হচ্ছে বলেই কালধর্ম্মে তাকে এত গভীর বলে মনে হচ্ছে? আমাদের অতীত কালের অনেক ছবি আমাদের মনে ভাসে, কিন্তু তার রূপ যায় বদ্‌লে। কিন্তু সেই ছবির সঙ্গে যে ভাব বা emotion জড়িত থাকে তার কোনও ছবি হয় না এবং ছবি হয় না বলেই তার পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের মত অনেক সময়ই ঠিক হয় না। কাজেই তার নিজের মনের কাছেই সে নিশ্চিতভাবে এই সাক্ষ্য দিতে অসমর্থ হয়েছিল যে সুজাতার প্রতি তার যে আকর্ষণ তা প্রকারে, জাতিতে ও পরিমাণে একান্ত বিভিন্ন প্রকারের। সুজাতার প্রতি কানাইয়ের ছিল অসীম শ্রদ্ধা, কাজেই সে সুজাতার সম্মুখে এমন কোনও উপহার আনতেই পারত না যা দেবতার উপহারের ন্যায় পবিত্র নয়। প্রেমের একটা ক্লিন্ন দিকের পরিচয় সে জীবনে পেয়েছে। সে প্রেমও ছিল ক্লিন্ন, তার পাত্রীও ছিল ক্লিন্ন। আজ সে উঠেছে মঞ্চের একটি উপরিতর ধাপে, পবিত্র হয়েছে তার চিন্তা এবং আত্মা। অপরদিকে সুজাতা শুদ্ধা, অপাপবিদ্ধা, তার কাছে সে প্রেমের এমন উপহার ধরতে পারে না যা তার উপযুক্ত নয়। সুজাতার প্রতি তার আকর্ষণ যে একটা উচ্চাঙ্গের ভালবাসা, দেহবিমুক্ত ভালবাসা, এ সম্বন্ধে সে নিজের কাছেই বা কি প্রমাণ দিতে পারে তা তার জানা ছিল না তাই সে সকল সময়ে নিজেকে নিরুদ্ধ করে' রাখত। আজ চিঠিতে যেটুকু ধরা পড়েছে সেটুকু অবচেতনাগত মনের স্খলনে।

সুজাতা বাল্যকাল থেকে যে রকম আবহাওয়া ও শিক্ষার মধ্যে মানুষ হয়ে এসেছিল তাতে দেহধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। প্রথম প্রথম সে মঞ্জরীকে বল্‌ত যে হৃদয়ের মধ্যে সে

একটা অভূতপূর্ব্ব আবেগ অনুভব করে, যে রকম আবেগ অনুভব করে একটা কুক্কুটী যখন সে ডিমের উপর বসে' তা দেয়। এটা একটা সৃষ্টির আবেগ, সৃষ্টির আত্মপ্রকাশের চেষ্টা, সুজাতার মধ্যে এই আবেগ কখনও দৈহিক পথে সঞ্চারিত হ্বার অবসর পায় নি। সুকুমারকে সে ভালবাসত, কিন্তু বাল্যকাল থেকে সে ভালবাসা ছিল অন্যরকম সংস্কারে জড়িত। সুকুমার ধরতে পারে নি তার সামনে সে রকম একটা ছবি যা পারত তার অন্তরের স্রোতকে দেহের দিকে নামিয়ে আনতে। কানাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখাতেই সুজাতার অবচেতনাগত মন চিনে নিয়েছিল তার মানুষটিকে, কিন্তু জ্ঞাতমন দিলে না সে দিকে সাড়া। কানাইকে সে দেখলে আত্মপ্রকাশের তাড়াতে ব্যগ্র। সুজাতা করলে তার প্রতিধ্বনি। সেও ছুটল আত্মপ্রকাশের তাড়ায় এবং এই পথে তার আবেগ পেল মুক্তি, কর্ম্মের মধ্যে সে ফিরে পেলে তার চিত্তের স্বাস্থ্য। তাই সে ছুটল কর্ম্মের দিকে। সে নারী, স্নেহের ক্ষুধা তার কম নয়। সে ক্ষুধা মুক্তি পেল অধ্যাপকের প্রতি বাৎসল্যে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, সে ক্ষুধা মুক্তি পেল স্নেহাস্পদের জন্য বিরাট বিজ্ঞান মন্দিরের কর্ত্তৃত্ব নিয়ে। এইটি হ'ল তার গৃহিণীপনার ক্ষেত্র। তবু সে ক্ষুধা অধ্যাপকের ভালবাসার মধ্যে পূর্ণকাম হ'তে পারল না। যেটুকু রইল অবশেষ সেটুকু ছুটল কানাইয়ের দিকে, কিন্তু তা গোপন করে' রাখতে হ'ল হৃদয়ের মধ্যে যেমন গোপন করে' রাখে পদ্মকোরক মধুবিন্দুকে তার শতপত্রদলের আবরণে, তার কিঞ্জল্কাভরণের মধ্যে। পদ্মকোরকের মুখ থাকে বন্ধ, তাই ভ্রমরের সেখানে আনাগোনা নেই। তার মধু থাকে গোপনে তার নালের প্রান্তে। কানাইয়ের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও পূজা উপচিত হয়ে উঠেছিল সুজাতার হৃদয়ের মধ্যে, তার সমস্তটুকুকে ব্যাপ্ত করেছিল কানাইয়ের প্রতি একটি ভালবাসা, নবনীত যেমন ব্যাপ্ত করে দুগ্ধের

সর্ব্বাঙ্গ। বাহ্য দৃষ্টিতে তাকে দেখা যায় না, তা টের পাওয়া যায় দুগ্ধের স্বাদে। কানাইয়ের কাছ থেকে যে চিঠিগুলি আসত তার অনেকগুলিতেই সে পেতে লাগল তার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। তার মন হয়ে উঠল উচাটন।

এদিকে কিছুদিন ধরে'ই সুকুমার ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছিল। যখন সুকুমার ছিল অত্যন্ত অসুস্থ তখন তার কাছে প্রায়ই যেতে হ'ত সুজাতাকে। বিস্বাদ পথ্য কি তিক্ত ঔষধ খাওয়াবার সময় বা কোনও একটা ইন্‌জেক্‌শান্ দেওয়ার সময় সুকুমার আব্দার ধরত উল্টো দিকে। তখন সুজাতা কাছে না এলে প্রভার সাধ্য ছিল না সুকুমারকে ঔষধ বা পথ্য খাওয়ানো। কিন্তু ক্রমশঃই যত সে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল ততই সুজাতা চাপাতে লাগল রোগীর সমস্ত ভার প্রভার উপর। সুজাতাকে পাওয়ার জন্য সুকুমার ছটফট করত কিন্তু সুজাতা এ বিষয়ে ছিল কঠোর। একান্ত প্রয়োজন না হ'লে সে কিছুতেই সুকুমারের ঘরে যেতে চাইত না। যখন বা যেত তখন সে ধমক দিয়ে উঠত সুকুমারকে, বলত লোভীপনা তোমাদের পুরুষজাতের একটা ধর্ম্ম। এই প্রচ্ছন্ন শ্লেষের ইঙ্গিতের মধ্যে যে সত্যটুকু ছিল, বিচক্ষণ সুকুমারের তা বুঝতে দেরী হ'ত না, কাজেই তাকে ম্লানমুখে চুপ করে থাকতে হ'ত। প্রভার আড়ালে সুজাতা অনেক সময় সুকুমারকে তিরস্কার করে' বলত—"প্রভার মত একটি মেয়ে তুমি কোথায় পাবে বল শুনি? দিন নেই, রাত্রি নেই, বসে' আছে তোমার শয্যার পাশে। অক্লান্ত পরিশ্রমে মুখে একটু দৈন্য নেই, কেমন করে' তোমার মুখে একটু হাসি ফোটাবে এই হচ্ছে চেষ্টা। তোমার সমস্ত জীবন দিয়েও এই ঋণ শোধ করতে পারবে না। প্রভা না এলে আমি কি পারতুম তোমার জন্য কিছু করতে, না আমি জানি ওর মত সেবা করতে? এবার যে বেঁচে উঠলে সে প্রভারই স্নেহে, প্রভারই যত্নে।"

স্থকুমার নীরব হয়ে থাকত। ভাবত—কথাটা ত মিথ্যা নয়, প্রভাই ত সব করেছে তার জন্ম, স্থজাতা ত বড় একটা এদিকে আসেই না। রোগী টের পায় রোগীর ঘরের সেবা। সেই ঘরে যে থাকে একান্ত আসন্ন হয়ে, তারই প্রতি পড়ে তার দৃষ্টি, তারই প্রতি হয় তার কৃতজ্ঞতা। যে ব্যবস্থায় বা যার ব্যবস্থায় সে সেবা সম্ভব হয়ে ওঠে তার সম্বন্ধে তার কিছুই জ্ঞান থাকে না। কল্পনা থাকে তার তুর্ব্বল, অনুমান শক্তি থাকে ক্ষীণ, তাই ঘরের বাইরের যে আয়োজন ঘরের ভিতরের আয়োজনকে সার্থক করে' তোলে, সে সম্বন্ধে সে থাকে অনেকটা অচেতন ও উদাসীন।

এরও কিছুদিন পরে এল আর একখানা চিঠি যাতে লেখা ছিল যে অধ্যাপকের মন বড় বিমর্ষ, তাঁর শরীরও ভাল নেই। মায়ের আসন নড়ল। স্থজাতা ভাবলে—আর ত থাকা যায় না। ইতিমধ্যে প্রভা একদিন রঞ্জনকে নিয়ে তার একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে গেল। বাড়ীতে রইল স্থজাতা। স্থজাতা প্রায়ই এরকম একটা অবস্থা ঘটতে দিত না, কারণ সে অনুভব করেছিল যে স্থকুমার তাকে চায়। সে কথা মনে করতে তার সর্ব্বশরীর ক্লিন্ন ও বিষাক্ত মনে হ'ত। স্থকুমার যখন অসুস্থ, তখন তাকে সে কোনও কথা বলে' পীড়া দিতে চায় নি। কিন্তু এখন স্থকুমার বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। স্থজাতা এর মধ্যে অনেকবার কলকাতায় ফেরবার কথা বলেছে, কিন্তু স্থকুমার একেবারে কান্নাকাটি বাধিয়ে দিয়েছে। আর প্রভাও যেতে চায় নি। স্থজাতার মনে হ'ল, আজ একটা বোঝাপড়ার দিন। স্থকুমার বার বার ডেকে পাঠাতে লাগল স্থজাতাকে। স্থজাতা গিয়ে একখানা চেয়ার নিয়ে বসলে স্থকুমারের শয্যা থেকে খানিকটা দূরে।

সুকুমার বল্লে—"একটু কাছে এসে বস না।"

সুজাতা বল্লে—"কেন, এই ত বেশ আছি।"

সুকুমার বল্লে—"কেন, কাছে বসতে দোষ কি ?"

সুজাতা বল্লে—"দোষ হয় ত কিছু না থাকতে পারে, প্রয়োজন ত কিছু নেই।"

সুকুমার বল্লে—"মনে কর দেখি সেই ছেলেবেলার কথা। তুমি কত আমার মাথায় দিতে হাত বুলিয়ে। উকুন বের করি বলে' মিথ্যা ভাণ করে' নখে নখে টুস্‌টুস্‌ শব্দ করতে। আমিও কত দিয়েছি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে, বেণীটা ধরে' দিয়েছি নাড়া। সে সব কথা কি ভুলে গিয়েছ ?"

সুজাতা বল্লে—"ভুলে কেন যাব ? জীবনের এক প্রান্তে যা ঘটে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তার জ্যোতির কনকরেখা ফেলে তার মসৃণ ছায়া। উষার তরুণ আলো ফুলকে করে বিকশিত, সন্ধ্যায় যখন সে ঝরে' পড়ে তখনও সে ফুল ভোলে না কার ছোঁওয়ায় জেগেছিল তার জীবনে প্রথম শিহরণ।"

সুকুমার বল্লে—"তবে ?"

সুজাতা বল্লে—"তোমার প্রশ্নের ত কোনও অর্থ বুঝতে পারছি না। জীবনের ইতিহাসে প্রথম আরম্ভে যা ঘটে সেইটিই থাকে চিরন্তন হয়ে, না চিরন্তন হয়ে থাকার কোনও দাবীই তার আছে ?"

সুকুমার বল্লে—"তবে যে তুমি বল্লে যে শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত থাকে তার ছায়া ?"

সুজাতা বল্লে—"ছায়া যে থাকে তার প্রমাণ এই যে লোকমুখে তোমার অসুখের খবর শুনে আমি সমস্ত কাজ ফেলে' ছুটে এসেছি তোমার কাছে। পত্র-সঙ্কর-কষায় কটুস্বাদ নির্ঝরিণী যখন তার ইতিহাসে

বৃহত্তর হয়ে মিলিত হয় জাহ্নবীর জলে, তখনও কি তার সেই স্বাদ থাকে অক্ষুন্ন? তথাপি সে যুক্ত থাকে তার পুরাতন প্রবাহের সঙ্গে। তেমনি তোমার সঙ্গে আমার জীবন বাল্যকালে এক সঙ্গে গড়ে' উঠেছে। সেখানে আমরা অচ্ছেদ্য। সে কথা আমার ইতিহাস চিরকাল স্মরণ করবে।"

সুকুমার আবার বল্লে—"কিন্তু গিরি-নির্ঝরিণীর কটু স্বাদ পরে কি পরিণত হয় না মধুর স্বাদে?"

সুজাতা বল্লে—"গিরি-নির্ঝরিণীর কটু স্বাদ মধুর স্বাদে পরিণত হয় না। অন্য স্থান থেকে মধুর স্রোত প্রবাহিত হয়ে গিরি-নির্ঝরিণীর কটু স্বাদকে দেয় ডুবিয়ে, তাই বলে' কটুস্বাদের কোনও দাবী থাকে না মধুর স্বাদের উপর। গাছে ফলে' আম প্রথম হয় কটুস্বাদ, সেই স্বাদ পরিণত হয় অম্লে, সেই অম্লস্বাদ পরিণত হয় মধুর স্বাদে। এখানে কটু স্বাদকে বা অম্লস্বাদকে পৃথক করা যায় না মধুর স্বাদ থেকে। এখানে মধুর স্বাদের ইতিহাসের মধ্যে কটু স্বাদ দিয়েছে আপনাকে ডুবিয়ে। তেমনি তুমি যদি থাকতে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে এবং আমাদের উভয়ের স্বাদ যদি পরিণত হ'ত রসান্তরে, তবে সে কথা হ'ত স্বতন্ত্র। তুমি তোমার জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে' নিয়েছিলে আমার কাছ থেকে, হেলিয়ে দিয়েছিলে তাকে অন্য দিকে। আমারও জীবনস্রোত অনেক বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে তার পথ কেটে নিয়ে ছিল অন্য দিকে। যা পেয়েছ তার চেয়ে বেশী লোভ কো'রো না।"

সুকুমারের মনে পড়ল কানাইয়ের যে চিঠি মঞ্জরী তাকে দেখিয়েছিল সেই চিঠির কথা। কানাইয়ের সঙ্গে সুজাতা যে একই বিদ্যামন্দিরে কাজ করছে এ কথাও সে জানত। সে জিজ্ঞাসা করলে—"কানাইবাবুর সঙ্গে কি তোমার বিয়ের কোনও পাকাপাকি কথা হয়েছে?"

সুজাতা এ কথা শুনে ক্ষোভে ও লজ্জায় একেবারে অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠল। সে সুকুমারকে বল্লে—"এ সব কি ইতরামি কথা বেরুল তোমার মুখ দিয়ে?"

সুকুমার বল্লে—"কানাইবাবু যখন তোমাকে ভালবাসেন এবং তাঁর স্রোতেই যখন মিলেছে তোমার স্রোত, তখন এ কথা জিজ্ঞাসা করায় দোষ কি?"

সুজাতা আগুন হয়ে বল্লে—"কে তোমাকে এ সমস্ত কথা বলেছে? না তোমার ঈর্ষাতে পৃথিবীতে কোনও স্বচ্ছ সুন্দর জিনিষ তুমি থাকতে দেবে না? তোমার মন এমন ক্লিন্ন হয়েছে জানলে আমি কখনও আসতুম না তোমার কাছে। আর এক মুহূর্ত্তও ইচ্ছা হচ্ছে না তোমার কাছে বসতে।"

সুকুমার বল্লে—"তোমার জেলে যাওয়ার অতি অল্পকাল মধ্যে কানাইবাবু তোমার কাছে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন সেখানা মঞ্জরী আমাকে পড়তে দিয়েছিল। সে চিঠি তুমিই দিয়েছিলে তাকে গোপনে রাখতে, কিন্তু সে তোমার গোপনতা রাখে নি।"

সুজাতা কোনও জবাব করলে না। তার চোখ দিয়ে ঠিকরাতে লাগল আগুন, তার বুক চেপে আসতে লাগল কান্না। সুকুমার তার মুখের দিকে না তাকিয়েই বল্লে—"চুপ করে' রইলে যে।"

সুজাতা এবার অত্যন্ত কঠিন হয়ে বল্লে—"আমি মেয়ে, এত বড় কুৎসিত মিথ্যা অপবাদের জবাব আমি কি করে' দেব? যদি হতুম পুরুষ, যদি তুমি বলতে এ কথা কানাইবাবুকে, তবে তিনি জানতেন কি করে' এর উত্তর দিতে হয়।"

এই অপমানের কশাঘাতে সুজাতার মন তার অন্তরের নিভৃতে আশ্রয় খুঁজছিল কানাইয়ের। সুকুমারের তখন মনে হ'ল যে মঞ্জরীর

পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, হয় ত সে কোনও রকমে যোগাড় করেছিল কানাইয়ের কোনও প্রেমপত্র এবং সেইটিই চালিয়ে দিয়েছিল সুজাতার নামে। সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—"কানাইবাবু কি কোনদিন কোনও সময়ে মঞ্জরীকে ভালবাসতেন ?"

সুজাতা যা কানাইয়ের কাছে শুনেছিল তাতে সে অনায়াসে বলতে পারত—হঁ্যা, কিন্তু কানাই যদি কোনখানে পথ ভুল করে'ই থাকে তবে সে তা কেন সুকুমারকে বলতে যাবে ? সে দৃঢ়ভাবে বল্লে—"তাঁর জীবনের কথা আমি কি করে' জানব ? তিনি একজন জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ। তুমি চেষ্টা কোরো না তাঁর গায়ে কলঙ্ক লেপন করতে, সে আমি কিছুতেই সহ্য করব না।"

সুকুমার পড়ল মুষ্‌ড়ে। সে তার চরিত্রের বল অনেকখানি হারিয়েছিল, কিন্তু সে একেবারে আত্মবিস্মৃত হ'তে পারল না। সে অনুভব করল যে এটা মঞ্জরীরই কোনও কারসাজি হবে। সে ভাবলে চিঠিখানা যে একেবারেই জাল নয় তারই বা প্রমাণ কি ? ধীরে ধীরে তার মনে প্রাচীন ছবিগুলি ভেসে উঠতে লাগল এবং অকস্মাৎ নূতন আলোকপাতে সে আবিষ্কার করে' ফেল্‌ল মঞ্জরীকে তার একটা নূতন মূর্ত্তিতে। কত চেষ্টাই না সে করেছে সুজাতাকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে! কি অসামান্য কৌশলে সে তথাপি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে তাদের পরস্পরের বন্ধুতা, আর সে মূর্খ, হতজ্ঞান, মঞ্জরীর প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে সুজাতাকে করেছে পরিত্যাগ, তার বিপদে দাঁড়ায় নি একদিন তার কাছে, বলে নি একটা সহানুভূতির কথা। মঞ্জরী তাকে যে রকম করে' ঘুরিয়েছে সেইরকমই সে ঘুরেছে, তার চোখে ঠুলি দিয়ে যেখানে তাকে নিয়ে গেছে সেইখানেই সে ছুটে গেছে। আজ ত সুজাতাকে কোনও দোষ দেওয়া যায় না। সে

অত্যন্ত অনুতপ্ত স্বরে বল্লে—"সুজাতা, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমার জীবনটা এ পর্য্যন্ত হয়েছে ভ্রম ও মোহের ইতিহাস। আমি যদি সেই সময় অত বড় একটা ভুল না করতুম, মঞ্জরীর লোভে অমন করে' প্রলুব্ধ হয়ে না উঠতুম, তবে হয় ত আমার আজ এমন দুর্দ্দশা হ'ত না। আমাকে মুক্তি দিতে কেবল তুমিই পার।"

সুজাতা বল্লে—"তাই ত এসেছি আমি তোমাকে মুক্তি দিতে।"

সুকুমার কিছুই বুঝতে না পেরে অথচ বেশ যেন একটু উৎসাহিত হয়ে বল্লে—"কি রকম ?"

সুজাতা বল্লে—"মনে করে' দেখ ছেলেবেলা থেকে আমরা বেড়ে উঠেছি একসঙ্গে। ছেলেবেলা থেকে পুরুষ বল্‌লে জান্‌তুম যে সে শক্তপোক্ত, অসহায় মেয়েদের সে রক্ষা করে, সংসারের সব শক্ত কাজ সেই করে। সেই হিসাবে তোমাকেও জানতুম পুরুষ বলে'। পুরুষের অন্য কোনও পরিচয় আমার জানা ছিল না। বয়স যখন বাড়তে লাগল, পা দিলুম যখন সতেরো আঠারোর কোঠায়, পড়লুম অনেক কাব্য-নাটক, অনেক রোম্যান্স্। সখীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় যখন কাণে আসতে লাগল নানারকমের ইঙ্গিত তখন ধোঁয়াটে হয়ে উঠতে লাগল পুরুষ ও নারীগত একটা বিশেষ সম্বন্ধের কথা। তাতে অনেক সময় নিজের অলক্ষ্যে মন যে উত্তেজিত না হয়ে উঠত তা নয়, কিন্তু কেন যেন ও সব আমার কাছে মনে হ'ত ক্লিন্ন, সরে' আসত মন ও সব চিন্তা থেকে অতি সহজে। অথচ মনের মধ্যে কি যেন একটা আবেগ ফিরত ঘূর্ণী খেয়ে। সে ঘূর্ণী যে কোন্‌খান থেকে পথ পাবে তা আমার জানা ছিল না—সেইটিই ছিল আমার প্রধান দুঃখ ও প্রধান সম্পদ। তখন তুমি এসে দাঁড়ালে আমার সামনে, দিতে চাইলে একটা নূতন পরিচয়, একটা নূতন ইঙ্গিত।

তার জন্য আমার মন প্রস্তুত ছিল না। চিরপরিচয়ের সূত্র দিয়ে না এসে তুমি যদি স্পর্শ করতে পারতে আমার হৃদয় কোনও মহত্ত্বের উচ্চ শিখর থেকে, তবে হয় ত ঘটতে পারত আমাদের কোনও নূতন পরিচয় বাল্য-পরিচয়কে অতিক্রম করে'। আমার মনে হয় এখানে মানুষে মানুষে একটা ভেদ আছে। কোনও মানুষের মধ্যে হয় ত ঋতুর স্বাভাবিক নিয়মে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে নামতে থাকে বর্ষণধারা, সে ধারায় প্লাবিত করে সমস্ত নদী ক্লিন্ন পঙ্কিল জলে। আবার কোনও কোনও মানুষের মধ্যে এমন ঘটে যে সেখানে বর্ষার জলধারা অতি সামান্য, তাতে নদীর জল উপচিত হয় না। গ্রীষ্মে যখন আল্প্‌স্‌-শিখর থেকে তুহিনরাশি স্বচ্ছধারায় বিগলিত হয় তখন সেই glacier-এর স্বচ্ছ স্নিগ্ধ জলধারায় প্লাবন আনে দেশের সমস্ত নদীতে। কোনও সুর আছে যা চড়া তারে বাঁধা, সেখানে নিখাদে ধরলে তবে সেই সুর নামিয়ে আনা যায় খাদে। আর কোনও সুর আছে যা খাদে আরম্ভ করলে তবে চড়িয়ে তোলা যায় নিখাদে। তুমি অস্থানে হাত দিয়ে সুর তুলতে চেষ্টা করেছিলে, সেই জন্য আমার বীণা তোমার হাতে বাজে নি। কোনদিনই পারতে না তুমি আমার বীণা বাজাতে—সেদিনও নয়, আজও নয়। প্রেমের একটা বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয় হয় সম্বদ্ধ, একটা ভালবাসা যে আর একটা ভালবাসাতে পরিণত হয় তার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কোনও যন্ত্র আছে যা নীচু তারেই বাজে। তাকে বাজানো হয় ত কঠিন নয়, ছুঁলেই যায় তাকে বাজানো, তার মধ্যে কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই। কিন্তু যে রকম সহজে তুমি বাজাবে একতারা, সে কৌশল ব্যর্থ হবে তোমার বীণার কাছে। দেহ যার সাড়া দেয় অতি সহজেই, মনে হয় ত কোনদিনই তার বাজনা

ওঠে না। সে বাজনা বাজাতে কোনও শিল্পীর প্রয়োজন হয় না, যে কেউ ছুঁলেই তা ওঠে বেজে। তাই সে বাজনাকে আত্মীয় করে' রাখা কঠিন। আর যে যন্ত্রে লাগে কৌশল বাজাতে, সে চিরদিনই হয়ে থাকে যন্ত্রীর ধন, কেউ অপহরণ করলেও পারবে না তাকে বাজাতে। অনেক সময় এমন থাকে যন্ত্রে যন্ত্রে লয় এবং মিলন যে ঘরের এক প্রান্তে একটি বাজনা বেজে উঠলে ঘরের অপর প্রান্তের যন্ত্রটিরও তারগুলি বেজে ওঠে সেই সুরে। সে বাজনাকে ছোঁবারও দরকার করে না, তার সহধর্ম্মী স্বরের ঝঙ্কাব উঠলে তাতে আপনিই ওঠে ঝঙ্কার। আমাকে যখন পারলে না তখন তুমি এমন একটা বাজনায় দিতে গেলে হাত যা সকলের ছোঁওয়াতেই ওঠে বেজে। তাই সে যন্ত্রটির পিছনে জীবন খুইয়ে ফেললে কিন্তু তাকে লাভ করতে পারলে না। সে নানা হাতে বেজে বেড়াচ্ছে, এখন উঠেছে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে।"

স্নুকুমার বল্লে—"আমাকে এত তিরস্কার করে' কি লাভ?"

সুজাতা বল্লে—"তোমাকে আমি তিরস্কার করতে চাই না। কিন্তু তুমি কখনও চেয়ে দেখ না কোনও দিকে—কি নিজের দিকে, কি পরের দিকে। এই চেয়ে দেখাটা নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছে তোমার নিজেকে বোঝবার জন্য এবং অপরকে বোঝবার জন্য। এ যদি তুমি না কর তবে ঘটবে তোমার বিষম বিপদ, জীবনটা হবে চূর্ণবিচূর্ণ।"

স্নুকুমার বল্লে—"চূর্ণবিচূর্ণ হ'তে আর বাকী কি আছে?"

সুজাতা বল্লে—"মানুষের জীবনের মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যতের তুলনায় যদিও বর্ত্তমান অতি সামান্য ক্ষণ মাত্র, তথাপি চেতনার দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট বলে' সে বর্ত্তমানের একটা সর্ব্বাভিভাবী ব্যাপকতা আছে। আজ যে দুঃখ পাওয়া গেল, মনে হয় জীবনে আর এমন

দুঃখ পাই নি। প্রতি বৎসরই আমরা বলি, এ গ্রীষ্মে যেমন বুক-ফাটানো গরম গেল এমন গরম আর কোনও বৎসরই নয়। এই অনুভব-লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কোনও Statistician-এর report-এর মিল হবে না। আজ যে দুঃখ পেয়েছ তার চেয়ে মহত্তর দুঃখ ও অকল্যাণ আসতে পারে ভবিষ্যতে, যদি না এখনও হও সাবধান, এখনও না নাও নিজেকে সাম্‌লে।"

সুকুমার হেসে বল্লে—"চৌরে গতে বদ কিমু সাবধানম্‌, চোর যখন সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করল তখন আর সাবধান হয়ে কি হবে?"

সুজাতা বল্লে—"সেই জন্যই ত বলছিলাম ঘর মিলিয়ে দেখবার কথা। চোর এসেছিল, সিঁধ কেটেছিল, তাই দেখেই যদি বুক চাপড়াতে সুরু কর যে 'সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে' 'সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে' তা হ'লে আর কি করে' চলবে বল? ঘরের জিনিষপত্র খতিয়ে দেখলে হয় ত দেখবে যে চোর নিয়ে গিয়েছে কতকগুলো ঠুনকো কাঁচ বা মাটির বাসন, সোণার জিনিষপত্র হয় ত সবই রয়ে গিয়েছে। ছিঁচ্‌কে চোর, সোণা সে চেনে না, সোণায় হাত দিতেও সে সাহস পায় না, নিয়ে গিয়েছে সে কতগুলো কাঁচের চক্‌মকে বাসন, তা গিয়ে থাকলেও হয় ত কোনও ক্ষতি হয় নি।"

সুকুমার আবার জিজ্ঞাসা করলে—"তোমার কথার অর্থ কি?"

সুজাতা বল্লে—"আমার কথার অর্থ সুস্পষ্ট। তুমি আকৃষ্ট হয়েছিলে মঞ্জরীর রূপের দিকে, তার চটুল বিলাসের দিকে। তোমার মধ্যের যে দিকটা দেহজ ধর্ম্ম নিয়ে সুখে থাকতে পারত সেটা শুধু যে তোমার পক্ষে তা নয়, সকলের পক্ষেই একটা তুচ্ছ দিক। যৌবনের প্রথম উন্মাদনায় রূপ যোগায় মোহের ইন্ধন। তা আনতে পারে একটা আকর্ষণ কিন্তু তা পারে না কখনও প্রেমের আগুন রাখতে

জেলে। যে ভালবাসা পিণ্ডীকৃত হয়েছিল তোমার একটি দেহের চাকচিক্যের উপর, তোমার সেই ভালবাসার পাত্রী যে তোমাকে বঞ্চনা করেছে এতে সে তোমার অশেষ মঙ্গল করেছে।"

সুকুমার আবার বল্লে—"শুধু যে মঞ্জরী আমায় আঘাত দিয়েছে তা ত নয়, তুমিও ত দিয়েছ।"

সুজাতা কঠিনভাবে বল্লে—"এ তোমার একেবারে মিথ্যা কথা। সত্যি করে' বলতে গেলে আমায় বলতেই হয় যে বাল্যকালে আমাদের সেই ভালবাসার পর তোমার ভালবাসার ক্ষমতা পেছিয়েছে, এগোয় নি। সে বদ্ধ হয়ে ছিল কেবলমাত্র দেহের আকর্ষণের উপর, তাই তুমি আমাকে চেয়েও পাও নি, মঞ্জরীকে চেয়েও পাও নি। তুমি অনেক লেখাপড়া করেছ, তুমি পণ্ডিত লোক, কিন্তু তোমার মন জাগে নি মনের দিক দিয়ে। যাদের চেয়েছ তাদের কারুরই মনের দিকে করো নি দৃষ্টি। আমাকে যদি সত্যি তুমি চাইতে কোনদিন, তবে তুমি দরদ দিয়ে দেখতে পারতে আমার মনটা ছুটেছিল কোন্ দিকে। সেই দিকে যদি থাকত তোমার সহানুভূতি, সঙ্গ যদি দিতে পারতে আমার চিত্তকে তার অনির্দ্দিষ্ট যাত্রাপথে, তবে তোমার সঙ্গে আমার এমন বিচ্ছেদ না'ও ঘটতে পারত। মন তোমার অলস, তুমি থাকতে চাও নির্ঝঞ্ঝাটে নিরুপদ্রবে। তোমার গতির বেগ অতি সামান্য, সর্ব্বদাই পড়ছ ক্লান্ত হয়ে, চাও যে একটি ঘর বেঁধে আড়াল করে' থাকবে। যেদিন তুমি আমাকে সমস্ত ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত হ'তে বলে অনেক উপদেশ দিয়েছিলে সেই দিনই তোমার প্রকৃতি আমি বুঝেছিলুম স্পষ্ট করে'।"

সুকুমার বল্লে—"কিন্তু আমি তোমাকে ত সেদিন বলেছিলুম যে কোনও অধ্যাপকের নিকট গিয়ে গবেষণা কর, এই স্বাদেশিকতার দ্বন্দ্বে

ঢুকে তোমার লাভ কি ? আর আজও ত তুমি সেই গবেষণার কাজেই এসে লেগেছ।”

সুজাতা বল্লে—“তোমার গবেষণার কল্পনা ও আমার কল্পনার অনেক পার্থক্য। তখন আমার জীবন চাইছিল তাকে ব্যক্ত করতে মনুষ্যত্বের বড় দরবারে, যে পথে বেরিয়ে পড়েছিলুম সে পথটা ঠিক আমার পথ ছিল না। কিন্তু তবু নানা পথ ঘুরে আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেটা আমারই পথ। আর সেটা এসেছেও আমার সেই পথেরই যাত্রা থেকে। আমার গবেষণা এ নয় যে দু’একটা উপাধি অর্জ্জন কবব আর তারপর তাই নিয়ে সমস্ত জীবন বসে’ ভাঙ্গিয়ে খাব। আমি চাই যে আমার কাজ হবে আমার জীবনের সঙ্গে সমব্যাপ্ত, কাজের মধ্যেই পাব আমি আমার জীবনের সার্থকতা। এমন প্রবৃত্তির সঙ্গে তোমাব কোনদিন ছিল না সহানুভূতি, তাই যখন থেকে আমার মন চলতে আরম্ভ করেছে তখন থেকে তুমি হয়েছ আমার অপরিচিত। মঞ্জরী প্রবঞ্চক, ধূর্ত্ত, শঠ, কিন্তু তথাপি কোন না কোন দিকে তার মনের একটা গতি ছিল, সে চাইত অসীম ধন, অসীম যশ। তুমি বা অজয়বাবু কেউ তাকে তা দিতে পারতে না, তাই সে তোমাদের সোপানপংক্তির মত ব্যবহার করে’ ছুটেছে তার স্বাভাবিক পরিণতির দিকে। তারও মনের সঙ্গে তোমার কোনও পরিচয় ছিল না।”

সুকুমার আবার বল্লে—“সূক্ষ্ম তত্ত্বে আমার ক্লান্তিবোধ হচ্ছে। আমাকে তুমি কি করতে বল ?”

এইবার সুজাতা এগিয়ে নিলে চেয়ারখানা সুকুমারের মাথার কাছে, বল্লে “তাই ত সুকু-দা, তোমায় বলছি একটু বিশ্রাম নাও। তোমার শরীর ও মন দুইই চায় বিশ্রাম।”

সুকুমার চুপ করে' রইল। একটু মুচ্‌কি হেসে সুজাতা বল্লে—“আমি তোমার ব্যবস্থা ঠিক করেই রেখেছি। তুমি প্রভাকে বিয়ে কর।”

সুকুমার চম্‌কে উঠে বল্লে—“প্রভাকে!”

সুজাতা বল্লে—“সেটা কি এমন অসম্ভব কথা? প্রভা কারুর চেয়ে কম সুন্দরী নয় এবং এ আমি লক্ষ্য করেছি যে প্রভা তোমায় ভাল বাসে। আর প্রভার কোনও মনের বালাই নেই, ওকে বিয়ে করলে তুমি দেখবে যে তোমার চেয়ে বড় ওর আর কিছু কাম্য নেই। তোমার বিরহই হবে ওর সব চেয়ে বড় দুঃখ, তোমার সঙ্গে মিলনই হবে ওর জীবনের সব চেয়ে বড় সুখ। ও সমস্ত জীবনটাকে ব্যাপ্ত করে' দিতে পারবে তোমার সুখের জন্য। যে চায় কোথাও বসে' জীবনটাকে ভোগ করবে, তার জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণ করে' দিতে পারবে প্রভা তার প্রেমের গাঢ় রসে।”

সুকুমার আবার জিজ্ঞাসা করলে—“কে বল্লে তোমাকে যে প্রভা আমাকে ভালবাসে?”

সুজাতা বল্লে—“রাগ কোরো না, আবার দিলে তুমি মোটা বুদ্ধির পরিচয়। অতি মোটা মোটা বিষয়গুলি মানুষ জানায় কথাতে। সূক্ষ্ম যা তা কেউ কথায় বলতেও যায় না, বলাও যায় না। কেউ যদি কাউকে ভালবাসে তা প্রকাশ পায় তার সমস্ত ব্যবহারে, দুগ্ধের স্বাদ যেমন ব্যাপ্ত করে' থাকে তার সমস্ত অবয়বে, মাধুর্য্য যেমন ব্যাপ্ত হয়ে থাকে সমস্ত ইক্ষুরসে।”

সুকুমার আবার বল্লে—“তুমি কি এমন দেখলে প্রভার মধ্যে?”

সুজাতা বল্লে—“তুমিও দেখতে পেতে যদি তোমার চোখ থাকত। তোমার বিলিতি পণ্ডিতেরা তোমাকে কি শিখিয়েছেন জানি না, কিন্তু আর যা শিখিয়ে থাকুন, চোখ দিয়ে দেখতে শেখান নি। কেউ

যদি কাউকে ভাল না বাসে তবে সে কি তার ঘরবাড়ী ছেড়ে এসে এমন একান্তভাবে সেবা করে একজন নিতান্ত অপরিচিতকে? প্রভাকে আমিই পাঠিয়েছিলুম তোমার দেখাশুনা করতে। এখন দেখছি যে তুমিই হবে এখন তার সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্যের ভার, সব চেয়ে বড় আনন্দের ভার। প্রভার মত স্নিগ্ধ মেয়ে বড় দুর্লভ। তার বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির অতি প্রাখর্য্য নেই; তার সৌন্দর্য্য আছে, নেই অভিমান; তার গতি আছে, সে গতি চায় কাউকে প্রদক্ষিণ করতে, চায় না বাঁধনহারা হয়ে ছুটে যেতে। তোমার বাবা-মা নেই, আমি আছি তোমার ছোট বোনের মত। আমারই উপর ছেড়ে দাও তোমাকে। আমারই এখন কর্ত্তব্য যে তোমার ভার এমন কারুর হাতে দেব যে তোমার জীবন সুখী করে' দেবে।"

সুজাতা সুকুমারের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল আর সুকুমার রইল চক্ষু বুজে অর্দ্ধতন্দ্রায়। সে যেন বেঁচে গেল সুজাতার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে।

এমন সময় শোনা গেল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। দরজার কাছে এসে জুতোটি খুলে নিঃশব্দে প্রভা প্রবেশ করল ঘরের মধ্যে। সে কোনদিনই সুজাতাকে সুকুমারের মাথায় হাত দিয়ে এমন আদর দেখাতে দেখে নি। সুকুমারও রয়েছে চোখ বুজে। সে বেশ একটু আশঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"ইনি কেমন আছেন?"

সুজাতা খিল্‌খিল্‌ করে' হেসে জড়িয়ে ধরলে প্রভাকে। বল্লে—"তোমার উনি ভাল আছেন গো, ভাল আছেন। এখন মাথার কাছে বসে একটু হাওয়া করো ত।"

বলে তাকে টেনে নিয়ে সুজাতা চেয়ারে বসাল। লজ্জায় প্রভার সমস্ত মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল। পিঠের কাপড় যেন উঠতে লাগল

মাথার উপর আবরণ করে' দিতে রাঙা মুখখানিকে। প্রভাত-সূর্য্যোদয়ে স্থলকমলিনীর মত ঝলক দিয়ে উঠল তার রূপের ফোয়ারা, মুখের স্থানে স্থানে অভিব্যক্ত হ'ল মুক্তাফলের ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু। মুখে বল্লে—"সুজাতা দি, তোমার কি ঠাট্টার একটা কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান নেই ?"

সেই দিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সুজাতার সঙ্গে প্রভার অনেক কথা চল্‌ল। প্রভার মন সুকুমারকে আশ্রয় করে' ছিল, কাজেই প্রভাকে বোঝাতে সুজাতার খুব দেরী লাগল না। সে প্রভাকে বুঝিয়ে দিলে যে অনেক পুরুষ নিজের মন না জেনে নানা স্থানে মুগ্ধ হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু তথাপি তাদের ভালবাসার আলোটি ম্লান হয় না। সুকুমারের হৃদয় কোমল, সে ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। সেই জন্যই প্রভা ও সুকুমার জীবনে পরস্পরকে সুখী করতে পারবে। সিদ্ধান্ত হ'ল যে পরদিন রাত্রের ট্রেণে সুকুমারকে নিয়ে তারা সকলে কলকাতা রওনা হবে। সুকুমার থাকবে প্রভার ওখানে। প্রভাই তাকে দেখাশোনা করবে। তারপর একটা শুভদিন দেখে তাদের শুভ বিবাহের ব্যবস্থা করা হবে।

সুকুমার চিরকালই আরামপ্রিয়। দেহচর্চ্চা ও লেখাপড়ার পরিশ্রমে তার জীবনীশক্তি হয়ে এসেছিল ক্লান্ত। তারপর দেখা দিল তার মনে প্রেমের বিলাস—জীবনে কাউকে সঙ্গিনী করে' স্বচ্ছন্দে কাল কাটাবে। যে দু'টি মেয়ে ছিল তার সামনে তাদের প্রত্যেকটির প্রতি পরস্পরাক্রমে হাত বাড়ালে। হাতে লাগল আগুনের ছ্যাঁকা। সুজাতার যেমন একটা মনের কাঠামো ছিল সুনির্দ্দিষ্ট, মঞ্জরীর মনের কাঠামোও ছিল তেমনি সুনির্দ্দিষ্ট, যদিও উভয়ের গতিপ্রণালী ছিল একেবারে বিভিন্ন। এদের কেউই পারলে না সুকুমারকে গ্রহণ করতে। হতাশায় ম্রিয়মাণ সুকুমার আকস্মিক অসুস্থতায় পড়ল জীর্ণ হয়ে।

প্রভাকে তার বরাবরই ভাল লাগত। বিশেষ, এবারকার শুশ্রূষায় প্রভা একেবারে দখল করে' নিয়েছিল সুকুমারের হৃদয়, তবু সুজাতার মনস্বিতায় সে একান্ত অভিভূত হয়েছিল এবং তারই অনুপ্রেরণায় একটা ক্ষীণ লড়াই করেছিল নিজের সঙ্গে। তাই সে চেষ্টা করেছিল প্রেম নিবেদন করতে সুজাতার কাছে। কিন্তু সুজাতার তেজস্বিতায় সে নিজের কাছে একেবারে ছোট হয়ে গেল। তাই যেমন সুজাতার কাছ থেকে প্রভার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব এল তখন সে আবার পড়ল ঘুমিয়ে, ঝড়ের অসহায়তার মধ্যে যেন পেল একটা আশ্রয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুকুমার ও প্রভার বিয়ে হয়ে গেছে। তারা বেশ মনের আনন্দে আছে এবং মধ্যে মধ্যে অধ্যাপকের বিদ্যামন্দিরে সুজাতার সঙ্গে দেখা করতে আসে। অভিনেত্রী ও গায়িকা হিসাবে মঞ্জরীর খ্যাতি চারি-দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রত্যহই তার নাম দেখা যায় কাগজে, কিন্তু কারও সঙ্গে তার পত্রাদির যোগ নেই, সে তার আপন জগতে খ্যাতি ও অর্থে ক্রমশঃ স্থূলতর হয়ে চলেছে।

কানাই, সুজাতা ও অধ্যাপকের কাজ চলেছে সুনিবদ্ধ প্রণালীতে। সুজাতা সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে করছে অধ্যাপকের সেবা, অধ্যাপকের মুখে সুজাতা যেন দেখতে পেয়েছিল জ্ঞাননিষ্ঠ পিতার প্রতিচ্ছবি। অধ্যাপকের সঙ্গে সুজাতার প্রায়ই নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা হ'ত ও এই সব আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সুজাতা প্রত্যহই প্রায় কোন না কোন রকমে তার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি, একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ নিজের কল্পনায় দৃঢ় করে' নিত।

একদিন অধ্যাপকের সঙ্গে সুজাতার কথা চলছিল। সুজাতা বল্লে—"আমাদের দেশের মেয়েরা মেয়েই হয়ে রয়েছে, মানুষ হ'তে পারছে না। অনাদিকাল থেকে পুরুষেরা তাদের নানারূপ স্তুতিগান করে' তাদের মেয়েলি ধর্ম্মটা এমন বাড়িয়ে তুলেছে যে মেয়ে ছাড়া মানুষ হিসাবেও যে তাদের একটা স্থান আছে এ কথা সম্বন্ধে তারা প্রায় কখনই সচেতন হ'তে পারে নি।"

অধ্যাপক বল্লেন—"তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না, তুমি মনুষ্যত্ব বলতে কি বোঝ?"

সুজাতা বল্লে—"দেহে ও মনে ঊর্দ্ধদিকে চলবার যে নিরন্তর একটা উৎসাহের স্পন্দন চলে তাকেই আমি প্রধানতঃ মনুষ্যত্বের ধর্ম্ম বলি। মনুষ্যত্বের পরিচায়ক অন্য যে সমস্ত ধর্ম্ম আছে সেগুলিকে আমরা এই ঊর্দ্ধশিখার প্রজ্জলন থেকে পেতে পারি।"

অধ্যাপক বল্লেন—"মানুষ এসেছে পশু থেকে, মানুষের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বুদ্ধি ও একটা অধ্যাত্মলোক। পশুলোকের সঙ্গে সংগ্রামে মানুষ হয়েছে জয়ী তার বুদ্ধির দ্বারা। মানুষের বর্ত্তমান যুগের ও পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাস হবে জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে শুধু বুদ্ধি মানুষকে বাঁচাতে পারে না, বাঁচাতে পারে শুভ বুদ্ধি। সেই জিনিষকেই আমরা শুভ বলি যা কেবল একের মঙ্গল চায় না, চায় সকলের মঙ্গল, যা স্বার্থের চেয়ে বড় স্থান দেয় পরার্থকে, নিষ্প্রয়োজনে যেখানে ওঠে আনন্দ। "অধ্যাত্ম" এই শুভ শব্দটির একটি প্রতিশব্দ। যখন এই অধ্যাত্ম বা শুভ প্রেরণা দ্বারা মানুষের বুদ্ধি ও কার্য্য প্রেরিত হয় তখনই দেখা যায় মনুষ্যত্বের বিকাশ।"

সুজাতা বল্লে—"আমার কথার সঙ্গে আপনার কথার পার্থক্য কোথায়?"

অধ্যাপক বল্লেন—"হয় ত কিছুই পার্থক্য নেই, হয় ত বা একটু আছে, সেটা নির্ভর করে তোমার কথার মধ্যে কতখানি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে তার উপরে।"

সুজাতা বল্লে—"কি রকম?"

অধ্যাপক বল্লেন—"বুদ্ধির কর্ম্মকেই আমি প্রধান কর্ম্ম বলি। আমাদের গায়ত্রী বলেছেন—ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। আবার অন্যত্র আছে—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন। এই বুদ্ধি কোন সময় বা দৈহিক কার্য্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, কোন সময় বা হয় না। যিনি কবি ও তত্ত্বদর্শী, জ্ঞানী ও তপস্বী, তাঁর দৈহিক পরিস্পন্দ কম, চিত্তের পরিস্পন্দ অত্যন্ত বেশী। এই বুদ্ধির পরিস্পন্দের সঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায় ভাবের পরিস্পন্দ, আনন্দের পরিস্পন্দ। কিন্তু তুমি এখানে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কি পার্থক্য করতে চাও তা আমি ভাল বুঝতে পারছি না।"

সুজাতা বল্লে—"আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে আমাদের দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকই ঘরকন্না, স্বামী পুত্র, সংসার নিয়ে তাদের সেই অত্যন্ত ছোট গণ্ডীর ঈর্ষ্যা দ্বেষ কলহ নিয়ে কাল কাটায়? কোন বড় জিনিষের দিকে তারা ছুটতে চায় না?"

অধ্যাপক বল্লেন—"আলোক-তরঙ্গের প্রতিটি উর্ম্মির জ্যা অতিশয় ছোট, শব্দের তরঙ্গের জ্যা তদপেক্ষা বৃহৎ, জলের তরঙ্গ হয় ত তার চেয়ে বৃহৎ, আবার এক শ্রেণীর electro-magnetic তরঙ্গ আছে যার প্রতিটি উর্ম্মির জ্যা বহু মাইল বিস্তৃত, কিন্তু এদের প্রত্যেকটিই সমানভাবে তরঙ্গধর্ম্মান্বিত। উর্ম্মির জ্যার লঘুতা ও বৃহত্ত্ব প্রযুক্ত তার চরিত্র ও স্বভাবের, তার ধর্ম্মের ও ক্রিয়ার অনেক বৈষম্য হয় বটে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও প্রকারগত পার্থক্য নেই।"

সুজাতা বল্লে—"আপনার এই উপমার তাৎপর্য্য কি ?"

অধ্যাপক বল্লেন—"মেয়েরা যা ছোট গণ্ডীর মধ্যে করে পুরুষেরা তাই করে তাদের আপিস আদালতে, তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রচালনা পদ্ধতির মধ্যে। ঈর্ষ্যা দ্বেষ মান দম্ভ অভিমান ছলনা নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অপরকে বিড়ম্বিত করা, এই সমস্ত লঘুতা ও অমানুষের কাজ ছোট গণ্ডীর মধ্যেও যেমন প্রবল হ'তে পারে বড় গণ্ডীর মধ্যেও তেমনই প্রবল হ'তে পারে, পরন্তু বড় গণ্ডীর মধ্যে পড়লে যে নিদারুণ ক্ষয় ক্ষতি ঘটতে পারে ছোট গণ্ডীর মধ্যে তা ঘটতে পারে না। একটি শিশু আর একটি শিশুব সঙ্গে একটা ছোবড়া নিয়ে মারামারি করতে পারে তার ফলে একটি শিশু অপরটিকে আঁচড়ে কামড়ে দিতে পারে। কিন্তু একটা জাতি যখন আর একটা জাতির সঙ্গে ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে করে লড়াই তার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বিনাশ ঘটে। বড় গণ্ডীর মধ্যে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ হয় প্রচুর, ছোট গণ্ডীর মধ্যে হয় তা অতি অল্প।"

সুজাতা বল্লে—"মেয়েদের মধ্যে রয়েছে একটা নির্জীবতা।"

অধ্যাপক বল্লেন—"যাকে তুমি নির্জীবতা বল তাও অনেক সময় লাগে জীবনের কাজে।"

সুজাতা বল্লে—"কি রকম ?"

অধ্যাপক বল্লেন—"এই যে বায়ুতে আমরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি এর অধিকাংশই nitrogen, অতি অল্পভাগই oxygen ; oxygen-এতেই চলে শ্বাস-প্রশ্বাসের উপকারিতা। oxygenই আমাদের রক্তের দূষিত ভাগকে দূর করে' রক্তকে করে পরিষ্কার—আমাদের শাস্ত্রে তাকে বলেছে 'বিষ্ণুপদামৃত'। কিন্তু nitrogen নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কোন কাজেই লাগে না। সে রয়েছে খালি oxygen এর দাহিকা

শক্তিকে নিবৃত্ত করার জন্য, সংযত করার জন্য। যদি nitrogen বাতাসে না থাকত পৃথিবী হয়ে যেত দগ্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে বিন্দুমাত্র না লেগে সে করেছে শ্বাস-প্রশ্বাসকে সম্ভব এবং সার্থক। আমাদের দেহে অনেক মর্ম্মস্থল আছে তার রস কদাচিৎ বিন্দুপ্রমাণ ক্ষরিত হয় দেহরক্তের মধ্যে, তাদের কোনও রাসায়নিক ক্রিয়া নাই দেহরক্তের উপর, শুধু তাদের সন্নিধিমাত্রে এই দেহরক্ত চেতনাধর্ম্মের নানা অনুকূল ক্রিয়ায় আপনাকে প্রকাশ করে; তাদের নিজেদের ক্রিয়া না থাকলেও তারা ক্রিয়াজনক। তেমনই যে নারীকে তুমি বলছ নির্জীব তার সেই নির্জীবতারই প্রয়োজন হয়েছে সংসারের গতিকে সামঞ্জস্যে সুন্দর করবার জন্য।”

সুজাতা বল্লে—“কি রকম ?”

অধ্যাপক বল্লেন—“ধর আমরা বর্ত্তমানকাল থেকে চলে গিয়েছি সেই মান্ধাতার যুগে যখন পুরুষের কুক্ষি ভেদ করে’ হ’তে পারত সন্তান, হাঁচিতে কাশিতে হ’তে পারত পুত্র উৎপন্ন। ধর সন্ততি-জননের জন্য স্ত্রীলোকের কোন প্রয়োজন নেই। পুরুষের ইচ্ছামত তার হয় ত কড়ে আঙ্গুল দিয়ে সন্তান উৎপন্ন হ’তে পারে। নারী নেই আছে খালি পুরুষ আর তাদের দাহিকাশক্তি, তাদের উগ্র প্রতাপ, তাদের উৎসাহ। কি হবে ফল ? যে সন্তানগুলি হবে সেগুলি হয়েই হবে বিনষ্ট ; কে করবে তাদের পালন ? হনুমান ব্যস্ত রইলেন তার লাঙ্গুল আছাড়ি পিছাড়ি করতে, ভীম রইলেন শালগাছ উপড়ে নিয়ে মারামারী করতে, প্রয়োজন হ’লে জ্ঞাতি ভাইএর রক্তপান করতে, পরশুরাম ছুটলেন তাঁর কুঠার নিয়ে, কার্ত্তবীর্য্য দশানন প্রভৃতিরা ছুটলেন তাঁদের নানা ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে। ফলে পৃথিবী হ’তে লাগল ধ্বংস। পুত্র যারা উৎপন্ন হ’তে লাগল পালনের অভাবে তারা হ’তে লাগল ধ্বংস।

ধরে' নাও বিনা পালনেই তারা বাড়ুক, রক্তবীজের ন্যায় এক ফোঁটা রক্তে ৬০০০০ ভূত পিশাচ উৎপন্ন হ'তে লাগল! ভেবে দেখ দেখি পৃথিবীর তা হ'লে কি গতিটা হ'ত।"

সুজাতা আবার প্রশ্ন করলে—"স্ত্রীজাতিকে দিয়ে এখানে আপনি কি কাজ করাতে চান ?"

—"আমি কিছুই করাতে চাই না, তারা কি করছে তাই চেয়ে দেখি। জননী ভগিনী প্রিয়ারূপে তারা মানুষকে বাঁধছে স্নেহের আকর্ষণে। তার দুর্দ্দাম দৈত্যস্বভাবকে তারা ঋজু করে' আনছে, মৃদু করে' আনছে, কোমল করে' আনছে। আবার নারী একদিকে করে যেমন সৃষ্টি অপর দিকে করে পালন। এই দুই বৃত্তিকে চরিতার্থ করবার জন্য বিধাতা সংযুক্ত করেছেন নারীকে বিবিধ নূতন অবয়বে, সেই জন্যই নারীর মধ্যে রয়েছে একটা স্বাভাবিক passivity ; মাথার চেয়ে তার হৃদয় বড়, হৃদয়ের সম্পদ না থাকলে স্নেহের প্রাচুর্য্য না থাকলে নারী পারত না বিধাতার এই দায়িত্ব সম্পাদন করে তুলতে। পুরুষ যেমন একদিকে নারীকে দেয় আশ্রয়, অপর দিকে সে তার আশ্রিত, বাল্যে ও কৌমারে সে নারীর স্নেহে বর্দ্ধিত, যৌবনে সে নারীর প্রেমে পায় আপনার বিশ্রাম, সঞ্চয় করতে পারে আপন শক্তি, বার্দ্ধক্যে আবার নিতে হয় আশ্রয় লালন পালনের জন্য। নারীর মধ্যে দুর্দ্দামতার অভাব আছে বলে'ই কোমলতার প্রাচুর্য্য আছে তাই সে পুরুষের শক্তির মধ্যে আনতে পেরেছে সামঞ্জস্য, সৃষ্টির মধ্যে স্থান দিতে পেরেছে মঙ্গলের। এই বিশেষ অভিব্যক্তির দিক বাদ দিলেও অন্যদিকে মনুষ্যত্বের জন্য নারী ও পুরুষের আপন আপন ক্ষেত্রের মধ্যে যে লড়াই করতে হয় সেটার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। পুরুষকে যেমন তার বড় ক্ষেত্রের মধ্যে হিংসা, ঈর্ষ্যা, অভিমান জয় করে'

মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করতে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়, মেয়েকেও তেমনি তার ছোট গণ্ডীর মধ্যে ঈর্ষ্যা, হিংসা, দ্বেষ জয় করবার জন্য সংগ্রাম করতে হয় প্রাণপণে। আর তুমি যে বলছ যে মেয়ে তার দৈনন্দিন রান্নাবাড়ার খবর ছাড়া আর কিছুতে গা মাখে না; কিন্তু সাধারণ পুরুষই বা কি করে ? আপিসের নির্দ্দিষ্ট কাজ, সেখানে উপরওয়ালাদের নিন্দা-চর্চ্চা, তাস, দাবা, আড্ডা, বাড়ীতে এসে শয়ন ভোজন ও বিশ্রাম—এর বাইরে কটা পুরুষেই বা কি করে ? এমন কি অনেক অধ্যাপকেরাও কিছু দিন খেটে করে' নেন ২।৪ খাতা নোট, কিংবা পাঠ্যজীবনে সংগৃহীত অধ্যাপকের নোট নিয়ে যান ক্লাসে, আর ৩০ বৎসর যাবৎ ছাত্রদের তাই যান আউড়ে—পরিণামে দাড়ি গোঁফ পাকিয়ে বড় প্রফেসর হয়ে মহা গৌরবে জীবন শেষ করে' দেন। মেয়েরাও দুবেলা জ্বালে চুলো, ঝাল ঝোল স্বক্ত চচ্চড়ি রেঁধে, খেয়ে ও খাইয়ে কাল কাটায় বিশ্রাম ও পরচর্চ্চায়, বড় লোকের গৃহিণী হ'লে ত কথাই নেই।"

স্বজাতা বল্লে—"মানলুম আপনার কথা যে সাধারণ স্তরের মধ্যে নারী ও পুরুষের পার্থক্য কেবল মাত্র এইখানে যে একজনের কর্ত্তব্য ছোট গণ্ডীর মধ্যে, আর একজনের কর্ত্তব্য বড় গণ্ডীর মধ্যে, এবং এই পার্থক্যেরও কারণ এই যে কঠোরতর ক্ষেত্রের মধ্যে প্রয়োজন হয় পুরুষের দৈহিক বলের ও তদনুরূপ সহ্যশক্তির, মেয়েদের করতে হয় সৃষ্টি ও পালন, তাদের স্নেহে রাখতে হয় পুরুষের উৎসাহের ভারকেন্দ্র। নইলে গড়ত না পরিবার গড়ত না সমাজ। একথাও আমি মানি যে স্বাভাবিক ১০জন পুরুষ যেমন ১০টা বড় বড় পরীক্ষা পাশ করে, আপিসে আদালতে অর্থ উপার্জ্জন করে তেমনি নারীও তাদের স্থান নিতে পারে অনায়াসে। বড় বড় যুদ্ধের সময় যখন পুরুষেরা যায় যুদ্ধে, তখন মেয়েরা নেয় পুরুষের হাত থেকে

সমাজের ভার, সমাজের কর্ত্তব্য। এমন কি যুদ্ধের মধ্যেও নারীসৈন্য-বাহিনীর সমাদর আরম্ভ হয়েছে। বর্ত্তমানে যে সেটা ঘটছে না সেটা বর্ত্তমানে একটা সমাজ ব্যবস্থা মাত্র। সমাজ গড়ে পুরাণো সমাজকে জোড়া তালি দিয়ে সারতে সারতে। এক রাশিয়া ছাড়া আর কোথাও নূতন করে সমাজ গড়বার চেষ্টা দেখা যায় নি। পুরাণোর উপর জোড়াতালি দিয়ে নূতনের দাবী চালাবার চেষ্টা করা হয় বলে এই সমস্ত সমাজে পুরাণো ও নবীনের একটা অসামঞ্জস্য থেকে যায়। হয় ত বা পুরাণোর মধ্যে একটা মন্দ বাদ দিতে গিয়ে দশটা ভালও পড়ে গেছে বাদ। আবার নূতন থেকে নেবার সময় একটা অতি ভাল জুড়ে দেওয়া হয়েছে যা পুরাণোর সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায় না, দেখতেও হয় অশোভন। এই রকম ব্যবস্থায় সমাজের যে অগ্রগতি ঘটে তাতে অনেক অসামঞ্জস্য হয় অনিবার্য্য।"

অধ্যাপক বল্‌লেন—"তুমি ঠিকই বলেছ। এই রকম আর একবার আধুনিককালে সমাজ গড়বার চেষ্টা হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের সময়। তাতে ঘটেছিল অনেক দুর্নীতি, কিন্তু সেই দুর্নীতি যে নূতন করে' সমাজ গড়বার চেষ্টাতেই ঘটেছিল এমন কথা বলা যায় না। এ দুর্নীতির কারণ ছিল এই যে দ্বেষ হিংসা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল চারিদিকে। কিন্তু মানুষের মধ্যে আছে একটা জন্মগত আলস্য। বাক্সে ফর্সা জামাকাপড় থাকলেও শুধু খুলে গায়ে দেবার আলস্যে অনেকে চলে দিনের পর দিন ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে। ছেঁড়া ছাতাটি ফেলে নূতন ছাতা কেউ কিন্‌তে চায় না। এই জন্য সমাজের অগ্রগতি চলেছে ঢিমে তেতালায়। নারীর কর্ম্মক্ষেত্র ছোট তাই তার দাবীও রয়ে গেছে এই রকম চিরন্তন কাল থেকে এবং সেদিক থেকে নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নি। বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র থেকে নারী

নিজে কোনও দাবী তোলে নি, পুরুষই তুলেছে সেখানে নারীর হয়ে দাবী তার নিজের প্রয়োজনে। জাতিতে জাতিতে যে বিরাট যুদ্ধ বেধেছে, পুরুষ একলা তার ভার সামলাতে পারবে না। তাই ইয়োরোপে পুরুষ চাইছে পারিবারিক ব্যবস্থা সঙ্কোচ করে' পুরুষের সহকর্ম্মী করে' দুর্দ্দিনে নারীকে তার সহায় করে' তুল্‌তে। দুর্দ্দিনের অবসানে সে আবার ফিরিয়ে দিতে চায় নারীকে তার গৃহক্ষেত্রে। কিন্তু এখন থেকে আস্‌তেই থাকবে দুর্দ্দিন-পরম্পরা এবং এমন দোটানা ব্যবস্থা কখনও চল্‌তে পারে না। তাই ভবিষ্যতের দিনে নারীও এসে দাঁড়াবে পুরুষের সঙ্গে উদার কর্ম্মক্ষেত্রে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার কৃপায় শিশুপালন প্রক্রিয়া হয়ে যাবে অত্যন্ত সহজ সেজন্য নারীর পরিশ্রমের ভার যাবে কমে। তবু নারী চিরকালই থাক্‌বে জননী, তাই সর্ব্বকালের জন্য সর্ব্বতোভাবে নারীকে পুরুষের সহকর্ম্মিণীরূপে টেনে আনা কখন সম্ভব হবে না। তা ছাড়া নারী যদি উঠতে চায় পুরুষের সহধর্ম্মী হয়ে এবং পুরুষও যদি টান্‌তে চায় সেই পথে তবে পুরুষ হবে তার ভারকেন্দ্র থেকে চ্যুত।"

সুজাতা বল্‌লে—"পুরুষেরাই ত স্তুতি করে' করে' নারীর অভিমান দিয়েছে বাড়িয়ে।"

অধ্যাপক হেসে বল্‌লেন—"কেউ কারো স্তুতিগান সহজে করে না। একথাও মনে কোরো না নারীর বিরুদ্ধে একটা মস্ত ষড়যন্ত্র করে' পুরুষেরা তাকে মিথ্যা মোহের মধ্যে আলস্যে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেয়। পুরুষ নারীকে স্তুতি করে তার আপন গরজে। সে চায় এই পৃথিবীর মৃত্তিকালোকের মধ্যে একটি কল্পলোক সৃষ্টি করতে। তপ্ত মরুভূমিতে পথিকের যেমন প্রয়োজন হয় একটি ওয়েসিসের—তেমনি পৃথিবীর দুর্দ্দান্ত সংগ্রামের মধ্যে মানুষ চায় একটি ছায়ার কুঞ্জবীথি

রচনা করতে, যেখানে হৃদয় পেতে পারে একটি নিরন্তর বিশ্রাম, যেখান থেকে সে পেতে পারে তার inspiration ; সেই আন্তর প্রয়োজনে মানুষ আঁকে ছবি, লেখে কবিতা, গাঁথে ছড়া, বানায় উপকথা ; সেই প্রয়োজনের বশেই কবির কাব্য মুখরিত হয়েছে নারীর স্তুতিগানে, শিল্পীর বর্ণিকা ফুটিয়ে তুলেছে নারীর সৌন্দর্য্য, নারীর যৌবন।”

সুজাতা বল্‌লে—“কিন্তু আমার প্রশ্নটা পড়ে' গেল চাপা। আমি বলছিলুম একথা যে, কোনও নারী যদি তার জীবনে পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে সংসার করা ছাড়া অন্য কোনও রকম আত্মপ্রকাশের দাবী অনুভব করে তবে সে কি করবে ?”

অধ্যাপক বল্‌লেন—“তাকে নিজের মধ্যে বেশ করে যাচাই করে' দেখতে হবে যে এটা কি তার সত্যকার ভিতরকার দাবী না অল্প মূল্যে কোনও মান খেতাব কিনবার দাবী ? যদি তা একটা ছোট চাহিদার দাবী হয় এবং তার জন্য তাকে যদি ত্যাগ করতে হয় নারী জীবনের স্বাভাবিক সঙ্গতি তবে আপন ছোট চাহিদার নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জেগে উঠবে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির চাহিদা। তখন জীবন তার পূর্ণ হয়ে উঠবে অশান্তিতে।”

সুজাতা আবার বল্‌লে—“কিন্তু বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করেও যদি কেউ এইটেই যথার্থ অনুভব করে যে তার আত্ম-প্রকাশ বা আত্ম সৃষ্টির দাবী সবচেয়ে বেশী তাহলে তারও কি উচিত হবে সাধারণ মেয়েদের মধ্যে জীবন যে সঙ্গতি লাভ করে সেই সঙ্গতিকেই প্রধান স্থান দিয়ে নিজের দাবীকে করবে গৌণ ?”

অধ্যাপক বল্‌লেন—“না, তা কখনোই মনে করি না। সমস্ত সাধারণ নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। জগতের ইতিহাসে এরকম নারীর সংখ্যা কম হ'লেও একেবারে বিরল নয়। তাঁরা মানুষের জ্ঞান

বিজ্ঞান, পুণ্য, ধর্ম্ম এমন কি প্রেম ও স্নেহ প্রভৃতির বৃত্তিও দিয়েছেন উঠিয়ে একটা উচ্চ ভূমিতে, এবং সেখানে তাঁরা স্থান নিয়েছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধকদের সঙ্গে।"

সুজাতা আবার বল্‌লে—"আপনি কি মনে করেন যে সাধনার সিদ্ধির জন্য এরকম সাধককে আন্‌তে হবে এমন কঠিন সংযম, যাতে হৃদয় হয় স্নেহহীন, কঠিন, বিশুষ্ক ?"

অধ্যাপক বল্‌লেন—"না, কখনোই তা বলি না। হৃদয়ের স্নেহ-ভাণ্ডারের রসে নিষিক্ত না হ'লে কোনও বিদ্যা, কোনও কর্ত্তব্য, কোনও মহৎ প্রচেষ্টা সফল হ'তে পারে না। স্নেহ বা প্রীতি যে শুধু মানুষকে অবলম্বন করেই ক্ষরিত হয় তা নয়, প্রীতি রস একটা আন্তর ধাতু, ক্ষরিত হ'তে পারে তা কেবল মাত্র অগৌণ কল্পনাকে লক্ষ্য করে'। প্রীতিতে করি আমরা সৃষ্টি, এবং যা আমরা সৃষ্টি করি তার উপর বর্ষণ করি আমাদের প্রেম। বহির্বস্তুর প্রতি আমাদের প্রেরণা ঘটতে পারে প্রবৃত্তির কিন্তু প্রীতি বা স্নেহের বর্ষণ হয় কেবলমাত্র অন্তঃসৃষ্টির উপর। মা যখন তার শিশুকে করেন স্নেহ, তখন শিশু একটি বাহিরের শিশু নয়, সে শিশু তাঁর আন্তর ধাতুর সৃষ্টি। তাই শিশুর মৃত্যু হ'লেও প্রীতি বা স্নেহের অভাব ঘটে না। আমাদের আত্মপ্রকাশের জন্য যা আমরা সৃষ্টি করি তা আমরা করি প্রেম-রসে সিক্ত। প্রেমরস্ ছাড়া সৃষ্টি হয়ও না বাঁচেও না। যে সাধনার মধ্য দিয়ে কেউ আত্ম-প্রকাশ করতে চায় সেই সাধনা মূর্ত্তিমতী হয়ে উঠ্‌বে তার কল্পনায় এবং তার প্রেম করবে তাকে সঞ্জীবিত। তবেই সম্ভব হ'তে পারে সেই সাধনায় সৃষ্টি।"

সুজাতা আবার প্রশ্ন করলে—"কিন্তু মানুষের হৃদয়ের প্রেম সহজে কি শুধু এক মুখী হয়ে চলতে পারে ?"

অধ্যাপক বল্‌লেন—"না, তা কেন হবে, প্রেমে প্রেমে ত বিরোধ নেই। সেইখানেই প্রেম দেখা দেয় তার যথার্থ উজ্জ্বলতায় যেখানে একটা প্রেম বাধা দেয় না অন্য প্রেমকে। প্রেমে প্রেমে আস্‌তে পারে একটা আপাত বিরোধ কিন্তু সে বিরোধকে অতিক্রম করে' প্রেম দেখা দেয় একটা গভীরতর মঙ্গলতর রূপে। যেমন চিন্তায় চিন্তায় আসে বিরোধ, সে বিরোধের কারণ হচ্ছে দেশ, কাল, অবস্থা ও উপাধির বিরোধ। চিন্তার যথার্থ গতি বিরোধের দ্বারা স্থগিত হয় না, সে আপনাকে প্রকাশ করে তার মহত্তর অভিব্যক্তিতে। বিরোধ কেবল মাত্র সঙ্কুচিত করে' তোলে এই অভিব্যক্তির পথ।"

সুজাতা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"প্রেমে প্রেমে বিরোধ হবে না কেন? মানুষের স্ত্রীপুত্রাদি সংসার যাত্রার সঙ্গে কি অন্য আকর্ষণের বিরোধ ঘটে না? স্বাদেশিক হিতৈষণার সঙ্গে কি পারিবারিক প্রেমের বিরোধ হয় না?"

অধ্যাপক বল্‌লেন—"আমি ত বলিনি আপাত বিরোধ ঘট্‌বে না। কিন্তু বিরোধটা স্থায়ীও নয়, স্বাভাবিকও নয়। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, প্রেম বল্‌তে আমি বুঝি হৃদয়ের দ্রুতি, হৃদয়ের ভাব-নিষেক। সেই প্রেম যখন প্রতিবিম্বিত হয়ে পড়ে বাইরের কাজে তখন বস্তুভেদে বিষয়ভেদে তাতে আস্‌তে পারে বিরোধ। কারণ একই সময়ে বিভিন্ন রকমের দু'টী কাজ বাইরের জগতে করা সম্ভব নয়। কেউ দেশহিতৈষণার জন্য এমন কাজ কর্‌ল যাতে হবে তার প্রাণ দণ্ড, এমন কাজের সঙ্গে তার স্ত্রীপুত্রের প্রতি প্রেমের অনুকূল যে কার্য্য ছিল তার সঙ্গে তার বিরোধ ত ঘট্‌বেই। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে দেশের প্রতি প্রেমকে যে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে তার এই প্রেমের মাহাত্ম্য বহুগুণ বেড়ে যাবে, বহুগুণ উদার ও সহনীয় হয়ে

উঠ্‌বে যখন সেই প্রেমের পশ্চাতের পটভূমির ছায়ায় এসে দাঁড়াবে তার স্ত্রীপুত্রের প্রতি হৃদয়ের আক্রন্দন। সে আক্রন্দন গভীর করে' তুল্‌বে তার প্রতিধ্বনিতে তার দেশের প্রতি প্রেমের সুরটি, তা উজ্জ্বল করে' তুল্‌বে তার সেই প্রেমের ছবি। বিরোধের দ্বারা প্রেম প্রকাশ পাবে একটা অভূতপূর্ব্ব মহিমাতে। এই জন্যই ভগবান শাক্যমুনি যখন সমস্ত সুখ সম্ভোগ ছেড়ে সর্ব্ব সত্ত্বের কল্যাণের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তা স্বর্ণাক্ষরে উদ্ভাসিত করে তুলেছে যুগান্ত থেকে যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রেমের মহনীয় কীর্ত্তি।"

সুজাতা বল্‌লে—"কিন্তু অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানচর্চ্চায় ত অসাধারণ স্থান লাভ করেছেন, দেশ হিতৈষণাতেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন অথচ তাঁদের ত স্ত্রীপুত্রাদি আছে। আপনিও ত করেছিলেন বিবাহ।"

অধ্যাপক হেসে বল্লেন—"এই ত মজা। প্রথম বয়সে ত মানুষ নিজেকে চিনতে পারে না। এইটুকুমাত্র বোঝে যে কারখানায় একটা কাজ চলছে, শব্দ শোনে শুধু হাতুড়ি পেটার, কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা কারখানায় বসে' কি গড়ছেন তার কিছুই পাওয়া যায় না টের। যৌবন ধর্ম্ম কতকগুলি প্রবৃত্তিকে করে মুখর; চারিদিক থেকে সমাজের আসে চাপ। অবসরের হয়ত অভাব ঘটে না, হয়ে যায় বিয়ে, আসে পুত্রকন্যা, তাদের প্রতি পড়ে ভালবাসা, চলে সংসারযাত্রা। হঠাৎ একদিন অনুভব করে জ্বলন্ত সীসা চলেছে ধমনীর মধ্য দিয়ে, ছুটে পড়ে সে কাজে। ক্রমশঃ সেই প্রেমই হয়ে পড়ে বড়। এতদিন যে প্রেম জোগাচ্ছিল খোরাক, তা হয়ে যায় একান্ত গৌণ, হয়ত ঝরে'ও বা পড়ে কাঁধ থেকে। চলে সে নূতন সূর্য্যালোকের সন্ধানে। তেঁতুলের বীচি থেকে অঙ্কুর হ'তে দেখেছ, দেখেছ লাউকুমড়োর বীচি

থেকে অঙ্কুর হ'তে? বীজের ভিতরকার দু'টি খোলা থেকে অঙ্কুর পাচ্ছিল তার খাদ্য। তাদেরই কাঁধে করে' সে অঙ্কুর ওঠে মাটি ফুঁড়ে', তারপর কিছুদূর উঠলেই সে সন্ধান পায় সূর্য্যালোকের, তার ডাঁটা থেকে বেরোয় পাতা। বীজ থেকে অঙ্কুর হওয়ার সময় সে যে দু'টি খোলা থেকে পাচ্ছিল খাদ্য, যাদের কাঁধে করে' সে উপরে উঠেছিল তার সহায় মনে করে', তারা হয়ে যায় একান্ত নিষ্প্রয়োজন, ঝরে' পড়ে তার কাঁধ থেকে। তেমনি মহাপুরুষ চলেন মহাপ্রেমের সন্ধানে, সংসারের বোঝাটা বাঁধা থাকে তাঁর চাদরের সঙ্গে। তাতে হয় ত আনতে পারে পরিবারের অসন্তোষ ও অনর্থ। তাঁর পরিবারের লোক তাঁকে পায় না এবং স্ত্রী যদি সমঝদার না হন তবে একটা দারুণ বিভ্রাটও ঘটে' যেতে পারে।"

সুজাতা বল্লে—"তা হ'লে পূর্ব্বে থেকে যে সচেতন হয় তার পক্ষে কোন পারিবারিক বন্ধনে না যাওয়াই ভাল।"

অধ্যাপকের চক্ষু একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি হেসে বল্লেন—"বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে।"

সুজাতা আবার প্রশ্ন করলে—"কিন্তু মেয়েদের পক্ষে এমন কি বিশিষ্টতা দেখলেন?"

অধ্যাপক বল্লেন—"পুরুষের পক্ষে পরিবার বন্ধন যে রকম মেয়েদের পক্ষে পরিবার বন্ধন সে রকম নয়। একটা দার্শনিক উপমার কথা মনে হ'ল, পুরুষ ও প্রকৃতির বন্ধন। পুরুষও প্রকৃতির সঙ্গে বাঁধা, প্রকৃতিও পুরুষের সঙ্গে বাঁধা। এই নিয়ে চলেছে বিরাট বিশ্বজগতের বৃহৎ পরিবার-; কিন্তু বাঁধন সত্ত্বেও পুরুষ পড়ে না বাঁধা, কারণ তাকে কিছুই করতে হয় না। প্রকৃতিই করেন সৃষ্টি, তিনিই করেন পুরুষের মনোরঞ্জন, জোগান তার ভোগ। মেয়ে যখন সংসার করে তখন

সে গর্ভে ধারণ করে পুত্রকন্যা, তাদের করে সৃষ্টি, পালন করে তাদের, পালন করে স্বামীকে। সেইটিই হ'ল মেয়েদের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এতে পরিশ্রম, মনোযোগ ও অধ্যবসায় কম লাগে না। কাজেই এই সমস্ত চালাবার পর কোন মেয়ের পক্ষেই কোন বড় কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় না। যাদের এদিকে রতি আছে, আনন্দ আছে, তাদের পক্ষে পরিবারের কর্ম্ম ভাল করে' করাও বড় কম কাজ নয়, যদিও এর বিদায় নগদ এবং ভবিষ্যতের খাতায় কিছু জমা রাখা যায় না।"

সুজাতা বল্লে—"আপনার কথার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে আমি যা বুঝলুম তা এই যে যে মেয়েরা চিরাচরিত পথকে অতিক্রম করতে চায় তারা পরিবার গঠন করতে পারে না।"

অধ্যাপক বল্লেন—"আমার কথাটার তাৎপর্য্য অনেকটা তাই। ভালবাসা মনের ব্যাপার, তা এক রকম বিধিনিষেধের ক্ষেত্রের বাইরে। কিন্তু মেয়েদের পক্ষে ভাল করে' পরিবার চালাতে অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হ'তে পারে, কাজেই কোন বড় কাজের সঙ্গে সেটা করা চলে না।"

এমনি নানা বিষয়ে অধ্যাপকের সঙ্গে কথা চল্‌ত। কানাইয়ের সঙ্গেও সুজাতা ক্রমশঃ অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে, কিন্তু উভয় পক্ষেই সেই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে একটা দাঁড়ি টানা আছে যে এর বেশী আর নয়।

একদিন এল প্রভা। বাংলা দেশে একটা কথা আছে যে বিয়ের জলের ছিটে গায়ে পড়লে মেয়েদের লাবণ্য ছোটে ফোয়ারার মত। প্রভাকে দেখলে এ কথার সত্যতা প্রমাণ হ'ত। নিদ্রার পর প্রভাতের ঝলমলে আলোতে যখন চেয়ে দেখি পুষ্পভারবিনম্রা স্থলকমলিনীর দিকে, যখন চেয়ে দেখি যে বড় বড় অরুণাভ পুষ্পে সে বল্লরীটির সমস্ত

পত্রপুঞ্জ গেছে ডুবে,' খালি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বালসূর্য্যপ্রতিস্পর্দ্ধী বল্লরীর লাবণ্য, তখন যে আমরা শুধু আনন্দিত হই তা' নয়, সেই পুঞ্জীভূত লাবণ্যে আমরা হই বিস্মিত। প্রভার মধ্যে আজ যে লাবণ্য উদ্দীপ্ত ও হর্ষোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তা যেন একা প্রভার নয়। নারী যখন আপন প্রিয়জনের সহিত সঙ্গত হয়ে পুঞ্জীভূত আদিম আনন্দকে আপন রক্তোচ্ছলতার সহজ লীলায় প্রকাশ করে আপন প্রসন্ন মুখবর্ণে, তখন মনে হয় যেন সে লাবণ্য শুধু তার নয়। সমস্ত অনাদিকালের বধূলোকের লাবণ্য যেন স্বর্গলোক থেকে নেমে আসে নবপরিণীতার মুখের উপর। বধূবরণের সময় প্রতিবেশিনী সমস্ত বধূরা একত্র হয়ে বরণ করে' তোলে নববধূকে বধূলোকের সমৃদ্ধির রাজ্যে। সেই একদিনের স্ত্রী-আচারে সমস্ত বধূরা মিলিত হয়ে আনন্দে যে মায়ার খেলা খেলে সে মায়া শুধু সেই রাত্রের নয়। সেই মায়াস্রোতের মধ্য দিয়ে অনাদি-কালের বধূলোকের সৌভাগ্য মণ্ডিত করে' তোলে নববধূর শ্রীকে। এই বধূলোকের সৌভাগ্যের মধ্যে আমরা সাক্ষাৎ পাই মহামায়ার মায়াসৃষ্টির। এ রূপ উজ্জ্বল, বিস্ময়কর, পবিত্র, এ আবাহন করে' আনতে পারে কবির কাব্য ও শিল্পীর শিল্প।

সিঁদুরের ফোঁটায় ডগমগ করছে প্রভার কপাল, সিঁথিতে সুবিন্যস্ত হয়েছে সিন্দুর রেখা, নয়নপল্লবের অধঃপ্রান্তে বক্রীকৃত চারুচাপের ন্যায় আয়ত হয়েছে কজ্জলরেখা,—যেন ভ্রমর পংক্তির মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জিত হচ্ছে কমল-লক্ষ্মী, যেন অন্ধকারের পরপার থেকে ছুটে আসছে আলোকরেখা তার উদ্ভ্রান্ত হর্ষোজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে এই বিস্মিত মহাভুবনের উপরে। চম্পকাভ গণ্ডের প্রতিস্পর্দ্ধিতায় দুলছে তার কর্ণাভরণ, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে যেন জ্যোতির পরিবেষের মধ্য দিয়ে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে তার মুখকান্তি। সর্ব্ব অঙ্গে আভরণ করছে তার ঝল্‌মল্। পরিধানে তার

নানাবর্ণে ঝল্‌মল্‌ করা বেনারসী শাড়ী। ছুটে এসে দাঁড়াল সে সুজাতার সামনে। সুজাতা তখন সবে বৈকালিক কৃত্য সেরে বেরিয়ে এসেছে তাদের প্রাঙ্গণে। তার পরণে একখানা অতি সাধারণ শুভ্র বস্ত্র, তার পাড়ের বহর দেড় ইঞ্চির বেশী নয়। তবে তার মুখ আনন্দ-পূর্ণ, কিন্তু সে আনন্দের গভীরতা লক্ষ্য করতে পারে সেই ডুবুরী যে গভীর জলে ডুব দেয় মুক্তার সন্ধানে। তার সমস্ত অঙ্গই প্রায় নিরা-ভরণ, কেবল দু'হাতে দু'টি সোণার রুলি; কাণে দুলছে দু'টি ছোট কর্ণাভরণ। সর্ব্ব অঙ্গে কোথাও কোন প্রসাধন নেই, যৌবনের কোন বিলাসবিলোল চেষ্টা নেই। দু'টি আয়ত চক্ষু, তা যেন এখনও মৃগশিশুর ন্যায় সরল। চক্ষু দু'টির মণি থেকে বেরিয়ে আসছে যে উজ্জ্বল আলোকশিখা, তার স্নিগ্ধতা ঠাকুরের আরতির দীপের ন্যায়—ধূপধূমাকুলিত বেদীর সমীপবর্ত্তী একটি দীপশিখা যেন নিয়ত আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছে ধূপের ধূমের কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়ে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্ত্তি। সে আলো সূর্য্যের আলোর ন্যায় দীপ্ত নয়, প্রখর নয়, বহুবর্ণের মধ্য দিয়ে করে না সে আপনাকে বিকীর্ণ। সে আলো যেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোন গহ্বরের সম্মুখে, তার রশ্মিগুলি প্রবাহিত হচ্ছে গহ্বরের গুহাহিতকে নিরীক্ষণ করবার জন্য। সে আলো স্পন্দমান অভ্যন্তরের ধ্যানলোকের মধ্যে, নাগলোকের মণিরেখার ন্যায় তা উজ্জ্বল ও শান্ত। সে আলো অধরাকে ধরবার জন্য। রাত্রির শেষ যামে পূর্ব্বদিগ্বিভাগে যখন শুকতারা উদিত হয়ে সূচিত করে' দেয় তা'র পশ্চাৎ-প্রবাহী অনাবিষ্কৃত আলোক রাশি, তেমনিই ছিল তার হাসিটুকু। তা প্রকাশ করত তার অন্তরের স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা, প্রভার ঔজ্জ্বল্যে নয়, ইঙ্গিতের গভীরতায়। সমস্ত দেহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল গঙ্গোত্রীধাবিনী ভাগীরথীর পুণ্যবারিধারার সমৃদ্ধি, আবহন করে'

আনছিল তার সঙ্গে সমস্ত তটচারী তপস্বীদের মৌনতপস্যার সঙ্কেত। আমরা জানি যৌবন কেমন করে' প্রবেশ করে প্রৌঢ়দশায় এবং প্রৌঢ়-দশা কেমন করে' প্রবেশ করে বার্দ্ধক্যে, কিন্তু আমরা জানি না যৌবন কেমন করে' প্রবেশ করে বাল্যে। এ যেন সেই শুচিতা যেখানে যৌবন তার অঙ্গে ঠাঁই না পেয়ে ফিরে যেতে চাইছে তার বাল্যের মাধুর্য্যে।

প্রভা এসে জড়িয়ে ধরলে সুজাতাকে, হর্ষে উল্লাসে উচ্ছল। এক মুহূর্ত্ত সুজাতা তাকিয়ে দেখলে প্রভার মুখের দিকে। বুকের কোন্‌খানে যেন হঠাৎ এক ঝলক রক্ত এসে চাপ বাঁধলে, নিমেষের জন্য সে হৃদয়ে অনুভব করলে একটা বেদনা, কিন্তু সে নিমেষের জন্য। তারপরেই সে কালোচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরলে প্রভাকে তেমনিই অনাবিল আনন্দে যেমন একটি শিশু ধরে আর একটিকে। সুজাতা জিজ্ঞাসা করলে প্রভাকে—"কেমন আছিস্?"

প্রাণের সমস্ত উচ্ছ্বাস বেরিয়ে এল প্রভার মুখে। সে বল্লে—"খুব ভাল আছি।"

সুজাতা আবার জিজ্ঞাসা করলে—"সুকু-দা' কেমন আছে রে?"

প্রভা বল্লে—"উনি আবার কেমন থাকবেন! ভেলায় ভেসে বেড়াচ্ছেন। ও লোক ত কখনো সাঁতরাতে পারত না, ভাগ্যিস্ ওঁর জুটে গেল একটা ভেলা।"

সুজাতা হেসে জিজ্ঞাসা করলে—"ভেলায় উঠিয়ে ভাল করে' বেঁধে ফেলেছিস্ ত?"

প্রভা আবার খিল্ খিল্ করে' হেসে বল্লে—"পুরুষমানুষগুলো ত অতি সস্তা। ফিরিওয়ালারা যেমন বাড়ী বাড়ী ডেকে বেড়ায় 'চাই তপ্‌সে মাছ,' উঠিয়ে নিলেই হ'ল। ওরা ত ওদের পসরা নিয়ে সর্ব্বদাই মেয়েদের দরজায় দুরজায় ঘুরে' বেড়াচ্ছে।"

সুজাতা একটু মুখ টিপে হেসে বল্লে—"ভারী ত ফাজিল হয়ে উঠেছিস্! উঠিয়ে নেওয়া সহজ হতে পারে, কিন্তু ধরে' রাখা শক্ত। কই মাছ হাঁড়িতে রাখলে দেখবি রাত্রিদিন লাফাচ্ছে, তারপর ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল বাইরে, নর্দ্দমা দিয়ে কোথায় গেল তার খোঁজ নেই।"

প্রভা আবার হেসে বল্লে—"ছোট একটা হাঁড়ির মধ্যে নড়তে চড়তে না পারলে কি করবে বেচারা?"

সুজাতা বল্লে—"ছোট হাঁড়ি কেন, প্রকাণ্ড পুকুরের জলের মধ্যে ফেললে মন খুসী হয় না, বর্ষা নামলে আনন্দে নাচতে নাচতে পুকুর ছেকে ছিট্‌কে এসে পড়ে নর্দ্দমার মধ্যে।"

প্রভা বল্লে—"সেখানে ত দুর্গতির শেষ থাকে না।"

সুজাতা আবার বল্লে—"পুকুর ত হারায় তাকে জন্মের মত, সে ত আর তাকে পায় না।"

প্রভা হেসে বল্লে—"আমার উপমাটার চাইতে তোমার উপমাটাই ঠিক হ'ল। তপ্‌সে মাছের মত ওদের উঠিয়ে নেওয়া যায় না। ওরা কই মাছের মত, গায়ে থাকে পিছল্, ধরতে গেলে মারে কাঁটা, কিন্তু তবু ত মেছুনীরা এক নৌকো জলের মধ্য থেকে ওদের ধরে' বার করে হাত দিয়ে। কৌশল জানা চাই।"

সুজাতা মুখ টিপে হেসে বল্লে—"তুই বুঝি কৌশলটা আয়ত্ত করেছিস্?"

একটু হেসে গর্ব্বিতভাবে প্রভা বল্লে—"করি নি ত কি! কিন্তু এ-কথা সে-কথায় প্রায়ই তোমার কথা বলেন।"

সুজাতা একটু গম্ভীর হয়ে বল্লে—"দিদির উপরেও বুঝি হিংসা হচ্ছে?"

প্রভা বল্লে—"ও বাবা, এ কি যেমন তেমন ধন?, এ নিয়ে হিংসা

করতে পারি সকলের সঙ্গে। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেব ?”

সুজাতা বল্লে—“বেশ ত, তোর ধন তুই বাক্সে পুরে রাখিস্, কেউ যাবে না সেখানে লোভ করতে। তা তুই এখন তোর সে ধন নিয়ে করবি কি ?”

প্রভা আবার হেসে বল্লে—“সব করব। ধোওয়াব, মোছাব, খাওয়াব, শোওয়াব, পূজো করব, আবার আন্‌ব ধূলোর মধ্যে টেনে—আমার যা ইচ্ছে তাই করব”—বলে’ খিল্ খিল্ করে’ হাসতে লাগল।

সুজাতা এই পতিসৌভাগ্যবতীকে দেখে’ খুসী হ’ল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ’ল যে এ ত প্রেম নয়, এ ত ভোগ আর খেলা। একটা ভোগের বস্তুতে মানুষ যখন তার দখলী স্বত্ব বিস্তার করে তখন ভোগের আনন্দের চেয়ে দখলী স্বত্বের আনন্দ হয় বেশী। আমারই এ আছে দখলে এই অভিমান থেকেই ভোগের আস্বাদ যায় বহুগুণ বেড়ে। তার মনে পড়ল মঞ্জরীর সঙ্গে তার একদিন যে আলোচনা হয়েছিল যে মেয়েরা চায় পুরুষকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করতে, তার শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে বিভক্ত করে’ তাকে বেঁধে রাখতে চায় ব্যাপ্ত করে’ তার আপন পরিধেয় বস্ত্রের মত। স্বামীর ধন সম্পত্তি, লোক জন, মান, গৌরব, সমস্ত ব্যাপ্ত করতে চায় আপন নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে। এই ব্যাপ্তির মধ্যে আত্মার ব্যাপ্তি কোথায় ? এর মধ্যে ছোটা নেই, আছে মুঠোর মধ্যে পাওয়ার পরিসমাপ্তি। সোণার চক্‌চকে বাটিতে চেতনা ও হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ মণি পড়ে ঢাকা, শুধু বাটির চাকচিক্যে ও ঝকমকিতে মোহমুগ্ধ হয় মন, পাখীর ডানা হয় পঙ্গু সোণার খাঁচাতে। তার মনে হ’ল, যেখানেই আমাদের মনে আসে ‘এটি আমার’ এই অভিমান, সেখানেই মনকে নিয়ে আসা হয় জড় করে’; জড়বস্তু পঙ্গু, অক্ষম সে চলতে, তাই তাকে দখল করতে চায় সচেতন পুরুষ। যে কারুর

দখলের মধ্যে আপনাকে দেয় ছেড়ে সে হারায় তার চেতন-স্বভাবকে। অধ্যাপক অবিনাশ বাবু একদিন তাকে বলেছিলেন যে আমাদের এই দেহটা হচ্ছে মন ও জড়বস্তুর মধ্যে একটা সেতু। দেহের মধ্যে আছে জীবনীশক্তি, তার কাজই হচ্ছে এই যে সে জড়বস্তুকে করবে আক্রমণ, করবে আত্মসাৎ, লাগাবে আপন কাজে। একটা চারা গাছ তার শিকড়কে পাঠিয়ে দেয় ভূগর্ভে, সেখান থেকে সে সংগ্রহ করে রস, তার খাদ্য এবং তাকে পরিণত করে আপন ধাতুতে এবং প্রেরণ করে নানা প্রণালীতে শাখা প্রশাখার মধ্যে। তার পাতায় সে সংগ্রহ করে বাতাসের কার্ব্বন, তাকে পরিণত করে তার দেহধাতুতে, শর্করায়। এমনি করে' জড়কে করে সে আত্মসাৎ। জড় রয়েছে যুক্ত হয়ে তার জীবনের সঙ্গে, জড়ের আপন ধর্ম্ম সেখানে থেকেও নেই, সে তাকে ব্যাপ্ত করেছে প্রাণের কাজে, পরিণত করেছে তাকে গাছের জীবনের মধ্যে, ঘটেছে সেখানে একটি অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধের মধ্যে স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য। কিন্তু মন যখন কোন জড়কে ধরে, চেষ্টা করে তাকে আত্মসাৎ করতে, সে পারে না তাকে বিলীন করে' দিতে আপন চেতনালোকের গতির মধ্যে। জড়কে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে সে আপনি হয়ে পড়ে জড়। একটা আলু যখন আমরা খাই তখন সে আলু দেহের মধ্যে প্রবেশ করে' হারিয়ে ফেলে তার নামগোত্র। দেহের জীবনী-শক্তির পেতে হয় না কোন উদ্বেগ তার জন্য। সে তার পরম আত্মীয়, সে আছে কি নেই তার কোন খোঁজ রাখবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই একটা আলুকে যদি মুঠো করে' ধরি তা হলে সেখানে তাকে রাখবার জন্য পেশীগুলোকে শক্ত করে' জড় করে' রাখবার দরকার হয়। সেটা জীবনীশক্তির বিরুদ্ধ ক্রিয়া, তাই বেশীক্ষণ তা করা যায় না, হাত আসে ঝিব্‌ঝিব্‌ করে', পেশীগুলি করে বিদ্রোহ। কিন্তু একটা পাথর

থাকে আর একটা পাথরের উপর অনাদিকাল ধরে'। তার স্থিতিতে কোন চাঞ্চল্য নেই, প্রযত্ন নেই, তাই তার স্বভাব। তার মধ্যে রয়েছে inertia। কিন্তু জীবনীশক্তিতে নেই inertia, সে দাঁড়িয়ে কাউকে আঁকড়ে ধরতে পারে না। আমি যদি আমার হাতখানা উপরের দিকে দিয়ে উর্দ্ধবাহু হয়ে বসে' থাকি, যেমন বসে' থাকে তপস্বীরা, তবে হাতখানা হারাবে তার জীবনধর্ম্ম, সে হয়ে যাবে জড়। এক বৎসর ঐ ভাবে রাখলে তাকে আর ইচ্ছামত নামানো উঠানো যাবে না। যা জীবিত তা যদি ব্যবহার করে জড়ের মত তবে তা হবে জড়ধর্ম্মাপন্ন।

আমাদের মনের মধ্যে রয়েছে যে চেতনা তা জীবনের চেয়েও সদাগতি, নিমেষকাল তাকে স্থিরভাবে রাখা যায় না। সেই মনকে দিয়ে যদি আঁকড়ে' ধরি আমি কোন মানুষকে, জায়গাজমি ধনদৌলতের মধ্যে যদি তাকে রাখি বেঁধে, সে মন হারায় তার মনোধর্ম্ম, সে হয়ে পড়ে জড়। নারী বা পুরুষ যখন পরস্পর আপনাদের আঁকড়ে ধরতে চায় এই রকম একটা জড়ধর্ম্মে, নিষেধ করতে চায় আপন অভিমানের দ্বারা সেখানে অন্যের প্রবেশ এবং আপনাকেও পারে না অন্যত্র সরিয়ে নিতে, তখন মনের সে অংশটা হয় hypertrophied, বিচ্যুত হয় তা মনোজীবন থেকে। তাই বহুকালের ব্যবহারে দম্পতীর মধ্যে যে ভাবটাকে বলি আমরা প্রেম, সেটা চেতনার অমৃত না হয়ে হয় মৃত্যু। তাতে থাকে না কোনও জীবনের লক্ষণ, তা পরিণত হয় অসার reflexএ।

নারী বা নর যখন চেতনার অনুপ্রেরণায় পরস্পর হয় গতিশীল, পরস্পরের মধ্যে অনুভব করে আপনাকে এবং একটা মহাযাত্রায় উভয়ের সান্নিধ্যে পায় আনন্দ, সেইটিই হচ্ছে যথার্থ প্রেমের ধর্ম্ম, কিন্তু অনেক

স্থলেই কদাচিৎ মাত্র এই প্রেম সম্ভব হ'তে পারে। উভয়ের মধ্যে একজন বা উভয়েই যদি হয় জড়ধর্ম্মী তবে প্রেম পরিণত হয় একটা জড়জাতীয় ভাল-লাগায়, যে ভাল-লাগা প্রকাশ পায় ইন্দ্রিয় ও দেহধর্ম্মে, যে ভাল-লাগা প্রকাশ পায় অসাড় অভ্যাসের দাসত্বে। যে প্রেমে একটা মহৎ চরিত্রের কাছে নারী করে আপনাকে নিবেদন, সেখানে সে মহা-চরিত্রের সঙ্গে ছুট্‌তে না পারলেও সে নারী তার আত্মনিবেদনের মধ্যে সেই মহাচরিত্রের পায় সাক্ষাৎ এবং তার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে' সে সার্থক করতে পারে ধ্যানলোকের মধ্যে প্রিয়ের সঙ্গে মহা-যাত্রার পথে সহচারিণীত্ব, যেমন করে' ভক্ত পেতে পারে সাহচর্য্য ভগবানের। ভগবানের মহা ঐশ্বর্য্যে, তাঁর মহা শক্তিতে ভক্তের কোন যথার্থ সহচারিত্ব নেই, কিন্তু তথাপি তার আছে সহচারিত্ব কারণ সে পায় তার ধ্যানলোকের মধ্যে প্রভুর সাক্ষাৎ।

সুজাতার আবার মনে হ'ল যে সুকুমার যে জাতীয় লোক তাতে সে যে কোন ভাল মেয়েকে বিয়ে করে' সুখী হ'তে পারত এবং আজও হয়েছে সুখী। তার মন অলস, সে চায় না উড়তে, সে চায় বাহু-বন্ধনের খাঁচার মধ্যে থেকে সুখাদ্য ও সুপেয় ভোগ করতে। আজ রক্তের চাঞ্চল্যে যে ভাল-লাগা উগ্র হয়ে উঠেছে, রক্তের চাঞ্চল্য থামলেও কেবল অভ্যাসের বশে সে ভাল-লাগা উঠবে স্নিগ্ধ ও মধুর হয়ে। সুখে দুঃখে তা থাকবে এক রকম, সমস্ত অবস্থাতে সে থাকবে অনুকূল, হৃদয় সেখানে পাবে বিশ্রাম, জরা এসে একটা রস হরণ করে' নিলেও রেখে যাবে একটা অভ্যাসগত রস ; মান অভিমানের পালা যখন হবে সাঙ্গ তখন তা পরিণত হবে একটা গাঢ় প্রীতিতে—এই হ'ল সাংসারিক প্রেমের পরাকাষ্ঠা। এতে গতি নেই, আছে স্থিতি ; আবিষ্কার নেই, আছে দেখা, ব্যাপ্তি নেই, আছে লেগে-থাকা। সুজাতার মন বিদ্রোহ

করল এই রকম প্রেমের কথা ভাবতে। দৃঢ়তর হয়ে উঠ্ল তার পণ উচ্চতর সোপানে আরোহণের জন্য।

এদিকে কানাই পড়েছিল একটা দ্বন্দ্বে। তার মন একটা কাজের আগুনে উঠেছিল জ্বলে' এবং সে সেই কাজের মধ্যে পাবে আপন সার্থকতা এই জন্যই সে এসেছিল অধ্যাপকের কাছে। কিন্তু তার চিত্ত ছিল না তত্ত্বদর্শী, সে নিজেকে চাইত না তত আবিষ্কার করতে যত চাইত প্রকাশ করতে। প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের করি আবিষ্কার কিন্তু তথাপি আত্মাবিষ্কারের একটা স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের মধ্যে যে অংশটা মুখর, স্পন্দমান ও স্রোতোবাহী সেটা সহজে পড়ে গিয়ে উচ্ছলিত হয়ে সহস্রবিধ কাজের মধ্যে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে আর একটা সত্য আছে যা বিধারণ করে' রাখে অন্তরের বিবিধ বৃত্তিকে, রচনা করে তার সংস্থান, দেয় তাকে তার একটা বিশেষ রূপ। কোন চিত্তই অতিক্রম করতে পারে না তার সংস্থানকে, সেটা হ'ল চিত্তের একটা বিশেষ কাঠামো। একটা পরমাণু থেকে আরম্ভ করে' মানুষ পর্য্যন্ত সকলেরই একটা একটা বিশেষ কাঠামো আছে। এই কাঠামোর মধ্যে প্রত্যেকের ইতিহাসের যে planটি দেওয়া আছে তাকে কেউ পারে না অতিক্রম করতে। বট-ফলের থেকে যদি বটের বীচি বের করে' নিই এবং তার সঙ্গে তুলনা করি একটি রাইসর্ষের দানার, তা হ'লে দেখা যাবে যে উভয়ের উপাদানকণা প্রায় একই পরিমাণ, নিক্তিতে ফেলে' ওজন করলে তাদের ভার হবে হয় ত সমান। পরিমাণের ও ওজনের সাম্যবশতঃ এটা অনুমান করা যেতে পারে যে উভয়ের মধ্যে হয় ত পরমাণুগত সংখ্যা বা পরিমাণের একটা সাম্য বা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু একটা হয় প্রকাণ্ড মহীরুহ পঞ্চশতবর্ষজীবী, আর একটা হয় ক্ষুদ্র সর্ষপের ওষধি, ফলপাকান্ত

তার জীবন, একটি ঋতুর বিলয়ে তার তিরোধান। এই সর্ষপবল্লরী ও মহাবনস্পতি বটবৃক্ষের যে এই পার্থক্য, তা কে ঘটিয়েছে? উভয়েই এক জলবায়ু মাটিতে পেয়েছে স্থান, তথাপি এই মহান্ পার্থক্যের কারণ কি? একটি হাইড্রোজেন পরমাণু বা একটি পারদ বা স্বর্ণ পরমাণুর মধ্যে যে একটি পার্থক্য আছে তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটির অন্তর্ব্বর্ত্তী সংস্থানগত পার্থক্য, প্রত্যেকটির অন্তর্ব্বর্ত্তী শক্তির বিলাসক্ষেত্রের পার্থক্য, প্রত্যেকটির অন্তর্গত সম্বন্ধপরম্পরার পার্থক্য। তাই বিজ্ঞানের কৃপায় আমরা সমর্থ হয়েছি কোন কোন পরমাণুর অন্তর্গত সংস্থানকে বিদীর্ণ করে' নিম্নতর পরমাণুর সংস্থানে পৌছে' দিতে। তেমনি একটি চিত্তের সঙ্গে অপর চিত্তের পার্থক্য কেবল শক্তিগত বা সামর্থ্যগত নয়, কিন্তু সংস্থানগত এবং শক্তির বিলাসক্ষেত্রগত পার্থক্য, তদন্তর্ব্বর্ত্তী সম্বন্ধপরম্পরার পার্থক্য। একটি মানুষের মনে চিন্তা যে ধারাতে খেলে, ভাব যে ধারাতে ওঠে ও লয় পায়, তাদের মধ্যে শক্তি যে ভাবে হয় বিক্ষুব্ধ ও সংযন্ত্রিত, তার মধ্যে একটা এমন পার্থক্য আছে যা কিছুতে অতিক্রম করা যায় না। এই পার্থক্য প্রধানতঃ রচনা করে প্রত্যেকের আত্মপ্রকাশের চরিত্র। এই কাঠামোর প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর ঘটছে দ্বন্দ্ব তার চতুষ্পার্শ্বস্থ পৃথিবীর সঙ্গে, প্রাণিকুলের সঙ্গে, নরনারীর সঙ্গে। এই দ্বন্দ্বের বিরোধে ও মিলনে, এই দ্বন্দ্বের ফলে কাঠামোর প্রকৃতির মধ্যে যে-সব ছাপ পড়ে তাকেই বলা যায় experience, তাকেই বলা যায় চরিত্রধর্ম্ম তাতেই নির্ণয় করে তার ভবিষ্যৎ বিকাশের ইতিহাস পদ্ধতি। প্রাচীন ইতিহাস সরল করে' দেয় ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সরণিকে। এমনি করে' গড়ে সমস্ত জীবের ইতিহাস, সমস্ত মানুষের ইতিহাস। কানাইয়ের দেহে ও মনে ছিল একটা উচ্ছল কর্ম্মপ্রিয়তা, তার মনের কর্ম্মপ্রবাহের সঙ্গে

একটা অত্যন্ত সহজ যোগ ছিল তার কাম্মিক নাড়ীবৃন্দের। তাই অন্তরে কর্ম্মপ্রবৃত্তি অতি দ্রুতভাবে পরিবর্ত্তিত হ'তে পারত বহির্লোকে কর্ম্মের মধ্যে। তার সঙ্গে গাঁথা ছিল কতকগুলি বাঁধাধরা কর্ত্তব্যবুদ্ধি। এই বাঁধাধরা কর্ত্তব্যবুদ্ধিগুলি মননের দ্বারা জীর্ণ হবার অবকাশ পায় নি। তাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের শৃঙ্খল যে ছিল তা বলা চলে না, কিন্তু সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধিগুলি প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠ্‌ত কর্ম্মকে প্রেরিত বা সংযম্রিত করবার জন্য। সেই জন্য কানাইয়ের একটুও অপেক্ষা থাকৃত না চিন্তাশক্তিকে ব্যয় করবার। ভীম এক সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে দুঃশাসনের রক্ত পান করবেন। প্রতিজ্ঞা করলেই তা পালন করতে হবে, এই ছিল সেকালের কর্ত্তব্যবুদ্ধি, অতএব ভীমকে পান করতেই হ'ল দুঃশাসনের রক্ত। মাতৃ-আজ্ঞা পালনীয়, এটিও ছিল তখনকার দিনের একটি কর্ত্তব্যবুদ্ধি। যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদীকে পশ্চাতে রেখে মাকে জানালেন যে তাঁরা ভিক্ষা এনেছেন, মা বল্লেন—সকলে ভাগ করে' ভোগ কর। তখন পাঁচ ভাই-য়ের মিলে বিবাহ করতে হ'ল দ্রৌপদীকে। পরশুরাম করলেন পিতৃ-আজ্ঞায় মাতৃহত্যা।

প্রাচীনকালে যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে কতকগুলি বাঁধাধরা কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা চালিত হ'ত মানুষের কাজ, সেই সমস্ত অনুশাসন-গুলিতে যুক্তি ও ভাবের প্রসেকের দ্বারা স্নিগ্ধ করে' তাদের যথার্থ তাৎপর্য্যকে স্থান না দিয়ে স্থান দেওয়া হ'ত অনুশাসনের বাক্যাক্ষরের তাৎপর্য্যকে, তেমনি একালেরও অনেকে, যাঁরা আত্মচিন্তার দ্বারা অনুশাসনবাক্যের চেয়ে তদন্তনিহিত মার্ম্মিক সত্যকে যথার্থ স্থান দিতে শেখেন নি, তাঁরা তাঁদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চান কতকগুলি পৃথক পৃথক বিচ্ছিন্ন অনুশাসনের দ্বারা। কানাইও চল্‌ত এইরকম

আনুশাসনিক মতে। যুক্তির তীক্ষ্ণতা তার ছিল কিন্তু সে যুক্তিকে সে প্রয়োগ করত তার আনুশাসনিক নিয়ম অনুসারে। চিন্তাশক্তি, আনুশাসনিক কর্ত্তব্যবোধ, কর্ম্মের মধ্যে জীবনের সাফল্যলাভ, এ সমস্তই তার ছিল, কিন্তু তারা যেন ছিল পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে। সমস্ত-গুলি মিলিত হয়ে চেতনাশক্তির একটা শাঁসালো সত্যে তা পরিণত হয়ে উঠতে পারে নি, আসতে পারে নি তা একটা সামঞ্জস্যে। তাই তার আপন অন্তরের সৃষ্টি নিরন্তর ব্যাহত হ'ত আপন অন্তরের মধ্যে, তা সব সময় প্রকাশ করতে পারত না তার সমস্ত ব্যবহারকে একটা সঙ্গতির রূপে।

সুজাতা বাল্যকালে তার পিতার নিকট শুনেছিল—আত্মানং বিদ্ধি। কানাইয়ের কাছে সে শুনেছিল—আত্মাকে প্রকাশ কর। অধ্যাপকের উপদেশে ও সান্নিধ্যে, তাঁর জীবন্ত আদর্শে ও তাঁর স্বাভাবিক আত্মাবিষ্কারের চেষ্টায় সে বাঁধতে পেরেছিল এই দু'টি মন্ত্রকে একটি ছন্দের মধ্যে। তাই তার অন্তর্জীবনে দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে' সহজ আনন্দে করতে পারত সে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত।

যৌবনের আস্বাদ কানাইয়ের ঘটেছিল জীবন তৈরী হয়ে উঠবার পূর্ব্বেই। মঞ্জরী তাকে দীক্ষিত করেছিল একটা নূতন উত্তেজনায়। মঞ্জরীর ঘুম কানাই ভাঙ্গায় নি, কানাইয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়েছিল মঞ্জরী। জীবনে প্রথম যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন যৌবনের পাত্র ভরে' উচ্ছলিত হয়ে ওঠে নবীন সুরার আস্বাদ, নবীন আমিষের আস্বাদ। তারপর অনেকেরই জীবনে বেড়ে যায় এই আস্বাদের লোভ। মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পথে যে সব সঙ্কোচ এসে একটা লজ্জা ও জড়িমা এনে দেয়, তাদের ব্যবহারে সে সব হয় অপসৃত। তখন ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে তারা শিকারে দক্ষ। তখন মানুষে বাঘিনীতে বাধে লড়াই,

বাঘিনী জেতে কি মানুষ জেতে সেটা নির্ভর করে অদৃষ্টের উপর। কিন্তু কানাইয়ের জীবনে ঘটল তার বিপরীত। মধুর আস্বাদ আকণ্ঠ পান করবার পূর্ব্বেই তার জীবনে এল একটা নূতন রকম উত্তেজনা, একটা মাদকতা, যা অতিক্রম করল এই মধুলোভকে। অবশেষে মধুর পাত্র গেল বিমুখ হয়ে তার কাছ থেকে এমনভাবে সরে' যে আর কখনো দাঁড়াবে না পাত্রটি তার সামনে এসে। সে পাত্রের কদর্য্যতা জুগুপ্সা এনে দিল তার প্রতি কানাইয়ের মনে। এমনি এক অবসরে তার সামনে এসে দাঁড়াল সুজাতা তপশ্চারিণীর মহনীয় লাবণ্যে। হৃদয়ের মধ্যে থমকে দাঁড়াল কানাই। কিন্তু কানাই পারত না অন্তরের মধ্যে চিন্তা করে' তার মনকে একটা সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে। তার প্রবৃত্তি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি উভয়েই প্রবল হয়ে ছুটত এবং আহত করত তার বক্ষ। অনেক খেলোয়াড আছে যারা বিপক্ষের গোলের দিকে বল চালনা না করে' স্বপক্ষেই দিয়ে থাকে গোল। কানাইয়ের ধাতু ছিল কর্ম্মপথে বেরিয়ে যাওয়া কিন্তু তার প্রবৃত্তি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বন্দ্বে তার চিত্ত কোন পথেই আত্মপ্রকাশ করতে পারল না, সে নিজের তেজে নিজেই হ'তে লাগল দগ্ধ।

সুজাতা আকর্ষণ করল তার শ্রদ্ধাকে এবং শ্রদ্ধার উচ্চস্তরে মেঘের মত ঘনিয়ে উঠল তার ভালবাসা। কিন্তু সেই মেঘকে সে সাহস করল না নামিয়ে দিতে ধারাবর্ষে নিম্নস্তরে। তার কর্ত্তব্যবুদ্ধি এসে তাকে বাধা দিল। তার ধারণা ছিল, একজনকে একবার ভালবাসলে দ্বিতীয়বার আর কাউকে ভালবাসা যায় না, প্রেম যদি না হয় একনিষ্ঠ তবে তা হয় ব্যভিচার। শরীরের ব্যভিচার ও মনের ব্যভিচার একই কথা। শ্রদ্ধা যখন ঘনিয়ে এল ভালবাসায় তার ভারে টন্‌টনিয়ে এল তার হৃদয়ের নাড়ী দূর প্রান্তে। কিন্তু সে চাইলে না তাকে স্বীকার

করতে। মনে মনে সে করলে আত্মাকে শাসন, বাইরে ত করলেই না তা প্রকাশ। এমন চাপ দিতে চেষ্টা করল সেই মেঘরাশিকে যাতে তা বর্ষিত না হয়ে পরিণত হয় লঘুবাষ্পে। লঘুবাষ্পে পরিণত হয়ে তার আয়তন গেল বেড়ে। ভিতরে সে অনুভব করছিল পীড়া দূর নাড়ীর প্রান্তে, এখন সে পীড়া ঘনিয়ে এল সমস্ত হৃদয়ের নাড়ীযন্ত্রের উপরে। মেঘকে উড়িয়ে দিয়েছে বলে' সে স্বস্তিবোধ করল কিন্তু তার এই নিরানন্দ বিমর্ষভাব যে কেন এল তা সে বুঝতে পারল না। যখন সুজাতা গিয়েছিল সুকুমারের কাছে, তখন সে একবারও মনে করতে পারে নি যে সুজাতার অভাবে তার মন এত ক্লিষ্ট হয়ে উঠবে। সুজাতার সঙ্গে সে বেরিয়েছিল বরিশালে এবং তারপর আশ্রমে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে তার সঙ্গে। কত শিশিরনির্ঝরিত উষায় বিকশিতকুসুমাঞ্চল-লাঞ্ছিত বনবীথিকায় কত চপল ভ্রমর গুণ্ গুণ্ করে' গিয়েছে উভয়ের কাণের কাছ দিয়ে, কত সুগন্ধ বায়ু একত্রে গ্রহণ করেছে তারা নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে, চক্ষুর অঞ্জলি আপূরিত করে' উভয়ে একত্র গ্রহণ করেছে পুষ্পরাজির লাবণ্য, কত সন্ধ্যার নৈঃশব্দ্য শুনিয়ে গিয়েছে তাদের কাণে তারালোকের বীণাধ্বনি, সূর্য্যাস্তের পাখীরা করে' গেছে কলগান, অস্তাচলে তারা উভয়ে নিরীক্ষণ করেছে গন্ধর্ব্বনগরীতে সুরসুন্দরীদের বর্ণনৃত্য, ক্লান্ত হয়ে বসেছে কত পাদপ-তলে, কোন সময় বা অন্যমনস্কতায় হাতে লেগে গেছে হাত; উভয়েরই হৃদয়ে পরস্পরের অজ্ঞাতে কখনও বা ছুটে' গেছে একটা রক্তকল্লোল, প্রতিবিম্ব পড়েছে সেই শোণিতের উভয়ের মুখমণ্ডলে; প্রত্যেকেই তা গোপন করতে চেয়েছে কেবল অপরের কাছ থেকে নয়, নিজেরও কাছ থেকে।

কানাই মঞ্জরীকে এক সময় ভালবাসত, কিন্তু সে ভালবাসা তাকে

মূঢ় করে' রেখেছিল তার আপন অনুভবের মধ্যে। আকার ইঙ্গিতের দ্বারা, অনুভবের দ্বারা, সূক্ষ্ম ভালবাসার লিপি সে জানত না পড়তে কারও মুখের ভাষায়, তাই সে কখনও সন্দেহ করতে পারে নি যে সুজাতার মন তার প্রতি কি রকম ধীরে ধীরে বিগলিত হচ্ছিল। কিন্তু তা যদি সে অনুভব করতে পারত তথাপি তার ছিল না সেই অভিজ্ঞতা, সেই কুশলতা যাতে ঘর্ম্মবৎ ঈষৎ বিক্রুতিকে পরিণত করা যায় স্রোতঃপ্রবাহে। তার ভাল লাগত সুজাতার সঙ্গ, কিন্তু সেই ভাল লাগার মূল যে প্রোথিত হয়েছে জীবনের নিবিড়তম প্রদেশে তা সে বুঝতে পারত না। কখনও বা যদি স্পষ্ট হয়ে তার মন বেগে ধাবিত হ'ত সুজাতার দিকে এবং অনুভব করতে পারত যে সেটা একটা অন্য জাতীয় আকাঙ্ক্ষা, তখনই তার হৃদয় বিদ্রোহ করত তার নিজের বিরুদ্ধে। কখনও সে মনে করত যে একবার যখন সে কাউকে ভালবেসেছে তখন আর তার দ্বিতীয় কাউকে ভালবাসার অধিকার নেই। কখনও বা মনে করত যে তার হৃদয় হয়েছে কদর্য্যভাবে উচ্ছিষ্ট, সেই উচ্ছিষ্ট পাত্র সে সুজাতার ন্যায় দেবীমূর্ত্তির কাছে উপহারছলে নিবেদন করে' দেবীর অপমান করতে পারে না। কখনও সে মনে করত যে উচ্চতর ভালবাসার অধিকারই নেই তার। সে যে মঞ্জরীকে ভালবেসেছিল তাতে ব্যক্ত হয়েছে শুধু তার নিম্নতর প্রবৃত্তির তাড়না, আজ সুজাতার প্রতি তার মনে যে ভাব উঠছে তা হয় ত নিরুদ্ধচেষ্ট সেই বৃত্তিরই সংক্ষোভ। সে কেমন করে' দেবে সেই কলুষিত প্রবৃত্তির কামনাকে উপহার করে' অর্ঘ্য করে' সুজাতার করপুটে!

এই জন্য সে সুজাতার সামনে কখনও মন খুলতে সাহস করে নি, অথচ বাহ্যতঃ সে অতি সহজেই তাকে গ্রহণ করেছিল একজন

সহকর্ম্মীরূপে। সুজাতা ইতিপূর্ব্বে কোন দিন কাউকে ভালবাসে নি। তার ছিল কানাইয়ের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। অধ্যাপকের নীচেই স্থান ছিল কানাইয়ের। সে জানত যে যে কোন বিপদেই সে পড়ুক না কেন, কানাই এসে দাঁড়াবে তার সামনে এবং তার সহজ সুন্দর সৌজন্যে এবং চরিত্রের মাহাত্ম্যে সে করবে যে কোন আত্মোৎসর্গ তার জন্য। কাব্যে নাটকে সে যে রকম ভালবাসার কথা পড়েছে তার আরম্ভ ও বিকাশ সে পর্য্যবসিত হ'তে দেখেছে দেহের বিক্ষোভে। তার পবিত্র কুমারী-হৃদয় মনে করেছে এই শ্রেণীর ভালবাসাকে একান্তভাবে ক্লিন্ন ও কলুষিত। জীবনের গোড়া থেকেই তার হৃদয় ছিল উঁচু তারে বাঁধা। অধ্যাপকের সংসর্গে এসে সে তার চলে' গিয়েছিল উচ্চতম গ্রামে। আবার কানাইয়ের প্রতি সুজাতার হৃদয় যে শ্রদ্ধায় আনত হয়ে আসছিল সেই আনতির মধ্যে ঘটেছিল যে স্নিগ্ধধারার মৃদু প্রবর্ষণ তাকেও সে শ্রদ্ধা বলে' প্রণাম করে' দূরে ঠেকিয়ে রেখেছিল অনেক দিন। শ্রদ্ধার আনতিতে যে মাধুর্য্য আনে তার সঙ্গে প্রেমের মাধুর্য্যের প্রথম স্তর বিচ্ছিন্ন করা অতি কঠিন। কিন্তু সহজ ভাবে পরিস্ফুর্ত্ত হ'ত সুজাতার হৃদয়। সে ছিল আত্মান্বেষী, তাই সে যখন আবিষ্কার করল যে কানাই তার প্রতি দরদ দেখালে বা তার অভাব বোধ করলে সে হয় আনন্দিত এবং কানাইয়ের অভাব সে পারে না দীর্ঘকাল সহ্য করতে, তার বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা রগ ওঠে টনটনিয়ে, তখন তার হৃদয়ের মধ্যে উষার প্রথম আলোকের ন্যায় অস্ফুটভাবে অভিব্যক্ত হয়ে উঠল একটা নূতন অনুভব, একটা নূতন বেদনা, একটা নূতন সত্তা। সে তাকে বধ করতে চেষ্টা করলে না, দমন করতে চেষ্টা করলে না, সে চলল তাকে উজ্জীবিত করে' তুলতে হৃদয়ের আনন্দনিষেকে।

কিন্তু এইখানে উঠল তার মনে একটা দ্বন্দ্ব। প্রথম একদিকে সে দেখতে পেল যে কানাইয়ের দিক থেকে যে সাড়াটুকু আসছে তা অতি ক্ষীণ। যে কারণেই হোক, কানাই চাইছে না সেটা প্রকাশ করতে। কোনদিন তা প্রকাশ হবে কি না, সেটা ক্ষণিক আকর্ষণ কি না, তাও সে পারলে না নির্ণয় করতে। তথাপি সে ভাবতে লাগল কোনদিন যদি কানাই আসে এগিয়ে তখন সে কি করবে। নিজের মধ্যে অনেক আন্দোলন করে' সে বুঝতে পেরেছিল যে প্রেমের সাধারণ ভাবে যে সাংসারিক পরিণতি ঘটে সেই পথ যদি সে অবলম্বন করে তবে সে কানাইকে টানবে মাটিতে, নিজেকেও নামাবে ধূলায়, ব্যর্থ হবে তার উর্দ্ধ প্রবৃত্তি। সে মনে মনে স্থির করলে যে কানাইয়ের কাছ থেকে ভবিষ্যতে যে রকম সাড়াই আসুক না কেন, সে তার প্রেমকে রাখবে বক্ষের মধ্যে ঢেকে, ব্যক্ত করবে তাকে কানাইয়ের প্রতি সেবায়, কিন্তু বাঁধবে না কোন নীড়, গড়বে না কোন পরিবার। গুরুদেবের কাছে করেছিল সে প্রতিজ্ঞা যে তার সর্ব্বস্ব দিয়ে সে তাঁর বিদ্যামন্দিরের প্রদীপটি রাখবে জ্বালিয়ে। তার ভালবাসায় সে বাঁধবে কানাইকে, চিরদিন সে থাকবে তার সহকর্ম্মী হয়ে, চিরদিন জুটবে খোরাক তার প্রেমের, তা ধন্য করবে তার নারীত্বকে, তটভূমিতে আছাড় খেয়ে সে তার প্রেমকে দেবে না চূর্ণ হ'তে। সে রাখবে তাব প্রেমকে উর্দ্ধলোকের সম্পদ করে'।

সুজাতা যখন গিয়েছিল সুকুমারের কাছে তখন সেই দীর্ঘ বিচ্ছেদে তার হৃদয় উঠল কামনায় আকুল হয়ে। সেই কামনার স্বরূপ চিনতে তার দেরী হ'ল না। কিন্তু কানাই জানত না যে প্রেমের একটি নিভৃত সুন্দর রূপ আছে যে রূপটি উত্তরমেরুর আকাশজ্যোতির ন্যায় আপনি থাকে দেদীপ্যমান হয়ে, দেহের মেদ থেকে জোগাতে হয় না

তার তৈলনিষেক। কামনার আকুলতা অনুভব করে' তার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহ করে' উঠল তার ক্লিন্ন স্বভাবের প্রতি এবং সে মনে মনে পণ করলে যে কিছুতেই সে তার অন্তরের এ দৈন্যটুকু জানতে দেবে না সুজাতাকে।

এমনি ছু'জনের মনে চল্‌ল ছু'রকমের দ্বন্দ্ব, হৃদয়ের সংস্থানভেদে তা প্রবাহিত হ'ল সম্পূর্ণ ছু'দিকে। ঋতুর পর ঋতু আসতে লাগল তাদের সৌভাগ্য সম্পদ নিয়ে, পৃথিবী চল্‌ল বারংবার আবর্ত্তিত হয়ে সূর্য্যের চারিদিকে, কিন্তু উভয়ের হৃদয় বাঁধা রইল আপন আপন অন্তরের সংস্থানের মধ্যে। বর্ষের পর বর্ষে বর্ষিত হ'ল নব নব জলধারা, প্লাবিত হ'ল পৃথিবীর বক্ষ, কিন্তু এই ছু'টি হৃদয়ের মধ্যে নাম্‌ল না এমন প্লাবন যা উভয়ের ধারাকে একটি অখণ্ড ধারায় করতে পারে মিলিত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এমনি করে' চলতে লাগ্‌ল বিদ্যামন্দিরের কাজ, সুজাতা যে কেবল অধ্যাপকেরই দেখাশুনা করত তা নয়, সে তার গবেষণায়ও অনেক সাফল্য লাভ করল। তার অনেক আবিষ্কার ইউরোপীয় বড় বড় বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকাশিত হ'তে লাগ্‌ল এবং ছু'টি একটি পণ্ডিতসভা থেকে তাকে দেওয়া হ'ল সম্মানিত সভ্যের স্থান এবং বিশেষ বিশেষ পদক পুরস্কার। ইউরোপের এই খ্যাতি বেশ একটা ঝড় বইয়ে গেল ভারতবর্ষের সংবাদ-পত্রগুলির উপর দিয়ে। এটা সকলেই আশা করতে লাগ্‌ল যে, যে সোপানাবলি বেয়ে সুজাতা উঠতে আরম্ভ করেছে তার অবশেষে তার জন্য অপেক্ষা করছে প্রভূত মান ও যশ।

মানুষের চিত্ত যতই নিস্পৃহভাবে আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হোক্ না কেন,

এবং যতই খ্যাতির জন্য লোভ না থাকুক, খ্যাতি ও যশ মানুষকে যে শুধু আনন্দিত করে তা নয়, তা দেয় মানুষকে নূতন বল। মানুষের মধ্যে সর্ব্বদাই মানুষের জন্য একটা অপেক্ষা আছে। মানুষের কর্ম্মের ক্ষেত্র সমাজ। মানুষ যা করে তা মানুষের জন্যই করে। তাই মানুষ যখন তার নিজের কাজের দ্বারা অপরকে খুসী করতে পারে তখন তার মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কাজ করতে করতে মানুষের মনে আসে একটা অবসাদ। সে বুঝতে পারে না তার কাজের মূল্য যতক্ষণ না তা যাচাই হয় দশের দরবারে। এই খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার কাজের নেশা গেল অনেকগুণ বেড়ে। যে সমস্ত জ্ঞানচারীরা আদিম কাল থেকে জ্ঞানের দুরারোহ শৈলের পথিক হয়েছে সে মনে মনে নিজেকে তাদেরই একজন মনে করে' গৌরব বোধ করতে লাগ্‌ল। এই গৌরব বোধ তার রক্তে এনে দিল একটা নূতন রকমের মাদকতা। যখন এই সমস্ত কীর্ত্তি ও গৌরবের প্রসাদ আসতে লাগ্‌ল তার সম্ভোগ গেল বহুগুণ বেড়ে। অধ্যাপক ও কানাইয়ের সহানুভূতি ও প্রশংসায় এক এক সময় তার কর্ণমূল হয়ে উঠ্‌ত আরক্ত। অধ্যাপক ও কানাই উভয়েই তাকে করত নিরন্তর প্রোৎসাহিত—তার রক্তে যেত যেন একটা উত্তেজনার বান ডেকে।

কানাইয়ের গবেষণাও চারিদিকে হ'তে লাগ্‌ল সমাদৃত। অনেক স্থান থেকে প্রস্তাব এল যাতে তার গবেষণালব্ধ ফল ব্যবসায়ীরা নিতে পারে কিনে'। অনেক পণ্ডিত সমাজ থেকে আসতে লাগ্‌ল তার আমন্ত্রণ, অনেক পণ্ডিত সমাজে সে হ'ল সম্মানিত সভ্য এবং পণ্ডিত সমাজে উঠ্‌ল একটা জনরব যে শীঘ্রই তাকে ইংলণ্ডের রাজকীয় বিজ্ঞানসভার সভ্য করা হবে। এই সমস্ত সংবাদে সুজাতা যেন গর্ব্বে ও গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ত এবং কানাইয়ের সামনে সে ধরত ভবিষ্যৎ

গৌরবের স্বপ্নময় চিত্র প্রোজ্জ্বল করে'। অধ্যাপকের সেবার সঙ্গে সঙ্গে সে কানাইয়েরও একটু একটু সেবা যত্ন আরম্ভ করল। কানাই ও সুজাতার মধ্যে এমন একটি ভাব দাঁড়াল যে কানাই মনে করত যে গবেষণার ক্ষেত্রে সুজাতা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অপরদিকে সুজাতা মনে করতে লাগল যে কানাই তার তুলনায় গবেষণাক্ষেত্রে অনেক শ্রেষ্ঠ। এমনি করে' গড়ে উঠতে লাগল পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা। এতদিন সুজাতা কানাইকে প্রধানতঃ শ্রদ্ধা করত তার চরিত্র, তার দৃঢ়তা এবং তার মহানুভবতার দিক থেকে, তার সঙ্গে এখন যুক্ত হ'ল তার বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা। সুজাতার সন্নিধিতে এসে অবধি কানাই আদর্শ নারীচরিত্র বলে' তাকে শ্রদ্ধা করত। সুজাতার বুদ্ধি, মেধা ও কল্পনার কথা তার তেমন কিছু মনে হয় নি, কিন্তু আজ গবেষণাক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ সাফল্য দেখে তার মনে শ্রদ্ধা ও পূজার একটা নূতন হিল্লোল বয়ে' গেল।

বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্ম্মঠতার দিক দিয়ে আমরা চিরদিনই মেয়েদের দেখি একটু ছোট করে'। সে বিষয়ে তাদের কোন অভাব থাকলে আমরা তা গণনার মধ্যে আনতে চাই না। মেয়েদের মধ্যে মেয়ে-সুলভ গুণ পেলেই আমরা তাদের গৌরব করে' থাকি। যেখানে যা সাধারণতঃ দেখা যায় না সেখানে তা দেখলে বিস্ময়রসে আমাদের মন আপ্লুত হয়। এই বিস্ময় রসের মধ্য দিয়ে যখন কারুর কোন যথার্থ গুণ আমরা দেখতে পাই তখন আমাদের দৃষ্টির রেখা স্থানচ্যুত হয়। শুধু যে স্থানচ্যুত হয় তা নয়, তা অনেক বৃহত্তররূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে ছেলেবয়সে অনেকে গান-বাজনা বোঝে বা অঙ্ক কষতে পারে। কেউ বা তেরোবৎসর বয়সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে প্রথমস্থান লাভ করে। আমরা এই সব ছেলে-

দের সম্বন্ধে অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে উঠি। আমরা মনে করি যে বড় হয়ে এ যেন কি একটা হবে, হয়ে দাঁড়াবে পৃথিবীর একটা অষ্টম আশ্চর্য্য। কিন্তু পরিশেষে এম্-এ পর্য্যন্ত আসতে আসতে দেখা যায় যে সে ছেলে কাদায় হাবুডুবু খাচ্ছে। ভবিষ্যৎজীবনে আর তার দেখাই পাওয়া যায় না। এ জন্য মেয়েরা পরীক্ষায় কোন ভাল ফল করলে আমরা মাসিক পত্রে তাদের ছবি ছাপাই, জয়গানে দিগন্ত মুখরিত করে' তুলি।

কিন্তু এ ছাড়াও আর একটা বিশেষ কারণে কানাই সুজাতার সামর্থ্য ও গুণ দেখত অনেক গুণ বাড়িয়ে। বাইরে প্রকাশের পথ না পেয়ে সুজাতার প্রতি কানাইয়ের প্রেম হৃদয়ের চাপে ভিতরে ভিতরে ক্রমশঃ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হ'তে লাগল। এই প্রেমের প্রতিফলন হ'ত যখনই কল্পনায় কিংবা চর্ম্মচক্ষুতে কানাই সুজাতাকে নিরীক্ষণ করত। তার হৃদয়ের মূল থেকে যে রস নিরন্তর উত্থিত হ'ত তা ক্রমশঃ প্রবাহিত হয়ে চলত তার চিত্তের সমস্ত শাখা প্রশাখায়, তা উঠত তার আদর্শের শীর্ষ পর্য্যন্ত। নিজের ধর্ম্মে বাইরের জিনিষ সংক্রান্ত করা এটা একটা প্রতিদিনের প্রাত্যহিক ঘটনা। চোখে যদি হয় কামলা, সব জিনিষ দেখি আমরা হল্‌দে। প্রেমকে যদি রাখি হৃদয়ে আবদ্ধ করে' সে নিরন্তর হয়ে ওঠে একটা আনন্দের উৎস। তার অমৃতময় প্রলেপে আমাদের চক্ষু হয় নিষিক্ত, সেই নিষেকে প্রেমাস্পদের ছবিটিকে আনন্দে দেয় পূর্ণ করে'। যে প্রেম হয় ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত, ইন্দ্রিয়ের তটে এসে যা হয় শতধা চূর্ণিত, সে প্রেম হারিয়ে ফেলে তার অমৃত-সঞ্জীবনী। তা থাকতে পারে না হৃদয়ের মধ্যে একটা চিরন্তন উৎস হয়ে, জাগাতে পারে না নূতন প্রাণনা বা প্রেরণা, তা আপনাকে বিশীর্ণ করে' দেয় জৈবধর্ম্মের ব্যবহারে। অন্তরের প্রেমধাতু যখন তার চৈতসিক

অবস্থা থেকে পরিবর্ত্তিত হয়ে নেমে আসে দেহধর্ম্মে তখন সেই আনন্দ-শক্তি দু'টি দেহের তট-ভূমিতে প্রাত্যক্ষিক ক্রিয়া ও উত্তাপ উৎপাদন করে' আপন সত্তা হারিয়ে ফেলে জড় জগতের মধ্যে। মানুষের সমস্ত জৈবক্রিয়ার শক্তিই জড থেকে গৃহীত, তাই প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের যে জৈবক্রিয়া চলে তার পরিমাণ আমরা করতে পারি জড়প্রণালীতে তার উত্তাপ থেকে। কিন্তু আমাদের চৈতসিক বৃত্তি, চিন্তা, হৃদয়ের আনন্দ, এ গুলিকে আমরা কোনক্রমে জড়প্রণালীর ব্যবস্থায় পরিমাপ করতে পারি না। হৃদয়কে যে প্রেম থাকে পূর্ণ করে' সে প্রেমকে কোন বাহ্য পরিমাণের দ্বারা মাপ করা যায় না, কিন্তু সেই আনন্দ যখন বিকৃত হয়ে পরিবর্ত্তিত হয় জৈব ব্যবহারে তখন তাকে পারি আমরা জড়প্রণালীতে মাপ করতে। কতখানি উত্তাপ উৎপন্ন হ'ল তাতেই ঘটে তার পরিমাণ। উত্তাপ উৎপন্ন হলেই তা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল জড়লোকে। এই জন্যই বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে যে প্রেম বিনষ্ট হয় না সে প্রেম বাড়াতে থাকে হৃদয়ের আনন্দ এবং এমন একটা অবস্থা ঘটতে পারে যখন প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়ে আপন হৃদয়নাল থেকে মানুষ পারে সে আনন্দ আপনিই পান করতে। আমাদের দেশের সহজিয়া সাধনপদ্ধতির এইটিই ছিল মূল রহস্য।

সুজাতার প্রেম বিভক্ত হয়েছিল অধ্যাপকের প্রতি বাৎসল্যে ও ভক্তিতে এবং কানাইয়ের প্রতি অনুরাগে। কিন্তু এ প্রেম হৃদয়ের মধ্যে চাপ বেঁধে জমাট হওয়ার পূর্ব্বেই নিঃসৃত হ'তে পারত নানাবিধ সেবার কর্ম্মে। কাজেই, কানাইয়ের হৃদয়ের মধ্যে প্রেম নিরন্তর যে একটা চাপ দিত এবং সমগ্র হৃদ্‌যন্ত্রকে যেরকম উদ্বিগ্ন করে' রাখত সুজাতার মধ্যে সেরকম হ'ত না। সেবার মধ্য দিয়ে যেটুকু বহির্লোকের জৈবধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হ'তে পারত তাই তাকে তার অন্তরের স্বাভাবিক

রকমে একটা সামঞ্জস্যের সীমার মধ্যে রেখেছিল। তাই তা উদ্বেগ সৃষ্টি না করে' উৎপন্ন করেছিল প্রচুর স্নিগ্ধতা, উদ্দামতা না এনে এনেছিল প্রসন্নতা।

কানাই যখন প্রথম এসেছিল, তার হৃদয় ছিল অধ্যাপকের প্রতি ভক্তিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু তার চেয়ে বড় তাগিদ ছিল তার নিজের কাজের তাড়না। অধ্যাপকের সাহায্যে তার কর্ম্মশক্তি হবে উন্মুখ এই ছিল তার উদ্দেশ্য এবং এই জন্যই সে নিয়েছিল আপন কর্ম্মের পদ্ধতি সম্পূর্ণ-ভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র করে' অধ্যাপকের কাছ থেকে। কিন্তু সুজাতা শুধু যে তার কর্ম্মের তাগিদ নিয়ে এসেছিল তা নয়, তার নারীহৃদয়ে ছিল প্রেমের আকুতি। তাই সে যেমন করতে লাগল আপন কাজ তেমনই সে ব্যাপৃত করলে আপনাকে অধ্যাপকের সেবার কাজে। এর ফলে তার হৃদয়, বুদ্ধি ও কর্ম্মঠতা এই তিনটিই একটি রসধারার মধ্যে বিধৃত হ'ল।

কোন কোন ছাত্র আসে আপন কাজকে প্রধান করে'। সে অধ্যা-পককে ব্যবহার করে সেই কাজের সাধন হিসাবে, যেন একটা যন্ত্র হিসাবে। তারা মনে করে যে, যে কাজটা করতে এসেছে সেই কাজটাই হ'ল সব চেয়ে বড়। অধ্যাপকের জ্ঞানের জন্য তারা করে ভক্তি, কাজের সাহায্যে তাঁকে নেয় খাটিয়ে, এর বেশী আর কিছু নয়। ফলে হয় তাদের কার্য্যসিদ্ধি, কিন্তু কাজের উপরি পাওনা যেটা সেটা তাদের ভাগ্যে জোটে না। নিজেকে শুধু নিজের কাজে না লাগিয়ে যদি সে নিজেকে অধ্যাপকের কাজেও লাগাত তখন হ'ত উভয়ের মধ্যে একটি রসের যোগ। সেই রসধারার মধ্য দিয়ে অধ্যাপক পারতেন নিজেকে বিক্রত করে' দিতে, প্রবাহিত করে' দিতে ছাত্রের হৃদয়ের মধ্যে। অধ্যাপকের অন্তর-জীবনের ছায়াটি সেই রসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত

হ'ত ছাত্রের হৃদয়ে, সেখানে অঙ্কুরিত হয়ে তার হৃদয়াকাশে যে ছায়াবৃক্ষ রচনা করত তার প্রতি পত্র দিয়ে সে ছাত্র পান করতে পারত সূর্য্যের কিরণ ধারা অঞ্জলিতে অঞ্জলিতে ; মহোচ্চ আকাশের দিকে হ'ত তার লক্ষ্য, ফলে তার জীবন অধ্যাপকের তপস্যায় হ'ত ফলবান্। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে গুরুশিষ্যের হৃদয়সন্নিপাতের এই গূঢ় রহস্যটি ব্যবহার করা হ'ত। এইটির অভাবে শিক্ষা হয়ে পড়ে যান্ত্রিক (mechanical)। একটি আত্মা যে আর একটি আত্মার মধ্যে আপনাকে রোপণ করতে পারে এই মহাতথ্যটি আজকালকার শিক্ষা প্রণালী থেকে একেবারে উঠে গিয়েছে।

কিন্তু কানাই যতই অন্তরে অন্তরে সুজাতার দিকে আকৃষ্ট হ'তে লাগ্‌ল ততই সে লাগ্‌ল তার সঙ্গে সমান দৃষ্টিতে সব জিনিষ দেখতে। সুজাতা অধ্যাপককে বল্‌ত 'গুরুদেব', কানাই বল্‌ত 'অধ্যাপক'। কিন্তু ক্রমশঃ অধ্যাপকের প্রতি সুজাতার যে ভালবাসা তা একটা বৈদ্যুতিক-শক্তির মত সংক্রান্ত হ'ল তার হৃদয়ে। সে অধ্যাপককে দেখতে লাগল একটা নূতন দৃষ্টিতে। তাঁকে অবলম্বন করে' উভয়ের রসধারা পেল একটা সমান ক্ষেত্র আপনাকে বিস্তৃত করতে। কোন্ সময় যে 'অধ্যাপক'-শব্দ তার মুখ থেকে বিলুপ্ত হয়ে 'গুরুদেব' শব্দে পরিণত হ'ল তা সে জান্‌ল না। কানাই অনুকরণ করবার ছেলে নয়। কিন্তু হৃদয়ের যখন হ'ল স্বচ্ছন্দ পরিবর্ত্তন, উপযুক্ত শব্দটিও বেরিয়ে এল তার সঙ্গে।

একটি পরিবারের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের প্রেম যখন ভোগের আওতায় পড়ে' ক্রমশঃ আসে ক্ষীণ হয়ে, তারই মধ্যে দেখা দেয় পুত্রকন্যাদের আবির্ভাব। বিবাহের প্রথম অবস্থায় পরস্পরের পরস্পরের প্রতি যে দু'টি স্বচ্ছ লীলোৎসারী স্রোত প্রবাহিত হ'ত, সেটি যখন হয়ে এল

মন্দগতি, তখন আর দু'টি নূতন স্রোত প্রবাহিত হ'ল পুত্রকন্যাদের উদ্দেশে। পুত্রকন্যার মধ্যে উভয়ের দাম্পত্যস্রোত এসে মিলিত হয়ে উভয়ের স্রোতকে রাখতে লাগ্‌ল অব্যাহত। পুত্রকন্যাদের প্রতি যে দু'টি স্রোত এল সে দু'টি উভয় দিকেরই বাৎসল্যের ধারা, কিন্তু এই দু'টি বাৎসল্যের ধারা পুত্রকন্যার মধ্যে মিলিত হয়ে উৎপন্ন করল একটি নূতন দাম্পত্য রসধারা। পুত্রকন্যাকে অবলম্বন করে' দু'টি বাৎসল্য ধারার ঘট্‌ল একটি অভূতপূর্ব্ব পরিণতি। প্রেম তার মূল স্বভাবে অদ্বৈত। সে পরিবর্ত্তিত হয় উপাধিবশে, তাই আমরা সর্ব্বদাই দেখতে পাই যে, যে কোন রকমের প্রেম উপাধির পরিবর্ত্তনে বিচিত্র বিচিত্র স্বাদে বহুধা বিচিত্র প্রেমের সৃষ্টি করে' থাকে। নরনারীগত একটি প্রেমই যে কত বিচিত্রভাবে আপনার পরিচয় দিতে পারে অভিজ্ঞ লোকেরা তা জানেন।

দু'টি প্রেমনিষিক্ত হৃদয় যখন পরস্পর সম্মুখীন হয় তখন একের জীবনের অনুভূতিতে যে পরিবর্ত্তন আসে সেই পরিবর্ত্তনে অপর চিত্তটিরও ঘটে পরিবর্ত্তন। বাহ্যিক কোন আলাপ আলোচনা এবং সংযোগ ছাড়াও হৃদয়ে হৃদয়ে এমন একটা অদৃশ্য সংযোগ থাকে যার ফলে একটি হৃদয়ের পরিবর্ত্তনপরম্পরার সঙ্গে স্বভাবতঃই অপর হৃদয়টির মধ্যে পরিবর্ত্তনপরম্পরা ঘটে' থাকে। একটি বৈদ্যুতিক-ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তনে তার পার্শ্বস্থ আকাশে তৎক্ষণাৎ ঘটে একটি চৌম্বক-ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন ও একটি চৌম্বক-ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তনে ঘটে একটি বৈদ্যুতিক-ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন। এই রহস্যটির ব্যবহারে আমরা প্রতি দিন আমাদের বাড়ীতে বসে' শুনতে পাই অশরীরী সঙ্গীত।

অধ্যাপককে লক্ষ্য করে' সুজাতার হৃদয়ে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছিল তার প্রতিধ্বনি হ'ল কানাইয়ের হৃদয়ে। উভয়ের হৃদয়ের রস

অধ্যাপকের সূত্রটিকে অবলম্বন করে' দানা বেঁধে উঠল এবং করতে লাগল একটি মাধুর্য্যমণ্ডিত স্ফটিকলোকের রচনা। অধ্যাপকের মধ্য দিয়ে, তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে উভয়ের প্রেমরস পেল একটা বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি, একটা সম্ভোগ ও সার্থকতা। দু'টি বিচ্ছিন্ন হৃদয়কে অধ্যাপক তাঁর নিজের অজ্ঞাতে মিলিত করলেন তাঁর জীবনের মধ্যে এবং তাঁর কাজের মধ্যে। তাই উভয়েই তাঁর কাজের মধ্যে কেবল যে কর্ত্তব্য-সম্পাদনের আনন্দ পেত' তা নয়, পেত' উভয়ের প্রেমধারার রসসম্ভোগ, যদিও তারা কখনো সে বিষয়ে হয় নি সচেতন। এমনি করে' কানাই নিরানন্দের মধ্যে পেল আনন্দ, তার ব্যাকুলতা থেকে সে পেল অনেক-পরিমাণে মুক্তি। তারা উভয়ে তাদের দিনের কর্ম্ম অধ্যাপকের কাছে করত নিবেদন, তাঁর উৎসাহে হ'ত অনুপ্রাণিত, উভয়ের প্রসন্ন মুখবর্ণে ও নেত্রের দীপ্তিতে পরস্পরের মধ্যে হ'ত ভাববিনিময়।

এমনি করে' চলতে লাগল উভয়ের কাজ এবং হৃদয়ের ভাব-বিনিময়। অনেক সময় তারা অধ্যাপকের নিকট বসে' অনেক বিষয়ে আলোচনা করত। কানাইয়ের কাছে যা কঠিন লাগত তা সুজাতা দিত বুঝিয়ে। তাদের জ্ঞান এসে সার্থকতা পেত' দর্শনে।

বিদ্যা বা শাস্ত্র বলে' যেটা চলে সেটা জড়বিদ্যাই হোক আর তত্ত্ব-বিদ্যাই হোক, তা পড়ে' থাকে তর্কের কোঠায়। জড়বিদ্যায় আমরা চোখে যা দেখি তর্কের দ্বারা তা করতে চাই গ্রথিত, আর তত্ত্ববিদ্যায় কোন একটা গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে তর্ককে অবলম্বন করে' আমরা কোন বিশেষ বিশেষ সমস্যাকে সেই তর্কের জালের মধ্যে চাই বিধারণ করতে। এইজন্য উভয় স্থলেই জ্ঞান থাকে আপন আপন ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু যতক্ষণ আমরা কোন এক পর্য্যায়ের জ্ঞানকে অপর এক পর্য্যায়ের জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন করে', আবদ্ধ করে' রাখি একটা

সীমার মধ্যে, সে জ্ঞান চৈতসিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়। একটি বৃক্ষ যখন তার মূলদেশে কোন একটি জীবকোষের দ্বারা ভূমিস্থ রস আকর্ষণ করে তখন সেই রস আবদ্ধ হয় সেই জীবকোষের মধ্যে। এমন অসংখ্য জীবকোষ রয়েছে একটি মূলের বেষ্টনীর চারিদিকে, তার অসংখ্য গৃহে আবদ্ধ হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে ভূমির রস। সেই রস যদি সেই জীবকোষের মধ্যেই থাকৃত তবে বৃক্ষের জীবন হ'ত অসম্ভব, কিন্তু সেই রসের স্বাভাবিক প্রেরণায় তা প্রেরিত হ'তে থাকে অন্য অন্য জীবকোষের মধ্য দিয়ে এবং তা সঞ্চারিত হয় বৃক্ষের শীর্ষস্থ উর্দ্ধতম জীবকোষ পর্য্যন্ত এবং এই সঞ্চারণেব মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় বৃক্ষের জীবন। একটা তাল বা খেজুরগাছের শিকড়ে যে রস আহৃত হয়, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মকে অতিক্রম করে' কোষজ প্রেরণায় সেই রস প্রেরিত হয় তালখর্জ্জুরের শীর্ষদেশে। সেই শীর্ষদেশের একটু ছাল কেটে আমাদের বৃহৎ পাত্র পূর্ণ করে' আমরা প্রত্যহ সে রস গ্রহণ করতে পারি। এমনি করে' আমাদের জ্ঞানের নানা কোষে আমরা যে নানা রস আহরণ করি তা যখন পরস্পরের মধ্যে হয় সঞ্চালিত, পরস্পরকে করে যখন তা বিদ্রুত, তখন তা প্রকাশ পায় চৈতসিক জীবনে একটি মহত্তর দর্শনে, একটি মহত্তর প্রতিভাসে; তখনই সেই জ্ঞান হয় সার্থক, তখনই সেই রস কোষবিশেষের ধর্ম্ম না হয়ে হয় সমস্ত চৈতসিক জীবনের ধর্ম্ম—তা প্রকাশ করে. জীবনের রহস্যকে এক নিমেষের প্রতিভাসে, যেমন প্রতিভাত হয় চক্ষুর উন্মীলনে অখণ্ড আকাশের রূপ। আমাদের উপনিষদের ঋষিদের বাক্যের মধ্যে আমরা এই জাতীয় প্রতিভাসেরই পরিচয় পাই। এই হচ্ছে যথার্থ দর্শন। পরবর্ত্তীকালের তার্কিকেরা তর্কের জাল বুনে যা রচনা করেছেন তা বিদ্যামাত্র, তা দর্শন নয়। তর্কের যে সূক্ষ্ম জালে ছোট

ছোট চুণোপুঁটি ধরা পড়ে সে জালে ধরা পড়ে না অগাধজলচারী তিমি, যে জালে ধরা পড়ে তিমি সে জালে ধরা পড়ে না চুণোপুঁটি। বৃহত্তর সত্যের প্রতিভাসের জন্য বিদ্যায় বিদ্যায় মিলন করে' ফুটিয়ে তুলতে হয় মানসপ্রত্যক্ষের দর্শন, তবেই তা দিতে পারে চেতস-বৃক্ষের মধুময় ফল। এমন করে' সংযমের মধ্যে, রসের মধ্যে, দর্শনের মধ্যে গড়ে' উঠতে লাগ্‌ল তাদের চরিত্র। কানাইয়ের জীবনের মধ্যে যে বাঁধা বাঁধা কর্ত্তব্যমন্ত্রের অনুশাসনে কাজ করবার পদ্ধতি ছিল সেটা পরিবর্ত্তিত হয়ে এল জীবনের রসশাসনের মধ্যে। কর্ত্তব্য যতক্ষণ কর্ত্তব্য হিসাবে থাকে খাঁড়া নিয়ে ততক্ষণ তার পালনে আসে দ্বন্দ্ব, আসে ভয়, আসে দোটানা, কিন্তু কর্ত্তব্যের মন্ত্র যখন পরিণত হয় রসধারাগত জীবনের নিয়মে তখন তার পরিপালনে ভয়ও থাকে না, দ্বন্দ্বও থাকে না, দোটানাও থাকে না, থাকে আনন্দ।

সুজাতা ও কানাই মিলে বিদ্যামন্দিরের নানা সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে এল অধ্যাপকের নিকট। তিনি সেই সংস্কারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন নিজের ভবিষ্যৎ কল্পনা ও স্বপ্ন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলেন। বল্লেন—"এতে যে প্রচুর অর্থ লাগবে।"

সুজাতা বল্লে—"অর্থাগমের উপায় আমরা ভেবে রেখেছি।"

অধ্যাপক সোৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি উপায় ?"

সুজাতা বল্লে—"ব্যাঙ্কে আমার প্রচুর টাকা রয়েছে, অব্যবহারে তা যাচ্ছে মরচে ধরে'। আমি সে সমস্ত বিনিয়োগ করতে চাই আপনার এ বিদ্যামন্দিরের সেবায়।"

কানাই দম্‌ল না। সে বল্লে—"আমার ব্যাঙ্কে কোন টাকা নেই, কিন্তু আমি যে রাসায়নিক আবিষ্কারগুলি করেছি সেগুলি বাজারে

বেচলে প্রচুর ধন আসবে তা থেকে। সে সমস্তই আমি দিতে চাই এই একই কার্য্যে।”

উভয়ে উভয়ের দিকে চাইলে সস্মিত উজ্জ্বল দৃষ্টিতে। একটি দৃষ্টির মধ্য দিয়ে উভয়ের সর্ব্বস্বধন অর্ঘ্য হয়ে পৌছল একই দেবতার পাদমূলে, যেন গ্রথিত হ'ল দু'টি হৃদয় একটি অভিষেকমন্ত্রে। অধ্যাপক অত্যন্ত আনন্দিত হ'লেন। কিন্তু বল্লেন—“তোমাদের সর্ব্বস্ব দেবে তোমরা এর পিছনে?”

সুজাতা বল্লে—“আপনিই শিখিয়েছেন যে প্রেমের দান্ দান নয়, সে পাওয়া। আমাদের এ পাওয়া হচ্ছে দু'রকম। একটা হচ্ছে এই যে আপনার এই বিদ্যামন্দিরকে সার্থক করে' তোলা আমাদের জীবনের পরম প্রিয় পদার্থ বলে' মনে করি। এই পরম প্রিয়ের জন্য যা ত্যাগ করব তার দ্বারা আমাদেরই পাব আমরা ফিরে, আমাদেরই হবে পূর্ণতা। কিন্তু এর আরো একটি দিক আছে, সেটি আমাদের উপরি পাওনা।”

কানাই বিস্মিত হয়ে সুজাতার মুখের দিকে চাইলে, ভাবলে— কি বলতে চায় এ!

সুজাতা বল্লে—“আপনার হৃদয়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছি আমাদের হৃদয়, তাই আপনার কল্পনাতে এই বিদ্যামন্দিরের অজস্র মঙ্গলের সম্ভাবনার মধ্যে ও সেই মঙ্গল সম্পাদনের মধ্যে আপনি যে আনন্দ পাবেন আমরা বিনা আয়াসে সে আনন্দ উপভোগ করব আপনার মধ্য দিয়ে।”

অধ্যাপক বল্লেন—“এসব কথা তুমি শিখলে কোথায়, মা?”

সুজাতা বল্লে—“আমার এমনিই মনে হয়েছে। এই দুই রকমেই যে আনন্দ পাই তা আমি নিজেই অন্তরে অনুভব করেছি।”

অধ্যাপক আবার হেসে বল্লেন—“প্রেমের এটা একটা গভীর রহস্য।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার ও ভক্তি, প্রেমকে এই পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়। আমাদের দেশে এই পাঁচটি রসই প্রধান জায়গা পেয়েছে। সব চেয়ে বেশী জায়গা পেয়েছে নরনারীগত শৃঙ্গার। উপনিষদ বলেছে যে দু'টি হৃদয় যখন একত্র আলিঙ্গিত হয় তখন তারা যে আনন্দ পায় তাতে মানুষ আপনাকে এমনি হারিয়ে ফেলে যে ভিতর বাইরের জ্ঞান থাকে না। ব্রহ্মের সঙ্গে যখন আমরা আপনাকে লীন বলে' অনুভব করি এ আনন্দ সেই আনন্দেরই অনুরূপ। পরবর্ত্তী-কালে কবিদের হাতে প্রেমের এই উচ্চ আদর্শ গেল একেবারে নেমে। কালিদাস ছিলেন প্রেমের কবি, চেতন অচেতন সর্ব্বত্র দেখতেন তিনি প্রেমের ছবি। কিন্তু প্রেমের যে অংশটা একান্তভাবে শরীরলগ্ন হয়ে থাকে, প্রেমের সেই ছবিটিই তিনি প্রধানভাবে এঁকেছেন। ভবভূতি বলে' গিয়েছেন যে প্রেম আরম্ভ হয় শরীরকে দিয়ে, কিন্তু সে প্রেম শরীরকে অতিক্রম করে' পরিণত হ'তে পারে গাঢ় স্নেহসারে। তিনি আরো বলেছেন যে দু'টি শরীর পৃথক দেশে থাকলে তাদের অবলম্বন করে' যে বিচ্ছেদের করুণ রস হয় সেইটিই যথার্থ রস। তা সমুদ্রের ন্যায় বিশাল এবং সমুদ্র যেমন কোন সময় বড় ঢেউ, কোন সময় ছোট ঢেউ, কোন সময় ফেনা, কোন সময় বুদ্বুদ প্রভৃতি নানা অবস্থায় আপনার পরিচয় দেয়, তেমনি বিযুক্তদেহ-প্রেম নানা পরিচয়ে আপনাকে প্রকাশ করে' থাকে। ভেদাভেদবাদে যেমন বলা হয় যে ব্রহ্মের সঙ্গে জগৎ ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে, তেমনি ভবভূতিও বলেছিলেন যে নানা পরিচয়ের মধ্য দিয়ে একই প্রেমরস আপনাকে ব্যক্ত করে। কিন্তু যে অবস্থার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাক না কেন, সকল অবস্থাতেই তা নির্ম্মল অখণ্ড প্রেম। দক্ষিণদেশীয়েরা প্রবর্ত্তন করলেন প্রধান ভাবে ভক্তিধর্ম্ম, তা প্রকাশ পেয়েছে বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম্মে।

এই উভয় ধর্ম্মে শরণাগতি এবং দাস্য এই দুইভাবেই তাঁরা ভক্তির ব্যাখ্যা করেছেন। শরণাগতিকে তাঁরা বিভাগ করেছিলেন দু'টি স্তরে—একটি হচ্ছে নিশ্চেষ্টভাবে বিড়াল শিশুর ন্যায় আশ্রিত হয়ে থাকা, আর একটি হচ্ছে সচেষ্টভাবে আশ্রিত হয়ে থাকা। দক্ষিণ দেশের প্রাচীন বৈষ্ণবেরা কিন্তু নরনারীগত প্রেমের উপমাতেই ভগবৎপ্রেমের ব্যাখ্যা করে' এসেছেন। কিন্তু আমাদের বাঙ্‌লাদেশে ভক্তি আবার ফিরে এল নরনারীগত প্রেমের উপমায়। তার একটি বিভাগে আমরা দেখতে পাই যে দেহবিযুক্তভাবে প্রেমের নানা লীলার মধ্যে আত্মাকে তরঙ্গিত করে' তোলাই ছিল ভক্তির একটি অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা রাধাকৃষ্ণের লীলারস বর্ণনা করে' গেছেন। একটি প্রেমরসের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ রয়েছেন বিলীন হয়ে। উভয়েই হারিয়েছেন তাঁদের নরত্ব বা নারীত্ব। এই দ্বৈতাদ্বৈত প্রেমরস বহুধা বিচিত্র পরিচয়ে আপনাকে প্রকাশ করে। ভক্ত ভুলে যাবে আপনার দেহ ও আপনার কামনা। দেহবিযুক্ত স্বভাবে সে আপনার চিত্তটিকে দোল খাইয়ে ফেরাবে রাধা-কৃষ্ণগত প্রেমের বিচিত্র পরিচয়ের মধ্যে দ্বৈত থেকে অদ্বৈতে এবং অদ্বৈত থেকে দ্বৈতে, প্রেমের বিচিত্র আরোহাবরোহে। ভক্ত ভুলে যাবে তার আপন ব্যক্তিজীবনগত প্রেমের আস্বাদ, সে মগ্ন হয়ে যাবে রাধাকৃষ্ণের লীলাস্বাদে। তুমিও দেখছি সুজাতা, তোমার হৃদয়ের সহজ অনুভূতিতে এটা অনুভব করতে পেরেছ যে আর একজনের আস্বাদের মধ্য দিয়ে নিজে আস্বাদ করতে পারা যায়; আমার আনন্দের বিচিত্র পর্য্যায়ের মধ্যে তুমিও পার বিচিত্র পর্য্যায়ের আনন্দ উপভোগ করতে। অত্যন্ত বিস্ময়কর তোমার এ অনুভব।"

সুজাতা লজ্জায় হ'ল সঙ্কুচিত। কিন্তু কানাই বল্লে—"বৈষ্ণবকবিদের

লেখা ত অশ্লীলতায় পূর্ণ, তাতে ত দেখা যায় অত্যন্ত মোটা-রকমের দেহধর্ম্মী জৈব ভালবাসা।"

অধ্যাপক আবার বল্লেন—"তুমি যা বলেছ এই রকমই অনেকে মনে করে বটে, কিন্তু তারা বৈষ্ণবকবিদের প্রকাশের পরিভাষা অবগত নয়।"

কানাই আবার বল্লে—"এর মধ্যে পরিভাষার প্রশ্ন কি করে ওঠে?"

অধ্যাপক বল্লেন—"ওঠে। মানুষের মনের মধ্যে প্রেমেব যে বিচিত্র অনুভব আছে—মান, অভিমান, ব্রীড়া, নির্ব্বেদ, গ্লানি—সেগুলি যে আন্তরিক বস্তু তা তুমি মান কি না? মান কিনা তুমি যে সেগুলি দেহের ধর্ম্ম নয়?"

কানাই বল্লে—"হ্যাঁ, তা ত অবশ্য মানতেই হয়।"

তখন অধ্যাপক বল্লেন—"তোমাকে যদি আমি বলতুম যে প্রেমের এই বিচিত্র পর্য্যায় ও পরিচয়ের ভাষায় ছবি আঁক, কর এদের বর্ণনা, তুমি তা হ'লে কি করতে?"

কানাই রইল চুপ করে'। তখন অধ্যাপক বল্লেন—"কি হে, চুপ করে' রইলে যে বড়? দাও না উত্তর।"

কানাই বল্লে—"এগুলো যে emotion, এগুলোব ছবি আঁকব কি করে'?"

অধ্যাপক বল্লেন—"সেই ত ছিল আমাদের বৈষ্ণবকবিদের সমস্যা। রঙে রূপ আঁকা যায়, আকার আঁকা যায়, কিন্তু তোমাকে এঁকে দেখাতে হবে যে একটা ফুল গন্ধে পূর্ণ হয়েছে। কি করে' তুমি এঁকে দেখাবে? তোমাকে আঁকতে হয় একটা ফুল, তাঁর চারিপাশে আঁকতে হয় দু'টো চারটে ভ্রমর। হয় ত বা আঁকতে হয় একজন পথিক, যে আকৃষ্ট হয়েছে ফুলের গন্ধের দিকে। এমনি করে' তোমাকে দ্যোতনা করতে হবে সেই গন্ধের যে গন্ধ পার না তুমি আঁকতে। তেমনি বিচিত্র পর্য্যায়ের

বিচিত্র প্রেমের পরিচয় তুমি ভাষায় পার না প্রকাশ করতে, কিন্তু সেই রকম প্রেম হ'লে দেহের আকার, ব্যবহার ও ইঙ্গিতের যে পরিবর্ত্তন ঘটে সেই অনুভাবগুলি তুমি ভাষায় বর্ণনা করতে পার। কাজেই সে ভাবগুলিকে প্রকাশ করতে হ'লে দেহবর্ণনার মধ্য দিয়ে ছাড়া অন্য উপায়ে প্রকাশ করা যায় না। কাজেই, অন্তরের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করতে হ'লে টেনে আনতে হয় স্থূল দেহটার নানা বিকার, যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় অন্তরের ভাবগুলি এবং যাকে প্রকাশ করতে পারা যায় ভাষায়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণরাধার প্রেমের চিরন্তন বিলাসবিবর্ত্ত প্রকাশ করতে হয়েছে প্রাকৃত কৃষ্ণরাধার প্রাকৃত দেহের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে। যে দেহের বিকারের বর্ণনা তাঁরা করেছেন সেটা ছিল তাঁদের অন্তরকে প্রকাশ করবার ভাষা। ওটা হ'ল শিল্পের টেক্‌নিক্। ভগবানও দিয়েছেন আমাদের দেহকে আমাদের অন্তরের ভাব প্রকাশ করবার জন্য, সেই ভাবের দ্বারা দেহকে বিক্ষুব্ধ করবার জন্য নয়।"

সুজাতা স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ রইল নির্ণিমেষ নেত্রে। তারপর প্রণাম করলে অধ্যাপককে তাঁর দু'টি পায়ে মাথা রেখে। কানাইও দু'টি হাত জোড় করে' মাথা করলে অবনত স্তব্ধ বিস্ময়ে। অধ্যাপক বল্লেন—"তোমাদের বিদ্যামন্দিরের সংস্কারের প্ল্যানটি সমস্তই সুন্দর হয়েছে, তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে সামান্য একটু বক্তব্য ছিল।"

উভয়েই সোৎসুকভাবে বল্লে—"বলুন।"

অধ্যাপক আবার একটু সঙ্কুচিতভাবে বল্লেন—"বলব?"

সুজাতা বল্লে—"আপনি ও রকম করছেন কেন? বলুন না।"

অধ্যাপক বল্লেন—"আমার ইচ্ছা যে এই বিদ্যামন্দিরের কম্পাউণ্ড-এর দক্ষিণদিকে তোমরা গড়ে' তোল স্বল্পায়তন একটি মন্দির, সেই

মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ। মন্দিরের চারিপাশে পুঁতে দাও কদম্বের গাছ এবং অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পের বল্লরী। স্থানটিকে উদ্যান করে' না তুলে রেখে দিও খানিকটা প্রাকৃতিক বন্য অবস্থায়, আর তার চারিদিকে তুলে দাও প্রাচীর।"

সুজাতা ও কানাই দু'জনে যেন একেবারে হাঁ হয়ে গেল, পরস্পর করতে লাগল মুখ চাওয়াচাওয়ি। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল তাদের গুরুদেবের দিকে। তারপর সুজাতা বল্লে—"আপনার কাছ থেকে ত ঠিক এমনটি আশা করি নি। তা, সে রাধাকৃষ্ণের কি পূজা ও পুরোহিতের ব্যবস্থাও করতে হবে?"

অধ্যাপক বল্লেন—"মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা করলে ত পূজার ব্যবস্থা করতে হবেই।"

সুজাতা খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠে জড়িয়ে ধরলে অধ্যাপকের দু'খানা পা, দু'টি চক্ষু উন্নত করে' চেয়ে রইল অধ্যাপকের চোখ দুটির দিকে। অধ্যাপকের চোখ দু'টি হ'ল জলভারাক্রান্ত। অধ্যাপক বল্লেন—"হৃদয়ে যা অনুভব করা যায় অতি গভীর ভাবে, আপন পরমাত্মীয় পরমসত্যভাবে, তাকে মানুষ প্রকাশ করতে পারে না বাইরের জগতে। তা প্রকাশ করবার বস্তু নয়, তা নিয়ে বাইরের জগতে করতে হয় না যাচাই। তাই কোন ইঙ্গিতে বা ভাষায় তা আমি কখনো চাই নি প্রকাশ করতে।"

সুজাতা বল্লে—"আপনি কি এই জাতীয় ধর্ম্ম মানেন?"

অধ্যাপক বল্লেন—"আমি সব জাতীয় ধর্ম্মই মানি। কিন্তু কতগুলো ধর্ম্ম আছে যা মনুষ্যসাধারণ, তা প্রকাশ করা যায় যুক্তি দিয়ে এবং ইঙ্গিত করা যায় অনুভবের আলোকে। কিন্তু যা সর্ব্বসাধারণের নয়, যা একান্তই আমার নিজের, যার সত্যতা রয়েছে বিলীন হয়ে আমার

সত্তার মধ্যে, তাকে ত আমি দিতে পারি না তর্কের দ্বারা যাচাই করতে।"

সুজাতা আবার প্রশ্ন করলে—"রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তির অর্থ কি ?"

অধ্যাপক বল্লেন—"যুগলবিগ্রহ হচ্ছে প্রেমের প্রতীক। যৌবনাবধি এই মূর্ত্তিকে দিয়েছি আমি স্থান আমার হৃদয়ে। এই মূর্ত্তির মধ্যে পেয়েছি জীবনে সর্ব্বকার্য্যের প্রেরণা এবং সর্ব্বকার্য্যের আশ্রয়। ঐ মূর্ত্তির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সর্ব্বমানুষের প্রতি প্রেম, ওরই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আমার অন্তর্য্যামীর প্রতি আমার নিবেদন। ঐ মূর্ত্তির মধ্যেই বাস করবে আমার চিরন্তন সত্তা, তা যেভাবেই পা'ক না পরিণতি এই দেহান্তে।"

সুজাতা অর্দ্ধস্ফুটস্বরে অত্যন্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"প্রতীকের তাৎপর্য্য কি ?"

অধ্যাপক বল্লেন—"প্রত্যেকের মধ্যেই যা রয়েছে তাকেই বলি প্রতীক।"

সুজাতা আবার বল্লে—"তার অর্থ কি ?"

অধ্যাপক বল্লেন—"জড়পরমাণু থেকে আরম্ভ করে' এই জগতে সর্ব্বত্রই চলেছে দু'য়ের লীলা। বহুও দু'য়েরই নামান্তর। এই দু'য়ের লীলা আমাদের অন্তরকে উদ্ভাসিত করেছে প্রেমে। এই দু'য়ের লীলাই প্রকাশ পেয়েছে আমাদের দেহের সঙ্গে চিত্তের বিধারণে, চিত্তের সহিত অধ্যাত্মের মিলনে। এই দু'য়ের লীলাই প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের প্রেমে ও প্রেমের অনুভবে। প্রেমই রেখেছে এই জগৎকে বিধৃত করে'। সমস্ত মৃত্যুকে লঙ্ঘন করে' সে এনেছে অমৃত। এই জন্যই যুগলকে আমরা দেখতে পাই সর্ব্বত্র। বহুশত বর্ষের সাধনা দ্বারা, বহু ভক্তের হৃদয়ের অভিষেক বারিতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত করেছে এই যুগল-

মূর্ত্তি। আর এর সব চেয়ে বড় কথা এই যে আমার জীবনের সমস্ত অনুভবের মধ্যে আমি আমাকে নিবেদন করে' দিয়েছিলুম এই যুগলমূর্ত্তির পদপ্রান্তে। আমার হর্ষ, আমার শোক, আমার গ্লানি, আমার পরাজয়, আমার দুঃখ, আমার লাঞ্ছনা, সমস্তই আমি চিরদিন নিবেদন করেছি এই অন্তর্য্যামীর পায়ে। আমার যিনি অন্তর্য্যামী, যিনি আমার পরম অন্তরঙ্গ, তিনি কেন যে এই রূপ নিয়েছেন আমার হৃদয়ে তা জানি না, তবু নিয়েছেন যে তা পরম সত্য।"

সুজাতা আবার প্রশ্ন করলে—"আপনাকে ত পূজা অর্চ্চনা করতে দেখি নি।"

"স্থূল পূজা আমি করি না, আমি করি হৃদয়ের মৌন পূজা। তবু স্থূল পূজা কেউ করলে আমার দেখতে ভাল লাগে।"

এর পরে আর কথা চলে না। তিনজনেই রইল অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে। তারপর সুজাতা ও কানাই উভয়েই অধ্যাপককে প্রণাম করে' চলে' গেল।

এমনি করে' কাটল অনেক দিন। তার পরে এল হঠাৎ একদিন অধ্যাপকের বিদায় নেবার পালা। কানাই ও সুজাতা এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে। স্থির নেত্রে তিনি দিলেন দু'জনের মাথায় হাত বুলিয়ে, চাইলেন দু'জনের দিকে। দু'জনেই সে ইঙ্গিতের অর্থ বুঝল। দু'জনেই বল্লে—"আপনার অনশ্বর দেহকে আমরা প্রতিপালন করে' চলব আমাদের সমস্ত জীবন ভরে', যা কিছু হ'তে পারে এর পরিপন্থী তা আমরা কিছুতেই করব না।"

এর পরে কেটে গেল অনেক দিন। অধ্যাপকের বিদ্যামন্দির হ'ল সুসংস্কৃত, মন্দির হ'ল স্থাপিত, বিগ্রহ হ'ল প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র ভারতবর্ষে, এমন কি, ভারতবর্ষের বাহিরেও এই বিদ্যামন্দির লাভ করল তার

প্রতিষ্ঠা। দু'টি ভক্তের সাধনার দু'টি সমান্তরাল ধারা ছুটে চল্‌ল তাদের সিদ্ধির সাগরসঙ্গমের দিকে। সুজাতা ও কানাইয়ের প্রেম গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে, কিন্তু কোন ভাষায় পায় নি তা প্রকাশ। তা প্রকাশ পেয়েছে তাদের পরস্পরের ব্যবহারে। উভয়ের স্থিতি একান্ত ভাবে হয়ে উঠেছিল পরস্পর সাপেক্ষ, পরস্পরের সত্তা যেন নিমগ্ন হয়ে আসছিল পরস্পরের মধ্যে।

একটি বসন্তসন্ধ্যায়, যখন উদ্যানের দিগ্বিভাগ আলোকিত করেছিল পুঞ্জীকৃত সন্ধ্যামণি ফুলে, দিনের মৌনতপস্যায় সন্ধ্যার রজনীগন্ধার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে সমুদ্গত হচ্ছিল গন্ধের আভাস, নবমল্লিকা ও হেনার পেলব পুষ্পদল থেকে সৌরভের স্রোত আসছিল বয়ে, ভূরি ভূরি চূতমুকুলের পরিপুষ্ট গন্ধ দুর্ব্বহ হয়ে উঠছিল পবনের পৃষ্ঠে, বকুলবীথিকার পাদমূল আস্তরিত হয়েছিল রাশি রাশি বকুল পুঞ্জে, মাধবী ছেড়েছিল তার গন্ধের বাণ কোন্ অলক্ষিত পত্রপুঞ্জের অন্তরাল থেকে, দক্ষিণের শীত-সুরভিত পবন মন্দপ্রবাহে গুঞ্জরিত হচ্ছিল কিশলয়কুলের মধ্যে অন্তঃ-সঞ্চারে, পরিণামরমণীয় দিনের প্রান্তে স্নিগ্ধ হয়ে উঠছিল সেই বাতাসে নরনারীর শরীর, জ্যোৎস্নাধবলিত গন্ধরাজ উৎফুল্ল হয়ে দোল খাচ্ছিল পবনে, অলিপুঞ্জ হয়েছিল বন্দীকৃত উদ্যানসরোবরের বনলক্ষ্মীর পত্রা-ঞ্চলের মধ্যে, সুদূরপ্রসারী মাঠের প্রান্তে পল্লীভবনে দীপশিখার মৃদু আলোক হচ্ছিল ঈষৎ আকম্পিত, সূচিত করছিল সমস্ত পল্লীভবনের গার্হস্থ্য সম্পদ, বনশাখীদের পত্রপুঞ্জের মধ্যে রাশি রাশি জোনাকীরা হয়েছিল পথভ্রষ্ট, অর্দ্ধসুপ্ত হয়েছিল বিহঙ্গমকুল নীড়ের মধ্যে, পূর্ব্ব-দিগ্বিভাগ আলোকিত করে' সমীপবর্ত্তী চিত্রানক্ষত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছিল ত্রয়োদশীর চন্দ্র,—এমনি এক সন্ধ্যায় সপ্তপর্ণীর এক বৃহৎ বেদি-কার উপরে দু'খানি কুশাসনে বসে ছিল কানাই ও সুজাতা।

জ্যোৎস্না এসে ঠিক্‌রে পড়ছিল সুজাতার মুখের উপরে। চূর্ণকুন্তল তার দুলে বেড়াচ্ছিল বাতাসে। বসন্তসন্ধ্যার গন্ধবাণগুলি যেন বিদ্ধ করছিল তার মর্ম্মস্থল। কত ঘুম-পাড়ানো বাসনা হৃদয়ের মধ্যে উঠতে লাগল কোলাহল করে'। সে কোলাহলের দূরশ্রুত ধ্বনি যেন একটা মোহকর সঙ্গীতের আবেশে আবিষ্ট করল সুজাতার চেতনালোক। জাগ্রত মনের যে দ্বারী সর্ব্বদা থাকে দণ্ডপাণি হয়ে, ফিরিয়ে দেয় নিরন্তর অবচেতনার পথিকদের তাদের গহ্বরের মধ্যে, প্রকৃতির মাধুর্য্যের মধ্যে সেও কোন সময় হয় ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন, হয় ঈষৎ দুর্ব্বল। স্বপ্নের সময় সে দ্বারী পড়ে যেন শ্রমার্ত্ত হয়ে ঘুমিয়ে। অবচেতনার পথিকেরা তখন কোন রকমে তার শাসনকে অতিক্রম করে' এসে প্রবেশ করে চেতনার ভূমিতে। কিন্তু অবচেতনার মধ্যে দীর্ঘকাল বন্দীদশায় থাকার ফলে তারা অনেক সময় এমন জীর্ণশীর্ণ ছায়াময় হয়ে ওঠে, তাদের মুখভাব ও পরিচ্ছদ হয়ে যায় এত পরিবর্ত্তিত যে চেতনাভূমিতে যখন তারা দেখা দেয় স্বপ্নরূপে, তখন তাদের যথার্থ পরিচয় চেনা হয় দুর্ঘট। অনেকদিন পূর্ব্বে সুজাতা একবার স্বপ্নে দেখেছিল যে সে যেন একটা ভেলায় রওনা দিয়েছে মহাসমুদ্রের মধ্যে। ভেলার মাঝি একজন বলিষ্ঠ কালো লোক। সুজাতার পরণে লাল চেলি, কপালে একটা সিঁদুরের ফোঁটা। এই স্বপ্নের কথা সুজাতা অনেক সময় ভেবেছে। যতই ভেবেছে, তার মুখ হয়েছে আরক্ত। তবে কি এ কালো লোকটি কানাই নাকি? কানাইয়ের সঙ্গে হবে নাকি তার মিলন এবং দু'জনে রওনা দেবে অকূলের দিকে ভেলায় চড়ে'? কানাইয়ের সঙ্গে যখন মেশামেশি হয়ে উঠল ঘনিষ্ঠ, তখন যখনই সুজাতার মনে সে স্বপ্নটি ভেসে উঠত তখনই মনে মনে সে অত্যন্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে উঠত। মেয়েদের অনেকেরই মনে স্বপ্ন সম্বন্ধে একটা দুর্ব্বলতা আছে। তাদের অনেকেরই মনে একটা

সংস্কার আছে যে স্বপ্নে দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতিবিম্ব দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই স্বপ্নশাস্ত্রের প্রচলন আছে এবং শাকুনবিদ্যার মধ্যে স্বপ্নবিদ্যাও পরিগণিত হয়েছে। কোন্ স্বপ্ন দেখলে ভাল হয়, কোন্ স্বপ্ন অত্যন্ত অশুভ, এ সম্বন্ধে স্বপ্নশাস্ত্রে অনেক আলোচনা দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে, যে সমস্ত আকাজ্ক্ষাকে, বিশেষতঃ নরনারীগত ধর্ম্মাক্রান্ত আকর্ষণকে আমরা বলপূর্ব্বক চেতনায় প্রস্ফুটিত হ'তে দিই না কিংবা চেতনায় প্রস্ফুটিত হ'লেও তাদের বহিঃ-প্রকাশকে করি ব্যাহত, সেগুলি নিগৃহীত হয়ে বাস করে অবচেতনা-লোকে এবং যখনই চেতনা ও অবচেতনার মধ্যবাসী দ্বারীটি হন শ্রম বা তন্দ্রাযুক্ত তখনই অবচেতনালোকের সেই সমস্ত নিগৃহীত ভাবগুলি বিভিন্ন বেশে এবং অনেক সময় বিকৃত ভাবে আমাদের প্রমূঢ় চেতনালোকে স্বপ্নরূপে আপনাদের প্রকাশ করে। তাই স্বপ্নশাস্ত্রের অনুশীলনের দ্বারা অবচেতনাগত মনের অনেক আভাস পাওয়া যায়। আমাদের মনের অবচেতনার মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের কোন ছায়া পড়ে কি না এবং সেই ছায়া স্বপ্নে সংক্রান্ত হ'তে পারে কি না এবিষয়ে এখনও যথেষ্ট অনুশীলন হয় নি। তবে জীবনে অনেক সময় অবচেতনানির্ম্মুক্ত আভাসকে সত্য হ'তে দেখা যায়। হঠাৎ বিনা কারণে মনে হ'ল আজ আমার ভাই আসবে—হয় ত সত্যই ভাই এসে উপস্থিত হ'ল। এই জাতীয় আভাসকে বলে প্রতিভা।

কিন্তু আজ এই বসন্ত সন্ধ্যায় ফুল্লকুসুমগন্ধের মধ্যে অন্ধীকৃত চেতনার অস্ফুট আবেশে সুজাতার চিত্তে যে আভাস উঠছিল তা ঠিক স্বপ্নলোকের স্বপ্নের মত নয়। তা যেন অবচেতনাগত নানা বিহ্বল ভাবের পদ-চারণের গুঞ্জন, যেন তাদের কেশবাসের সুগন্ধ। গন্ধের মতই তা দুর্বিজ্ঞেয়, জ্যোৎস্নার মতই তা অপরিস্ফুট, লাবণ্যের মতই তা যেন

তরল। সে যায় অনুভবের প্রান্তে একটু শিহর দিয়ে, কিন্তু তার মূর্ত্তি দেখায় না। যখন কোন তরুণ যুবা বসে' থাকে একটি ঘরে এবং তার পাশের ঘরে পর্দ্দার আড়াল থেকে শোনা যায় তরুণীদের কলহাস্য, পাদগুঞ্জরণ, ক্বচিৎ বা দেখা যায় ওড়নার প্রান্তটুকু, তখন তার রক্তে যে একটি নামগোত্রহীন ব্যাকুল হিল্লোল ওঠে, এ যেন কতকটা সেইরূপ। নিগৃহীত অবচেতনার মধ্য থেকে সেই আকর্ষক গুঞ্জরণ সুজাতার কাণের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে' অপরিস্ফুট বেদনার অনুভবে নিষিক্ত করেছিল তার মুখমণ্ডল একটা অপূর্ব্ব অলৌকিক দীপ্তিতে।

কানাইয়ের মনে যে আন্দোলন উঠছিল সে শুধু অবচেতনাগত সংস্কারের আন্দোলন নয়, তার মধ্যে মিশ্রিত হয়ে ছিল নিরুদ্ধ দেহবৃত্তির আস্ফালনের তাণ্ডব। মঞ্জরীর সঙ্গে কানাইয়ের যে ব্যবহার ঘটেছিল তাতেই নরনারীগত যে ভাবটি দেহে ও মনে তরঙ্গ খেলে যায় সেই ভাবটীর সঙ্গে তার একটা স্ফুট পরিচয় হয়েছিল। দীর্ঘ নিগ্রহের দ্বারাও সেই পরিচয়টি ছায়ার ন্যায় বিশীর্ণ হয়ে যায় নি। বাইরে তার প্রকাশ হয়েছে নিরুদ্ধ, তাই ভিতরের আবেগের পূর্ণতায় তা ছিল সজীব হয়ে। বন্দীর ন্যায় কারাগৃহের বাইরে তা আসতে সাহস করত না, কিন্তু কারাগৃহের দরজার গরাদের উপরে তা সময় সময় করত মিথ্যা ক্ষোভ-প্রকাশ। কারাগৃহের গরাদ ছিল অতি দৃঢ়, তাই সে কিছুতেই ছুটে বাইরে আসতে পারত না। সে একবার স্বপ্নে দেখেছিল যে সে উঠছে একটা দুরারোহ শৈলে, তার সঙ্গে রয়েছে একটি মেয়ে; মেয়েটির মুখ অবগুণ্ঠনে ঢাকা। মেয়েটি উঠছে তর্ তর্ করে' এগিয়ে, আর সে রয়েছে পড়ে' পিছনে। যখন পিছল জায়গায় পিছল পাথরের উপরে সে পড়তে চায় পা পিছলে, মেয়েটি দেয় তাকে অবলম্বন। তারপরই সে ধরতে চায় তার হাত, দেখে মেয়েটি গেছে এগিয়ে। যখন অতি উর্দ্ধে

উঠতে গিয়ে তার মাথা উঠ্ছে ঘুরে, মেয়েটি আশ্রয় দিচ্ছে তাকে কাঁধের উপরে, কিন্তু যেই সে চলতে গিয়েছে, সে দেখেছে মেয়েটি আর তার পাশে নেই, গেছে সামনে এগিয়ে। স্বপ্নটিকে সে ব্যাখ্যা করেছে নিজের মনে মনে। সে বার বার পণ করেছে যে এই আরোহণে তার সঙ্গিনীর চেয়ে তার নিজের বল সে অধিক পরিমাণে ব্যক্ত করবে, চাইবে না তার আশ্রয়, উঠবে আপন বীর্য্যে, তার বিনা অবলম্বনে। কিন্তু তবু কোথায় যেন জড়িয়ে ছিল একটা মধুরতা এই মেয়েটির হাতে ভর করায় এবং তার স্কন্ধকে করতে অবলম্বন।

আজ এই বসন্তসন্ধ্যার নির্জ্জনতা তার মনকে দিয়েছিল হাল্কা করে'। যে গন্ধের সুরা সে পান করেছিল, তাতে যেন ক্ষণিক অনবধান হয়ে পড়েছিল অবচেতনার দ্বারী। সে বারবার সুজাতার অজ্ঞাতে আকণ্ঠ পান করেছিল তার চন্দ্রিকোদ্ভাসিত মুখের লাবণ্য। চন্দ্রের সুরার সঙ্গে মুখলাবণ্যের সুরা মিশ্রিত হয়ে উচ্ছল করে' তুলেছিল তার রক্তের তরঙ্গ, শিথিল করে' দিয়েছিল তার আপনার উপরে সংযম। সে একটু এগিয়ে এসে আরো একটু কাছে বসল সুজাতার। সুজাতা একবার তাকালে তার দিকে, তারপর নেত্রপল্লব রইল আনত করে'।

কাব্যে ইতিহাসে দেখা যায় যে বসন্তপুষ্পাভরণা পার্ব্বতী পদ্মরাগের পরিবর্ত্তে রক্তাশোকের গুচ্ছে, হেমালঙ্কারের পরিবর্ত্তে কর্ণিকার গুচ্ছে হয়েছিলেন অলঙ্কৃত, মুক্তাকলাপীকৃত করেছিলেন সিন্ধুবার পুষ্পের মালা, বসন পরেছিলেন তরুণার্করাগের। পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী লতার ন্যায় ছিল তাঁর গতি। মন্মথের দ্বিতীয় মৌর্বীর ন্যায় কোমরে পরেছিলেন কেসরদামকাঞ্চী। তাঁর মুখের নিঃশ্বাসে বদ্ধতৃষ্ণ হয়ে ব্যাকুল ভ্রমর ফিরছিল তাঁর বিম্বাধরের সন্নিকটে সঞ্চরণে, সম্ভ্রমলোল দৃষ্টিতে লীলারবিন্দে তিনি তাদের কর-

ছিলেন নিবারণ। তাঁর তাম্রাভ করতলে ভানুময়ূখবিশোষিত মন্দাকিনী-পুষ্করবীজমালা তিনি অর্পণ করেছিলেন ধ্যাননির্ম্মুক্ত মহাযোগীন্দ্রের করপুটে। চক্রীকৃতচারুধন্বা মন্মথ ছিলেন এই অবসরকে লক্ষ্য করে' তাঁর বাণপ্রয়োগের জন্য। মহাযোগীন্দ্র চন্দ্রোদয়ারম্ভে অম্বুরাশির ন্যায় হয়েছিলেন কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্য, বারংবার ত্রিলোচনের লোচনত্রয় আকৃষ্ট হচ্ছিল বিম্বফলাধরোষ্ঠা পার্ব্বতীর মুখমণ্ডলের দিকে। স্ফুরদ্বালকদম্বকল্প শিহরণে শিহরিত হচ্ছিল পার্ব্বতীর সমগ্র দেহ অনুরাগস্ফুরণে। তারপর পৃথিবীতে কতবার কত স্থলে কত দেশে ঘটেছে এই মহাসত্যের অভিনয়। গিরিলোক থেকে গিরিজা কতবার তা দেখে ঈষৎহাস্যে চেয়েছিলেন সর্পকলাপী শিবের দিকে, লজ্জিত হয়েছিলেন রূপের দ্বারা গিরীশের প্রতি আপনার ভগ্নমনোরথ আকর্ষণের চেষ্টার কথা স্মরণ করে'। আজও বুঝি সেই লগ্নকাল হয়েছিল উপস্থিত। বসন্তপুষ্পাভরণা পৃথিবী সুজাতাকে নারীলোকের প্রতীক করে' ক্ষোভিত করে' তুলেছিল কানাইয়ের ক্ষুদ্র হৃদয়-সমুদ্রের কল্লোল। বননিকুঞ্জের মধ্যে চক্রীকৃতচারুধন্বা মন্মথ যেন আজও কোনখানে প্রতীক্ষা করছিল তার বাণ প্রয়োগাবসরের, বিস্মৃত হয়েছিল সে তার পূর্ব্বজীবনের দুর্ভাগ্যের কথা। হঠাৎ আবেগে কানাই চেপে ধরলে সুজাতার হাত। সুজাতা কোন কথা বল্লে না, জলভারাবনম্র হ'ল তার দুটি চক্ষু। কানাই বল্লে—"তুমি আমার।"

সুজাতা রইল চুপ করে'। আবার কানাই বল্লে—"বল, তুমি আমার।"

সুজাতা ধীরে ধীরে বল্লে—"লগ্ন গিয়েছে পার হয়ে।"

কানাই বল্লে—"আমার হৃদয়ে পাচ্ছি তোমার হৃদয়ের সাড়া, এই ত চিরন্তন লোকের আদিকালের লগ্ন।"

স্বজাতা বল্লে—“সাড়া এখন পরিণত হয়েছে ক্ষতে, যন্ত্রের তার হয়ে গিয়েছে বিশৃঙ্খল। আজ তুমি যে স্থরে তাকে বাজাতে চাও সে স্থরে সে বাজবে না।”

কানাই বল্লে—“কেন ?”

স্বজাতা বল্লে—“যে বর্ষণে কার্ত্তিকে বাড়ে হৈমন্তিক ফসল, অগ্রহায়ণে সে তাকে করে বিশীর্ণ। যে জলরাশি শুক্তিকে করে পালন সেই তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে' যদি পথ না পায় বের হয়ে যেতে, তবে সে হয়ে যায় মুক্তার ন্যায় কঠোর।”

কানাই রইল স্তব্ধ হয়ে। স্বজাতা বল্লে—“আজ তোমার আমার পথ হয়েছে নির্দ্দিষ্ট। এক তরীতে দিয়েছি দু'জনে ভাসান তুমি থাকবে হালের কাছে, আমি থাকব নৌকার ভিতরে। আমার কাছে তুমি এগিয়ে এলে নৌকা যাবে উল্টে। তুমি আমি দু'জনে উঠেছি দূরারোহ শৈলে। পিচ্ছিল সে শৈলের গাত্র। প্রণয় ব্যাপারের অনুকূল নয় সে স্থান, দু'জনেই যাব পড়ে' পা পিছ্‌লে অতল গহ্বরে। একটি কর্ম্মধারার মধ্যে আমাদের দু'টি চিত্ত ভেসে যাবে অকূল সমুদ্রের দিকে, ব্যক্তিগত স্থখসম্ভোগের সেখানে কোন স্থান নেই। আজ আমার এ যন্ত্র তুমি আর বাজাতে পারবে না তার আদিম স্থরে। হয় ত সে স্থরের রয়েছে এখনো রেশ, কিন্তু সে হারিয়েছে তার আদিপ্রকাশের মহিমা। আজও আমরা দু'জনে মিলিত, কিন্তু কঙ্কণসূত্রে নয়। এতে ক্ষোভ আছে, পরিতাপ আছে, কিন্তু এতে থাকবে না কোন ব্যর্থতা, থাকবে না কোন অনুশোচনা, কোন পরিদেবনা। আকাশের ধ্রুবতারা যেমন চেয়ে থাকে সপ্তর্ষির নয়নের দিকে তেমনি আমি চেয়ে থাকব তোমার দিকে। সে দৃষ্টিতে চিরকাল চলবে বিনিময়, কিন্তু লৌকিকভাবে কখনো হব না আমরা সংলগ্ন।”

কানাই বল্লে—"এ ত প্রেমের অভিশাপ।"

সুজাতা বল্লে—"এ অভিশাপ নয়, এ বরমাল্য। আমার হৃদয়ের মধ্যে আমি আবিষ্কার করেছি যে এতেই পাওয়া যাবে প্রেমের চির সঞ্জীবনী।"

কানাই রইল স্তব্ধ হয়ে। তার বুকের রক্ত আস্তে আস্তে নেমে আসতে লাগ্‌ল তার স্বাভাবিক সঞ্চরণে। পৃথিবীতে আবার হ'ল মদনভস্মের অভিনয়, তপস্যার মধ্যে প্রেমের সঞ্জীবন।

সুজাতা কানাইয়ের হাতখানি সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বল্লে—"এই হ'ল আমাদের পাণিগ্রহণ। বিবাহ যেখানে সম্পন্ন হয় বেদীর চারিদিকে সাত পা ফেলে, সেখানে আমরা চল্‌ব দূর দিগন্তের যাত্রায়, বিদ্যার বেদীমণ্ডপে, গুরুদেবকে সাক্ষী করে'। তাঁরই আদর্শিত পথে আমাদের দু'টি ধারা চিরকাল চলবে পাশাপাশি, চিরকাল করবে পরস্পরকে নিরীক্ষণ, নিরন্তর হবে কাছাকাছি, কিন্তু তাদের যথার্থ মিলন হবে বিদ্যা ও প্রেমের মহা-অন্তরের মধ্যে। তোমার ব্যক্তিত্ব হবে তোমার মধ্যে সম্পূর্ণ, আমার ব্যক্তিত্ব হবে আমার মধ্যে সম্পূর্ণ, অথচ উভয়ের ব্যক্তিত্ব আমরা পূর্ণ করব উভয়ের আস্বাদনে। গাছের সমস্ত রস যেমন পরিণত হয় মাধুর্য্যে তেমনি আমাদের পরস্পরের দৃষ্টির মধ্যে আমাদের জীবনের সমস্ত উপলব্ধি, সমস্ত আস্বাদন পূর্ণ হবে একটি অমৃতরসের আস্বাদে। বাইরে সকলে দেখবে দু'টি নদী পৃথক, কিন্তু ভিতরের ফল্গুধারায় আমাদের অন্তরের মধ্যে বইবে একটি স্রোত। আমাদের সেই স্রোতধারার মিলনের মধ্যে শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদধারা বর্ষিত হবে আমাদের উপরে। পরিবার গঠনের মধ্যে যে প্রাত্যহিক ক্লিন্নতা আছে তার থেকে মুক্ত থাকলেই আমাদের হৃদয়ের দু'টি বর্ত্তি জ্বলতে থাকবে উজ্জ্বল হয়ে আমাদের গুরুদেবের আরতির থালাতে।"

রাধাকৃষ্ণজীর মন্দিরে আরতির বাজনা উঠল বেজে। স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে সমস্ত বনভূমি তুললে একটি নবীন স্তুতিগান। আকাশে তখন চিত্রা নক্ষত্র গেছে চন্দ্রমাকে ছাড়িয়ে। তাদের জ্যোতির্বর্ষণ নিষিক্ত হ'ল সমস্ত ভুবনের উপর, নিষিক্ত হ'ল সুজাতা ও কানাইয়ের উপর। গ্রামের প্রান্ত থেকে একটি শঙ্খধ্বনির বিজয় ঘোষণা এসে পৌছল তাদের কানে।

শেষ